ব্রজবিদেহী মহন্ত

শ্রী১০৮ স্বামী

সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত

তদীয় শিষ্য

ব্রজবিদেহী মহন্ত

শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী মহারাজ প্রণীত

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৯৪০

মূল্য আড়াই টাকা

প্রকাশক
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এস্-সি.
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য
তাপসী প্রেস
৩০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওঁ শ্রীশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

নিবেদন

পরমারাধ্য শ্রী ১০৮ গুরুদেবের জীবন-চরিত প্রণয়ন কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা সত্ত্বেও গুরুভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক এই দুরূহ কর্ত্তব্যের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহারই অসীম কৃপায় এই কার্য্য আজ সমাপ্ত হইল। ইহাতে তিনি কতটুকু প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

এই স্থলে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে গ্রন্থ লেখার কার্য্যে আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা আন্তরিকতার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং কতক উপকরণও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাহায্য না পাইলে জীবন-চরিত প্রণয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইত। সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে তিনি অনিচ্ছুক থাকায় এখানে তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তথাপি তাঁহার প্রতি আমি যে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শ্রীগুরুদেব তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-বিধান করুন এই প্রার্থনা করিতেছি। অন্যান্য যাঁহারা জীবনীর উপকরণ প্রদান করিয়া অথবা সৎপরামর্শ দিয়া এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও আমি সাদরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

লোকোত্তরচরিত্র মহাপুরুষের এই জীবনী প্রণয়ন কার্য্যে অনেক প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, সহৃদয় পাঠকবর্গ কৃপাপূর্ব্বক নিজগুণে ক্ষমা করিবেন আশা করি। অলমতিবিস্তরেণ, ইতি।

শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম
পোঃ বৃন্দাবন, জিলা মথুরা
শ্রীশ্রীমহালয়া, ১৩৪৭ সাল

নিবেদক
শ্রীধনঞ্জয়দাস

বিষয়-সূচী

প্রথম খণ্ড

কর্তৃক পুনঃ খরচ প্রদান, ২৪—অশান্তি ও পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্যহানি, অপ্রস্তুত অবস্থায় বি.এ. পরীক্ষা দান ও সাফল্য লাভ, ২৫—পাশ্চাত্য দর্শনে এম.এ. পরীক্ষা দানের সঙ্কল্প, ২৬—সিটি স্কুলে শিক্ষকতা ও মজিলপুর স্কুলে হেডমাষ্টারী গ্রহণ, ২৭—এম.এ. পরীক্ষার জন্য কঠোর শ্রমে বিদ্যাভ্যাস, সঙ্গীত-চর্চা, ২৮—এম.এ. পরীক্ষায় সাফল্য লাভ, সিটি স্কুলে শিক্ষকতা ও নীতি-শিক্ষা প্রদান, ২৯—চরিত্রবলে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র দমন, ৩০—সিটি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য, ছাত্রদিগের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ, গৃহে ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দান, রাজনৈতিক আন্দোলন ও ভারত সভায় যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান, সংবাদপত্রে লিখন, ইংরাজী পত্রিকা সম্পাদন, ৩১-৩২—কর্ম্মবাহুল্যের মধ্যেও অবিরত আত্মচিন্তা, বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্র ও আন্তরিক ধর্ম্মভাব, ধর্ম্ম প্রচারে নিজের উৎসাহ ও অপরকে উৎসাহ দান।

তৃতীয় অধ্যায়—আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন : যোগী সম্প্রদায়ে প্রবেশ। ৩৩—দেশের বাড়ীতে গমন, পৃথক্‌ভাবে আহার ও অবস্থান, তৎপূর্ব্বেই জনৈক পণ্ডিত সহ পিতার কলিকাতায় ও কাশীতে গমন, ৩৪-৩৫—কাশীতে জ্বররোগগ্রস্ত পিতার নিকটে গমন, দেবদর্শন, বৈদান্তিকের সহিত ও ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক-বিতর্কেও মতের অপরিবর্ত্তন, ৩৬—জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাস, ৩৭-৩৮—পিতার সঙ্গে আগত পণ্ডিতের সহিত ভাস্করানন্দ স্বামীর সমক্ষে ধর্ম্ম-বিচার, ৩৯—স্বামীজী কর্ত্তৃক উভয়ের প্রশংসা, স্বামীজীর মতামত প্রকাশে বিরতি, ৪০—স্বামীজীর প্রতি আকর্ষণ ও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে গমন, রাজার সহিত কথাবার্ত্তা, স্বামীজীর প্রতি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লাভ, ৪১—ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন, ৪২—পিতার সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন, ৪৩-৪৪—'ষ্টেট্‌সম্যানে' সার্কাসের বিবরণ পাঠ, গুরুশক্তির প্রতি বিশ্বাসের

সঞ্চার, ৪৫—আভ্যন্তরীণ তড়িৎ-শক্তির প্রভাব বিষয়ে চিন্তা, আলোচনার ফলে মানসিক ভাবের বিচিত্র পরিবর্ত্তন, খাদ্যাখাদ্য, জাতি বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বতন ধারণার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি, ৪৬—পুনঃ পুনঃ চিন্তার ফলে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা, হিন্দু আচার ত্যাগের অবৈধতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, বিলাত গমন ও প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দানের সঙ্কল্প ত্যাগ, বন্ধুর সহিত গুরুশক্তি সম্বন্ধে আলাপ, শক্তিশালী-মহাজনের সন্ধান লাভ, ৪৭—দেশে গমন, মানসিক পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও হিন্দু-সমাজে পুনঃ প্রবেশের অনিচ্ছা, পিতার অনুরোধেও উপবীত গ্রহণে অসম্মতি, স্ত্রীর পিত্রালয় হইতে আগমন ও শ্বশুরালয়ে বাসের অনিচ্ছা, ৪৮—কলিকাতায় প্রত্যাগমন, যোগীসম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক মহাজনের শিষ্যত্বগ্রহণ ও প্রাণায়াম সাধন, ৪৯—সাধনশক্তির প্রকাশ, ৫০—ষটচক্রভেদ, পুনরায় ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যোগ রক্ষা, স্ত্রীর সহিত পিতার কলিকাতায় আগমন ও সকলের একত্র বাস, ৫১—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর যোগী সম্প্রদায়ের সাধন লাভ, কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপর সাধনশক্তির প্রভাব, ৫২—কর্ণেল অল্‌কট্ ও ভারতীয় মহাপুরুষ, ৫৩-৫৫—মাদ্রাজী খৃষ্টানের অগস্ত্যঋষির আশ্রমে গমন ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন, ঋষিদিগের প্রতি দৃঢ় আস্থা ও ভক্তির সঞ্চার, আধ্যাত্মিক চিন্তার ফলে ক্রমিক পরিবর্ত্তন, আত্মচিন্তার সুবিধার জন্য সময়ে সময়ে কলিকাতার বাহিরে গমন, ৫৬—পিতার সহিত শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে গমন, গঙ্গাস্নান ও পিতার অনুরোধে উপবীত ধারণ, ৫৭—মনে মনে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ, ৫৮—ব্রাহ্ম সমাজের অপূর্ণতা বিষয়ে তত্ত্বকৌমুদীতে দীর্ঘ পত্র প্রকাশ, সিটি কলেজের কর্ম্ম ত্যাগ, ৫৯—গৃহ শিক্ষকের কার্য্যে ও ব্যাখ্যা পুস্তক প্রণয়নে অর্থাগম।

চতুর্থ অধ্যায়—শ্রীহট্টে ওকালতি : হিন্দু সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন।

সস্ত্রীক বৃন্দাবনে গমন, দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়া, ১১২-১১—স্বামী-স্ত্রীর দীক্ষালাভ, ব্রজপরিক্রমা, কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—উকিলরূপে। ১১৭—ওকালতিতে শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিপিন পালের মত, ১১৮-২০—স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত, ডক্টর স্যার রাসবিহারী ঘোষের উচ্চ ধারণা, ১২১-২২—ব্রজলাল শাস্ত্রীর মত, ১২৩-২৪—কার্য্যদক্ষতায় ও গুণবত্তায় জজ নরিস সাহেবের সন্তোষ ও শ্রদ্ধা, ওকালতিতে অল্প সময় ও অখণ্ড মনোযোগ দান, ১২৫-২৬—শরৎচন্দ্র ধরের লিখিত বিবরণ, অধ্যাত্ম চিন্তায় অধিকাংশ সময় ব্যয়, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রত্যাখ্যান, দরিদ্রের মোকদ্দমা বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালন, শেষ অবস্থায় ওকালতিতে বিপুল পসার, ১২৭—অসাধারণ সততা, সাধুতা সম্বন্ধে রামলাল মিত্রের বর্ণিত বিবরণ, ১২৮—স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সকল কথা প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় যুক্তির প্রাধান্য স্থাপন, ১২৯-৩০—মোকদ্দমায় জোর না থাকিলে ফী প্রত্যর্পণ, চুক্তির অতিরিক্ত ফী গ্রহণে অসম্মতি, মোকদ্দমা আপোষে মীমাংসার চেষ্টা, ১৩১—মক্কেলরূপী ভগবানের সেবা, ১৩২—নব্য উকিলদিগকে শিক্ষা-দান, সময়ে সময়ে শাসন ও সাহায্য, ১৩৩—হাইকোর্টের লাইব্রেরীতে সমাজ-গঠন, সৎপ্রসঙ্গ, অনেকের মনে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ওকালতিসম্পর্কে উপদেশ, ১৩৪-৩৫—স্বপ্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে সূক্ষ্ম যুক্তির সমাবেশ, যুক্তিমূলে শিক্ষিত সমাজের বিবিধ প্রশ্নের সমাধান।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। ১৩৬—প্রগাঢ়

তৃতীয় অধ্যায়—সাধনার দিক। ২০১—পূজার বন্ধে বৃন্দাবনে গমন, ব্রজ-পরিক্রমা ও দীপমালা দর্শন, ২০২—গুরু কৃপায় সাধুগণসহ ব্রজ-পরিক্রমার সুযোগ লাভ, পথিমধ্যে গুরুদেবের ও অপরের বিশ্রামের নিপুণ ব্যবস্থা, গুরুসেবা, ২০৩—গুরুসেবার্থে ঋণ করিয়া মাসিক টাকা প্রেরণ, ঋণ করিয়া বৃন্দাবনে গমন, ২০৪—গুরুদেবের আদেশানুযায়ী দ্রব্য ক্রয়, ২০৫—দ্রব্য ক্রয়ে সমস্ত অর্থ নিঃশেষ, দোকানদার হইতে ধারে দ্রব্য ক্রয় ও ব্রজপরিক্রমার ব্যয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ, ২০৬-২০৯—গুরুদেব কর্তৃক নিজের ও স্ত্রীর নিষ্ঠা পরীক্ষা, ২১০—পরীক্ষায় উত্তরণ, গুরুদেবের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে গুরুদেবের বিদায়বাণী, কলিকাতায় আগমনের পর উত্তরোত্তর ঋণ বৃদ্ধি, মোকদ্দমার ফাঁদে ঋণ শোধ, ২১১—গুরুদেবের পত্র লাভে আনন্দোচ্ছ্বাস, ২১২—অপূর্ব্ব গুরুভক্তি, গুরুদেবের স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যগ্রতা, ২১৩—গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে উপলব্ধি, বৃন্দাবনে ঠাকুরজীর মন্দির নির্ম্মাণ, ২১৪—গুরুদেবের আদেশে ঠাকুরজীর নিকটে বর প্রার্থনা, ২১৫—গুরুদেবের বর প্রদান, ২১৬—ব্রজ-পরিক্রমায় কৃষ্ণলীলা দর্শন, ২১৭—কৃষ্ণ বলরামের জিলাপী ভক্ষণ, ২১৮—একাদশী তিথিতে খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান না হওয়ায় সমগ্র দিন নিরম্বু উপবাস, ২১৯—মধ্যরাত্রে দুধের লোটাসহ বালকের আগমন ও দুগ্ধ প্রদানান্তে অন্তর্দ্ধান, দুধের অপূর্ব্ব স্বাদ, ২২০—বৈরাগ্য-বশতঃ সংসার ত্যাগপূর্ব্বক গুরুর চরণাশ্রয়ে বাসের সঙ্কল্প, স্ত্রীর ভবিষ্যতে ভরণপোষণের ব্যবস্থা, চতুর্ভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন ও সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প-ত্যাগ, ২২১—নিয়মিত সাধন-ভজন, বৃন্দাবন-বাস সম্বন্ধে গুরুদেবের বাণীর সাফল্যের প্রতীক্ষায় অবস্থান।

চতুর্থ অধ্যায়—বৃন্দাবনে আশ্রম-নির্ম্মাণ। ২২২—বৃন্দাবনে বৃহৎ মন্দির ও 'নিম্বার্কাশ্রম' প্রতিষ্ঠা, গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য,

গুরুদেবের দেহরক্ষা, ২২৩-২৪—আশ্রম নির্ম্মাণের ব্যবস্থা, প্রথম অবস্থায় গুরুদেবের তত্ত্বাবধান, যাট হাজার টাকা ব্যয়ে আশ্রম নির্ম্মাণ, ২২৫—আশ্রমের বর্ণনা, আশ্রম প্রতিষ্ঠা, ২২৬—প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্যাপকভাবে নিমন্ত্রণ, প্রতিষ্ঠার সময় প্রচুর অর্থাগম, ২২৭—প্রতিষ্ঠা-উৎসবে মৃত ব্যক্তির সমাগম সম্বন্ধে বার্ত্তা, ২২৮—বাসায় সমবেত লোকদিগের বৃন্দাবন গমনের ব্যয়ভার বহন ও যাত্রীদের জন্য সুবন্দোবস্ত, ২২৯—উৎসবকালে সুব্যবস্থা, ২৩০—কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রা, সুশৃঙ্খলায় কার্য্য নির্ব্বাহ, অভিষেক, ২৩১—অসংখ্য লোককে প্রসাদ ও কাঙ্গালীদিগকে পয়সা বিতরণ, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন।

পঞ্চম অধ্যায়—বানপ্রস্থ। ২৩২—সংসারত্যাগপূর্ব্বক সাধন-ভজনের সঙ্কল্প, ঋণ শোধের জন্য আকুলতা, ২৩৩—গুরুবাক্যের সফলতার জন্য প্রতীক্ষা, ঋণ শোধ, সস্ত্রীক বৃন্দাবনযাত্রা, ২৩৪—যোগারূঢ় অবস্থা ও কর্ম্মত্যাগ, ২৩৫—বিশ্বের সহিত চিত্তের যোগ, নিজের প্রতি অপরের আসক্তিরূপ অন্তরায় ২৩৬—ভ্রাতৃগণকে পৈত্রিক সম্পত্তি দান, দুর্ভিক্ষে সাহায্য, বিপুল উপার্জ্জন ও ঋণমুক্তি, ২৩৭—হাইকোর্ট ত্যাগকালে বার লাইব্রেরীতে করুণ দৃশ্য, ২৩৮—বিদায়কালে স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ২৩৯—সাহায্যপ্রাপ্ত ও সাহায্যার্থীদিগকে সংসারত্যাগের পূর্ব্বে এককালীন দান ও বিদায়গ্রহণ, ২৪০—বৃন্দাবনযাত্রা, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় বা বিতরণে সর্ব্বরিক্ত অবস্থা, ২৪০-৪১—নিষ্কিঞ্চনভাবে বৃন্দাবনে বাস ও ভিক্ষান্নে কালাতিপাতের মনোভাব, অর্থের প্রতি নিস্পৃহতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়—শ্রীবৃন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র সাধনা ও সিদ্ধি। ২৪২—বৃন্দাবন আশ্রমে সস্ত্রীক বাস, স্বহস্তে সেবাপূজা, ধ্যানজপে সময় যাপন, সহধর্ম্মিণীর সেবাকার্য্যে সহায়তা, স্ত্রীর কাশীধামে গমনের পর নিজ হস্তে সকল প্রকার কার্য্য সমাপন, সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক ভজন,

তৃতীয় খণ্ড

পরিশিষ্ট (ক)

পরিশিষ্ট (খ)

৫১১-১২—স্বামী রামদাসজী, ৫১৩-১৪—স্বামী কৃষ্ণদাসজী (সিদ্ধ বাবা), ৫১৪-১৬—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

পরিশিষ্ট (গ)

৫১৭-২১—কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের মর্ম্মস্পর্শী শ্রদ্ধাভিব্যক্তি, ৫২২-৩০—স্মৃতিসভার বিবরণী।

শুদ্ধিপত্র—৫৩১-৩২



[illegible]

প্রথম খণ্ড

ওঁ শ্রীশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রী ১০৮ স্বামী

সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও বাল্যাবস্থা

শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমান্তর্গত বামৈ গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বাঙ্গালা ১২৬৬ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ* রাত্রিকালে জন্মগ্রহণ করেন। এইদিন দশহরা যোগ ছিল।

বামৈ গ্রামের চৌধুরী বংশ তদঞ্চলে সুপরিচিত ও বিশেষ সম্মানিত। ইঁহারা অনেকদিনের বনিয়াদী ঘর ও প্রতাপশালী জমিদার, তদুপরি শুদ্ধাচার ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। এই বংশে বহু সাধক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কয়েকজন মহাত্মা শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কুলকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ চৌধুরী, রামগোবিন্দ চৌধুরী ও গৌরীচরণ চৌধুরী মহাশয়গণের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রবাদ আছে, গঙ্গাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় শ্রীশ্রীকালী মাতার দর্শন লাভ করেন; দেবীর কৃপায় তাঁহার সদ্গুরু লাভ হয়, অনন্তর তিনি হিমালয়ে গিয়া কঠোর তপশ্চরণপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ (ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ)।

* ইংরাজী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন, শুক্রবার।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের জন্মস্থান হইতে প্রাপ্ত বংশ-তালিকা দৃষ্টে অনুমান হয়, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশের মূল পুরুষ দেশমুখ্য মিশ্র কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া বামৈ গ্রামে বসবাস করেন। তাঁহা হইতে বর্ত্তমানে প্রায় ষাট ঘর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইঁহারা গৌতমগোত্রীয় বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই বংশের স্বর্গীয় হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় নিরামিষাশী, একাহারী বৈষ্ণব ভাগবত ছিলেন। চৌধুরীবংশ কুলক্রমে শাক্ত, তন্মধ্যে একমাত্র ইনিই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহার ঔরসে স্বর্গীয়া গিরিজাসুন্দরী দেবীর গর্ভে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। অন্নপ্রাশন কালে তাঁহার নাম রাখা হয় "তারাকিশোর"।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শিশুকালে তাঁহার পিতার এক বৃদ্ধা জেঠাইমা ছিলেন। এই ঠাকুরমাই তাঁহাকে লালনপালন করেন। ইঁহার নিকট তিনি প্রায় সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারতের কথা শিখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর ঠাকুরমার নিকট গিয়া বসিতেন এবং তিনিও আদর করিয়া রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের অনেক গল্প বলিতেন। আহ্লাদের সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে বালক তাঁহার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িতেন। প্রায় প্রতিদিনই এইরকম হইত। এইরূপে অতি শৈশবেই রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানভাগ এবং শাস্ত্রের অনেক বিষয় বালকের মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল এবং স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকায় আজীবন তাহা স্মরণ ছিল। তাহার কোন কোন কথা "ঠিক সেইরূপেই এখনও মনে আছে" বলিয়া আমাদের নিকট দেহরক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বেও বলিয়াছেন।

তিনি বালককালে অতি চঞ্চলপ্রকৃতি কিন্তু সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দীননাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে

বিদ্যাভ্যাস করাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। সেকালে ভদ্র গৃহস্থ ঘরে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচিত হইত। বিশেষতঃ শৌচাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে বয়স্ক গুরুজনেরা সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করিতেন, সন্তান শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হউক, তাহা দ্বারা বংশের সংস্কার সকল রক্ষিত হউক, তবেই তাহার হাতের জলপিণ্ড পিতৃপুরুষগণ ও নিজেরা পাইবেন। এজন্য তদুপযুক্ত করিয়া ছেলেকে গড়িয়া তুলিতে গুরুজনেরা বিশেষ যত্ন লইতেন।

ছয় বৎসর বয়সে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দীননাথ চৌধুরী মহাশয় বর্ণপরিচয়, নামতা প্রভৃতি শিখাইতেন, জ্ঞাতি ঠাকুরদাদা ঈশ্বর চৌধুরী মহাশয় এবং কখন কখন বাড়ীর অপর লোকেও আদর করিয়া তাঁহাকে সংস্কৃত শ্লোক শিখাইতেন। এই রকম অন্য ছেলেরাও শিখিত। এক একদিন বাড়ীর সব ছেলেকে লইয়া কে কত শ্লোক শিখিয়াছে, তাহার পরীক্ষা হইত। একজন একটি শ্লোক বলিলে তাহার শেষবর্ণ আদিবর্ণ হয়, এমন শ্লোক আর একজনকে বলিতে হইবে। যে না পারিবে, তাহার হার হইবে, এই রকম নিয়ম ছিল। এইভাবে অনেক শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। * দুই তিন বার একটি শ্লোক শুনিলেই তাহা তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত।

* এই রকম নানা কৌশলে বৃদ্ধেরা বাটীর ছেলেদের সংস্কৃত শ্লোক শিখাইতেন। সংস্কৃত ও ভাষায় আদি শ্লোক বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে, আদিকবি বাল্মীকিকৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দের সেই—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ (রামায়ণ, দ্বিতীয় সর্গ)

শ্লোকটি প্রত্যেক ছেলেকে সর্ব্বপ্রথমে শিখিতে হইত।

চৌধুরী-বাটীর নিকটে একটি চতুষ্পাঠী ছিল। সেখানকার অনেক ছাত্র এ বাটীতে থাকিতেন; তাঁহারাও শ্লোক শিখাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলাপ ব্যাকরণ পড়িতেন, কলাপ ব্যাকরণের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা সেই সকল ছাত্রেরা তাঁহাকে মুখস্থ করাইয়া দিয়াছিলেন।

সকাল বেলায় সাধারণতঃ হাতের লেখা অভ্যাস করিতেন। তখনকার দিনে লিপিশিক্ষা আজকালকার মত সহজ ছিল না, বহু আয়াসে দীর্ঘকালের সাধনার বিষয় ছিল। প্রথমে আঙ্গুল দিয়া মাটিতে, তারপর বাঁশের কঞ্চির কলম দিয়া মাটিতে, তারপর খাগের (শরের) কলম আর ঘরে তৈরী ভূষোর কালি দিয়া কলার পাতে, তারপর তাল-পাতায় লিখিতে হইত। কালি দোকানে কিনিতে পাওয়া যাইত না, নানা-রকমের কালি ঘরেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইত। ইহার পরে 'ভুটিয়া' * কাগজে খাগের কলম ও পরে ময়ূর কিংবা হাঁসের পালকের কলম (ইহাকে পেনের কলম বলা হইত) দিয়া লিখা অভ্যাস করিতে হইত। এই সকল ধাপের এক একটি ভালরূপ অভ্যস্ত ও আয়ত্ত হইলে তাহার পরেরটিতে অধিকার পাওয়া যাইত এবং এইরূপে এইসকল সাধনভূমি ক্রমে ক্রমে পার হইয়া অবশেষে পেনের কলম দ্বারা শ্রীরামপুরী কাগজে লিখিবার অধিকার পাওয়া যাইত। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও এইরূপেই লিখিতে শিখিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কখনও কখনও তাঁহার বাল্যকালের কথা প্রসঙ্গক্রমে গল্পচ্ছলে আমাদিগের নিকট বলিতেন। তাহা আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, এই স্থলে তাঁহার কথাই কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

---

* দেখিতে অনেকটা বালির কাগজের মত রং খুব পুরু একপ্রকার কাগজ। তখন ইহার খুব প্রচলন ছিল, আজকাল বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

"বাল্যকালে আমার স্বভাব অতিশয় চঞ্চল ছিল। আমার সম্বন্ধে সকলেই বলিতেন 'এ অতি চঞ্চল ছেলে'। একস্থানে দীর্ঘকাল আমি বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। পিতাকে অতিশয় ভয় করিতাম। তিনি আমাকে দেখিলেই অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এজন্য পারতপক্ষে তাঁহার কাছে যাইতাম না, দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতাম। কোন কারণ বশতঃ তাঁহার নিকটে গিয়া বসিতে হইলে ভয়ে ভয়ে জুজুর মত বসিতাম। কিন্তু এইরূপ স্থির হইয়া বসিয়া থাকা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল, হয়ত অল্পকাল পরেই আমি পা নাচাইতে আরম্ভ করিলাম, তিনিও অমনি তাড়া করিলেন।

"গ্রামে নানারকম খেলা তখন প্রচলিত ছিল। সমস্ত খেলাতেই সমবয়স্ক ও অধিকবয়স্ক বালকদিগের সহিত আমি যোগ দিতাম। দাঁড়াগুটি, চাম্পাদাঁড়া (যাহাতে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বল ব্যবহার হয়), ছিমালি (হাডুডু), জলে সাঁতার, গাছে চড়া প্রভৃতি সকল খেলাই আমার প্রিয় ছিল। পিতা যখন বাটীর বাহিরের প্রাঙ্গণে বসিয়া থাকিতেন, আমি তখন পলাইয়া অন্যদিক্ দিয়া চলিয়া যাইতাম। খেলার স্থানে দূর হইতে পিতাকে দেখিলে পলাইয়া যাইতাম এবং লুকাইতে চেষ্টা করিতাম। একদিন চাম্পাদাঁড়া খেলায় কাঠের বল মাথায় পড়িয়া সেই জায়গা ফুলিয়া উঠিল। তাহাতে যে ক্লেশ হইল তাহা গ্রাহ্য না করিয়া এই ভয়ে সর্ব্বক্ষণ ভীত হইতে লাগিলাম যে, পিতা দেখিলে প্রহার করিবেন। তখন শীতকাল। শীতকালে বৃদ্ধেরা যেমন বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া রাখেন, মাথার ফুলা ঢাকিবার জন্য আমিও সেই রকম কাপড় দিয়া মাথা ঢাকিয়া রাখিলাম। ফুলা দুই তিন দিন ছিল, সুতরাং প্রকাশ হইয়া পড়িল। পিতাও খুব তর্জ্জন করিয়া "কেন খেলায় গিয়াছিলি" বলিয়া শাসন করিয়াছিলেন।

"আমাদের গ্রামের অনতিদূরস্থ নদীতীরে ব্রহ্মপুত্রস্নানের দিন এক মেলা বসিত। সেই মেলায় ছোট ছোট লোহার ছুরি অনেক বিক্রয় হইত। তখন চৈত্র মাস, গাছে গাছে আমের গুটি হওয়ায় তাহা তলায় ঝরিয়া পড়ে। এই সকল কচি আম বালকদের অতি প্রিয় খাদ্য। গ্রামে আম গাছ অনেক ছিল, বালকেরা সুযোগ পাইলেই গাছতলায় গিয়া আম কুড়াইয়া খাইত। "টিকরা" (গুটি) আমের খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইবার নিমিত্ত অভিভাবকেরা প্রতিবৎসর মেলা হইতে ছুরি আনিয়া দিতেন। একবার আমিও এইরূপ একখানি ছুরি পাইয়াছিলাম। এক দিন এক জ্ঞাতির বাড়ীতে বাহিরে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছি; দেখিলাম, তথায় একটি 'আইল্লা' রহিয়াছে। মাটির হাড়ীতে তুষ ভরিয়া তাহার উপর একখানি জ্বলন্ত কাঠের চেলা রাখিয়া দেয়, তাঁহাতে তুষ ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকে ও সমস্ত দিন অগ্নি থাকে। ইহাকে ঐ অঞ্চলে 'আইল্লা' বলে। ইহার একটি সম্মুখে রহিয়াছে দেখিয়া আমার হাতে যে চাকুখানা ছিল, তাহা উহার মধ্যে পুতিয়া দিলাম। কিছু মতলব করিয়া যে ঐরূপ করিলাম তাহা নহে, চঞ্চল স্বভাব বশতঃ একটা কিছু করিতে হইবে বলিয়াই করিলাম। কিছু গরম হইয়া উঠিলে চাকু উঠাইয়া লইলাম। আমা হইতে পাঁচ ছয় বছরের বড় একটি ছেলে নিকটে বসিয়াছিল। হঠাৎ তাহার উরুর উপর গরম চাকু ধরিয়া দিলাম। কোন বিদ্বেষবশতঃ যে আমি উহার গায়ে গরম ছুরি ধরিয়াছিলাম তাহা নহে, এমনি চঞ্চল স্বভাব বশতঃ কিছু না ভাবিয়াই হঠাৎ ঐরূপ করিয়াছিলাম। ছেলেটি লাফাইয়া উঠিল এবং ক্লেশ পাইয়া বলিল, "এখনি তোমার বাবাকে বলিয়া দিতেছি।" পিতার নিকট বলিবে শুনিয়া আমি ভয়ে অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িলাম এবং কি যে করিব তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ভাগ্যক্রমে

পিতা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। ছেলেটি অগত্যা বাড়ীর মেয়েদের নিকটে গিয়া বলিল। আমি বাড়ী না গিয়া দীর্ঘকাল পলাইয়া রহিলাম। খাইবার সময় অতীত হইবার অনেক পরে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বাড়ীতে যাইতে বাধ্য হইলাম। মেয়েরা আমাকে অনেক তিরস্কার করিলেন, কিন্তু পিতার কাছে প্রকাশ না করাতে আর মার খাইতে হইল না।"

সাত বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ গ্রামস্থ ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও অঙ্ক শিক্ষা আরম্ভ হইল। ধারাপাত ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর বৎসরই লস্করপুরে মহকুমার * স্কুলে পড়িতে গেলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দীননাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে মহকুমার নিকটবর্ত্তী যাত্রা গ্রামে ৺গৌরচন্দ্র কবিরাজের বাটীতে রাখিয়া আসিলেন। তখন তথায় যাইবার কোন প্রকার যান ছিল না; সুতরাং পায়ে হাঁটিয়াই এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

নয় বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। শেষ রাত্রিতে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন, কে একজন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে! তোর মা মারা যাচ্ছে, দেখে যা।" ডাক শুনিয়া তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাতার নিস্পন্দ দেহ পড়িয়া আছে, একটু কিসের অপেক্ষায় প্রাণ বহির্গত হইতেছে না। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন, দেহত্যাগের পূর্ব্বে শেষ জলবিন্দু পুত্রের হাতে পাওয়া দরকার। তিনি সকলের অনুরোধক্রমে মাতার মুখে জল দেওয়া মাত্রই তাঁহার দেহত্যাগ হইল।

এই বিষয়ে তিনি কথাপ্রসঙ্গে একসময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, এই ঘটনায় তখন তাঁহার তেমন দুঃখ হয় নাই। সাধারণতঃ নয় দশ

* তখন হবিগঞ্জে মহকুমা স্থাপিত হয় নাই।

বৎসর বয়সে বালকেরা মাতৃবিয়োগ ব্যথা কি তাহা বুঝে। কিন্তু শৈশব-কাল হইতেই মৃত্যুজনিত শোক তাঁহার মনের উপর ক্রিয়া করিত না। তিনি বলিয়াছেন "মৃত্যুকেও জন্মের মতই স্বাভাবিক বলিয়া আমার বোধ হইত।"

এই প্রসঙ্গে তাঁহার বাল্যকালের আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার একটি ভগিনীকে তিনি খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহার মৃত্যুতে তাঁহার শোক হয় নাই। অপরে কি মনে করিবে ভাবিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়াছিলেন মাত্র।

দশ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীহট্ট সহরে পড়িতে যান। সেখানে মিশন স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এই স্কুল হইতেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইংরাজী ১৮৭৪ সালে (বাং ১২৮১) চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় আসাম প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পনর টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

তাঁহার এই সময়ের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কখন কখন আমাদিগকে কিছু বলিয়াছেন। তিনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন এবং অধ্যয়নেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। শ্রীহট্ট সহরে পড়িতে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার উপনয়ন হইয়াছিল; তদবধি নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা করিতেন, সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। সহরে আসিয়া এই দশ বৎসর বয়সেও তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন, অনেক সময় অপরকেও খাওয়াইতেন। এই সকল করিয়া অবশিষ্ট সময়ে তিনি পাঠাভ্যাস করিতেন। রাঁধিবার সময়ে পাক চড়াইয়া দিয়া একটু দূরে একখানি চৌকীতে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বৎসরই তাঁহার বিবাহ হয়। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী অন্নদা দেবী খেজুড়া গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ বিশারদবংশীয়

স্বর্গীয় হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের প্রথমা কন্যা ছিলেন। এই কন্যার জন্মের পর হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়—নানা সূত্রে অর্থাগম হইতে থাকে, এজন্য আদর করিয়া তিনি মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন "অন্নদা"। যতদিন শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী বাঁচিয়াছিলেন, ততদিনই নানা প্রকারে এই নামের সার্থকতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

প্রচুর আড়ম্বর ও সমারোহের সহিত এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর একমাত্র ভ্রাতা এখনও জীবিত আছেন। তিনি বলেন—"তখনকার বিবাহ উৎসব বর্ত্তমান কালের মত কেবল একপক্ষের উপর অপর পক্ষের দাবী দাওয়াতেই পর্য্যবসিত হইত না। পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে উৎসব লইয়া প্রতিযোগিতামূলক এক সংগ্রাম বাধিয়া যাইত। এক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ জমিদার, প্রজাদের সকলেরই বিবাহে যাওয়া চাই, কয়েকখানা খুব বড় বড় বাইচের নৌকা আনিয়া তাহা সুসজ্জিত করা হইল এবং তাহাতে সমস্ত লোকজন লইয়া বরকর্ত্তাগণ কন্যাপক্ষের বাড়ীতে গেলেন। অভ্যর্থনার জন্য কন্যাপক্ষও যথোচিত আয়োজন করিয়াছিলেন এবং উৎসব ব্যাপারে তাঁহারাও প্রতিযোগিতার ত্রুটি করেন নাই। এই বিবাহ ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব আমার এই দিদিকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তাই স্বয়ং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও বিবাহে সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়া মেয়েকে জমিদারের ঘরে দিয়াছিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিকাতায় পঠদ্দশা : ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এফ্. এ. পড়িবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। সেকালে সাধারণতঃ এক এক জেলার ছাত্রগণ একত্রিত হইয়া ছাত্রাবাস গঠিত করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেন। প্রথিতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস ও দেশনেতা স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল (দু'জনেই তখন কলেজের ছাত্র) এবং শ্রীহট্ট জেলার আরও কতিপয় ছাত্র মিলিয়া নিমু খানসামা লেনে এক মেস করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও সেই ছাত্রাবাসে আসিয়া উঠিলেন।

শ্রীহট্টে থাকিয়া পড়িবার সময় তিনি যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আচার সকল দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন, এখানে আসিয়াও তদ্রূপই করিতে লাগিলেন। নিয়মিতরূপে ত্রিসন্ধ্যা করিতেন, শূদ্রান্ন গ্রহণ করিতেন না। এই ছাত্রাবাসে কিছুকাল বাস করিবার পর তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। স্বর্গীয় দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই সময়ে তাঁহার তরুণ হৃদয়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আচার ব্যবহারের প্রতি ক্রমশঃ আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, কায়মনোবাক্যে তাহারই অনুসরণ করিতেন। সম্পূর্ণ নিষ্কপট

ব্যবহার, সম্যক্‌রূপে নিজের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণ চিরদিন তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই ইহা জানেন। কাজেই, যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আচারসমূহের প্রতি তাঁহার আস্থা তিরোহিত হইল, তখন সে সকল তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। অথচ ইনিই শ্রীহট্টে থাকিয়া পড়িবার সময় দশ বৎসর বয়সেও স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়া পড়াশুনা করিতেন।

এই সময়ে তিনি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। দেশের বাটীতে পিতা তাঁহার এই সকল পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার খরচ পাঠান বন্ধ করিয়া দিলেন। অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া খরচ কমাইবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে * আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন, কিন্তু কেমিষ্ট্রি (রসায়ন শাস্ত্র) পড়িবার জন্য তখনও প্রেসিডেন্সি কলেজেই যাইতেন।

এই সকল পরিবর্ত্তন ও অর্থাভাবজনিত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পর বৎসর এই কলেজ হইতেই এফ্. এ. পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ২০৲ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইলেন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। এফ্. এ. পরীক্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ব্বাচনী (test) পরীক্ষায় সুরেন্দ্রনাথের পরীক্ষিত বিষয়ে তাঁহার লিখিত উত্তরসমূহ এত ভাল হইয়াছিল যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার খাতাখানি সকলকে দেখাইয়াছিলেন। এফ্. এ. পরীক্ষায় ফল ভাল হওয়াতে তাঁহার পিতা সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় খরচ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং তিনিও অর্থাভাব হইতে অব্যাহতি পাইয়া পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজেই তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন।

* তদানীন্তন নাম মেট্রোপলিটান কলেজ।

তাঁহার চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই সময়কার ছাত্রজীবনেই প্রকাশ পাইয়াছিল—ইহা তাঁহার চিন্তাশীলতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য তাঁহার কখনও ছিল না। প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে হিন্দুয়ানী পরিত্যাগ করিবার পর, ব্রাহ্মসমাজ ও খৃষ্টানী আন্দোলন হইতে দূরে থাকিলেও একেশ্বরবাদ (Monotheistic view) তাঁহার চিত্তকে দৃঢ়রূপে অধিকার করে। কিছুকাল পরে ক্রমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে তিনি কিছুকাল পর্য্যন্ত নিরীশ্বরবাদী (Agnostic) * হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই অবস্থায় একটি ঘটনাদৃষ্টে তাঁহার এই নাস্তিকতা দূর হইয়া ক্রমে আস্তিক্যবুদ্ধি আসে ও তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বর্ণনা প্রায় তাঁহারই ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় আমার জনৈক বন্ধু ৺দ্বিজদাস দত্ত অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে একদিন দেখিতে গেলাম। তিনি তখন ৩নং মুসলমানপাড়া লেনে ঢাকার ছাত্রদের মেসে থাকিতেন। আমি গিয়া দেখিলাম তিনি জ্বরে শয্যাগত আছেন; অতি-শয় কাতর ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, 'আমি অতিশয় যাতনা ভোগ করিতেছি। সকলেই আপন আপন পাঠ লইয়া ব্যস্ত, আমার নিকট বসিয়া থাকিবে কে? যাতনা এত অধিক হইয়াছিল যে, আত্মহত্যা করিয়া ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা শ্রেয়স্কর বোধ করিয়াছিলাম। কেবল ভগবদুপাসনায় শান্তিলাভ করিয়া জীবিত আছি এবং ক্লেশকেও ক্লেশ বলিয়া বোধ

---

* Agnosticismকে বাঙ্গালায় অজ্ঞেয়বাদ অথবা সন্দেহবাদ বলা হয়।

করিতেছি না।' এইরূপ কথোপকথন উপলক্ষে আরও বলিলেন যে, এই ব্যারামের সময়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি ভগবৎকৃপা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছেন, অন্য সময়ে এরূপ উপলব্ধি করেন না। গদ্‌গদস্বরে তিনি এই সকল কথা এমন করিয়া বলিলেন যে, আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া চলিয়া আসিবার পরও তাঁহার কথা আমার উপর কার্য্য করিতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, কেবল ইনি নহেন, বহু বহু মহাজন পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে, ভগবৎকৃপা তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন এবং তাহাতে শান্তিলাভ করিয়াছেন। আমি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধ আছি তাহাতে আমার অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। মহাজনদিগের সাক্ষাৎ অনুভূতি অগ্রাহ্য করিবার সঙ্গত কারণ দেখিতেছি না। আমি যে তাঁহাকে জানিতেছি না তাহা তাঁহার অনুসন্ধান ও ভজন করিতেছি না বলিয়াই বুঝিতে হইবে। আমাদের দেশে পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে বহুলোকেই ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি চলিয়া আসিয়াছে। সকল দেশেই এইরূপ মহাজন অনেক হইয়াছেন ও তাঁহারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে স্থাপন করা যায় না ইহা সত্য—বাস্তবিক আত্মা প্রভৃতি অদৃশ্য বিষয়ে কেবল তর্কের দ্বারা যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে না। যে সকল মহাত্মা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে মিথ্যা বলিয়াছেন এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার চিন্তনে মাত্র এত অশান্তি দূর হইতে পারে—আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, এক ব্যক্তি শারীরিক যন্ত্রণায় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিবার ইচ্ছা মনে উদিত হওয়ার পরেও তাঁহার কেবল ভগবচ্চিন্তার ফলে রোগযন্ত্রণাকে আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ

করিতেছেন না, তখন আমার ত নিরীশ্বরবাদকে স্বচ্ছন্দচিত্তে পোষণ করা সঙ্গত হইতেছে না।

কিছুকাল যাবৎ এইরূপ চিন্তার ফলে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপদেশ ও উপাসনা হইয়া থাকে, তাহাই সঙ্গত বলিয়া আমার ধারণা হইল এবং আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইব, স্থির করিলাম। আমার বন্ধু সুন্দরীমোহন বাবু তৎকালে মীরজাফর লেনে* আমার সহিত এক বাটীতেই ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন জানিয়া তাঁহাকে আমি একদিন বলিলাম, 'আমার নিরীশ্বরবাদ ভুল বলিয়া আমি বুঝিতেছি, আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিব।' তিনি ইহাতে আগ্রহের সহিত সম্মত হইলেন এবং ইহার পর সমাজদিনে আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলাম। তদবধি ব্রাহ্মসমাজের মতেই আমি প্রতিষ্ঠিত হইলাম।

এই সময়ে তাঁহার মনে বিলাত যাইবার ইচ্ছা হয়। পিতা খরচ দিবেন না ভাবিয়া নিজেই খরচ সংগ্রহের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। গিলক্রাইষ্টবৃত্তি † লাভ করিতে পারিলে তদ্বিষয়ে সাহায্য হইবে ভাবিয়া এক সময়ে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু গিলক্রাইষ্ট বৃত্তিদ্বারা আংশিক ব্যয়সংকুলান হয় মাত্র, অথচ পিতার নিকট হইতে এবিষয়ে সাহায্যের আশা বিন্দুমাত্রও নাই বলিয়া পরে এ চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির পরিমাণ গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহা দ্বারা কয়েক বৎসর বিলাতবাসের

* এই রাস্তার নাম অধুনা কলেজ রো হইয়াছে।

† Gilchirst scholarship. এই বৃত্তির জন্য তখন একটি রসায়ন শাস্ত্রের (chemistry) পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইত। যে ছাত্র প্রথম হইতেন তাঁহাকে বিদেশে গিয়া রসায়ন-বিষয়ে গবেষণা করিবার সাহায্যার্থ এই বৃত্তি প্রদত্ত হইত।

সম্পূর্ণ খরচই চলিতে পারে জানিয়া এই বৃত্তিলাভের জন্যই অতঃপর সচেষ্ট হইলেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি আজকাল যেমন গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য দেওয়া হয়, সেকালে এরূপ নিয়ম ছিল না। তখন এজন্যও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবৎসর একটি পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন, এম্. এ. পাশ করিবার পর অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে এই পরীক্ষা দিতে হইত। এম্. এ. পরীক্ষাও তখন বি. এ. পরীক্ষার সঙ্গে একই বৎসরে পর পর দেওয়া যাইতে পারিত, দুইটি পরীক্ষা অল্প কিছুদিন আগে পাছে হইত। এ সকল ইংরাজী ১৮৭৭ সালের (বাংলা ১২৮৪) কথা। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এ সময়ে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। বি. এ.র পরই এম্. এ. পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়া ইতিহাসের ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির (History and Political Economy) এম্. এ.র পাঠ্য * বইগুলি নিজে নিজে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বি. এ.র পাঠ্য বাড়ীতে কিছুই পড়িতেন না, কলেজে যাহা পড়া হইত, তাহাই শুনিয়া আসিতেন মাত্র। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে থাকিতে থাকিতেই এইরূপে এম্. এ.র পাঠ্য শেষ করিয়া রাখিয়া পর বৎসর চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে বি. এ.র পাঠ্যসমূহ পড়িয়া লইবেন, স্থির করিলেন।

এই সময়ে দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, সেদিকেও তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু মহাশয় বিলাত হইতে ফিরিয়া "ছাত্র-সমিতি" (Students' Association) গঠিত করিলে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

* ইতিহাস বিষয়টি অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতীতও বাড়ীতে নিজে নিজেই পড়িয়া লইতে পারিবেন মনে করিয়া ইতিহাসেই এম্. এ. দেওয়া তখন স্থির করিয়াছিলেন। পুরাতন নিয়মানুসারে এম্. এ.তে তখন অর্থশাস্ত্র ইতিহাসের অঙ্গ (একটি পেপার) মাত্র ছিল, পৃথক্ বিষয় ছিল না।

আহূত হইয়া তাহাতে যোগদান করিলেন। তাঁহাদের পরিচালনায় ছাত্র-সমিতির সভায় দেশের স্বাধীনতা এবং সাধারণ উন্নতি সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে বক্তৃতাদি হইত। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ খুব উৎসাহের সহিত এই সকল সভা-সমিতির সর্ব্ববিধ কার্য্যে যোগদান করিতেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেও এক আন্দোলন দেখা দিল। ইংরাজী ১৮৭৮ সালের প্রথমেই ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার কুচবিহারের রাজার সহিত বিবাহের প্রস্তাব হয় *। চৌদ্দ বৎসর বয়সের কমে মেয়েদের বিবাহ হওয়া উচিত নহে, এইরূপ ব্রাহ্ম সমাজের সকলের অভিমত ছিল। বিবাহ-বিষয়ক যে আইন † কেশববাবু প্রমুখ ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃগণের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাতেও এই মর্ম্মেরই বিধান ছিল। পরন্তু ৺শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন (ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ছিলেন) মিলিত হইয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন ‡ যে ষোল

* ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়; বিবাহ হিন্দুমতেই হইয়াছিল।

† ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন (Act III of 1872)।

‡ "I forget the date, but it was sometime in the autumn of 1877, that we took our oath of initiation as members of this group......We made a fairly big fire, collected some green banyan leaves, wrote on these leaves words indicating our different passions and appetites such as lust, anger, envy etc., as well as those which stood for the more glaring social evils about us like, for instance, caste, zenana seclusion and the meaningless ceremonialism of popular Hinduism. Dipping these in pure clarified butter, we went round this fire and chanting a hymn specially composed by Shivanath for this occasion, we threw these leaves into this fire and then after offering a fervent prayer to the

বৎসরের কম বয়সে যাহাতে মেয়েদের বিবাহ না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। কেশববাবুর কন্যার বয়স তখন চৌদ্দ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, কুচবিহারের রাজাও ব্রাহ্ম নহেন, হিন্দুমতেই তাঁহার বিবাহ হইবে, এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে এই ব্যাপার লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। সর্ব্বদাই নানা স্থানে প্রতিবাদ সভা ও বক্তৃতাদি হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই আন্দোলনে বিশেষ ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। সভায় বক্তৃতা দিতেন,

---

Lord to lead us to our ideal, we signed this pledge······The original members of this group were (1) Babu Sarat Chandra Ray (2) Babu Annada Charan Mitra (3) Babu Kalisankar Sukul (4) Babu Tara Kishore Chowdhury (5) Babu Sundari Mohan Das and (6) myself."

Bipin Chandra Pal, in his "Memories of my Life and Times" Pp. 317-18.

ইহার বঙ্গানুবাদ :—

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শরৎ কালের কোন এক সময় (তারিখ আমার মনে নাই) এই সমিতির সভ্যরূপে আমরা দীক্ষা-শপথ গ্রহণ করিলাম। আমরা বেশ একটি বড় অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিলাম, কয়েকটি বটবৃক্ষের পত্র সংগ্রহ করিয়া তদুপরি কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন রিপু এবং প্রধান প্রধান সামাজিক দোষ, যথা—জাতি-বিভাগ, নারী অবরোধ ও জনসমাজে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অর্থশূন্য আচার সমূহের নাম লিখিলাম। সেইগুলি ঘৃতে ডুবাইয়া অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রচিত একটি স্তুতি পাঠ করিলাম। ঐ পত্রগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ভগবানের নিকট আমাদিগকে আদর্শে লইয়া যাইবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করিলাম। তৎপরে আমরা প্রতিজ্ঞা-পত্র সহি করিলাম। এই সমিতির প্রথম সভ্যসমূহ ছিলেন—(১) বাবু শরৎচন্দ্র রায়, (২) বাবু অন্নদাচরণ মিত্র, (৩) বাবু কালীশঙ্কর সুকুল (৪) বাবু তারাকিশোর চৌধুরী (৫) বাবু সুন্দরীমোহন দাস এবং (৬) আমি।

প্রতিবাদ সভার আয়োজন করিতেন, ঘরে এই বিষয়ে চিন্তা করিতেন। কয়েক মাস ধরিয়াই আন্দোলন চলিল এবং ইহাতে তিনি এত জড়িত হইয়া পড়িলেন যে, বাড়ীতে পড়াশুনা একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার পাঠ্যাবস্থা হইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় বাং ১৩৪২ সালের পৌষ মাসের "প্রবর্ত্তকে" লিখিয়াছেন—"কি রাজনৈতিক রাজ্যে, কি ধর্ম্মনৈতিক রাজ্যে, তিনি সর্ব্বত্রই চাহিতেন গণতন্ত্রতা। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ যখন একমাত্র কেশবচন্দ্রের শাসনাধীন মনে করিলেন, তারাকিশোর কুচবিহার বিবাহ-প্রতিবাদ সভায় ঐ সমাজের এক-তন্ত্রতার বিরুদ্ধে এ্যালবার্ট হলে প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তরুণদের মধ্যে তিনিই প্রথমে বোধ হয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য হইয়াছিলেন।"

একটি পারিবারিক ঘটনাতেও এই সময়ে তাঁহাকে কিছু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। শৈশবেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৎপরে তাঁহার পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার নিজেরও বিবাহ হয়। নববধূরূপে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী অন্নদা দেবী যখন এই সংসারে প্রবেশ করেন তখন তিনি নিতান্ত বালিকা, দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন মাত্র। বালিকা শ্বশুরালয়ে আসিয়া সৎশাশুড়ীর স্নেহ পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এই বিমাতা পুত্রবধূকে খুব ভাল বাসিতেন। কিন্তু এই সুখের অবস্থা বেশীদিন রহিল না, তাঁহার এই বিমাতাঠাকুরাণী ইহার অল্পকাল পরেই পরলোকগমন করেন। ইহার পর তাঁহার পিতা তৃতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার এই দ্বিতীয়া বিমাতার নিকট হইতে বালিকা বধূ (অন্নদা দেবী) পূর্ব্ববৎ স্নেহলাভ করিতে পারিলেন না, বরঞ্চ একটু বিদ্বেষের ভাবই ইঁহার ব্যবহারে

পরিস্ফুট হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে যিনি বাল্যকালে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পিতামহী এই সময়ে জীবিতা ছিলেন এবং সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। এই বৃদ্ধা যতদিন সংসারে ছিলেন, ততদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই, কারণ ইনি তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনিও অত্যন্ত বৃদ্ধা হওয়াতে কাশীবাস করিতে চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণীর ক্লেশের আরম্ভ হইল, সংসারে অশান্তি দেখা দিল, সংশাশুড়ী তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় থাকিতেন বলিয়া এই সকল সাংসারিক অশান্তির কথা প্রথম প্রথম তেমন জানিতে পারেন নাই, তাঁহার স্ত্রী পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবার পরে এই বিষয়ে তিনি দুই দিক্ হইতে পত্র পাইলেন। একদিকে তাঁহার স্ত্রী ও শ্বশুরমহাশয় এই ঘোর অশান্তির বিষয় তাঁহাকে পত্রে জানাইলেন, অপর দিকে তাঁহার পিতাও পুত্রবধূর সম্বন্ধে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া পত্র লিখিলেন। এই সকল পত্র পাইয়া সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, দেশে তাঁহাদের নিজের বাটীতে অথবা পিত্রালয়ে এই উভয় স্থানের কোন খানেই আব এখন থাকা তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, এই অবস্থায় নিজের কাছেই স্ত্রীকে আনিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া পত্নীকে আনিবার জন্য তিনি দেশে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় স্ত্রীকে লইয়া বাসা করিয়া থাকিবার ব্যয়ভার অবশ্য তাঁহার পিতা বহন করিবেন না, বরঞ্চ স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিজের খরচ দেওয়াও বন্ধ করিতে পারেন। তখন মাসে মাসে বৃত্তির কুড়িটি টাকা মাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতায়

কিরূপ চলিবে সে চিন্তা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। প্রতিকূল অবস্থার ভয়ে ভীত হইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না।

দেশে যাইবার পূর্ব্বে কাহাকেও সংবাদ দিলেন না। শ্বশুরবাড়ীর নিকটবর্ত্তী অন্য একস্থানে থাকিয়া লোকমারফত শ্বশুর মহাশয়ের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র দিলেন যে, তাঁহার পত্নীকে যেন তাঁহার নিকট আনিয়া পৌছাইয়া দেওয়া হয়, তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবেন। পত্রানুসারে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় কন্যাকে সেখানে পৌছাইয়া দিলেন এবং তথা হইতে নৌকাযোগে উভয়ে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় পৌছিয়া এই সংবাদ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার পিতাকে জানাইলেন এবং লিখিলেন যে, এই রকম অশান্তির অবস্থায় তিনি স্ত্রীকে কাছে রাখাই সঙ্গত বোধ করিয়াছেন। দেশের বাটীতে তাঁহার পিতা হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং এবম্বিধ পুত্রের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার পুত্রবধূও বিধর্ম্মী হইয়া যাইবে ও কুলে কলঙ্ক হইবে এই ভাবিয়া নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চৌধুরী মহাশয় অগত্যা তখন গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করিয়া দেশের অনেক লোক সহ কলিকাতায় আসিলেন ও বাগবাজারে বাসা করিয়া রহিলেন। এই সময়ে বাবাজী মহারাজের শ্বশুর মহাশয়ও পৃথক্‌ভাবে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পটলডাঙ্গায় থাকিতেন। প্রতিদিনই, সাধারণতঃ বৈকালে কলেজের ছুটির পর, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহার পিতাও তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ছাড়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টায়ও যখন পুত্রের মত পরিবর্ত্তন হইল না তখন পিতা খরচপত্র দেওয়া বন্ধ করিলেন; কিন্তু পুত্র কিছুতেই বিচলিত হইলেন না, বরঞ্চ তাঁহার দৃঢ়তা বাড়িয়া গেল।

একদিন বৈকালে বাগবাজারের বাড়ীতে গেলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে একটি ঘরে বন্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি তখন দৃঢ়ভাবে পিতাকে বলিলেন, "আমার শরীর আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার আত্মা আপনা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। শরীরকে আপনি অনায়াসে বিনষ্ট করুন, কিন্তু যে পথে আত্মার কল্যাণ আমি দেখিতেছি, সে পথ আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" রাধু সিং নামক তাঁহাদের একটি পুরাতন ভৃত্য তাঁহার পিতার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে তাঁহার পিতাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিল। তাঁহার পিতা অবশেষে হতাশভাবে বলিলেন, "আমি তোমাকে ইংরাজী পড়াইয়াছিলাম অর্থলোভ বশতঃ, তাহাতে তুমি যে বিধর্ম্মী হইবে ইহা আমি কখন কল্পনাও করি নাই। যাহা হউক আমি তোমার জন্য যে অর্থব্যয় করিয়াছি, তাহা তুমি পরিশোধ করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে লিখিয়া দাও, তারপর তুমি যাহা ইচ্ছা কর।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইহাতে সম্মত হইয়া পিতার কথানুসারে, উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাকে তিন হাজার টাকা দিবেন এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখিয়া দিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই তাঁহার পিতা সঙ্গীয় লোকজন সকলকে লইয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। খরচপত্রের জন্য বাবাজী মহারাজকে কোন টাকা দিলেন না। শ্রীভগবানের কেমন ইচ্ছা, কলিকাতা হইতে অনেক দূরে গিয়া কি ভাবিয়া তিনি আবার এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র ও পূর্ব্বোল্লিখিত রাধু সিংকে কলিকাতায় ফেরত পাঠাইলেন এবং তাহাদের মারফত পুত্রের তিন চারি মাসের খরচ একত্রে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মনে করিয়াছিলেন কেথিড্রাল মিশন কলেজে ভর্ত্তি হইবেন (সেখানে বেতনের হার প্রেসিডেন্সী কলেজ

অপেক্ষা অনেক কম ছিল), কিন্তু এই টাকা আসিয়া পড়াতে আর তাহা করিতে হইল না। তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও এই সময় দেশে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ইচ্ছানুসারে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীও পুনর্ব্বার পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন।

একদিকে ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন, অপরদিকে নানা পারিবারিক অশান্তি, এই বিবিধ উপদ্রবের ফলে তাঁহার পড়াশুনা ও স্বাস্থ্য উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি হইল। ক্রমাগত মানসিক উত্তেজনা ও অবিরাম পরিশ্রমের ফলে প্রবল শিরঃপীড়া দেখা দিল। কয়েক মাস ভুগিবার পর অবশেষে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে তিনি তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ৺বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতা খুবই রহিয়া গেল। পড়াশুনা কিছুই হয় নাই, অথচ বি. এ. পরীক্ষার তখন কিঞ্চিদধিক দুইমাস মাত্র বাকী *। ত্রস্ত হইয়া অল্প অল্প পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত পড়া হইল না। এই ভাবেই, প্রস্তুত না হইয়া এবং দুর্ব্বল শরীর লইয়া কোন মতে বি. এ. পরীক্ষা দিলেন। উত্তীর্ণ হইবার আশা বিশেষ ছিল না, কিন্তু ভগবৎ কৃপায় উত্তীর্ণ হইলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করিলেন। পড়াশুনার ও শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় এই বৎসরই পুনরায় এম্. এ. পরীক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইল কিন্তু এম্. এ. পাশ করিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লইয়া বিলাত যাইবার ইচ্ছা পূর্ব্বের ন্যায়ই তাঁহার বলবতী ছিল। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা তিনটি বিষয়ে দিতেই

* তখন এন্ট্রান্স ও এফ্. এ. পরীক্ষা নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে, বি. এ. ও বি. এল্. পরীক্ষা জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং এম্. এ. পরীক্ষা জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে হইত।

চলিত, কিন্তু চারিটি বিষয়ে দিলে মোট নম্বর বেশী পাওয়া যায় বলিয়া বৃত্তি পাইবার সম্ভাবনাও বেশী হয়। তিনটি বিষয় তাঁহার এই সময়ে একপ্রকার আয়ত্তই ছিল। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। বি. এ. পড়িবার সময় তিনি পদার্থবিজ্ঞান ভালরূপে পড়িয়াছিলেন এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে থাকিতে এম্. এ. পরীক্ষার জন্য ইতিহাস পড়িয়াছিলেন। সুতরাং আর একটি নূতন বিষয়ে পরবৎসর এম্. এ. পরীক্ষা দিলে সেটিও আয়ত্ত হইয়া যাইবে এবং তাহাতে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া পর বৎসর "ফিলজফি"তে (Philosophy—পাশ্চাত্যদর্শন) * এম্. এ. পরীক্ষা দিবেন স্থির করিলেন। এযাবৎ ফিলজফি কিছুই পড়েন নাই, সুতরাং এম্. এ.তে তাহা নিলে সুবিধা করিতে পারিবেন কিনা—একেবারে প্রথমেই এম্. এ.র পাঠ্য অধ্যাপক পড়াইতে সম্মত হইবেন কিনা—তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তিনি ফিলজফির তৎকালীন খ্যাতনামা অধ্যাপক জেনারেল এসেম্ব্লি'র † প্রফেসর হেষ্টি (Prof. Hastie) সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। সাহেব পাঠ্য-তালিকা খুলিয়া এম্. এ.তে যে সকল বিষয় পড়িতে হয় তাহা দেখাইয়া বলিলেন যে, বি. এ. তেও যখন তিনি পাশ্চাত্যদর্শন পড়েন নাই, তখন তাঁহার পক্ষে এক বৎসরের মধ্যে এত বই পড়িয়া পরীক্ষা দেওয়া কখনও সম্ভবপর হইবে না। হেষ্টি সাহেবের কথায় তিনি দমিলেন না, বরঞ্চ ইহাতে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বাড়িয়া গেল।

* আজকাল প্রাচ্যদর্শন শাস্ত্রেরও কিছু কিছু ফিলজফিতে এম্. এ.র পাঠ্যতালিকার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

† General Assembly's Institution. এই কলেজটি এক্ষণে আর নাই। পরে ডাফ্ কলেজের সহিত মিলিত হইয়া বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে পরিণত হইয়াছে।

ইহার কিছু পূর্ব্বে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগেই শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির উদ্যোগে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্যার্থ সিটি স্কুল স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজেরও উৎসাহ ছিল। হেষ্টি সাহেবের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি শিক্ষকরূপে এই স্কুলে যোগদান করিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার জনৈক ব্রাহ্মবন্ধু ৺কালীনাথ দত্তের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁহাদের দেশের (২৪ পরগণা জিলাস্থ জয়নগর গ্রামের) এন্‌ট্রান্স স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া চলিয়া গেলেন। নিকটে আর একটি স্কুল ছিল, তাহার মালিক জমিদারদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া এই স্কুল জয়নগর ও মজিলপুরের জমিদারদের চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতার জন্য শিক্ষকদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। ছাত্রেরা বাড়ীতে আসিয়া পড়িত; না পড়াইলে অন্য স্কুলে চলিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় শিক্ষক মহাশয়গণ অতিরিক্ত শ্রমস্বীকার করিয়া বাড়ীতেও পড়াইতেন। পড়ান ব্যতীতও হেড মাষ্টারকে স্কুলের জন্য অন্য অনেক রকমে খাটিতে হয়। সুতরাং এই নবগঠিত বিদ্যালয়ের জন্য শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে এই সময়ে বহু পরিশ্রম করিতে হইত, ফলে নিজের পড়ার জন্য সময় অতি অল্পই থাকিত। তথাপি পাশ্চাত্যদর্শনে এম্. এ. পরীক্ষা দিয়া পরে চারি বিষয়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প তিনি ছাড়িলেন না। প্রথমে বি. এ.র ফিলজফির পাঠ্য * ও সঙ্গে মিলের প্রণীত তর্কশাস্ত্র (Inductive Logic by John Stuart Mill) কিছু কিছু দেখিতে লাগিলেন। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার্থীদিগের নির্ব্বাচনী পরীক্ষা (টেষ্ট পরীক্ষা, Test Examination) হইয়া গেলে স্কুলের এতৎসংক্রান্ত সমস্ত কাজ মিটাইয়া তিনি এই চাকুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

* Hamilton's Lectures, Fowler's Inductive Logic, etc.

তখন এম্. এ. পরীক্ষার আড়াইমাস কি তিনমাস মাত্র বাকী। এখন পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক অনন্যকর্ম্মা হইয়া একান্তমনে এম্. এ. পরীক্ষার জন্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ ১৫।১৬ ঘণ্টা করিয়া পড়িতেন। যখন যাহা পড়িতেন, সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম লিখিয়া রাখিতেন, পরদিন সেইখান হইতে আবার পড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এইটুকু আলোচনা করিয়া লইতেন. এইরকম তাঁহার পড়িবার প্রণালী ছিল। ইহাতে পড়া কিছু ধীরে ধীরে চলিলেও, যতটুকু পড়া হইত, তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া যাইত। সমস্ত দিন পড়িয়া মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠিত, সন্ধ্যাব পর পাঠে আর মন বসিত না। কয়েকদিন পর্য্যন্ত রোজই এইরূপ হইতেছে লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে করিলেন যে, সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণ সঙ্গীত-চর্চ্চা করিবেন, তাহা হইলে হয়ত বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের জন্য ও গানের আনন্দে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহার অনেক গীতবাদ্যে নিপুণ বন্ধুকে সঙ্গীত শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, বন্ধুও সম্মত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে তবলাবাদন ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাহা হইল ; ঘণ্টাখানেক সঙ্গীতচর্চ্চা করিবার পর মাথা বেশ ঠাণ্ডা ও মন প্রফুল্ল হইত, আবার বেশ খানিকক্ষণ পড়িতে পারিতেন।

এই ভাবে পড়িয়াও এত অল্প সময়ে সব বই শেষ করিতে পারিলেন না। কিন্তু যাহা পড়িলেন, তাহা এমন আয়ত্ত হইল যে, যে সকল বই পড়েন নাই, তাহারও সার একটু দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন। পাশ্চাত্য দর্শনের মূল মর্ম্ম তাঁহার অধিগত হইল ও তৎসম্বন্ধে তিনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে মিল, হ্যামিল্টন প্রভৃতির উক্তিতে কোথাও কোথাও ভুল আছে বলিয়া এই সময়েই তাঁহার নজরে পড়িয়াছিল। যাহা হউক, এই

অবস্থায় ইং ১৮৮০ সনে এম্. এ. পরীক্ষা দিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন। এ বৎসর ফিলজফিতে আর কেহ পাশ হয় নাই। পরীক্ষার পর পুনরায় সিটি স্কুলে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় নির্দ্দিষ্ট অধ্যাপনা কর্ম্ম ব্যতীতও ছাত্রদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার এবং বিদ্যালয়ে ও অন্যত্র তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিবার ভার তাঁহার উপর দিলেন। স্কুলের ছুটির পর তাঁহাকে নীতিশিক্ষা দিবার জন্য পৃথক্ ক্লাস করিতে হইত। ইহা ছাড়া তিনি সকল ছাত্রদের জন্য একটি সাপ্তাহিক সভা স্থাপন করিলেন। তিনি সভাপতি হইতেন, ছেলেরা কেহ কেহ বাড়ী হইতে প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া সেই সভায় পাঠ করিত এবং অপর কেহ কেহ তাহার সম্বন্ধে মৌখিক আলোচনা করিত। সর্ব্বশেষে তিনি সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এই সভা ও ক্লাস শীঘ্রই ছাত্রদিগের প্রিয় হইয়া উঠিল। ভাল ছেলেরা আকৃষ্ট হইয়া স্কুলের পরও নীতিশিক্ষার ক্লাসে অনেকক্ষণ থাকিত এবং সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হইত। অনেকে গৃহে গিয়াও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত ও তাঁহার উপদেশ লইত। এইরূপে ছাত্রদের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মিল।

এই সময়ের একটি ঘটনায় ছেলেদের উপর তাঁহার প্রভাব এবং অন্যত্রও শিক্ষকরূপে তাঁহার যোগ্যতার খ্যাতি খুব বর্দ্ধিত হয়। তিনি দ্বিতীয়বার এইরূপে সিটি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করিবার কিছু পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি সেক্‌শনের সমস্ত ছাত্রকে অবাধ্যতা ও দুশ্চরিত্রতার জন্য স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে আসিয়া সিটি স্কুলে ভর্ত্তি হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ছেলেদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিতেন বলিয়া ইহাদের নানাপ্রকার চরিত্রদোষ শীঘ্রই তাঁহার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন

তিনি তাহাদিগকে স্কুল হইতে তাড়াইবার জন্য উমেশবাবু প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন বিদ্যালয়ের ছুটীর পর তিনি গৃহে যাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন সময় একটি লোক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, পথে তাঁহাকে মারিবার জন্য গুণ্ডা লইয়া সেই সব ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন নিকটস্থ একটি গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীযুক্ত উমেশবাবু এই কথা শুনিয়া স্কুলের দারোয়ানকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আজ না হয় আপনি দারোয়ান পাহারা সঙ্গে দিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঘরে পৌঁছাইয়া দিলেন, কিন্তু ঘরে ত আমি সব সময় বসিয়া থাকিব না। অবশ্যই মধ্যে মধ্যে আমাকে বাহিরে যাইতে হইবে, স্কুলেও রোজ আসিতে হইবে। সব সময় ত দারোয়ান আমার সঙ্গে থাকিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ছাত্রেরা আমাকে দেখিলে ওরূপভাবে কখনও আমার সামনে আসিতে সাহস পাইবে না। রোজ যেমন একা যাই, আজও তেমনি একাই যাইব।" এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। সেই গলির মোড়ের নিকটে গেলে দেখিলেন কয়েকটি ছেলে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদিগকে দেখিয়াই তাঁহার মনে পড়িল যে সেদিন তাহারা স্কুলে যায় নাই। তিনি তীব্রদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইলে তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি যখন গলির মধ্যে ঢুকিলেন তখন আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। পরদিন সেই সকল ছাত্রের নাম স্কুলের খাতা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল এবং তাহারাও আর স্কুলে আসিল না। এই ঘটনা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইলে তাঁহার মর্য্যাদা খুব বাড়িয়া গেল। খারাপ ছেলেরা তাঁহাকে খুব ভয় করিত এবং তাঁহাকে দেখিলেই তটস্থ হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিত।

ইহার পর বৎসরই সিটি স্কুলের সঙ্গে এফ্. এ.র প্রথম বার্ষিক শ্রেণী খোলা হইল। তিনিও একজন অধ্যাপক হইলেন। তিনি এফ্. এ. ক্লাসে তর্কশাস্ত্র (লজিক—Logic) ও পদার্থ বিজ্ঞান (Physical Science) পড়াইতেন এবং স্কুলে উপরের কোন কোন শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ছাত্রবর্গের শ্রদ্ধা প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সবাই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিত ও অনেকে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিত।

ধর্ম্মে, শিক্ষায় এবং আরও নানাদিক্ দিয়া তখন বঙ্গদেশের নবোন্নতির যুগ; অনেকটা শীতের পরে বসন্তাগমের ন্যায়। তরুণ ছাত্রবর্গের মনে প্রবল উৎসাহ; ভালরূপে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইব, জীবনে উন্নতি করিব, এরূপ একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা অধিকাংশের মনে ছিল। কোন যোগ্য শিক্ষকের নিকট বাড়ীতে সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহারা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ছাড়িত না। কাজেই পড়াশুনার জন্য এবং নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার উপদেশ লইবার জন্য অনেকে বাড়ীতেও তাঁহার নিকট আসিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কাজ ছিল। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে তিনি এই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। নিত্য সংবাদপত্র পড়িতেন, কখন কখন সংবাদপত্রে লিখিতেন। Brahmo Public Opinion (ব্রাহ্ম লোক-মত) নামক একটি তদানীন্তন ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদনভার কিছুকাল তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। ভারতসভার (Indian Association) তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন; এই প্রতিষ্ঠানের এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী তিনিই লিখিয়াছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে কখন কখন মফঃস্বলে গিয়াও বক্তৃতা করিতেন। এত কাজ সত্ত্বেও নিজের

পড়াশুনা ছাড়েন নাই, অবশ্য এই সকলের ফলে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন মৃদুগতিতেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আজীবন অনলস কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। সুতরাং প্রথম যৌবনে তিনি যে বহুবিধ হিতকর কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। বরঞ্চ এই সময়ের এই কর্ম্মবহুল জীবনের অন্তরালে তাঁহার চিরাভ্যস্ত আত্মচিন্তার ধারা যে সমভাবে বহমানা ছিল, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মৌলিক চিন্তা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীযুক্ত উমেশবাবু ছাত্রসমাজের চরিত্রোন্নয়ন এবং তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিয়োগ যে সার্থক হইয়াছিল, ছাত্রবর্গের উপর তৎকালে তাঁহার প্রভাবের দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হয়। পরন্তু অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা হইতে উৎসারিত না হইলে, জলন্ত বিশ্বাসের সহিত যুক্ত না হইলে, নিজের জীবনে স্বীয় আচরণের দ্বারা সমর্থিত না হইলে—কেবল মৌখিক উপদেশ কখনও কার্য্যকরী হয় না। তাঁহার নিজের নৈতিক চরিত্র অতি বিশুদ্ধ এবং ধর্ম্মভাব তাঁহার অন্তরের বস্তু ছিল বলিয়াই ছেলেরা তাঁহার উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিত এবং তাহা লাভ করিবার জন্য বাড়ীতে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট আসিত।

ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে তাঁহার কিরূপ উৎসাহ ছিল, এই সময়ের একটি ঘটনাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও তিনি একসঙ্গে শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এই সময়ে তাঁহারা উভয়ে শ্রীহট্টের অধিকাংশ কলিকাতা-প্রবাসী ছাত্রগণের সহিত একত্রে ১৪নং কলেজ ষ্ট্রীটে মেস্ করিয়া বাস করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় এফ্. এ. পড়িবার পর আর পড়েন নাই।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ন্যায় তিনিও রাজনৈতিক আন্দোলনে উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন এবং এই সময়ে তাঁহার কোনও চাকুরী ছিল না। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উদ্যোগী হইয়া মেসের আরও অনেকের পরামর্শে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার জন্য তাঁহাকে শ্রীহট্টে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিয়মিতরূপে কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় সেখানে এক প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তখন আর তাঁহাকে মাসিক সাহায্য করিবার আবশ্যকতা রহিল না।

তৃতীয় অধ্যায়

আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন : যোগী সম্প্রদায়ে প্রবেশ

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার পর অনেক দিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাদের দেশের বাটীতে যান নাই। সিটি স্কুলে কাজ লইবার পর ইংরাজী ১৮৮০ সনে (বাংলা ১২৮৭) পূজার ছুটির সময় একবার দেশে গেলেন। দীর্ঘকাল পরে আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন। একটু অসুবিধাও হইল। তিনি "ব্রহ্মজ্ঞানী", "মেলেচ্ছ" ইত্যাদি বলিয়া কোন কোন বিষয়ে আপত্তি হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বুঝিতে পারিয়া নিজে হইতে সাবধান হইলেন। তিনি বাহিরে বসিয়া খাইতেন ; কখনও ঠাকুরঘরে, রান্নাঘরে কিম্বা খাইবার ঘরে যাইতেন না। ইহাতে অসুবিধাটুকুর সহজেই সমাধান হইয়া গেল।

এতদিন পরে বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বাটী পৌছিবার কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার পিতা তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদ্দেশীয় একজন পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার দিকে রওনা হইয়া গিয়াছিলেন। অসময়ে চৌধুরী মহাশয়ের এইরূপ ভাবে সহসা কলিকাতায় আগমনের বিশেষ কারণ ছিল। এই পণ্ডিত মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি "তারাকিশোরবাবুকে তর্কেপরাস্ত করিয়া তাঁহার ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বমতে আনয়ন করিবেন।" তাই আশামুগ্ধ পিতা তখনই তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইয়াছিলেন। চৌধুরী মহাশয় পুত্রকে কলিকাতায় না পাইয়া কি ভাবিয়া কাশীতে চলিয়া গেলেন।

সেখানে পৌছিয়াই বাটীতে (শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে) পত্র লিখিলেন যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের বাড়ীতে যাওয়া অন্যায় হইয়াছে; তিনি যেন বাহিরে খাওয়া দাওয়া করেন, ঘরের ভিতরে না ঢুকেন ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই এই সকল মানিয়া চলিতেছিলেন, সুতরাং চিঠি পাইয়া তাঁহার আচরণের কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইল না। কয়েকদিন পরেই পুনরায় তাঁহার পিতার আর এক পত্র পাইলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তিনি জ্বর হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যেন পত্র-পাঠ মাত্র কাশীতে চলিয়া আসেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি অবিলম্বে রেলযোগে কাশীতে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার পিতার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে কিন্তু শরীর খুব দুর্ব্বল রহিয়াছে। তাঁহাকে সুস্থ না দেখিয়া ফিরিতে পারিলেন না, সুতরাং কাশীধামে কিছুদিন থাকিতে হইল।

কাশীতে যতদিন ছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন, তাহাতে বেশ তৃপ্তি পাইতেন। এখানে ব্রাহ্মণজাতীয় জনৈক ডাক্তার তাঁহার পিতার বন্ধু ছিলেন। এই ভদ্রলোকের সহিত যাইয়া কাশীর দেবালয় সকল দেখিয়া আসিতে তাঁহার পিতা একদিন তাঁহাকে বলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন যে, দর্শন করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কোনরূপ পূজার্চ্চনা তাঁহার দ্বারা হইবে না। ইহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহার পিতৃবন্ধু এই ডাক্তারবাবু তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে কাশীর সমস্ত প্রসিদ্ধ দেবমন্দির দর্শন করাইলেন। তিনি দর্শন-মাত্র করিয়া চলিয়া আসিতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার কোন মানসিক পরিবর্ত্তন কেহ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী পণ্ডিত এই সময়ে কাশীতে ছিলেন। একদিন

ডাক্তারবাবু তাঁহাকে এই পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট লইয়া গেলেন। ডাক্তারবাবুর অনুরোধে ইঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কিছুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। অবশেষে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "সমস্তই ব্রহ্ম, দেবতারাও পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহাদিগকে পূর্ণব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে বাধা কি?" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন, "যদি সকলেই পূর্ণব্রহ্ম হন তবে আমিও তাহাই; আমি অন্যের উপাসনা কেন করিব? আমার কথা আপনি কেন অগ্রাহ্য করিবেন? আমার কথাও পূর্ণব্রহ্মেরই কথা বলিয়া কেন আদৃত না হইবে?" এই উত্তর শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয় কিছু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখন এই সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে না। ছয় মাস যদি আমার নিকট বেদান্ত পড, তবে বুঝিতে পারিবে।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "পড়িবার ফল ত আপনি যাহা বলিলেন তাহাই, ইহা আমার মনঃপূত হইতেছে না, পড়িয়া কি করিব?" পণ্ডিত মহাশয় আর কোন কথা বলিলেন না, তিনিও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতা অতঃপর কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। কাশী-বাসী জমিদার, ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় পারদর্শী এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও আসিয়াছিলেন। সমাগত পণ্ডিতগণ ও এই জমিদারবাবুটি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন বিচার্য্য বিষয় উপস্থিত হইলে তাঁহারা শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মতের পোষক প্রমাণরূপে তাহার উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন। তাহাতেই অসুবিধা হইল, শাস্ত্রবচনকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রমাণরূপে মানিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, "এই সকল শাস্ত্রবাক্যকে আমি প্রমাণ বলিয়া গণ্য করি না। যদি যুক্তিদ্বারা

আপনাদের মত ন্যায্য বলিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবেই আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি। নতুবা কেবল শাস্ত্রগ্রন্থে লেখা আছে এই কারণে, আমার বিবেচনায় যাহা অযৌক্তিক তাহা আমি প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিব না।" কিন্তু পণ্ডিতমহাশয়গণ কেহই এইরূপ যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলেন না। কাজেই এই সভার তর্কবিতর্কের ফলে তাঁহার মতের কোন পরিবর্তন হইল না।

সভা শেষ হইয়া গেলে তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সভায় উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া ভদ্রলোকটি তাঁহাকে একটু দাঁড়াইতে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার মস্তকটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলেন। তিনি সম্মত হইলে ভদ্রলোকটি হাত দিয়া কিছুক্ষণ মস্তক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনার মাথায় কতকগুলি অসাধারণ লক্ষণ আছে। আপনি অনেক মহৎ কাজ করিবেন দেখিতেছি।" এই রকম আরও অনেক কথা বলিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন যে, এই সব কথার কোন মূল্য আছে বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন না, কারণ মানুষের ভবিষ্যৎ যদি এইরূপে নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে ত সর্ব অবধারিতই আছে, মানুষের স্বাধীনতা কিছুই নাই ইত্যাদি।

অনন্তর আর অপেক্ষা না করিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিত তাঁহাদের বাটীতে একদিন বেড়াইতে আসিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার অনেক কথা হইল, কথা-প্রসঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্র * যে অভ্রান্ত সত্য, নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জিজ্ঞাসা

* ফলিত জ্যোতিষ (Astrology)।

করিলেন, "আপনি মানুষের পাপপুণ্য মানেন কি না?" জ্যোতিষী বলিলেন, "পাপপুণ্য মানি বৈ কি? প্রত্যেক মানুষ অবশ্যই নিজকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করে।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "যদি তাহাই হয় তবে আপনার জ্যোতিষকে সত্য বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করা যায়? মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল ঘটনাই যদি জ্যোতিষের বিচারের দ্বারা বলিতে পারা যায়, তবে ত সে সকল অবধারিত আছে বলিতে হইবে ও তাহার অন্যথা করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। এইরূপ মানুষ যদি নিয়তির অধীন হইয়াই সমস্ত কাজ করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহার নিজকৃত পাপ অথবা পুণ্যের জন্য সে কি নিমিত্ত দায়ী হইবে, আর কি কারণেই বা সেই সকল কর্মের ফলে সে সুখদুঃখাদি ভোগ করিবে? সে ত স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারে না।" পণ্ডিতজী এই আপত্তি শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন এবং ইহার সদুত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, "আপনার এ কথার উত্তর আমি এখন দিতে পারিলাম না বটে কিন্তু জ্যোতিষের গণনা যে সত্য হয়, তাহা আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি।" বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন, "সে সকল আকস্মিক সম্মিলন হইতে পারে, তদ্দ্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।"

যে পণ্ডিত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া তাঁহার পিতা কাশীতে আসিয়াছিলেন—যিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া পুনরায় হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী করিবেন বলিয়া দেশে থাকিতে তাঁহার পিতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন—তিনি ঘটনাক্রমে এই সকল কথাবার্তার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি বিচার করিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিব।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বেশ, আপনি যদি আমাকে বুঝাইতে পারেন তবে আমি মানিয়া লইব, কারণ আমি সত্যেরই অনুসন্ধিৎসু।" কিন্তু কোন

উপযুক্ত ব্যক্তিকে মধ্যস্থরূপে রাখিয়া তাঁহার সমক্ষে বিচার হইবে। পণ্ডিতমহাশয় অতঃপর এইরূপ প্রস্তাব করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "মধ্যস্থের প্রয়োজন নাই। আপনি যদি বিচার দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে আপনার মত সত্য, তবে আমি নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া লইব, এ জন্য মধ্যস্থের কোন প্রয়োজন হইবে না। আর আপনি যদি আমাকে বুঝাইতে না পারেন এবং মধ্যস্থ কেবল বলিয়া দেন যে আপনার কথাই সত্য, তবে তাঁহার সে কথা আমি কখনও গ্রহণ করিব না।" অনেক বাদানুবাদের পর অবশেষে শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ স্বামীর সাক্ষাতে বিচার হইবে স্থির হইল, তথাপি বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "স্বামীজি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে না পারিলে তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, তাঁহার কথা তিনি গ্রাহ্য করিবেন না।"

এই সময়ে শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ স্বামী দুর্গাবাড়ীর নিকটে এক রাজার বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। পরদিন পণ্ডিতমহাশয় বাবাজী মহারাজকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি যোগীশ্বর ভাস্করানন্দ স্বামী।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দেখিলেন, তিনি নগ্নদেহে বসিয়া আছেন, কৃশকায়—অস্থি-চর্ম্মসার, কিন্তু বড় হাস্যময়। তাঁহারা দু'জনে প্রণাম করিলে, তিনি অতি প্রসন্নভাবে স্মিতাননে বাবাজী মহারাজের দিকে চাহিতে লাগিলেন। পণ্ডিতমহাশয় বাবাজী মহারাজকে দেখাইয়া স্বামিজীকে সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন, "ইনি বিধর্ম্মী হইয়াছেন, শাস্ত্র মানেন না, আপনার সমক্ষে আমরা উভয়ে পরস্পরের সহিত বিচার করিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।" স্বামিজী [illegible] বলিলেন, "[illegible]"। অতঃপর পণ্ডিতমহাশয় শাস্ত্রের প্রামাণিকতা, [illegible]-

ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয়ে নানা যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় অনেক কথা বলিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয় লোক—বাঙ্গালীদিগের সংস্কৃত উচ্চারণ তত শুদ্ধ নহে, তাই স্বামিজী কোন কোন স্থলে তাঁহার উচ্চারণ সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার বক্তব্য বেশ মনোযোগের সহিত শুনিতে থাকিলেন ও মধ্যে মধ্যে এক একবার বলিলেন "বাঃ, আচ্ছা পণ্ডিত হ্যায়।"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহার উত্তর বলিতে লাগিলেন। তিনি সংস্কৃত অল্পই জানিতেন, পণ্ডিত-মহাশয়ের কথা যতটুকু বুঝিয়াছিলেন, তাহার উত্তর ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে স্বামিজীর নিকট বলিলেন। শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ স্বামিজী বাঙ্গালী নহেন—বাঙ্গালা বুঝেন না, একথা বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের নিরাকারত্ব বিষয়েই তিনি অনেক কথা বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়াও স্বামিজী বলিলেন "ইয়ে আচ্ছী বাত কহতা হ্যায়।" বাবাজী মহারাজের কথার উত্তর দিয়া পণ্ডিত মহাশয় পুনরায় নানা যুক্তি দেখাইয়া সংস্কৃত ভাষায় এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন এবং বাবাজী মহারাজও আধ ভাঙ্গা হিন্দীভাষায় প্রত্যুত্তর দিলেন। এইরূপে আরও কয়েকবার উভয়ে পরস্পরের যুক্তি খণ্ডন করিয়া পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত, ভাষায় ও তিনি আধভাঙ্গা হিন্দী ভাষায় স্ব স্ব মতের পোষকতা করিলেন। স্বামীজি প্রতিবারেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন, "বড়া আচ্ছা পণ্ডিত হ্যায়!" তাঁহার সম্বন্ধেও বলিলেন, "ইয়ে বড়ী আচ্ছী বাত কহতা হ্যায়।" সুতরাং এই তর্কের ফলে কোনই মীমাংসা হইল না এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজেরও মতের কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না। পণ্ডিত মহাশয় ক্রমে ভগ্নোৎসাহ হইয়া নিরস্ত হইলেন ও অবশেষে উভয়ে স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীহট্টের পণ্ডিত মহাশয় ব্যর্থমনোরথ হইয়া ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ স্বামিজীর আকৃতি প্রকৃতি দৃষ্টে বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। উভয়ের প্রতি তাঁহার অপক্ষপাত ভাব ও শিশুর ন্যায় সরল ব্যবহার, বিশেষ করিয়া তাঁহার আনন্দময় মূর্ত্তি ও অপূর্ব্ব মধুর হাসিটি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পরে কাশীতে যতদিন ছিলেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাইতেন। তিনি গেলেই স্বামিজীও অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কাছে বসাইতেন এবং কথাবার্ত্তা কহিতেন। এইরূপে একদিন স্বামিজীর নিকট তিনি উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে যে রাজার উদ্যানবাটীতে স্বামিজী থাকিতেন, সেই রাজাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী রাজাকে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আদেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহার শিষ্য ?" বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন, "আমি কাহারও শিষ্য নহি। ভগবানই আমার পথ-প্রদর্শক।" কাহারও শিষ্য নহেন শুনিয়া রাজা কিছু অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে তিনিও কিছু অবজ্ঞার ভাবে উত্তর প্রদান করিলেন। অতঃপর স্বামিজী নিজেই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "ব্রহ্মকে কিরূপে জানা যায় ?" তখন স্বামিজী উদাত্তস্বরে শ্রুতিসকল পাঠ করিয়া উত্তর বলিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখ আনন্দে অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার সেই মূর্ত্তি বাবাজী মহারাজের চিত্তে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া গেল; পরে বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দদান করিত ও স্বামিজীর প্রতি ভক্তির উদ্রেক করিত, একথা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন।

অতঃপর একদিন শ্রীমৎ তৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করাইবার নিমিত্ত

তাঁহার পিতৃবন্ধু সেই ডাক্তারবাবু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীশ্রীবেণীমাধব জীউর মন্দিরের নিকট যে বাড়ীতে স্বামিজী থাকিতেন তথায় লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া স্বামিজীর বিষয়ে খোঁজ করিয়া তাঁহারা শুনিলেন যে, স্বামিজী তিন মাস যাবৎ কিছু আহার করেন নাই ও সম্প্রতি এক যজ্ঞ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই কথা বিশ্বাস করিয়া লইলেন এবং স্বামিজী ছাদের উপর আছেন শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি ও ডাক্তারবাবু উপরে গেলেন। দেখিলেন ছাদের এক কোণ হইতে উঠানের উপর দিয়া অপর কোণ পর্যন্ত * কয়েকটি মোটা বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে ফেলা আছে, তাহার উপর প্রাঙ্গনের উর্দ্ধে শ্রীযুক্ত স্বামিজী আসন করিয়া বসিয়া আছেন। ডাক্তারবাবু ভক্তিভরে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, অনন্তর উত্থিত হইয়া স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ব্রাহ্ম সমাজের লোক, তিনি দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন ও দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। স্বামিজীও হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে মৌনভাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে স্বামিজীর সম্বন্ধে নানা চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "ইহাকে কিছু কঠোর দেখাইতেছে, ভাস্করানন্দ স্বামিজীকে ইহা অপেক্ষা সরল বোধ হইয়াছে। ইনি পরম জ্ঞানী লোক বলিয়া শুনিয়াছি, আবার শুনিতেছি, তিন মাস যাবৎ উপবাস করিয়া রহিয়াছেন ও যজ্ঞ করিবেন, ইহা কিরূপ আমি ত বুঝিতেছি না। যদি তেমন জ্ঞানীই হইবেন, তবে এই সকল যজ্ঞাদি বাহিরের কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন?" তিনি যতক্ষণ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, ততক্ষণ সমস্ত সময়ই স্বামিজী এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে

* [illegible]

চাহিয়াছিলেন। স্বামিজীর সম্বন্ধে তাঁহার মনে এই সকল সংশয়ের উদ্রেক হইলেও তাঁহাকে অতিশয় তেজস্বী পুরুষ বলিয়া অনুভব করিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ গত হইলে তাঁহারা উভয়ে স্বামিজীকে পুনরায় প্রণাম করিলেন—বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বের ন্যায় হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন এবং ডাক্তারবাবু সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন। স্বামিজীও পূর্ব্ববৎ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীযুক্ত হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় ইতিমধ্যে সুস্থ ও সবল হইয়াছিলেন। পণ্ডিতদিগের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কোন পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া এখন তিনি দেশে ফিরিতে ইচ্ছুক হইলেন। সকলে একত্রে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিলেন। বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় রহিলেন, চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গীয় সেই পণ্ডিতটি শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পর কিরূপে তাঁহার চিন্তাধারার ও আভ্যন্তরীণ জীবনের আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, তাহা এক সময়ে আমাদের নিকট তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন সেই রূপেই, প্রায় তাঁহারই ভাষায়, ইহা আমার নিকট লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

"শৌচাদি নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া প্রথমেই সংবাদ-পত্র পড়িতাম। ৺কাশী হইতে ফিরিয়া কলিকাতা আসিবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সংবাদ-পত্র পড়িতেছি, তাহাতে দেখিলাম অষ্ট্রেলিয়ান টাইম্‌স্ পত্রিকা (The Australian Times) হইতে চিয়ারিণী (Chiarini) সার্কাস্ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ চিয়ারিণী সার্কাস্ পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিল। কিন্তু আমাদের সার্কাস্

প্রভৃতি দেখা বিষয়ে কোন সখ ছিল না। এই জন্য তাহা আমি কখনও দেখিতে যাই নাই। কিন্তু ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে এই সার্কাস্‌ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ উদ্ধৃত রহিয়াছে দেখিয়া, কেন বলিতে পারি না তাহা পাঠ করিতে আমার কৌতূহল হইল। দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে জাহাজে করিয়া সার্কাস্‌ওয়ালা তাহাদের বাঘ দুইটি অষ্ট্রেলিয়ায় লইয়া যাইতেছিল। সমুদ্রের তরঙ্গাদি দৃষ্টে বাঘগুলি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উত্তেজিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য যথাস্থানে পৌঁছিয়া, সার্কাস্‌ওয়ালা যে সকল খেলা দেখাইত, তন্মধ্যে বাঘের খেলা প্রথম দুই তিন দিবস দেখাইতে পারে নাই। তৎপর বাঘগুলি শান্ত হইয়াছে ও খেলা দেখাইবার যোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া তাহারা এক দিবস ক্রীড়াস্থানে বাঘ লইয়া গেল। বৃহৎ খাঁচার ভিতরে দুইটি বাঘ থাকিত, সেই খাঁচার দরজা খুলিয়া খেলোয়াড় সাহেব তাহাতে প্রবেশ করিতেন এবং নিজ ইচ্ছানুসারে বাঘদিগকে চালিত করিয়া তাহাদের খেলা প্রদর্শন করিতেন। ঐ দিবস ঐরূপ সাহেব খাঁচার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাঘগুলিকে বাহির করিয়া লৌহবেষ্টনীর মধ্যে আনিলে অল্পক্ষণ পরেই বাঘগুলি উত্তেজিত হইয়া পড়িল এবং তাহার প্রতি ভীষণ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে সাহেব অতি দৃঢ় স্থির গম্ভীর ভাবে বেষ্টনীর লোহার শিকের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া বাঘদিগের প্রতি অতি তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগলেন। এইরূপ অল্পক্ষণ দৃষ্টি করিলেই বাঘগুলি শান্তভাব অবলম্বন করিল এবং একটু ভীত হইয়া লেজ গুটাইয়া খাঁচার ভিতরে প্রবেশ করিল। সাহেব তখন খুব স্থির গম্ভীরভাবে পাদ-বিক্ষেপ করিতে করিতে তাহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া মাথার হাত বুলাইয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন ও তাহাদিগের খেলা দেখাইতে লাগিলেন।

"বহুকাল পূর্ব্বে আমি ইহা পড়িয়াছিলাম। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ান্ টাইম্‌সএর ঐ বর্ণনার ভাব আমার মনে এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে এ যাবৎ তাহা আমার স্মরণ আছে। এই ঘটনাটি পাঠ করিয়া আমি অতি বিস্মিত হইলাম এবং আমার মনে এক অদ্ভুত চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলাম, এই বাঘগুলি ভীষণ পশু, মনুষ্যের প্রতি ইহাদের স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি আছে এই পাশব হিংসাবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহারা সাহেবকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। সাহেবের নিকট কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না এবং তাহাদের ভয় উৎপাদন করিতে পারে, এমন কোন বস্তু বা যন্ত্র তিনি তাহাদিগকে প্রদর্শন করেন নাই। অথচ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া তাহাদিগের স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি মন হইতে দূর করিয়া অহিংস ভাব তাহাদিগের মনে উদয় করাইলেন। ইহা কি প্রকারে হইল? এই বিষয়ে আমি অতি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলাম। পরে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, তাঁহার আভ্যন্তরিক বশীকরণ শক্তিকে তিনি তাঁহার নেত্রের দ্বারা দৃষ্টির সহিত তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদের পাশবৃত্তি দূর করিয়াছেন। তদভিন্ন আর কিছুকে এই ব্যাপারের কারণ বলিয়া ধরিতে পারিতেছি না। এই সিদ্ধান্তে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন আমার মনে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমার মনে হইল যে, গুরুশক্তি দ্বারা শিষ্যের আভ্যন্তরিক পাশবিক বৃত্তি সকল যে বিশুদ্ধ হইতে থাকে বলিয়া আমাদের দেশে শক্তিসম্পন্ন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রথা পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিয়াছে, যাহাকে আমি এতদিন এক বুজরুকি ও অসার জিনিষ বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি, তাহা অবৈজ্ঞানিক নহে। সাহেব যেমন আপনার শক্তি বাঘের মধ্যে সঞ্চারিত করিলেন, গুরু শক্তিমান্ হইলে শিষ্যে কি নিশ্চিত সেইরূপ

শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিবেন না? আমাদের দেশের এই প্রথাকে কু সংস্কার বলিয়া যে আমি এতদিন অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছি, তাহা সঙ্গত হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ কেবল নিজ সাংসারিক স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তই ধর্ম্মজীবনের উন্নতির পক্ষে গুরুকরণ ও দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা প্রচার করিয়া লোকদিগকে মোহান্ধকারে পাতিত করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে যে শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া আমি তখন হৃদয়ঙ্গম করিলাম এবং এই চিন্তাস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে জড় বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু পড়িয়াছিলাম তৎসমস্ত বিচার আমার মনে উদয় হইল। আমি বুঝিতে লাগিলাম যে, মনুষ্যের শরীর একটি যন্ত্র স্বরূপ মাত্র। ইহা তাহার আভ্যন্তরিক তড়িৎ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে এবং প্রত্যেকের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির অনুরূপ তড়িৎশক্তি সর্ব্বদা তাহার শরীর হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বাহ্যবস্তুতে প্রবিষ্ট হইতেছে। মানুষের ইচ্ছাশক্তির উন্নতি হইলে সে যথেচ্ছাক্রমে তাহা অন্যের প্রতি অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত করিতে পারে। শরীরের অঙ্গুলি সকলের সহিত তড়িৎ যন্ত্রের Point সকলের সাদৃশ্য আছে। তদ্দ্বারা প্রত্যেকের আভ্যন্তরিক তড়িৎ আপনা হইতে নির্গত হইয়া অপর বস্তু সকলে সঞ্চারিত হয়। আমার মনে হইল, এই কারণেই সম্ভবতঃ এতদ্দেশীয় শাস্ত্রে ঋষিগণ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শের দোষগুণ সকল বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকৃতিগত গুণের উপরই সম্ভবতঃ জাতিভেদও এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এবম্প্রকার নানা আলোচনা আমার মনে আন্দোলিত হইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাকে এক প্রকার নূতন মানুষ করিয়া তুলিল। আমি যে পূর্ব্বে খাদ্যাখাদ্যের বিচার, স্পর্শের দোষগুণ বিচার, শাস্ত্রীয় জাতিভেদ বিচার প্রভৃতিকে কুসংস্কার এবং স্বার্থ-পরতা-মূলক বলিয়া

পরিত্যাগ করিয়াছি ইহা সঙ্গত হয় নাই বলিয়া আমার মনে খুব দৃঢ় সন্দেহ উপস্থিত হইল।

"আমি এই সকল চিন্তার বিষয় অনেকদিন পর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, নিজেই মনে মনে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতে লাগিলাম। পরন্তু যতই আন্দোলন করিতে লাগিলাম, ততই হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যবহার-বিষয়ক শাস্ত্রের প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া আমি যে তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা আমার সঙ্গত হয় নাই বলিয়া ধারণা দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল, এবং পূর্ব্বে যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লইয়া বিলাত যাইবার সঙ্কল্প ছিল, তাহাও ইহার ফলে পরিত্যক্ত হইয়া গেল এবং ঐ বৃত্তির জন্য আর কিছু করিতে ইচ্ছা রহিল না।

"চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রাম নিবাসী কালীনাথ দত্ত নামে আমার এক ব্রাহ্ম-বন্ধু ছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় বন্ধুভাব ছিল। তিনি ব্রাহ্ম সমাজে থাকিয়াও কোন যোগী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গোপনে কিছু সাধন করেন এইরূপ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। আমার উক্ত প্রকার মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিলে আমি তাঁহার সহিত গুরুর শক্তি শিষ্যে সঞ্চারের সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ যে সম্ভবতঃ মিথ্যা নহে এই বিষয়ে কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন তিনিও অতিশয় প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলিলেন, ইহা নিশ্চয় সত্য। তিনি নিজেও শক্তিসম্পন্ন গুরুলাভ করিয়া ইহা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ ইহা স্বীকার করে না বলিয়া তিনি এই বিষয় সকলের নিকট প্রকাশ করেন না, এবং আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা নিশ্চিত সত্য ইহা আমাকে তিনি দৃঢ়রূপে বলিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, এইরূপ শক্তিসম্পন্ন লোক কেহ যদি তাঁহার জানলারে থাকেন, তবে তিনি

আমাকে লইয়া গেলে আমিও তাঁহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। তিনি খুব আনন্দিত হইয়া বলিলেন যে তাঁহার নিজ গুরু দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তে ঐ সম্প্রদায়েরই অন্য একজন মহাজন আছেন। তাঁহার নিকটই তিনি এইক্ষণ অনুগত হইয়া সাধন অভ্যাস করিতেছেন। আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবেন। এই সকল কথোপকথনের অল্পদিন পরেই ৺পূজার নিমিত্ত কলেজ বন্ধ হইল।

"আমি দেশে গেলাম। ধর্ম্ম বিষয়ে আমার মানসিক ভাবসকলের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া পিতা কিছু সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু আমি যদিও শাস্ত্রোপদিষ্ট আচার ব্যবহারের প্রতি অনেক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম তথাপি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজকে শাস্ত্রানুরূপ সমাজ বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। আমি দেখিতাম যে, বর্ত্তমান সামাজিক জাতিভেদে বিশেষ কোন বিজ্ঞান নাই। ইহা দ্বারা প্রকৃতির পরিচয় হয় না। এইক্ষণে ইহা প্রকৃতিগত ভেদের উপর স্থাপিত নহে এবং আচার ব্যবহারও বিজ্ঞানমূলক নহে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া হিন্দু-সমাজে প্রবিষ্ট হইতেও আমার ইচ্ছা হইল না।"

বাঘৈএর বাটীতে অবস্থানকালে, শাস্ত্রোপদিষ্ট আচার পদ্ধতির উপর তাঁহার আর অশ্রদ্ধা নাই দেখিয়া তাঁহার পিতা যেমন সন্তুষ্ট হইলেন, তেমনি আশান্বিতও হইলেন এবং উপবীত গ্রহণ করিয়া পুনরায় হিন্দু সমাজভুক্ত হইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। পুত্রের সহিত স্বয়ং না পারিয়া হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় এই সময়ে পুত্রবধূকে পিত্রালয় হইতে আনাইলেন, বলাবাহুল্য তাহাতে এতদ্বিষয়ক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। বাঘৈএর সংসারে নানা অশান্তির জন্য যোগমায়া ঠাকুরাণী ইতিপূর্ব্বে পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এ কথা বথাস্থলে বলিয়াছি,

প্রায় তদবধি তিনি পিত্রালয়েই ছিলেন। এখন শ্বশুরালয়ে আসিয়াও নানাকারণে তিনি তথায় বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন না; শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে থাকিবার জন্যই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক, দেশের বাটীতে আরও কয়েকদিন অবস্থান করিয়া বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের সহিত একত্রে এক বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক যোগীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রাণায়াম সাধন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"আমি ইতিপূর্ব্বেই বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার কথিত মহাজনের নিকট গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত জগৎ চন্দ্র সেন। তিনি গৃহস্থ লোক ছিলেন। তখন কোন অফিসে কেরাণীগিরি করিতেন। আমি তাঁহার নিকট মন্ত্রলাভ করিলাম। তাঁহাদের মধ্যে এক অতি উচ্চ অঙ্গের প্রাণায়াম সাধন প্রচলিত ছিল। সেই সাধন সাধারণতঃ এতদ্দেশে প্রচলিত নাই। আমি মন্ত্রলাভ করিবার পর তিনি এবং তাঁহার অপর শিষ্যগণ সকলে একত্রে বসিয়া আমাতে শক্তি সঞ্চারিত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তৎকালে শক্তির ক্রিয়া সামান্য ভাবে মাত্র অনুভব করিলাম। বিশেষ ভাবে কিছু অনুভব করিতে পারিলাম না। ঐ দিবস তাঁহার বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়া তাঁহার প্রদত্ত নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম। আমি এই সময়ে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে থাকিতাম ও আমার গুরু শ্রীযুক্ত জগৎবাবু ভবানীপুর কাঁসারিপাড়ায় থাকিতেন। এইক্ষণকার মত ট্রাম প্রভৃতি যান তখন কলিকাতায় প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং প্রত্যহ তথায় সন্ধ্যার সময় গিয়া তাঁহাদের সাধনে আমার পক্ষে

যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু আমি বাসায় থাকিয়া ভজন করিতাম। ভজন করিতে করিতে দুই তিন দিবস পরে আমার শরীরে এক অদ্ভুত ক্রিয়া উপস্থিত হইল। আমার গুরু এবং তাঁহার অনুগত সাধকদিগের যেরূপ শ্বাসের ক্রিয়া চলিতে আমি দেখিয়াছিলাম, আপনা হইতে আমার তদ্রূপ শ্বাসের ক্রিয়া চলিতে লাগিল এবং শরীরের ভিতরে একটি অদ্ভুত শক্তি প্রবাহিত হইল বলিয়া বোধ করিলাম। এক ছুটির দিন বৈকাল বেলায় এই ব্যাপার ঘটিল। আমি তখনই কালীনাথ বাবুর নিকট গিয়া তাঁহাকে ঐ সংবাদ দিলাম। তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমাকে পুনরায় সাধনে বসাইলেন, এবং তৎপরে পুনরায় আমার শরীরে পূর্ব্ববৎ শ্বাসের ক্রিয়া সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, আমার শরীরে সাধন-শক্তি ফুটিয়াছে এবং ষটচক্রের রাস্তা খুলিয়া গিয়াছে। আপনা হইতেই ইহা হইয়াছে দেখিয়া তিনি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে দুই তিন দিনের মধ্যেই সেই শারীরিক ক্রিয়া আমার আয়ত্ত হইল। আমি ইচ্ছাক্রমে ইহা বন্ধ করিতে পারিতাম, এবং ইচ্ছাক্রমে চালাইতে পারিতাম। কলেজ যখন বন্ধ থাকিত, তখন কখনও কখনও ভবানীপুরে গিয়া গুরুর নিকট সাধনে বসিতাম, এবং ঐ সাধনে ক্রমশঃ আমার খুব আসক্তি জন্মিয়া গেল। আমার গুরু জগৎবাবু অল্পদিনের পর চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। তিনি ভবানীপুরের বাসা ছাড়িয়া আপন পৈত্রিক বাটী গৌরীতায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। একবার কলিকাতায় আসিয়া আমাদের বাসার নিকটস্থ রাজা লেনস্থিত এক বাড়ীতে ছিলেন। তথায় তাঁহার খুব জ্বর হয়। আমি সিটি কলেজ হইতে কলেজের ছুটি হইবার দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কলেজের কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। তখন তাঁহার খুব জ্বর, আমাকে দেখিয়া

তিনি খুব প্রসন্ন হইলেন এবং আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বেগের সহিত প্রাণায়াম কার্য্য আরম্ভ করিয়া আমার শরীরে শক্তি-সঞ্চার করিতে লাগিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়াম করিতে লাগিলাম। শরীরে খুব ক্রিয়া হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "অদ্য তোমার মূলাধার হইতে দ্বিদল পর্য্যন্ত ছয়টি চক্রই ভেদ হইয়া গেল।" এই বলিয়া বলিলেন, "আরও কি অধিক কিছু চাও?" আমি বলিলাম, "আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় তদ্রূপ করুন।" তিনি বলিলেন, "আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক, তুমি সাধন করিয়া এইটুকু আয়ত্ত কর। এইরূপ একেবারে ষট্‌চক্র ভেদ অন্য কাহারও হয় নাই।" আমি ভাবের ঘোরে টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিলাম, এবং সাধন করিতে লাগিলাম। ক্রমে এই সাধনের প্রতি আমি বিশেষ আকৃষ্টচিত্ত হইলাম ও দিনের পর দিন পূর্ণ মনে তাহা অভ্যাস করিতে লাগিলাম।"

এইরূপে যোগী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম সাধন করিতে থাকিলেও ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎই রহিল। প্রতি রবিবারে সমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিতেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের বন্ধুগণের সহিত সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎ ঘনিষ্ঠ রহিল। এই সময়ে একদিন তাঁহার পিতা পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও অতঃপর তাঁহাদের সহিত প্রথমতঃ দ্বিজদাস বাবুর সেই বাসাতেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনজনে নিকটস্থ রাজা লেনের একটি বাটীতে উঠিয়া গেলেন।

তাঁহার তৎকালীন বন্ধুগণের মধ্যে আরও কেহ কেহ এই সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এ সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাদিগকে কিছু কিছু বলিয়াছেন। তাহা এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

"আমি ও দ্বিজদাসবাবু যে বাটীতে থাকিতাম তাহার নিকটেই ঝামাপুকুরে অপর একটি বাটীতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় বাস করিতেন। আমি এই যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার দুই তিন মাস পরে শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ও আমার গুরু জগৎবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া এই সাধন লাভ করিলেন।

"শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের শক্তি-সঞ্চারের সময় যে অবস্থা খুলিয়াছিল তাহা এযাবৎ আমার স্মরণ আছে। সেই দিবস রবিবার, ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার দিন ছিল। বৈকালে তিনি এবং কালীনাথ বাবু প্রভৃতি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সেইখানেই আমাদের সাধনের বৈঠক হয়। কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় "নাম" পাইয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া ষট্চক্রের রাস্তা খুলে নাই। ঐ দিবস ঐ বৈঠকে তাঁহাকে শক্তি সঞ্চারিত করিতে বৈঠকের সকলেই চেষ্টা করেন। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া গেল এবং তাহাতে তিনি এমন আনন্দে অভিভূত হইলেন যে, সায়ংকালে বৈঠক শেষ করিয়া আমরা সকলে সমাজের মন্দিরে যাইতে প্রস্তুত হইলে তিনি বলিলেন, "আমার এখান হইতে আর উঠিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আমি এখানেই দুই তিন দিন থাকিতে ইচ্ছা করি।" আমি ভাবিলাম যে, তিনি অল্প দিবস হইল বিবাহিত হইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী একাকিনী বাড়ীতে আছেন, তিনি বাড়ীতে না গেলে তাঁহার স্ত্রী খুব ক্লেশ পাইবেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্ততঃ একবার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া উচিত। তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া কহিয়া যদি তিনি পুনরায় আসেন, তবে ভাল হয়। কিন্তু একথা তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে বলিতে তখন ইচ্ছা হইল না, কারণ ইহাতে তাঁহার ভাব ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা ছিল। তাঁহাকে বলিলাম, "বেশ! এখানে থাকিবেন ভাল, কিন্তু অদ্য সমাজের

দিন, একবার সমাজে যাওয়া ভাল নয় কি?" তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, সমাজে যাইব।" অতঃপর আমরা সমাজে গেলাম। সমাজের উপাসনার পর ঘরে ফিরিবার সময় দেখিলাম, যে তাঁহার ভাবের গভীরতা কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। তাঁহার বাড়ী সমাজের উপাসনা-গৃহ হইতে অধিক দূরে ছিল না। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, তাঁহার স্ত্রী একাকিনী আছেন। তিনি বাড়ী হইতে দুপুরের পরই বাহির হইয়া আসিয়াছেন, রাত্রেও যদি সংবাদ না দিয়া অনুপস্থিত থাকেন, তবে তিনি খুব চিন্তিত ও ক্লিষ্ট হইবেন। অতএব তাঁহাকে একবার সংবাদ দিয়া আমাদের বাড়ী গেলে ভাল হয়। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন এবং আমরা উভয়ে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। আমি বাহির দরজায়ই দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি গৃহ প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরেই আসিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই। বাড়ীতে ভারী গোলযোগ উপস্থিত। তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কান্নাকাটি করিতেছেন। আমার আর আজ আপনাদের বাটীতে যাওয়া হইবে না।" তখন আমি তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলাম।"

এই সময় কর্ণেল অলকট (Colonel Alcot) এই দেশে আসিলেন। ভারতবর্ষীয় কোন মহাপুরুষ আমেরিকায় তাঁহার গৃহ মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন এবং তিনি যে যথার্থই ভারতবর্ষীয় জীবিত লোক, বিভীষিকা মাত্র নহেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত নিজ মস্তকের পাগড়ীটি তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সম্মুখেই অন্তর্হিত হইয়া যান; অতঃপর অলকট (Alcot) সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া এক পাহাড়ে পুনরায় তাঁহার দর্শন লাভ করেন, ইত্যাদি বৃত্তান্ত বিশেষরূপে প্রকাশিত হইল।

এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের মন প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের শাস্ত্রোল্লিখিত অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্ঞানবত্তা বিষয়ে ক্রমশঃই আরও দৃঢ়রূপে আস্থাসম্পন্ন হইতে লাগিল এবং ঋষিগণের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি জন্মিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন—

"লাহোর হইতে কংকালে একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল যে, একজন মাদ্রাজী ভারতীয় খৃষ্টান (Native Christian) কিছুকাল বর্ম্মায় থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করেন। পরে মাদ্রাজে আসিয়া খৃষ্টানী ভাবেই পুনরায় থাকিয়া একটি স্কুলের শিক্ষকতা করিতে থাকেন। এক দিবস রাত্রে তিনি নিদ্রিত আছেন, এমন সময় শুনিলেন যে, দূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য কেহ আহ্বান করিতেছেন। তিনি সেই শব্দে এত আকৃষ্ট হইলেন যে, কোন প্রকার বিচার না করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইয়াই কাহাকেও না বলিয়া একেবারে দ্রুতবেগে যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে প্রস্থান করিলেন। সারা-রাত্রি চলিয়া প্রভাত হইলে তিনি এক নির্জ্জন বনে এক শিব মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরে কেবল শিবমূর্ত্তি দেখিলেন। তথা হইতে আকাশবাণী নির্গত হইয়া তাঁহাকে এক বিশেষ দিকে সোজা চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং ইহাও নির্দেশ করিলেন যে, সোজাসুজি চলিয়া গিয়া যেখানে তিনি পাহাড় দেখিবেন, নির্গমনের কোন রাস্তা দেখিবেন না, সেই স্থান হইতে অন্য গন্তব্য স্থানে তাঁহাকে অন্য একজন লোক আসিয়া লইয়া যাইবে। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ঐ আদেশানুসারে চলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এক পাহাড় তাঁহার সম্মুখ-দিকের গতি রুদ্ধ করিয়া অবস্থিত আছে, দেখিতে পাইলেন। কিয়ৎকাল

তিনি তথায় অবস্থান করিতে না করিতে এক জটাধারী পুরুষ আসিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পরে সেই পুরুষ এক প্রস্তরময় পাহাড়ের স্থান প্রাপ্ত হইয়া একখণ্ড প্রস্তরকে টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে এক গুফা দৃষ্ট হইল। সেই পুরুষ ঐ গুফার মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করাইলেন এবং নিজেও প্রবিষ্ট হইয়া ঐ প্রস্তরকে পুনরায় পূর্ব্বস্থানে স্থাপিত করিয়া গুফার মুখ বন্ধ করিলেন। গুফাটি বহু বিস্তৃত ও আলোকময়, তন্মধ্যে অনেক লোক আছেন, অনেকে ধ্যানস্থ হইয়া আছেন, অনেকে পাঠ করিতেছেন, অন্যেরা অন্যান্য কাজ করিতেছেন। তিনি অবগত হইলেন, ঐটি ভগবান্ অগস্ত্য ঋষির আশ্রম, তিনি ঐ পাহাড়ের উপরিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থানে স্থিত একটি গুহাতে ধ্যানে নিমগ্নাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক পঞ্চাশৎ বৎসর পরে তাঁহার ঐ গুফাতে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য স্থানের অনেক ঋষি সমাগত হয়েন এবং তাঁহাদের সভায় আগামী পঞ্চাশৎ বৎসরের জন্য জনসমাজের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিয়া তাঁহারা আপন আপন স্থানে ফিরিয়া যান। তিনি ঐ স্থানে কয়েক বৎসর কাল বাস করেন। সেই স্থানে সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ একত্রিত আছে তিনি দেখিতে পান এবং তন্মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ তাঁহার অধ্যয়ন করা হইলে মানসসরোবর দর্শন করিয়া আসিবার নিমিত্ত ঐ গুহার দ্বার দিয়া তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। তৎপর তিনি হাঁটিয়া হাঁটিয়া মানসসরোবর দর্শন করেন এবং তথায় স্নানান্তে ফিরিবার সময় এক ঋষির সাক্ষাৎ পান। তিনি নেত্র মুদ্রিত করাইয়া তাঁহাকে আকাশপথে কৈলাশ পর্ব্বতে লইয়া গেলেন। সেখানে দর্শনাদির পর ঋষি তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ নেত্র মুদ্রিত অবস্থায় ভূতলে আনিয়া

পুনরায় অগস্ত্যাশ্রমে যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি তথা হইতে চলিতে চলিতে লাহোর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ইংরেজী ভাষাবিৎ কৃতবিদ্য কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে তিনি এই সকল কথা প্রকাশ করেন। তাঁহারা এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরেজী ভাষায় পূর্ব্বোক্ত পুস্তিকাখানি প্রচার করেন।

"এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া আমার মনে ঋষিদের প্রতি আস্থা আরও বর্দ্ধিত হইল এবং এযাবৎ যে তাঁহারা জনসমাজের কল্যাণ-বিধায়ক হইয়া রহিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।"

অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায়, সর্ব্ববিধ বাহ্য ব্যবহারের অন্তরালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চিত্তে সাধারণতঃ বহিঃপ্রকাশহীন ঊর্দ্ধমুখী এক চিন্তাস্রোত সর্ব্বদা বহমান ছিল, ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাই অতীতে দেবদ্বিজ ভক্তিমান্ পরমনিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আচারভ্রষ্ট একেশ্বরবাদী এমন কি নিরীশ্বরবাদী করিয়াছিল, নিরীশ্বরবাদী শুষ্ক তার্কিককে ভজনশীল ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মকে যোগী করিয়াছিল। ইহাই আবার আজ তাঁহাকে এক নূতন পরিবর্ত্তনের দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। বাস্তবিক এই আভ্যন্তরিক জীবন-স্রোতের ক্রমিক পরিণতির ইতিহাসই তাঁহার প্রকৃত জীবন-বৃত্তান্ত।

কর্ম্মকোলাহলমুখরিত নাগরিক জীবন আত্মচিন্তার পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়া সুযোগ পাইলেই তিনি কলিকাতার বাহিরে গিয়া এক একদিন যাপন করিয়া আসিতেন। শিবপুরের বোটানিকেল গার্ডেন, তথাকার নয়নমনোরঞ্জন শ্যাম শোভা এবং আত্মচিন্তার অনুকূল শান্ত নিস্তব্ধতা তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিত। বাতায়াতে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ভ্রমণটুকুও তাঁহাকে নিরাবিল আনন্দ দিত। এজন্য অবসর পাইলেই

এক একদিন শিবপুরের উদ্যানে তিনি একাকী বেড়াইতে যাইতেন, সকালে যাইতেন এবং সমস্ত দিন সেখানে অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিতেন। কখনও গঙ্গাতীরে গিয়া একাকী এক বৃক্ষতলে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতেন।

গঙ্গাতীরস্থ এক উদ্যানে বেড়াইতে যান শুনিয়া তাঁহার পিতা একদিন তাঁহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সারাদিন থাকিবেন জানিয়াও নিরস্ত হইলেন না, বলিলেন কিছু খাবার সঙ্গে নিয়া গেলেই চলিবে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইহাতে সম্মত হইয়া কালেজের কোন ছুটির দিনে সকাল বেলায় তাঁহাকে লইয়া নৌকা করিয়া বোটানিক গার্ডেনে বেড়াইতে চলিলেন। এখনকার ন্যায় তখন গঙ্গায় খেয়া ষ্টীমার ছিল না, নৌকাতেই গঙ্গাপার হইতে হইত। শিবপুরের দিকে লোক নামিবার জন্য বাঁধান ঘাটও তখন ছিল না। কাঁচা ঘাটে নৌকা গিয়া ভিড়িত। পথে গঙ্গাবক্ষের মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ও নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে করিতে, তাঁহারাও সেই ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তীরে উঠিয়া বাগানের মধ্যে, জগতের সর্ব্বস্থান হইতে সযত্নে আহরিত বিবিধ তরুগুল্ম দর্শন করিতে করিতে কিছুকাল ঘুরিবার পর এক নিভৃত স্থানে গিয়া পিতা-পুত্রে বসিলেন। গঙ্গাস্নানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রীতি ছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে অসুস্থ পিতার আহ্বানে যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হিন্দু আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায় আস্থার উদ্রেক হয় নাই, তথাপি গঙ্গাস্নান করিতেন ও করিয়া আনন্দ পাইতেন। কিছুক্ষণ বসিবার পর তিনি স্নান করিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে আসিলেন। স্নান করিয়া কেবল উঠিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পিতা আসিয়া একটি পৈতা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমার অনুরোধ, তুমি ইহা রক্ষা কর। ইহাতে

তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না। ইহা প্রাচীনকাল হইতে আমাদের জাতিগত চিহ্ন।" এইরূপ অনেক কথা অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এই বিষয়ে কোন কথা তাঁহার পিতা পূর্ব্বে তাঁহাকে বলেন নাই। তাঁহার পিতা যখন গলায় পৈতা দিয়া দিলেন, তখন তিনি কি করিবেন, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনিও তৎপূর্ব্ব হইতেই ঋষিদের প্রবর্ত্তিত আহারাদি সম্বন্ধীয় উপদেশ যথাসাধ্য পালন করিতেছিলেন। নিরামিষ খাইতেন, তাঁহার স্ত্রী যাহা পাক করিতেন, তাহাই খাইতেন, অন্য কোন স্থানে আহার করিতেন না। এরূপ অবস্থায় পিতা যখন এইরূপ জিদ্ করিয়া তাঁহাকে উপবীত ধারণ করাইয়াছেন তখন ইহা পরিত্যাগ করিয়া পিতাকে অবজ্ঞা করিবার এবং ক্লেশ দিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বাস্তবিকই ত তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এই সকল বিবেচনা করিয়া যজ্ঞোপবীত রাখাই স্থির করিলেন, তাহা ফেলিয়া দিয়া পিতার মনে অতিশয় বেদনা দিতে আর প্রবৃত্তি হইল না।

উপবীত ধারণ করিলেও তিনি তখনই হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে পারিলেন না। এদিকে ব্রাহ্ম সমাজেও সামাজিকভাবে মিশা সম্ভব হইল না; কারণ ঐ সমাজে আহারাদি বিষয়ে কোন নিয়ম নাই এবং গুরুশক্তি প্রবর্ত্তিত না থাকাতে সাধনাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে অগ্রসর হইবার কোন পন্থা নাই। চক্ষুষ্মান্ এমন পথ-প্রদর্শক কেহ তাঁহাদিগের মধ্যে নাই যিনি বলিতে পারেন যে, আমি নিষ্পাপ হইয়াছি ও ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছি। এ কারণ সামাজিক ভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা তাঁহার পক্ষে মিথ্যা আড়ম্বরমাত্র, এই ভাবিয়া তিনি মনে

মনে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। হিন্দু সমাজ হইতেও পূর্ব্ব হইতেই বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। অতএব এখন নিজেকে উভয় সমাজচ্যুত একাকী বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সাধনের অপূর্ণতা ও জীবের অন্তঃকরণে যথার্থ শান্তি-দানের পক্ষে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সিটি স্কুল ও কলেজ প্রধানতঃ ব্রাহ্ম সমাজের ভাব প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল ও এই উভয় বিদ্যায়তনের শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও যখন সিটি স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন, তখন অর্থোপার্জ্জনই মাত্র তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। বর্ত্তমানে নিজের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন যে, ছাত্রবর্গের উপর যখন তাঁহার প্রভাব খুব বেশী, অথচ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মনে মনে তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহার পক্ষে এই কলেজে অধ্যাপকরূপে আর অধিক দিন থাকা কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী হইবে। তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন অপরেও লক্ষ্য করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় এজন্য যেন কথঞ্চিৎ শঙ্কাযুক্তও হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল। এই সকল ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের কার্য্যে ইস্তফা দিবেন স্থির করিলেন এবং অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশবাবুকে জানাইলেন যে, তিনি আর এই চাকুরী করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি তাহাতে খুব দুঃখ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু বাবাজী মহারাজের এ বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার পদত্যাগের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষক মিলিত হইয়া এক সভা করিয়া

তাঁহার পদত্যাগে দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন।

এই সময় তাঁহার অন্য কোন আর্থিক অবলম্বন ছিল না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার এক স্থানে গৃহ-শিক্ষকের কাজ জুটিয়া গেল। বাগবাগানের চারু দত্ত নামক জনৈক ব্যারিষ্টার ভদ্রলোক তাঁহার একটি পুত্রকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বিলাত পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া ছেলেটিকে কিছুদিন পড়াইবার জন্য একজন শিক্ষক খুঁজিতেছিলেন, মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে এই কার্য্যের ভার তিনি পাইলেন। আর একটি কাজও এই সময়ে পাওয়া গেল। জনৈক পুস্তক ব্যবসায়ীর অনুরোধে তিনি সেই বৎসরের এণ্ট্রান্স কোর্সের ব্যাখ্যা লিখিয়া তাঁহার নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে আট শত টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইলেন। এইরূপে এই সময়ে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে আর্থিক অনটন ভোগ করিতে দিলেন না।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীহট্টে ওকালতি : হিন্দু সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত হরকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার পুত্র একজন বড় উকিল হন। তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে এজন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেন। পিতার অনুরোধে তিনি কলেজে প্রফেসারী করিবার সময়ে এক বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে ও পর বৎসর মেট্রোপলিটন কলেজে আইনের ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। উপস্থিতি লেখাইবার জন্যই শুধু যাইতেন, কোনও আইনের বই কখনও কিনেন নাই, অথবা পড়েনও নাই। এই সময়ে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বাং ১২৯০ সাল) সিটি কলেজে আইন বিভাগ খোলা হইল। তখন তিনিও অধ্যাপনা কার্য্যের অন্তে "ল-ক্লাসে" যোগদান করিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহার কলেজে চাকুরীর শেষ বৎসরের কথা। চাকুরী ছাড়ার পরও তিনি আইনের ক্লাসে উপস্থিত হইতেন। এতদিন ক্লাসে গিয়াছেন, আর কিছুদিন গেলেই আইনপড়ার নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়, এইজন্যই তখনও যাইতেন, পরীক্ষা দিয়া উকিল হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি অনেক সময় অনুভব করিতেন যেন কোন অদৃশ্য শক্তিদ্বারা চালিত হইয়া আইন ক্লাসে উপস্থিত হইতেছেন। ওকালতি ব্যবসায়ে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া অন্য কোন কলেজে প্রফেসারী চাকুরী পান কিনা, তাহারই চেষ্টায় থাকিতেন। এই অবস্থায় এক অভাবনীয় ঘটনায় ওকালতি সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক ও আচার্য্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যে যোগী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন, গোস্বামী প্রভুও সে সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া অভ্যাস করিতেন ; কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি উক্ত সাধন গ্রহণ করার পর সমাজে তাঁহার উপাসনা ও বক্তৃতায় লোক অধিকতর আকৃষ্ট হইত, কারণ তখন তিনি সাধন-শক্তি লাভ করিয়াছেন। এই অবস্থায় গয়ার ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক উৎসবে আহূত হইয়া তিনি তথায় গমন করেন। সেখানে অবস্থান কালে একদিন আকাশ গঙ্গার পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া কতিপয় সাধুর সাক্ষাৎলাভ করেন এবং তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া এমন আকৃষ্ট হন যে, গৈরিক বস্ত্র আনাইয়া তাহা পরিধান পূর্ব্বক একেবারে তাঁহাদের আশ্রমে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। এই সময় পাহাড়ের এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া তিনি প্রত্যহ ভজন করিতেন। তথায় মানস-সরোবরবাসী এক সিদ্ধ মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দেন এবং তাঁহার প্রতি অশেষ কৃপা প্রকাশ করেন। ইহা বাংলা ১২৯০ সনের আষাঢ় মাসের ঘটনা (ইং ১৮৮৩)। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ও বাবাজী মহারাজের মধ্যে পরস্পর অতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, উভয় পরিবারের মধ্যেও খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুতরাং এই সংবাদ অতি শীঘ্রই তাঁহার কর্ণগোচর হইল ও ইহাতে আইন অধ্যয়ন সম্বন্ধে তাঁহার মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলেন, ওকালতি স্বাধীন ব্যবসা, যেখানে সেখানে থাকা যায়। কোন স্থানে চাকুরী লইলে অন্যত্র যাওয়া যায় না, সেখানেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। আইন পরীক্ষায় যে আর কয়েক মাস বাকী আছে, তাহার মধ্যেই বিশেষ চেষ্টা করিয়া আইনের

পুস্তক পড়িয়া ওকালতি পরীক্ষা দিবেন এবং উকিল হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে গয়ার মত কোন স্থানে ইচ্ছানুসারে বাস করিবেন। তাহা হইলে শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় তাঁহারও সাধুসঙ্গ লাভ হইতে পারিবে, কারণ ঐ সব অঞ্চলেই সাধুগণের যাতায়াত আছে, অনেকে থাকেনও। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া আইনের পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলেন। এইবার পাঠ্য-বিষয় তিনি খুব সহজ বলিয়া বোধ করিলেন, সুতরাং পরীক্ষার অল্প সময় বাকী থাকিলেও অধিকাংশ পুস্তক পড়িয়া লইতে সমর্থ হইলেন এবং ইংরাজী ১৮৮৪ সনের জানুয়ারী মাসে (বাং ১২৯০) বি. এল্. পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষান্তে পিতার অনুরোধক্রমে সস্ত্রীক দেশের বাটীতে গেলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের স্বগ্রাম বামৈ হইতে হবিগঞ্জ মহকুমা অধিক দূরে নহে। এই সময়ে হবিগঞ্জের ফৌজদারী আদালতে একটি বড় জালিয়াতি মোকদ্দমা চলিতেছিল। রামানন্দ পাল নামে একজন জমিদার হবিগঞ্জের মুন্সেফী আদালতে একটি খাজানার মোকদ্দমায় একখানি কবুলিয়ত দাখিল করেন। ঐ দলিলের অপর পৃষ্ঠে ষ্ট্যাম্প-বিক্রেতা যে তারিখে কাগজ বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া লিখিয়া দিয়াছে, তাহার বহুপূর্ব্বে কবুলিয়ত সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া দলিলে লেখা ছিল। সুতরাং কবুলিয়ত জাল সাব্যস্ত করিয়া মুন্সেফ ফৌজদারী আদালতে জালের বিচারের নিমিত্ত জমিদারকে প্রেরণ করেন। এই ফৌজদারী মোকদ্দমা লইয়া তৎকালে শ্রীহট্ট জেলায় বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দেশে যাইবার কয়েকদিন পরেই খবর পাইলেন যে, তিনি বি. এল্. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সংবাদ পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই জমিদার রামানন্দবাবুর

একজন নায়েব তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নিজের মনিবকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে এবং তাঁহার পিতাকে একান্তভাবে ধরিয়া পড়িলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, "আমি পরীক্ষায় পাশ হইয়াছি এইমাত্র খবর পাইয়াছি, পাশ হওয়ার সার্টিফিকেট পর্য্যন্ত এখনও পাই নাই। সার্টিফিকেট পাইলেও হাইকোর্টে উকিল স্বরূপ নামভুক্ত না করাইয়া কেহ ওকালতি কার্য্য করিতে পারে না। এইরূপ নাম ভর্ত্তি করাইয়া সনন্দ পাইতেও প্রায় দেড়মাস সময় লাগে। এখন ত আমি উকিল হইয়া কোন আদালতে উপস্থিত হইতে পারি না।" কিন্তু নায়েব মহাশয় তাঁহার পিতাকে বিশেষ কাতরভাবে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "উনি আদালতে উপস্থিত হইয়া অনুরোধ করিলে মোকদ্দমার তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়া মুলতুবী হইতে পারে, উঁহাকে যাইতেই হইবে। আমি শ্রীহট্টের উকিলদের নিকট গিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মোকদ্দমায় আসামীর অব্যাহতি লাভের কোন উপায় নাই। এই সব কথা শুনিয়া মাত্র উঁহারই ভরসা করিয়া আমরা উঁহাকেই আশ্রয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।"

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ কলেজে প্রফেসারী করার সময় এবং তৎপূর্ব্বেও বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং অন্যান্য কারণেও শ্রীহট্ট জেলায় তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। সেই জন্যই তাহারা এইরূপ ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। তাহাদের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "ইহার মোকদ্দমা তোমার লইতেই হইবে।" তিনি বলিলেন "আমি সনন্দ পাই নাই, আমি কিরূপে আদালতে উকিল হইয়া যাইব?" তথাপি তিনি জিদ করিয়া বলিলেন, "দেখ, ইহার কোন উপায় বাহির কর, যাইতেই হইবে।" ক্রিমেন্সল সাহেব কৃত ফৌজদারী কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয় আইনের বই একখানি তাঁহার নিকট

ছিল। তিনি তাহা খুঁজিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে যে, আদালতের অনুমতি লইয়া যে কেহ আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে পারে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যদি আদালত অনুমতি দেন, তবে অবশ্য আসামী পক্ষে উকিল স্বরূপে কার্য্য করিতে পারি। অনুমতি না দিলে হাস্যাস্পদ হইয়া ফিরিতে হইবে।" তাঁহার পিতা বলিলেন "যেমনই হউক, যাও, গিয়া চেষ্টা কর। ইনি সম্ভ্রান্ত লোক, জমিদার। এখন সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত।" জমিদারের নায়েবও বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশীয়, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আত্মীয় ছিলেন। অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া নায়েব মহাশয়ের সহিত হবিগঞ্জ আদালতে গেলেন।

এণ্ডারসন নামে বিশেষ ভদ্র স্বভাব-সম্পন্ন এক সাহেব বিচারকের এজলাশেই এই মোকদ্দমা চলিতেছিল। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রার্থনা ইঁহাকে জানাইলে সাহেব অপর পক্ষের মোক্তারদিগকে বলিলেন, "ইনি ত বি এল্. পাশ করিয়াছেন, ইনি উকিল স্বরূপ কার্য্য করিলে কি আপনাদের কোন আপত্তি আছে?" মোক্তারেরা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতেন, অনেকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তাও ছিল, সুতরাং তাঁহারা সহজেই সম্মত হইলেন এবং সাহেবও তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী, উক্ত কবুলিয়ত দাতা প্রজা স্বয়ং জবানবন্দী দিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বে কখনও আদালতে যান নাই বা সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে দেখেন নাই, কিন্তু এই সাক্ষীর জেরা করিতে হইল। ভগবৎ কৃপায় জেরার প্রশ্ন সমূহ আপনা হইতে পরপর, তাঁহার মনে আসিতে লাগিল, যেন কোন অদৃশ্য শক্তি অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাকে প্রেরণা দিতে লাগিলেন।

জেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিল, পরে মোকদ্দমার অন্য তারিখ পড়িয়া গেল। তাঁহার জেরার প্রণালী দৃষ্টে সকলেই একেবারে নূতন উকিলের পক্ষে এইরূপ জেরা আশ্চর্য্যজনক মনে করিলেন ও সেখানে তাঁহার খুব প্রশংসা বাহির হইল। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই বি এল পরীক্ষায় পাশের সার্টিফিকেট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম দিনেই হবিগঞ্জের কাছারীতে এই রকম সুনাম হওয়াতে তাঁহার পিতা এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ সকলেই শ্রীহট্ট আদালতে গিয়া উকিল হইবার দরখাস্ত করিতে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বে মনস্থ করিয়াছিলেন ওকালতি ব্যবসায় লইয়া গয়ায় যাইবেন। কিন্তু সকলের অনুরোধে বাধ্য হইয়া শ্রীহট্টে গিয়া তথাকার জজ সাহেবের দ্বারা নিয়মানুসারে ওকালতি কার্য্যে ভর্ত্তি হইবার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত পাঠাইলেন। শ্রীহট্ট হইতে ফিরিয়া আসিবার পর পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমা চালাইবার জন্য নানা তারিখে হবিগঞ্জের আদালতে তাঁহাকে যাইতে হইল। অবশেষে দৈবানুগ্রহে বিচারক সাহেব আসামী জমিদারবাবুকে অব্যাহতি দিয়া তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে শ্রীহট্টের জজ আদালতে সেসনে বিচারের জন্য প্রেরণ করিলেন। জমিদার মুক্ত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হইলে তাঁহার খুব নাম পড়িয়া গেল।

এই সময় হবিগঞ্জের অন্য ফৌজদারী এজলাশে আর একটি বড় মোকদ্দমা চলিতেছিল। তাহাতে পাবলিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের একজন ওভারসিয়ার আসামী ছিলেন। হবিগঞ্জের এলাকায় সরকারী খরচে কন্‌ট্রাক্‌টার রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই রাস্তার কার্য্যে কত মাটি কাটা হইয়াছে, তাহা পরিমাণ করিয়া অভিযুক্ত ওভারসিয়ার বাবু রিপোর্ট দেন। সেই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কন্‌ট্রাক্‌টারকে

অনেক টাকা দেওয়া হয়। পরে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া পুনরায় মাপিয়া বলেন যে, মাটি এত অধিক কাটা হয় নাই, অনেক কম কাটা হইয়াছে, এবং অনেক বেশী টাকা কনট্রাক্টারকে দেওয়া হইয়াছে। অনন্তর মিথ্যা রিপোর্ট দিয়া টাকা বাহির করিবার অভিযোগে এই ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হয়। ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার জবানবন্দী দিয়া বলেন যে, মাপিয়া তিনি কম মাটি পাইয়াছেন এবং অভিযোগের পোষকতায় অন্যান্য প্রমাণও দেওয়া হয়। বিচারকারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা সেসনে বিচারের জন্য অর্পণ করেন। পূর্ব্বোক্ত জালিয়াতি মোকদ্দমায় জমিদার অব্যাহতি পাইলেন দেখিয়া সেই ওভারসিয়ার শ্রীহট্টে সেসন আরম্ভ হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে বামৈএর চৌধুরী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক ছিলেন, বামৈএ আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যাহাতে সেসন কোর্টের বিচারকালে তাহার পক্ষে কাজ করেন তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বিশেষ অনুনয় করিতে লাগিলেন। তখনও তিনি হাইকোর্ট হইতে ওকালতির সনন্দ পান নাই। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, বিশেষ চেষ্টা করিলে সেসনের বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সনন্দ সম্ভবতঃ পাইতে পারিবেন, সুতরাং এই মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া কাগজ-পত্র দেখিলেন। বাবাজী মহারাজ এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার বৎসরই সার্ভেইং পড়িয়াছিলেন ও তখনই জরিপ, নকসা আঁকা প্রভৃতি কাজ ভালরূপ শিখিয়াছিলেন। তখন এজন্য পৃথক্ পরীক্ষা লওয়া হইত। এই শিক্ষা এখন তাঁহার উপকারে আসিল। তিনি এই ওভারসিয়ারের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত খুব ভালরূপে বুঝিয়া আয়ত্ত করিলেন। অতঃপর উভয়ে এক সঙ্গেই শ্রীহট্টে গেলেন, তথায় গিয়া হাইকোর্টে রেজিষ্ট্রারের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহার এনরোলমেণ্ট সনন্দ আনাইলেন।

৺পূজার ছুটির অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সেসন হয়, সেই সময়ে এই সনন্দ আসিয়া পৌঁছিল। এইটিই সেবার সেসনের প্রথম মোকদ্দমা ছিল। বিপক্ষের প্রধান সাক্ষী ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রিয়নাথবাবু স্বয়ং। সার্ভেইং বিষয়ে যে বাবাজী মহারাজের অভিজ্ঞতা আছে, তাহা তিনি জানিতেন না। সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিশেষ জেরা হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। জেবাব সময় বাবাজী মহাবাজের প্রশ্নে তিনি এমন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন যে, অতিশয় অসম্ভব ও পরস্পরবিরোধী উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে দক্ষতা ও সাবধানতার সহিত রাস্তার মাটি মাপিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উত্তর শুনিয়া কাহারই মনে হইল না। দুই তিন দিন ধরিয়া দায়রায় বিচার চলিল, অবশেষে জজ সাহেব শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সওয়াল জবাব (argument) ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়া তদনুযায়ী রায় দিয়া আসামীকে খালাস দিলেন।

ইহার পরেই শ্রীহট্টে একটি খুব চাঞ্চল্যকর মামলা (sensational case) সেসনে সোপর্দ্দ হইল। মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন (Election) উপলক্ষে সহরে দুইটি দল হইয়াছিল। এই মোকদ্দমার প্রধান আসামী এক দলের নেতা ছিলেন। কাজেই এই মামলা লইয়াও দুইটি দল হইয়াছিল, এক দল আসামীর পক্ষে, অপর দল বিপক্ষে ছিলেন। এই মোকদ্দমায় আসামীদের পক্ষে শ্রীহট্ট সহরের সমস্ত বড় বড় উকিল পূর্ব্বেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু ওভারসিয়ারের মোকদ্দমায় তিনি খালাস পাওয়ায় বাবাজী মহারাজের নাম খুব প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া এই মোকদ্দমায়ও আসামীপক্ষ তাঁহাকে উকিল নিযুক্ত করিল। অন্য উকিলেরা আসামীদের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাকেই তাহাদের মোকদ্দমা চালাইতে দিলেন। এই মোকদ্দমায়ও আসামী খালাস পাইল। এইরূপে পর পর তিনটি বড় মোকদ্দমায় জয়ী হওয়াতে তাঁহার সেখানে

বেশ পসার হইল এবং ফৌজদারী বিভাগে উকিলদের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন।

সেসন শেষ হইবার কয়েকদিন পরেই পূজা উপলক্ষে আদালত বন্ধ হইল। ছুটিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বাড়ী গেলে এইবারে তাঁহার পিতা ও আত্মীয়স্বজনেরা অনেকে তাঁহাকে সমাজে উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে গ্রামে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল ও বিশেষ দলাদলির সৃষ্টি হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিজে পুনবায় হিন্দু সমাজে গৃহীত হইবার জন্য এই সময়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন না বলিয়াই হউক, অথবা কয়েকজন জ্ঞাতির প্রবল বিরোধিতার জন্যই হউক এই চেষ্টা কিছুদিন পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার শ্রীহট্টে অবস্থান কালেই অবশ্য জ্ঞাতিবৃন্দ ও সামাজিকগণ তাঁহাকে সাদরে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সকল কথা পরে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

কাছারী খুলিবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীহট্টে ফিরিয়া আসিলেন এই সময়ে আদালত খুলিবার অব্যবহিত পরেই, একটি বড় দেওয়ানী আপীলের মোকদ্দমার তারিখ ছিল। একটি পাহাড়ের অধিকার লইয়া এক পক্ষে গভর্ণমেন্ট ও অপর পক্ষে একজন জমিদারের মধ্যে এই মামলা উপস্থিত হইয়াছিল। সবজজ এই মোকদ্দমা প্রথমকল্পে বিচার করিয়া গভর্ণমেন্ট পক্ষে রায় দেন। প্রতিপক্ষ জমিদার তদ্বিরুদ্ধে জজের নিকট আপীল করেন। উভয় পক্ষে শ্রীহট্টের সমস্ত বড় বড় উকিল নিযুক্ত ছিলেন। পরন্তু বাবাজী মহারাজের নামও তখন কিছু প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ায় জমিদার পক্ষ তাঁহাকেও নিযুক্ত করিলেন। তিনি খুব পরিশ্রম করিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র পড়িয়া বুঝিয়া লইলেন। বিচার আরম্ভ হইলে কয়েকদিন ধরিয়া তিনি সওয়াল জবাব

করিলেন, অন্য উকিলগণ তাঁহাকেই তর্ক-বিতর্ক করিতে দিলেন। সপ্তাহাধিক কাল শুনানীর পর জজ সাহেব জমিদারের অনুকূলে রায় প্রকাশ করিয়া সবজজের নিষ্পত্তি রহিত করিলেন। ইহাতে দেওয়ানী বিভাগেও তাঁহার যশঃ খুব বিস্তৃত হইল এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মোকদ্দমার অনেক মক্কেল তাঁহার নিকট আসিতে লাগল।

এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই তিনি শ্রীহট্টের একজন প্রধান উকিল বলিয়া গণ্য হইলেন এবং সহরে জমি কিনিয়া নিজে বড় বাড়ী করিলেন। বাটীতে অনেক লোক থাকিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বাযে হইতে আসিয়া এখানে তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের জ্যেষ্ঠ দীননাথ চৌধুরী মহাশয় এবং দুইটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অন্নদাকিশোর ও হেমকিশোরও এই বাটীতেই তাঁহার নিকট থাকিতেন। দীননাথবাবুর পুত্রসন্তান ছিল না, তিনিই বালককালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে মানুষ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। এখন বাবাজী মহারাজ উপার্জ্জনশীল হইয়া নিজে বাড়ী করিলে তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং আমরণ এখানে তাঁহার নিকটেই ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কাছারীতে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, কাছারী হইতে আসিয়া ইঁহার নিকট দিতেন, ও ইনি নিজে হাতে সব খরচ-পত্র করিতেন। অন্নদাকিশোর ও হেমকিশোর শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়িতেন। বাসায় ইহা ছাড়া আরও অনেক লোক থাকিতেন, মুহুরীরা পত্নী সহ সেখানেই বাস করিতেন। দেশেও চৌধুরীদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা থাকায় তথাকার বহুলোক কার্য্যোপলক্ষে সহরে আসিয়া এই বাটীতেই উঠিতেন, কেহ কেহ এই বাটীতে থাকিয়াই শ্রীহট্টে চাকুরী করিতেন।

দুঃস্থ ছাত্রও অনেকগুলি থাকিত, সুতরাং আত্মীয়, স্বজন, ছাত্র, অতিথি, অভ্যাগত প্রভৃতি বহুলোকে বাটী সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত।

গয়া কিম্বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্য কোথাও গিয়া ওকালতি করিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের যে ইচ্ছা ছিল, তাহা আপাততঃ চাপা পড়িয়া গেল। এখানে থাকিয়াই তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। নিয়ম করিলেন যে, সন্ধ্যার পর আর মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন কার্য্য করিবেন না। সারাদিন ওকালতির কার্য্য করিতেন এবং সন্ধ্যার পর রাত্রিকাল তিনি ভজনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রাখিলেন। ভগবৎ কৃপায় তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও মেধা তাঁহার ছিল, নিষ্ঠার সহিত প্রাণায়ামাদি সাধন করিয়া চিত্তের একাগ্রতাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন ও তজ্জন্য যখন যে কাজ করিতেন, তাহাতে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারিতেন। সুতরাং মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক হইলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তৎসমস্ত বিষয় তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইত, অধিক পরিশ্রম করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইত না। কাজেই সাধন বিষয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও প্রায়শঃ ঘটিত না। এই সময়ে তাঁহার বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় শ্রীহট্টে সস্ত্রীক থাকিয়া ডাক্তারী ব্যবসা করিতেন। তাঁহারা উভয়ে ইতিপূর্ব্বেই যোগীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। নিজের বাটী বহু জনাকীর্ণ হওয়ায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কখনও কখনও সুন্দরীবাবুর বাড়ীতে গিয়া প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিতেন। বাং ১৩৪২, পৌষমাসের "প্রবর্ত্তক" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ক্রমশঃ শিথিল হইয়াছে। শ্রীহট্টে যখন ওকালতির পসার বৃদ্ধি, তখনও আমাদের সকলে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সাধনায় বসিতেন। * * * * অট্টহাস্য শুনিয়া শহরের লোক আমাদের নাম রাখিয়াছিল, 'আনন্দীদল'।"

শ্রীহট্ট সহরে একটি হিন্দুসভা ছিল। সেখানে প্রতি রবিবারে মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ হইত, সময়ে সময়ে বক্তৃতাদিও হইত। স্থানীয় জজ আদালতের সেরেস্তাদার মহাশয় এই সভার সম্পাদক ছিলেন। ইনি শ্রীহট্টের লোক ছিলেন না। ঢাকা জেলার অধিবাসী ছিলেন। নানাকারণে ইহার সহিত স্থানীয় কয়েকজন প্রধান প্রধান সভ্যের বিশেষ মতান্তর ও ক্রমে বিরোধ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা অপরাপর স্থানীয় সভ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া সম্পাদকের পদ হইতে ইহাকে সরাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইনি তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজে দুই মাসের বিদায় লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। সভার সম্পাদকের পদ খালি হইল। বাবাজী মহারাজ যোগীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইবার পর সভা-সমিতিতে যাওয়া এবং বক্তৃতা করা বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীহট্টের এই ধর্ম্মসভার সম্পাদকের পদ খালি হইলে তথাকার সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য অনেকে একত্রিত হইয়া এই সভার সম্পাদনের পদ গ্রহণ করিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন এমন ছিলেন, যাঁহাদিগকে তিনি বালককাল হইতেই অতিশয় মান্য করিতেন। তিনি সভা-সমিতিতে যাইতেন না বলিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে প্রথমতঃ রাজী হইলেন না। কিন্তু তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ করিয়া বলিলেন যে, তিনি অন্ততঃ দুই মাসের জন্যও এই পদ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের সভাটি রক্ষা পায়। অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতে সকলে একমত হইতেছেন না। অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া সম্পাদকতা গ্রহণ করিলেন এবং প্রতি রবিবারে সভায় যাইতে লাগিলেন। দেখিলেন, সভার অবস্থা অতি শোচনীয়। পাঁচ সাত জন লোক মাত্র রবিবারে সভায় আসেন, একজন পণ্ডিত আসিয়া অতি নীরসভাবে মহাভারতের কয়েকটি শ্লোক পাঠ করেন এবং তাহার

অনুবাদ করিয়া বাংলায় অর্থ করিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে কাহারও মন আকৃষ্ট হয় না। এক একদিন পণ্ডিত মহাশয়ও আসেন না, সেদিন আর সভায় বিশেষ কোন কাজ হয় না। সভার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন।

কোন কাজ যেমন তেমন করিয়া সম্পন্ন করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল, অপর কাহাকেও সেরূপ করিতে দেখিলে তিনি প্রসন্ন হইতেন না। নিজে যখন যে কাজ হাতে লইতেন, তাহা যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। কাজেই তিনি সভার সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া তাহার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতেন। পাঠক পণ্ডিত মহাশয় একদিন সভায় আসিলেন না দেখিয়া তিনি নিজে গীতা পাঠ করিয়া প্রথমাবধি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিনেই ইহা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইল দেখিয়া তিনি প্রতি রবিবারেই এইরূপ করিতে লাগিলেন। এই কথা প্রচারিত হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সভায় ক্রমশঃ বেশী লোক আসিতে লাগিল। ইহাতে সভায় কিছু প্রাণসঞ্চার হইল। পূর্ব্বের সম্পাদক মহাশয় ছুটি ফুরাইলে শ্রীহট্টে ফিরিয়া আসিয়া আর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না, সুতরাং শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজই সম্পাদক রহিয়া গেলেন।

তিনি যে যোগীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী ছিল যে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে অন্তর্হিত হইবার পর এক ফকির বেশে আবার বঙ্গদেশে আসিয়া এই সাধন গুপ্তভাবে প্রবর্ত্তিত করেন। বাবাজী মহারাজ তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-সম্বন্ধীয় চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া তিনি অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতেন। শ্রীহট্টে

সহরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহস্থ লোকের সংখ্যা খুব অধিক। তিনি তজ্জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থও এই সভায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে সভায় লোক সমাগম বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবাবু নামক তাঁহার ছাত্রজীবনের অনেক বন্ধু শিলং স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ইহার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত আলোচনার ফলে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গে ভক্তিমান হন এবং ক্রমে সংসার ও চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গলীলা প্রচার ও সংকীর্ত্তনই জীবনের সারব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি গৌরাঙ্গদেবের পিতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের মূল বাসস্থান শ্রীহট্ট আগমন করিলেন এবং তথায় সংকীর্ত্তন প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা শ্রীহট্টে অধিক, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এজন্য সংকীর্ত্তন ও মহাজনী পদ গান বিষয়ে অনেকেরই এখানে ভালরূপ শিক্ষা ছিল। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট একজন ব্রাহ্মণ চাকুরী ছাড়িয়া মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন ও তাহা প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছেন শুনিয়া অনেকেই উৎসাহিত হইয়া ইহার সঙ্গে সংকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। শ্রীহট্ট সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সংকীর্ত্তনের বন্যা ছুটিল।

দেবেন্দ্রবাবু শ্রীহট্টে বেশীদিন রহিলেন না, নবদ্বীপে চলিয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি তখন তাঁহাদের সভায় পাঠান্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এই সংকীর্ত্তনের আকর্ষণে শ্রীহট্ট সহর একেবারে মাতিয়া উঠিল। সরকারী কর্ম্মচারী, উকিল, মোক্তার, দোকানদার, ধনী, দরিদ্র সকলে আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। শ্যামলাল বাবু নামক হুগলী জেলার এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এই সময় শ্রীহট্টে

পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। তিনি এবং আরও কয়েকজন এই সংকীর্ত্তনে অগ্রণী হইলেন। মণিপুরী রাজবাড়ীতে ঠাকুরের মন্দির সম্মুখে প্রশস্ত নাটমন্দির ছিল। সেই স্থানে তাঁহারা সকলে সংকীর্ত্তনের জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। এইরূপ দুই তিনটি স্থান প্রত্যহ সংকীর্ত্তনের জন্য অবধারিত হইল। সন্ধ্যার পরে প্রতিদিন মুহুমুহুঃ তুমুল হরিধ্বনিতে শ্রীহট্ট সহর কম্পিত হইতে লাগিল। সহরে হিন্দুদের মধ্যে মদ্য বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। মদ্য বিক্রেতা নিজে আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া একজন বিশেষ ভক্ত বলিয়া গণ্য হইল। সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া করিয়া সকল লোক সংকীর্ত্তনে চলিয়া যাইত। এক একদিন সারারাত্রি সংকীর্ত্তন চলিত। কীর্ত্তনস্থলে প্রায়ই প্রবল ভাবাবেগে বহুলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক একদিন পনর বিশ জন পর্য্যন্ত এইরূপে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা দুই তিন দিন পর্য্যন্ত ভাঙ্গিত না। কপট মূর্চ্ছা মনে করিয়া এক ডাক্তারবাবু গিয়া মূর্চ্ছিত ব্যক্তিদের কাহারও বক্ষঃস্থল যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অবশেষে ইহা যে কপট মূর্চ্ছা নয় তাহা বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একদিন একজন জেলে শ্রেণীর মূর্খ লোক এইরূপ মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই সে ভাণ করিয়াছে মনে করিয়া এক ব্যক্তি একখানি টীকা ধরাইয়া তাহা তাহার পায়ের উপর একস্থানে রাখিলেন, দেখা গেল, তাহাতে চামড়া পুড়িয়া গেলেও তাহার কোন প্রকার বোধ জন্মিতেছে না। ইহা দেখিয়া নিজেকে অতি অপরাধী মনে করিয়া তিনি তাহার পায়ের উপর হইতে টীকা সরাইয়া লইলেন। তখন কীর্ত্তনস্থলে ভাবস্রোত অতি বেগে প্রবাহিত হইল এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর ভাব অতিশয় নির্ম্মল হইল। শ্রীহট্টে বদনসিংহ (মণিপুরী) নামক এক ব্যক্তির যাত্রার দল ছিল। তাহারা এক বাড়ীতে কৃষ্ণলীলা গান করিতেছিল। [illegible]

সমস্ত লোক অতি নির্ম্মল ভাবে মুগ্ধ হইয়া সেই গান শুনিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাসের সহিত হরিধ্বনি করিতেছিলেন। সেই হরিধ্বনির উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়া, যে ছেলেটি কৃষ্ণ সাজিয়া গান করিতেছিল, সে গান করিতে করিতে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সুতরাং গান বন্ধ হইল। সেই ছেলেটিকে কোলে লইয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনগণ "চন্দ্রাব পাব" নামক নিকটস্থ গ্রামে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। বাবাজী মহারাজ প্রভৃতিও সভা হইতে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার বাসার নিকটেই সেই ছেলেটির বাড়ী ছিল। সেইদিন এবং রাত্রেও তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। পরদিন প্রাতঃকালে তাহাকে জলধারা দিয়া স্নান করাইলে তাহার কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞানের স্ফুরণ হইল। তাহাদের পাড়ায় একটি মন্দির আছে সেই মন্দিরের শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সম্মুখে তাহাকে বসান হইল। অজস্রধারে তাহার চক্ষের জল বহিতে লাগিল। এইরূপ বহুক্ষণ গত হইলে তাহাকে লইয়া গিয়া আবার তেলজল দিয়া স্নান করাইলে তাহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন তাহাকে কিছু খাওয়াইয়া অন্যমনস্ক করিবার জন্য যে দোকানে সে গহনা প্রস্তুত করিবার কাজ করিত, সেই দোকানে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু গহনার কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া তাহাতে তাহার মনোনিবেশ হইবামাত্র সে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এইরূপে দুই তিন দিন গত হইলে পর সে প্রকৃতিস্থ হইল। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বহুদিনের বাতরোগগ্রস্ত একজন অর্দ্ধপঙ্গু লোক সংকীর্ত্তনে যোগ দিলে তাহার ব্যারাম সারিয়া গেল।

নগর সংকীর্ত্তন বাহির করিবার জন্য সকলে এক দিবস সকালে একত্রিত হইলেন। তখন আকাশে খুব ঘনঘটা করিয়া মেঘ দেখা দিল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাঁহারা সকলে খুব উচ্চৈঃস্বরে

হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। আকাশ দেখিতে দেখিতে পরিষ্কার হইয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে মহোৎসাহে কীর্ত্তন লইয়া নগরে বাহির হইলেন। এইরূপ নানা অদ্ভুত ঘটনা সংকীর্ত্তন উপলক্ষে শ্রীহট্টে ঘটিতে লাগিল। একবার এমন ঘটিয়াছিল যে, পাঁচদিন ক্রমান্বয়ে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আহার করিয়া বাবাজী মহারাজ সংকীর্ত্তনে যাইতেন এবং প্রাতঃকালে বাড়ীতে ফিরিয়া স্নান করিয়া মক্কেলের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এই পাঁচদিন এক ঘণ্টার জন্যও নিদ্রা যাইবার সময় পান নাই। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার শরীরে কিছুমাত্র গ্লানি জন্মিল না।

সংকীর্ত্তন ব্যাপারে হিন্দুগণই যোগদান করিতেন। তথায় ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত যে কয়েকজন লোক ছিলেন, তাহারা কেহই আসিতেন না। বরঞ্চ বাবাজী মহারাজ প্রথমে ব্রাহ্ম থাকিয়া পরে যে এইরূপ হিন্দুভাব কার্য্য করিতেছেন ইহাতে তাহারা কেহ কেহ তাঁহাকে কপটাচারী বলিয়া মনে করিতেন। তিনি তাহা বুঝিয়াও গ্রাহ্য করিতেন না। তাহারা ভ্রান্ত—এইমাত্র মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে সদভাবেই মেলামেশা করিতেন।

তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিয়া দেশে আসিবার পর তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করা সম্বন্ধে গ্রামে খুব দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি নিজে হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য কোন প্রকার উৎসুক ছিলেন না। আহারাদি সম্বন্ধে খুব নিয়মাধীন ছিলেন। অন্যত্র গিয়া খাইতেন না। আমিষাহার ত ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে নিমন্ত্রণে মাছ মাংসই অধিক পরিমাণে লোকের প্রিয় আহার। তিনি যে মাছ মাংস খাইতেন না, তাহা সকলে জানিতেন।

সুতরাং তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিবার পক্ষে যাঁহারা ছিলেন, তিনি নিমন্ত্রণে কোথাও যাইতেন না বলিয়া তাঁহারা বিশেষ বিরক্ত হইলেন না। তিনি নামমাত্রই তাহাদের সঙ্গে একদলে ছিলেন কিন্তু তিনি সকল হইতে পৃথক থাকিতেন। এমন কি, ওকালতি কার্য্য করা কালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে বাস করা সত্বেও বহুদিন পর্য্যন্ত স্বপাকে খাইতেন। কিন্তু এই সংকীর্ত্তনের ব্যাপারে তাঁহার ধারণা হইতে লাগিল যে হিন্দুসমাজকে আপন বোধে তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়াই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। তিনি দেখিলেন যে হিন্দু সমাজের লোকই প্রাণ খুলিয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতেছে এবং ভক্তিভাবে পূর্ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব বর্জ্জন করিতেছে। সংকীর্ত্তনের সময় ব্রাহ্মণজাতীয় লোকেরাও নীচজাতীয় লোকের পদধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ করিতেছে এবং আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এই অদ্ভুত ভাব পরিবর্ত্তন সহরবাসী হিন্দুগণের হইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি বাহিরের লোক ইহার বাহিরেই থাকিয়া নিজেদের হিংসা-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এই ভাবের বন্যা তাহাদিগকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিতেছে না।

এই সকল লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ক্রমে ধারণা জন্মিল যে, হিন্দুসমাজ যতই অধঃপতিত ও ভ্রষ্ট হইয়া থাকুক, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুভাবাপন্ন লোকেরই অভ্যুদয় হইবে এবং তাহাদের দ্বারাই দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। এই ধারণার বশে তিনি হিন্দুসমাজকে নিজের অন্তরে একান্ত আপনার বলিয়াই গ্রহণ করিলেন এবং তাহার পর অল্পদিনের মধ্যেই দেখিলেন যে, তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করা বিষয়ে যে ঘোর দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ শান্ত হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি কর্ত্তব্য বোধে ও পিতৃনির্দ্দেশে পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়া বিধিমত

প্রায়শ্চিত্ত করিলেন *। হিন্দুসমাজও তাঁহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বাসায় নিমন্ত্রণাদি করিতে আরম্ভ করিলেন ও তাহাতে সকলে আসিয়া আহার করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যখন ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন, তখন এই ব্যাপার লইয়া তাঁহাদের দেশে কিরূপ প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কিছু আভাষ পাঠক ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। কিন্তু ইহা যে কতদূর ব্যাপক হইয়াছিল ও এজন্য তাঁহাদিগকে কতদূর বিব্রত হইতে হইয়াছিল, তাহার কিছু বিবরণ এই স্থলে দেওয়া আবশ্যক।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত হবিগঞ্জে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কর নামে একজন প্রাচীন উকিল আছেন। তৎকালীন ব্যক্তি যাহারা আজিও জীবিত আছেন, ইনি তাহাদের অন্যতম। ইনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন, "ব্রাহ্ম তারাকিশোর চৌধুরীকে দেশে ও সমাজে উঠানো সম্বন্ধে একটা তুমুল আন্দোলন ও দলাদলি আরম্ভ হইল, তারাকিশোরের পিতার বহু শত্রু ছিল। ইহারা তাঁহাকে নির্য্যাতিত করিবার এই সুযোগ পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটী করিলেন না। ইহাদের একদল ও হিন্দুধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষায় প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজের অপর একদল, এই দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। বিরুদ্ধবাদীর গোঁড়া দল বলিতেন যে, তারাকিশোর চৌধুরী অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি জাতিভ্রষ্ট ও পতিত হইয়াছেন, তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মে আর গ্রহণ করা যায় না। যাহারা তাঁহার সংস্রব রাখিবেন, তাহারাও

* তাঁহার পিতৃদেব এই উপলক্ষে নবদ্বীপের ও কাশীধামস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা আনাইয়াছিলেন ও তদনুসারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কঠোর ব্রত পালন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু এসম্বন্ধে অন্যদিক সম্পূর্ণ বিবরণ না পাওয়ায় তাহা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হইল না।

তাঁহার ন্যায় পতিত হইবেন। সুতরাং তাহাদের সহিতও হিন্দুসমাজের নিয়মমত আচার-ব্যবহার ও সামাজিকতা, বিবাহ প্রভৃতি কিছুই চলিতে পারে না। তাহারা হিন্দুসমাজ হইতে বর্জ্জিত। তাহাদের হাতের জল খাওয়া কি এক হুকায় তামাক খাওয়া পর্য্যন্ত দূষণীয়, ইত্যাদি নানা প্রকারে কুৎসাপূর্ণ উক্তি সকল প্রচার করিয়া তাহারা দেশ-বিদেশে, শ্রীহট্ট জিলায় ও বিভিন্ন জিলায় এক প্রকাণ্ড দলাদলির সৃষ্টি করিল। সর্ব্বজাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। তারাকিশোরের পিতা পুত্রকে পুনরায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়া বিমল আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে অশান্তির ও নিন্দার ভাজন হইয়া হিন্দুসমাজ তাঁহার বিরুদ্ধাচারীদের নিকট অন্যায় মতে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহার সম্পত্তি পণ করিয়া দেশের কতকগুলি সদাশয় সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সহিত তারাকিশোরকে সমাজে কি উপায়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে পণ্ডিতগণসহ শাস্ত্রালোচনা করিয়া, হিন্দুসভা ডাকিয়া সমাজের লোককে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া, শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলে তারাকিশোর হিন্দু সমাজে উঠিতে পারিবে কি না, তৎসম্বন্ধে তাহাদের মত লইতে লাগিলেন। এইভাবে চেষ্টার ফলে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এবং এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত কোন কোন সভায় তারাকিশোরের নিকট তাঁহার কার্য্যের বিষয় জানিয়া পণ্ডিতসমাজের মত লইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইল।

"অতঃপর তারাকিশোর চৌধুরীর পিতা স্বগ্রামবাসী প্রতিপত্তিশালী জ্ঞাতি রামধন চৌধুরী, চন্দ্রনাথ চৌধুরী, গোপীমোহন চৌধুরী, কালীকুমার চৌধুরী প্রভৃতি ও পরগণা বানৈ ও নিকটবর্ত্তী মৌজা সকলের

মধ্যে ভাদিকারা নিবাসী সমাজে প্রতিপত্তিশালী মিরাশদার ও দেশস্থ বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট বাবু গঙ্গাপ্রসাদ কর ও তাঁহার এক সমাজের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক নিয়া সমারোহের সহিত হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে তারাকিশোরের কল্যাণার্থে এক ৺কালীপূজা আরম্ভ করতঃ গ্রামস্থ সকলকে ঐ ৺পূজায় নিমন্ত্রণ ও আহ্বান করেন। তারাকিশোর শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করায় তাঁহার পক্ষাবলম্বী সকলেই এই ৺পূজায় যোগদান করিয়া তারাকিশোরকে নির্দ্দোষ বলিয়া হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিলেন। তারাকিশোর চৌধুরীর ধর্ম্মজীবনের সহিত পূর্ব্বোক্ত সদাশয় ভবিষ্যদ্দর্শী ব্যক্তিগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা সমাজে গ্রহণ না করিলে হিন্দুসমাজের উজ্জ্বল রত্নটি হয়ত ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেই জীবন কাটাইতেন ও আজ ৺ব্রজধামের প্রধান মহন্ত ব্রজবিদেহী ৺সন্তদাসকে পাওয়া যাইত না।

"ইহাতেও শান্তি হইল না। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শত্রুতা সাধন করাই যাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহারা এখনও বিরুদ্ধবাদী রহিল। এই বিরুদ্ধবাদী দল শত্রুতা সাধন জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী কুটুম্বগণের নিকট উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার নিন্দা ও কুৎসা করেন ও তারাকিশোর এবং তাঁহার দলের ব্যক্তিগণকে সমাজচ্যুত রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এমন কি, অশিক্ষিত অন্ধ-বিশ্বাসী নিম্ন-জাতীয় লোকগণের মধ্যে গিয়া নূতন নূতন কুৎসা প্রচার করিয়া দল পাকাইতেও ইহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। ফলে পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাপ্রসাদ বাবু ও রামধন চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ও নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হওয়ায় তাঁহারা নিজ নিজ প্রতিপত্তিশালী কুটুম্বগণের বাড়ীতে ও দেশে গিয়া নানাস্থানে সভা ডাকিয়া, শত্রু-পক্ষীয়গণের প্রচারিত নিন্দাবাদ যে একান্তই ভিত্তিহীন, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে ফল হইল। প্রকৃত সত্যই ক্রমশঃ

প্রকাশিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ ত্যাগী ও ধর্ম্মপ্রাণ তারাকিশোর সত্য ও ধর্ম্মের জন্যই ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন, কোনপ্রকার ব্যভিচার অথবা অখাদ্য খাইবার প্রলোভনে যান নাই এবং তিনি যথার্থ শুদ্ধচিত্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি, এক্ষণে বিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রকৃত হিন্দুই হইয়াছেন ইহা লোকে বুঝিল।"

শ্রীশ্রীবাবাজী মহাবাজ সংকীর্ত্তনে উপস্থিত হইয়া যোগ দিলেই সংকীর্ত্তনের উৎসাহ ও ভাবাবেগ খুব বর্দ্ধিত হইত। তাঁহাকে অনেকে ভাবাবেগে আলিঙ্গন করিত এবং কেহ কেহ আলিঙ্গন করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। তিনি স্পষ্ট অনুভব করিতেন তিনি যোগীসম্প্রদায়ের সাধন দ্বারা যে শক্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই শক্তি, তাঁহাকে যাহারা আলিঙ্গন করিতেন তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতেই এইরূপ অবস্থার বিকাশ হইত। এই ভাব তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অনুভব হওয়াতে তিনি তাঁহার যৌগিক সাধনের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইলেন। তিন বৎসর শ্রীহট্টে এইরূপ ভাবে অতীত হইলে ইং ১৮৮৭ সালে (বাংলা ১২৯৪) পূজার বন্ধের সময় কলিকাতায় একবার আসিয়া তাঁহার গুরুদেব এবং অপরাপর গুরু-ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত কয়েকদিন বেশ সাধন করিলেন। এইবার ষট্চক্র অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে সহস্রারের দিকে তাঁহার শরীরস্থ শক্তি ধাবিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে অনুভব করিলেন যে ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদলযুক্ত ষষ্ঠ আজ্ঞাপুর নামক চক্র ও ব্রহ্মস্থান সহস্রদলের মধ্যে আরও যে কয়েকটি পর্দ্দা ভেদ হইলে সহস্রদল পদ্মের মূলে প্রবেশ করা যায়, তাহারও প্রথম পর্দ্দা তাঁহার ভেদ হইয়া গেল। এই সকল কথাই তিনি প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগকে বলিয়াছেন।

ছুটি ফুরাইলে শ্রীহট্টে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরে শ্রীহট্টে আর

একটি বৎসর মাত্র ছিলেন। স্বীয় গুরুদেব ও গুরুভ্রাতৃবর্গের সমীপে বাস করিতে পারিবেন বলিয়াই হউক অথবা হাইকোর্টের উকিল হইলে ব্রিটিশভারতের সর্ব্বত্র—গয়া কিম্বা ইচ্ছামত যে কোন জায়গার কোর্ট ওকালতি কার্য্য করা যায় বলিয়াই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক কিছুদিন হইতে তাঁহার মনে কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া উকিল হইবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। কোন মফঃস্বলের আদালতে চারি বৎসর ওকালতি না করিলে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যাইত না। সুতরাং শ্রীহট্টে আর এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ হইবামাত্র স্থানীয় ভদ্রসমাজে বিপুল প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মসভার অনুরাগী ও পোষকবৃন্দের আন্তরিক অনুরাগ এবং ওকালতি ব্যবসায়ে প্রভূত পসার ও প্রচুর অর্থাগম উপেক্ষা করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে উকিল হইবার জন্য দরখাস্ত পাঠাইয়া দিলেন। পূজা উপলক্ষে আদালত বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় গুটাইয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ শ্যাম নামে শ্রীহট্ট সহরে তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নিকট এক হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিলেন। হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিলে প্রথম প্রথম উপার্জ্জন অধিক না হইতে পারে, তখন অনটন পড়িলে এই টাকা প্রয়োজন মত কিছু কিছু লইয়া খরচ চালাইবেন, ইহাই স্থির করিলেন। বন্ধের কয়েকদিন পরেই পিতা ও আত্মীয়স্বজন সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গ্রামের বাটীতে গেলেন।

এই সময়ে তাঁহার শ্রীহট্ট ত্যাগের অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাত দীননাথ চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অন্নদাকিশোর চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, "তাঁহার

মৃত্যুতে আমাদের সংসারের যেদিক শূন্য হইয়া গেল, যে ক্ষতি হইল তাহা আর পূরণ হয় নাই। শ্রীহট্ট টাউনের বাসাতেই তাঁহার মৃত্যু হয় ও পূজ্যপাদ অগ্রজমহাশয় তাঁহার আত্মজ পুত্রের ন্যায়ই স্বহস্তে সুর্ম্মা নদীর তীরে তাঁহার দেহের অগ্নিসংস্কার করেন। আমাদের বামৈএর ভদ্রাসন বাটীতে বহুব্যয়ে খুব সমারোহের সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।"

শ্রীহট্টের বাসায় বহুলোক থাকিতেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং খরচ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু প্রচুর উপার্জ্জন ছিল বলিয়া সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও উদ্বৃত্ত হইত। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রতিদিন টাকা ও নোট যাহা পাইতেন তাহা একত্র করিয়া জেঠা মহাশয়ের নিকট দিতেন, আর সিকি দুয়ানী যাহা তাঁহার হাতে আসিত তাহা তাঁহার স্ত্রী লইয়া নিজের কাছে রাখিতেন—এই সকল ছোট ছোট জিনিষে তাঁহার খুব প্রীতি ছিল। এইরূপে তাঁহার হাতে সামান্য কিছু জমিয়াছিল। তাঁহার জেঠা ৺দীননাথ চৌধুরী মহাশয়ও বিবেচনার সহিত বাসা খরচ চালাইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন এবং বৎসরান্তে পূজার ছুটির সময় বাড়ী গিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই সমস্ত উদ্বৃত্ত টাকা একত্রিত করিয়া পিতাকে অর্পণ করিতেন। কলেজে পড়িবার সময় যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, তখন পিতাকে তিন হাজার টাকা দিবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতিও এইরূপে পূর্ণ হইল। প্রথম তিন বৎসরেই তিন হাজার টাকার অনেক অধিক দেওয়া হইয়া গেল। পরে চতুর্থ বৎসরের উপার্জ্জন হইতে এক হাজার টাকা শ্রীযুক্ত সারদাবাবুর নিকট রাখিয়া দিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান : সদ্‌গুরুলাভ

পূজার ছুটি বাটীতে কাটাইয়া হাইকোর্ট খুলিবার প্রাক্কালে সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিলেন ও হাইকোর্টের অনুমতি লাভ করিয়া ইং ১৮৮৮ সালের (বাংলা ১২৯৫) নভেম্বর মাসে হাইকোর্টে যোগদান করিলেন। এখানে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম প্রথম তেমন অর্থাগম হইত না। কলিকাতায় যখন আসিয়া পৌছেন, তখন তাঁহার হাতে এক শত টাকারও কম ছিল সুতরাং শীঘ্রই অর্থাভাবে পড়িলেন। সারদা বাবুর নিকট গচ্ছিত টাকার নিমিত্ত পত্র দিলেন। উত্তরে তিনি লিখিলেন যে, সে টাকা অন্য লোকের নিকট দাদন দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং পরিশোধ করিতে বিলম্ব হইবে। কাজেই সে টাকা এখন তাঁহার কোন কাজে লাগিল না।

বৈকালে কাছারী হইতে ফিরিয়া রোজই কিছু জলযোগ করিতেন। এই অভাবের সময়ে একদিন তাঁহার মনে হইল যে, এই জলখাবার যদি না খাই, তবে ত কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। তদবধি আর জলখাবারের ব্যবস্থা করিতেন না। শ্রীহট্টে থাকাকালে তাঁহার স্ত্রী কতকগুলি সিকি দুয়ানি সখ করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেগুলি তাঁহার নিকট ছিল, অগত্যা তাহাই ভাঙ্গাইয়া তিনি তাঁহার জন্য জলখাবার আনাইয়া রাখিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া একটু ব্যথিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "সখ করিয়া ইনি কতকগুলি সিকি দুয়ানি নিজের কাছে রাখিয়াছেন! কটি

টাকাই বা তাহাতে তাঁহার হাতে আছে। এইরূপ ভাবে তাহা খরচ হইতে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হইবে না। আর ক'দিনই বা এরূপ ভাবে উনি চালাইতে পারিবেন।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া একদিন তিনি স্ত্রীকে এ বিষয়ে নিষেধ করিয়া দিলেন, বলিলেন যে তিনি কাছারী হইতে আসিয়া আর জলখাবার খাইবেন না, তাঁহার জন্য জলখাবার যেন আর আনান না হয়। সেদিন অপরাহ্নে হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া দেখেন স্ত্রী তাঁহার কথা না মানিয়া অন্যান্য দিনের মতই জলখাবার আনাইয়া রাখিয়াছেন। তথাপি তিনি আর সেদিন কিছু খাইলেন না। ইহাতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী মনে মনে অতিশয় বেদনা পাইলেন। তিনিও তাহা বুঝিলেন, কিন্তু সেদিন খাইলে উনি ভবিষ্যতেও জলখাবার আনাইতে নিবৃত্ত হইবেন না ভাবিয়া তিনি স্ত্রীর অনুনয় সত্ত্বেও অভুক্ত রহিলেন।

শ্রীনাথ মিত্র নামে তাঁহার একজন ধর্মবন্ধু ও গুরুভ্রাতা নিকটেই বাস করিতেন। তিনিই ইঁহাকে লইয়া গিয়া জগৎবাবুর নিকট দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে শ্রীযুক্ত জগৎবাবুও এই সময় শ্রীনাথবাবুর সহিত তাহার বাটীতেই বাস করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই প্রতিদিন সেখানে আসিতেন ও সন্ধ্যার পর তাঁহাদের সাধনের বৈঠক বসিত। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও প্রত্যহ সেই সময়ে গিয়া বৈঠকে যোগদান করিতেন। আজও সেইরূপ গেলেন।

কলিকাতার বিখ্যাত ধনী মল্লিক পরিবারের নন্দিনী নাম্নী একটি মেয়েও তাঁহার গুরুদেবের নিকট সাধন পাইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে কখনও এই বাড়ীতে আসিয়া সাধনে যোগদান করেন নাই। এদিন বাবাজী মহারাজ পৌঁছিবার অল্পপরেই সেই মেয়েটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার নানা প্রকার উপাদেয় মিঠাই প্রচুর পরিমাণে তিনি সঙ্গে

আনিয়াছিলেন, সেদিন যে কয়জন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, সকলকেই তাহা সাদরে আহারের জন্য বণ্টন করিয়া দিলেন। ইহার মধ্যে এমন অনেক উৎকৃষ্ট সামগ্রী ছিল, যাহা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বে কখনও খান নাই। এই ঘটনায় তিনি এমন বিস্ময়ান্বিত ও ভাবাবিষ্ট হইলেন যে, তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল ভাবিলেন 'হে ভগবান তোমার কৃপা কি এতই অধিক যে, একদিন আমি ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় জলখাবার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি ইহা তোমার সহ্য হইল না তুমি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য অমনি অযাচিতভাবে আনিয়া উপস্থিত করিলে।' অনন্তর ভাবগদগদচিত্তে সম্মুখস্থ মিষ্টান্ন সমূহ প্রেমময় ভগবানেরই প্রদত্ত স্থির করিয়া সানন্দে আহার করিয়া তিনি অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার উপার্জ্জন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও তাঁহার কলিকাতার বাসার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবার আর কোন অসুবিধা হইল না। ওকালতি ব্যবসায়ে যশও তাঁহার দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বাবাজী মহারাজ ওকালতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও সাধন-ভজন পূর্ব্বের নিয়মানুসারেই করিতেন। সারাদিন ওকালতি ব্যবসায়ের কার্য্য করিতেন, সন্ধ্যার পর আর মামলামোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্য্য কিছু করিতেন না, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দৃঢ় নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত, কখনও একাকী কখনও অপর গুরুভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বৈঠকে বসিয়া সাধন করিতেন। এই সাধনে শ্রীহট্টে থাকিতেই তিনি বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিলেন ও তৎকালে বহুবিধ অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতায় আসিবার পর হইতে স্বীয় গুরু ও গুরুভ্রাতৃবর্গের সন্নিধানে বাস করিয়া তাঁহার আরও দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি বিশেষ উচ্চাবস্থা লাভ করিলেন ও

দেখিলেন যে, এই স্থানে যাহা প্রাপ্তব্য তাহা তাঁহার পাওয়া হইয়াছে। এই সময়ে সম্প্রদায় মধ্যেও তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিল, তিনি নিজেই অনেককে সাধনে বসাইতেন ও শক্তি সঞ্চার করিতেন, সেই শক্তি কাহার কোন্ চক্রে চলিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

তাঁহার এই সময়ের মনোভাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ স্বয়ং বলিয়াছেন—"(এই) যোগীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় দ্বাদশবর্ষ তাঁহাদের অধীনে থাকিয়া প্রাণায়ামাদি যোগশিক্ষা করিলাম। অবশেষে আমার মনে এইরূপ ধারণা হইল যে, এই সম্প্রদায়ে সাধনের যাহা আছে, তাহা আমার লাভ হইয়াছে। ·· এবং এখানে থাকিয়া যে আমার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইবে, এইরূপ আর বিশ্বাস রহিল না। কারণ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এইরূপ পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। যে ব্রহ্মদর্শন ও আত্মতত্ত্বপ্রকটের নিমিত্ত আমি এই সাধক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা এই স্থানে আমার হইল না। এখানকার সাধনে যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা অপূর্ব্ব হইলেও ইহা যে ব্রহ্মানন্দ, এরূপ ধারণা আমার কিছুতেই হইল না। আমি দেখিলাম যে ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী নহে, সাংসারিক কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে ইহা তিরোহিত হয়। এই ক্ষণিক আনন্দ কখনও ব্রহ্মানন্দ নহে। আমার নিজ আত্মতত্ত্ব এযাবৎ ইহা দ্বারা কিছুমাত্র প্রকাশিত হইল না। যে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি তাঁহার অথবা তাঁহার শিষ্য কাহারও মধ্যে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছে, অথবা ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, ইহা আমি বুঝিলাম না।

"আমার অবলম্বিত এই সাধনে অনেক শক্তি প্রকাশিত হয়, ইহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি সত্য এবং ইহা দ্বারা এক প্রকার

ভাবাবেশ হইয়া থাকে, তাহা অতি মধুর, ইহাও আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এই শক্তিদ্বারা আমি কেবল দৃষ্টিপাত করিয়া নিজে কোন কোন রোগীর রোগ মুক্ত করিয়াছি। আমার দর্শন মাত্রে হিষ্টিরিয়া রোগীর মূর্চ্ছা অপগত হইয়াছে, এইরূপও কখন ঘটিয়াছে, এবং আমাকে স্পর্শ করিয়া অনেকে ভাবাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু এই সকল শক্তি আমার আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মদর্শনের দ্বার উদ্ঘাটিত করে নাই।

"অতএব এই সাধন অবলম্বনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না ইহা আমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করিলাম। তন্নিমিত্ত আমাকে অন্য উপযুক্ত গুরু গ্রহণ করিতে হইবে—এইরূপ আমার নিশ্চয় ধারণা হইল। সুতরাং যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন এবং যাঁহার কৃপায় আমি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, এমন সদ্গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি সদ্গুরু লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম।"

তদবধি ঐ সাধকদলে যাওয়া আসা তাঁহার কমিয়া গেল এবং কোথায় ব্রহ্মজ্ঞ সদ্গুরু পাইবেন, এই চিন্তায় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বাহিরে ওকালতি কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু অন্তরে সদ্গুরুলাভের তৃষ্ণা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। তিনি যে সদ্গুরুলাভ করিয়াছিলেন তাহাও তিনি জানিতেন। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু, গয়া হইতে তাঁহার পত্নী, শাশুড়ী ও বন্ধু উমেশবাবুর আগ্রহাতিশয্যে ও নিজ সিদ্ধগুরুর অনুমতিক্রমে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ এই সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। কথা প্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভু তাঁহার সদ্গুরুলাভের

বিষয় ও তৎসম্পর্কিত ঘটনাবলী তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। তিনি এ সকল পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন এবং গোস্বামী প্রভুর প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তিও ছিল। কিন্তু তাঁহার তখন ধারণা ছিল যে, তিনি তখনও পূর্ণ সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন নাই। সুতরাং তাঁহার উপদেশ সকল পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞের উপদেশের ন্যায় ধ্রুব সত্য বলিয়া সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিনা তৎসম্বন্ধে তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইল। এজন্য শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর শিষ্যত্বগ্রহণে তাঁহার মন অগ্রসর হইল না।

এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ স্বরচিত তাঁহার গুরুদেবের জীবন চরিত গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর সহিত আমি বহু পূর্ব্বাবধি খুব ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলাম। তিনি এই কুম্ভের মেলার প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে সদগুরুলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, ঐ কুম্ভের মেলার পূর্ব্বে তাঁহার বহু শিষ্যও হইয়াছিল, আমিও সময় সময় তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম এবং তাহার তীব্র তপশ্চরণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি খুব শ্রদ্ধান্বিত ছিলাম; তাঁহার সাধনের বেগ এমন ছিল যে, আমি কিছুদিন পরে পরে যাইয়া দেখিতাম যে ইতিমধ্যেই তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাঁহার নেত্রের ভঙ্গীর এবং মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন অতি শীঘ্র শীঘ্র ঘটিতেছে লক্ষ্য করিতাম। তাঁহার এই সকল পরিবর্ত্তন তাঁহার সাধনাবস্থার উন্নতির সূচক ছিল। এইরূপ সচরাচর সাধকের ঘটে না। আমি তন্নিমিত্তও তাঁহাকে অতি অসাধারণ পুরুষ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল উন্নতি দর্শন করাতেই আমি তাঁহাকে তৎকালে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। তাঁহাকে অতি উচ্চ অবস্থার পুরুষ বলিয়া মনে করিলেও উচ্চ সাধক বলিয়াই মনে করিতাম। একেবারে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইত না, সুতরাং তাঁহাকেও গুরুত্বে

বরণ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না।" যেমন ইঁহাকে, তেমনি অপর কোন খ্যাতনামা সাধুপুরুষকেও সহসা গুরুত্বে বরণ করিতে পারিলেন না, কারণ তাঁহাদের মধ্যে কে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন, কে হন নাই, অথবা কাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ তাহা তাঁহাদের বাহ্য ব্যবহার দৃষ্টে নির্ণয় করা যায় না। মহাপুরুষেরা সাধারণতঃ আত্মগোপন করিয়া থাকেন, বাহিরে চোখে দেখিয়া তাঁহাদিগকে চিনিবার অথবা তাঁহাদের অবস্থা জানিবার উপায় নাই। এইরূপ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অভিমত ছিল। একথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন, উক্ত জীবন-চরিত গ্রন্থেও বহুস্থানে ইহার উল্লেখ আছে।

এই সময়ে তাঁহার অন্তরে যে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। একদিকে সদগুরুলাভ না হইলে সকলই ব্যর্থ, এই ধারণায় যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ সদগুরু পাইবার জন্য প্রাণে প্রবল আর্তি, অপর দিকে নিজের চিরাভ্যস্ত বিচারশীলতার জন্য কেবল বাহির দেখিয়া অথবা লোকমুখে সিদ্ধপুরুষ এইরূপ খ্যাতি শ্রবণ করিয়া কাহাকেও গুরুত্বে বরণ করিতে নিজ মনে অপ্রবৃত্তি, এই উভয়ে মিলিয়া তাঁহার জীবনকে শান্তিহারা করিয়া তুলিল। পূর্ব্বোক্ত জীবন-চরিত গ্রন্থে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমি মনের কষ্টেতেই—কবে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্গুরুর আশ্রয় পাইব এই চিন্তাতেই দিনপাত করিতেছিলাম। দিনের বেলায় ব্যবসায়-কর্ম্ম করিতাম, কিন্তু সন্ধ্যার পর আর তৎসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিতাম না, এই বিষয়ের চিন্তাতেই আমার সময় যাইত।"

এই সময়ে একদিন শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া প্রথমস্কন্ধের একস্থানে দেখিলেন লেখা আছে যে তীর্থ পর্যটনের দ্বারা পাপরাশি বিধৌত হয় ও সৎসঙ্গ লাভ হয়, তৎফলে ক্রমে ক্রমে ভগবদ্ভক্তির উদয়

হয় ও পরে মোক্ষলাভ হয় *। তাঁহার চিত্তের বর্ত্তমান অবস্থায় এই স্থানটি বিশেষভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল ও কথাটি গভীরভাবে অনুধাবন করিয়া তাঁহার মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন যে, এই উপায় অবলম্বন তো কতক পরিমাণে তাঁহার আয়ত্তাধীন, অপর কোন পথই যখন পাইতেছি না তখন আর বিলম্ব করা না। এবং স্থির করিলেন—স্ত্রীর ভরণপোষণের কোন একটা ব্যবস্থা করিয়া ওকালতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িবেন এবং তীর্থে তীর্থে ঘুরিতে থাকিবেন।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী নামে তাঁহার একজন ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন †। ইনিও হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন এবং এই সময়ে উভয়েই সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে পরস্পর নিকটস্থ দুইটি বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। মোহিনীবাবু অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ও আদর্শচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার ও বাবাজী মহারাজের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রাণের সব কথা তাঁহার নিকট খুলিয়া বলিলেন, নিজের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া তাঁহার উপর ভার দিলেন, তিনি যেন তাঁহার পুস্তক, আলমারী প্রভৃতি সমুদায় অস্থাবর জিনিষ বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে অর্পণ করেন। শ্রীহট্টে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ শ্যামের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও স্ত্রীকে দিয়া যাইবেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই টাকা আনাইলেন। এইরূপ সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া যেদিন বাটীতে নিজ সঙ্কল্পের

* প্রথম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬।১৭ ১৮।১৯ ২০।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† ইঁহার শেষ বয়সে ইঁহাকে আমরা দর্শন করিয়াছি। এইরূপ যথার্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অধিক ছিলেন না। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিবার যোগ্য। তৎসমুদয় পরিশিষ্টে যথোপযুক্তভাবে দেওয়া হইল

বিষয় প্রকাশ করিলেন, সেদিন সেখানে অতি শোকাবহ ব্যাপার উপস্থিত হইল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া ইট দিয়া ললাটে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং জিদ করিয়া বলিলেন, তিনিও তাঁহার সঙ্গে তীর্থভ্রমণে যাইবেন। এই দিনের ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অন্নদাকিশোর চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,"হাইকোর্টে ওকালতির পশার-প্রতিপত্তির মাথায় কুঠারাঘাত করিয়া, উকিল-বন্ধু শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবুর নিকট আইনের পুস্তকগুলি দিয়া, (ছোট অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয়) আমাকে, হেমকিশোরকে এবং বৌদিদিকে নিরাশ্রয়ভাবে রাখিয়া সদ্গুরুলাভাশায় তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া যাইবেন শুনিয়া আমরা সকলে চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। ঠিক এই সময়ে যেন দৈবপ্রেরিত হইয়া তাঁহার ক্লার্ক হরিনারায়ণবাবু * আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়া তিনি তখনই যাইয়া হাইকোর্টের জজ্ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং অগ্রজমহাশয়ের বন্ধু প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা যৎপরোনাস্তি সুমধুর বাক্যাবলী দ্বারা দাদাকে বুঝাইয়া, এখনও সংসার-ত্যাগের সময় হয় নাই ইত্যাদি নানা উপদেশ প্রদান করিয়া তখনকার মত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।" এই ঘটনা খুব সম্ভবতঃ বাংলা ১২৯৮ সালের (ইংরাজী ১৮৯১ খৃঃ) কথা।

কি অসাধারণ ব্যাকুলতা ও আর্ত্তিসহকারে তিনি এই সময়ে

* শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ স্বরচিত তাঁহার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থে যে অভয়নারায়ণবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা হরিনারায়ণবাবুর উল্লেখ করিয়াছেন, এই ক্লার্ক হরিনারায়ণবাবু তিনি নহেন। ইনি পৃথক ব্যক্তি।

ভগবান্‌কে লাভ করিবার পথ খুঁজিতেছিলেন, এই ঘটনায় তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সকল ছাড়িয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া পড়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আপাততঃ হইল না বটে, কিন্তু শ্রীভগবান তাঁহার ডাকে সাড়া দিলেন এবং একটি পরমাশ্চর্য্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার কাতর প্রার্থনা পূরণের ব্যবস্থা করিলেন। সকল তীর্থের সারভূতা, লোকপাবিনী গঙ্গাদেবীও তাঁহার নিকটেই ছিলেন — "গঙ্গা সমং ত্রিভুবনে নচ তীর্থমস্তি" — আর তিনিও নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন, এবং সুবিধা পাইলে গঙ্গাতীরে গিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন, এক এক সময় নিজের মনের ব্যথা তাঁহাকেই নিবেদন করিতেন। একদিন (সেদিন হাইকোর্ট ছুটি ছিল) মধ্যাহ্ন আহারাদির পর কিছুক্ষণ গঙ্গাতীরে বসিয়া ভজন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তখন জ্যৈষ্ঠমাস—দারুণ গ্রীষ্ম, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে রাস্তাঘাট আগুন হইয়া উঠিয়াছে। নিদাঘের সেই প্রচণ্ড তাপ উপেক্ষা করিয়াই তিনি হ্যারিসন রোড দিয়া গঙ্গার অভিমুখে চলিলেন। হ্যারিসন রোড ও চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে উপস্থিত হইলে তাঁহার মনে পড়িল নিকটবর্ত্তী মসজিদের দরজায় একজন সিদ্ধ মুসলমান ফকির থাকেন। তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া যাইবেন ভাবিয়া তিনি তাঁহার নিকট গেলেন, ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ফকির সাহেব হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "হঁয়া বড়া ধুপ হ্যায়, বড়া ধুপ হ্যায়, ঘরমে ক্যা নেহী হোতা হ্যায়?" তিনি তখন এই সকল কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না এবং তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া তথা হইতে ধীরে ধীরে পুনরায় গঙ্গার দিকে চলিলেন। কিন্তু মসজিদের নিকট হইতে বাহির হইয়া হ্যারিসন রোডের দিকে চিৎপুরের রাস্তায় চলিতে চলিতে

ফকিরের ঐ কথাগুলি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে ইহার অর্থ এই—"ঘরে বসিয়া কি ভজন করা হয় না? যেখানে যাইতেছ, সেখানে অতিশয় রৌদ্র, ছায়া নাই।" তিনি তখন ইহা বুঝিয়াও গঙ্গার পুলের ঘাটের দিকেই অগ্রসর হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি (ফকির) যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য, ঘাটে প্রচণ্ড রৌদ্র, কোথাও ছায়া নাই। বেলা তখন প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। ঘাটের উপর পাণ্ডাদের বড় ঘর, তাহার ভিতরেও পশ্চিম দিক হইতে সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ফকির সাহেবের কথা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং আপন স্থানে বসিয়া থাকিয়াও তিনি যে অতি দূরবর্ত্তী স্থান দেখিতে পাইতেছেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। অতঃপর মনে করিলেন যে, এই স্থানে যখন বসিবেন মনে করিয়া আসিয়াছেন তখন তথায় ভজন না করিয়া ফিরিয়া যাইবেন না। ঐ ঘরের নানা স্থানে কাঠের অনেক বাক্স ছিল, তাহার উপর স্নানার্থী লোকেরা বসিয়া পাণ্ডাদের নিকট হইতে তৈল লইয়া মাখে। দ্বিপ্রহরে স্নান করিতে কেহ সচরাচর আসে না, পাণ্ডারা বারটা একটার সময় ঘরে চলিয়া যায়, তখন স্থান খালি পড়িয়া থাকে। তিনি বাছিয়া বাছিয়া বড় বড় তিন চারিটি বাক্স লইয়া একটির উপর আর একটি রাখিয়া তাহার ছায়ায় আসন করিয়া বসিলেন।

এই ভাবে বসিয়া গঙ্গাদেবীর ধ্যান করিতে করিতে অতি কাতর ভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিকট আত্ম-নিবেদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। এইরূপ ঘটনা তিনি সাধারণতঃ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থে সামান্যভাবে ইহার উল্লেখ মাত্র আছে। আমরা

সৌভাগ্যক্রমে ইহা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। যেমন ভাবে তিনি ইহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপই ইহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আমি স্থির চিত্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, আমি যে গঙ্গাদেবীর তীরে বসিয়া রহিয়াছি, ইনি ত জীবের পাপ তাপ হরণ করিবার জন্যই এই ভূতলে প্রবাহিত হইতেছেন। ইহাকে পাপ-নাশিনী বলিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে, আমার কি পাপ এতই অধিক যে, ইনি তাহা ধৌত করিতে পারেন না? আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া কাতরভাবে গঙ্গাদেবীর দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে আমার মনোগত ভাব জ্ঞাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপ অবস্থায় দেখিলাম যে, আমার চক্ষুর সম্মুখে হিমালয়ের যে স্থান হইতে গঙ্গা উদ্ভূত হইয়াছেন, সেই মূল গঙ্গোত্রী গোমুখী স্থান হঠাৎ প্রকাশিত হইল এবং সেই স্থানে বিরাজমান উমা মহেশ্বরদেবও আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। আমি বিস্মিত হইয়া ঐ স্থান ও তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম। নমস্কার করিতেও ভুলিয়া গেলাম। অতঃপর মহেশ্বর একটি একাক্ষরী বীজমন্ত্র আমাকে উপদেশ করিলেন এবং এইরূপ জ্ঞাপন করিলেন যে, এই মন্ত্র জপের দ্বারা আমি যথার্থ সদ্‌গুরু লাভ করিব। ইহার পরই হরগৌরী এবং সেই গঙ্গোত্রীর স্থানের দৃশ্য আমার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। আমি যে স্থানে বসিয়াছিলাম সেই স্থানেই গঙ্গাজীকে সম্মুখে দেখিলাম। তখন আমার অন্তঃকরণে অতিশয় আনন্দের ধারা বহিতে লাগিল এবং নৈরাশ্যের ভাব দূর হইয়া সদ্‌গুরুলাভ বিষয়ে আশান্বিত হইলাম।" এই ঘটনাও খুব সম্ভবতঃ বাংলা ১২৯৮ সালের গ্রীষ্মকালে ঘটিয়াছিল (ইং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া শ্রীযুক্ত অন্নদাকিশোর চৌধুরী মহাশয় বলেন। ইহার তিন বৎসর পরেই বাবাজী মহারাজ পরমপূজ্যপাদ ব্রজবিদেহী

মহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষালাভ করেন।

ইহার পর তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইবার যে সঙ্কল্প পূর্ব্বে করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। দিনের বেলায় পূর্ব্ববৎ ব্যবসায়-কার্য্য মনোযোগের সহিত করিতেন এবং সন্ধ্যার পর সাধ্যানুসারে এই দৈবপ্রাপ্ত মন্ত্র জপ করিতেন। ইহার কিছুকাল পরে ১২৯৯ সালের ৩রা ভাদ্র তাঁহার পিতৃদেব পরলোক-গমন করেন। তাহার এক বৎসর পরে পিতার সপিণ্ডীকরণ শেষ করিয়া ১৩০০ সালের ভাদ্র মাসে তিনি মাসাধিক কাল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তীর্থ-দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী ইত্যাদি স্থান হইয়া আশ্বিন মাসে মথুরা বৃন্দাবন গিয়াছিলেন *। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে বাংলা ১৩০০ সালের মাঘ মাসে প্রয়াগ কুম্ভমেলার সময় উপস্থিত হইল। এই মেলায় গিয়া কিরূপে তিনি পরমারাধ্য শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের দর্শনলাভ করেন ও পরে ক্রমে তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুরূপে লাভ করেন, তৎসমস্ত তাঁহার গুরুদেবের জীবন-চরিত্র গ্রন্থে তিনি স্বয়ং বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনা অতি উপাদেয় বলিয়া এবং বর্ত্তমান স্থলের বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া উক্ত গ্রন্থের সেই অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৩০০ বাংলা সালের মাঘ মাসে প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা হয়। সেই কুম্ভমেলায় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিয়া মেলাস্থানে সাধুদিগের মধ্যে তাঁবু বসাইয়া তথায় স্বীয় আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। আমার একজন বন্ধুর অনুরোধে বাধ্য হইয়া

* এই সব বিষয় দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের যথাস্থানে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

উদিত হইয়াছিল তাহা ও তাহার উত্তর প্রথমেই তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। এই সম্বন্ধীয় কোন কথা তখন আমার মনেও ছিল না। তিনি এইরূপ বলিলে আমি একবারে চমকিয়া উঠিলাম, মনে ভাবিলাম একি! দুই মাস কাল পূর্ব্বে নিভৃত দূরবর্ত্তী স্থানে গভীর নিশীথে বসিয়া মনে মনে আমি কি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছি, তাহা ইঁহার বিদিত হইয়াছে। ইনি কিরূপে ইহা জানিলেন? তবে বোধ হইতেছে আমার মনের আবদার ভগবান শুনিয়াছেন সুতরাং তাঁহার জন যিনি যেখানে আছেন, তাঁহারও ইহার খবর হইয়াছে বোধ হয় ইনি একজন ভগবজ্জন হইবেন, তাহা হই ইঁহারও এই বিষয়ে অবগতি আসিয়াছে।" এইরূপ ভাবিয়া আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত বড় আশাযুক্ত হইলাম। তৎপর আবার ভাবিতে লাগিলাম আচ্ছা যদি ইনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগতই হইয়াছেন তাহা হইলেও আমাকে এইরূপে বলিলেন কেন? তবে কি আমি যেরূপ মহাপুরুষের আশায় কাল কাটাইতেছি ইনিই সেই মহাপুরুষ এবং আমার প্রতি কৃপা করিবেন বলিয়া এইরূপ আত্মপ্রকাশ করিলেন? যাহা হউক আমি এক্ষণে কেবল দেখিয়া যাইব, কোন কথা কিছু বলিব না।" এইরূপ স্থির করিয়া দুই পাঁচ মিনিট বসিয়া অন্যান্য কথাবার্ত্তা শুনিলাম তৎপর শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে আসিয়া আহারাদি করিলাম এবং তৎপর অন্যান্য সাধু ও সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া নানা সৎপ্রসঙ্গে সেই দিন অতিবাহিত করিলাম। তৎপর দিবস প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া শুনিলাম, শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু সশিষ্যে শ্রীযুক্ত দয়ালদাস স্বামীকে দর্শন করিতে যাইবেন। শ্রীযুক্ত দয়ালদাস স্বামী তাঁহার জমাত লইয়া ঝুসির সংলগ্ন একটি বালির চড়ার উপরে আসন স্থাপন করিয়াছেন। দিল্লীর এক শেঠ দাসের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যত লোক স্বামীজির নিকট উপস্থিত

হইতেন, প্রত্যেককে তিনি অতি পরিপাটিরূপে নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা উদর পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতেন। শুনিয়াছি যে প্রায় প্রত্যহ তিন চার পাঁচ পংক্তিতে দশ হাজার পর্য্যন্ত লোক তথায় আহার করিত। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু তাঁহার দর্শনে সশিষ্য যাইবেন শুনিয়া আমিও তথায় যাইব স্থির করিলাম। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে তখন প্রায় ষাট সত্তর জন লোক একত্রিত হইয়াছিলেন। সকলেই প্রাতে চা খাইতেন। অপর সকলে চা খাইয়া শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর সঙ্গেই তাঁবু হইতে নির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে কেবল তাঁহার শিষ্য শ্রীধর, অশ্বিনী এবং অভয়বাবু ও আমি চা খাওয়ার জন্য তাঁবুতে রহিলাম। তখন আমাদের নিমিত্তও চা আসিল এবং শ্রীধর চা খাইতে খাইতে বলিলেন, "গোঁসাই এত শিষ্য করিয়াছেন আমার ভাল লাগে না। এখানে যেন এক হাট বসিয়াছে; সমস্ত দিন গোলমাল। এর চেয়ে বড় কাঠিয়া বাবাকে আমার ভাল লাগে। শুনিয়াছি তাঁহার গুরু বলিয়াছেন, 'চারি চেলা করিবে', তিনিও তদনুসারে চারিদেশে চারি চেলা করিয়াছেন, আর চেলা করেন না।" শ্রীধরের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি ইহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিলাম। তাহার যে সময় সময় মাথা গরম হয়, তখন যাহা ইচ্ছা বকে, তাহা আমি জানিতাম না। তাহার এই কথা সত্য মনে করিয়া আমি ভাবিলাম যে, পূর্ব্বদিবস আমি যে আশা করিয়াছিলাম "শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজই বা সেই মহাপুরুষ হইবেন, যিনি আমার গুরু হইয়া আমাকে কৃপা করিবেন" তাহা সত্য নহে; কারণ শ্রীধর বলিলেন, তিনি আর চেলা করেন না। অতএব পূর্ব্বদিবসের চিন্তা কেবল বৃথা কল্পনা বলিয়া আমি অবধারণ করিলাম। তৎপর চা খাওয়া হইলে আমরা চারিজন সাধু-মণ্ডলীর পরিক্রমা করিয়া খ্যাতনামা সাধুদিগকে বিশেষরূপে অভিবাদন

করিতে করিতে চলিলাম। প্রথমে ছোট কাঠিয়া বাবাজী নামক জনৈক সাধুকে অভিবাদন করিয়া তৎপর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসনের নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যেমন তাঁহার আসন সমীপে বসিলাম, অমনি তিনি আপনা হইতে বলিয়া উঠিলেন, "হমারা ত পাঁচ ছে চেলা হেয়। সুপাত্র হোনেসে অব্ ভী চেলা করনে হেঁ।" এই কথা কোন প্রসঙ্গ বিনা তিনি বলাতে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শ্রীধরের কথা-প্রসঙ্গে আমার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকেই বলা হইতেছে বলিয়া আমি ধারণা করিলাম। কিন্তু তখনও প্রকাশ করিয়া কাহাকেও কিছু বলিলাম না। কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া অপর সাধু সকলকে দর্শন করিতে করিতে শ্রীযুক্ত দয়ালদাস স্বামীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি মোট পাঁচ ছয় দিবস প্রয়াগের মেলা স্থানে ছিলাম, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দিবসই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে গেলে এইরূপ কোন না কোন কথা তিনি বলিতেন, যাহাতে তাঁহার অন্তর্যামিত্ব আমার নিকট প্রকাশিত হইত এবং যেন আমাকে তিনি কৃপা করিবেন বলিয়া এইরূপ পরিচয় দিতেছেন বলিয়া আমার ধারণা হইতে লাগিল। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহার কিংবা অপর কাহারও নিকট এই সকল ভাব প্রকাশ করিলাম না। পরে যে দিবস আমি মেলা হইতে চলিয়া আসিব, সেই দিবস তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গেলাম। যখন তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া আসিব, তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুম্ চৈত্ মাহিনেমে বৃন্দাবনমে যায়কের হমকো ফের দর্শন দেনা।" আমি বলিলাম, "মহারাজ! আমি ওকালতি কার্য্য করি, চৈত্রমাসে কোন দীর্ঘ ছুটি নাই, আমি কেমন করিয়া সেই সময়ে বৃন্দাবনে যাইব? তবে আপনি যদি আমাকে টানিয়া নেন, তবে আমি যাইতে পারি।" তিনি হাসিয়া

বলিলেন, "হাঁ, তুমকো মহাবীরজী জরুর লে যায়গা।" তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া হরিনারায়ণবাবু ও আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। কিন্তু আমার মনে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইতেছিল, তাহা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। এবং পূর্ব্বের দৈব-প্রাপ্ত মন্ত্রেরই সাধন আমার চলিতে লাগিল। * * * * * *

"মেলা ভাঙ্গিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। আমি শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে যাইতেছি এইমাত্র বন্ধুবর্গকে বলিয়া চৈত্রমাসের শেষভাগে শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর সঙ্গে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী, শ্রীযুক্ত মৌনীজী, কল্যাণদাস নামক রামানন্দ সম্প্রদায়ের একজন সাধু ও পুষ্করদাস নামক আর একজন সাধু তখন আশ্রমে ছিলেন। আমরা সন্ধ্যার পর আশ্রমে উপস্থিত হইলাম এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে ও অপর সকলকে অভিবাদন করিলাম। শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীর চেহারা দেখিয়া আমি তাঁহার প্রতি বড় শ্রদ্ধান্বিত হইলাম। যেন শান্তির সাগর বলিয়া তাঁহাকে আমার বোধ হইতে লাগিল। তিনি রাত্রে ডাল ও রুটি প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইলেন। আমরা প্রায় তিন সপ্তাহ কাল এইবার আশ্রমে ছিলাম। নিত্যই অতি উপাদেয় ডাল রুটি হইত। আমরা প্রীতিপূর্ব্বক প্রসাদ পাইতাম। ভাতের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা আমাদের হইত না, সকলেই স্বহস্তে আপন আপন উচ্ছিষ্ট মোচন করিতেন, আমরাও আহারান্তে আপন আপন উচ্ছিষ্ট মোচন করিয়া উচ্ছিষ্ট থালা মাজিয়া পরিষ্কার করিতাম। তাহাতে আমাদের কোন কষ্ট বোধ হইত না। কিন্তু আহারাদি বিষয়ে কোন কষ্ট না হইলেও আশ্রমে থাকিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী

মহারাজের কার্য্য-কলাপ দর্শন করিয়া আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। তথায় যাইবার পূর্ব্বে আমি ভাবিয়াছিলাম, যে হয়ত গিয়া দেখিব যে তিনি অধিকাংশ সময় সমাধিস্থই থাকেন, অথবা এইরূপ অন্ত কোন অলৌকিকভাবে থাকিয়া কালযাপন করেন, কিন্তু তথায় গিয়া দেখিলাম যে তিনি অতিশয় সাধারণ অপেক্ষাও সাধারণ লোকের ন্তায় জীবন যাপন করিতেছেন। নিত্য নিজে প্রাতে বাজার করিতে যান এবং খুব দর করিয়া শাক তরকারী প্রভৃতি জিনিষপত্র বাছিয়া বাছিয়া খরিদ করেন। নিজে কাঁধে করিয়া তৎসমস্ত বাজার হইতে লইয়া আসেন। অপর কোন চেলা দ্বারা জিনিষপত্র খরিদ করাইলে খুব কড়াকড়ি করিয়া তাহার হিসাব লয়েন। সেবাকুঞ্জের নিকট রাস্তার কিনারে সকালে বিকালে বসেন। যাত্রী সকল এই রাস্তায়ই গমনাগমন করে। কেহ সিকি পয়সা কেহ আধ পয়সা, কেহ বা একটি পয়সা তাঁহাকে ভিক্ষা দেয়। একটি সম্পূর্ণ পয়সা কোন যাত্রী দিলে তিনি বড় প্রসন্ন ভাব দেখান। ব্রজবাসী কেহ কেহ আসিয়া তাঁহার নিকট ঐ স্থানেই বসিয়া গাঁজা খায় এবং যাত্রীকে রাস্তায় যাইতে দেখিলে কখন কখন বলিয়া উঠে, "আরে ইয়ে দুধাধারী বাবা হ্যায়, এ খালি দুধ পিকের রয়তা হ্যায়, ইনকো কুছ দেও।" যাত্রীদিগকে ব্রজবাসিগণ কখনও এইরূপ আহ্বান করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া হাসিতে থাকেন। এইরূপে দুই বেলা কিছু পয়সা সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে লইয়া আসেন এবং সেই পয়সা অতি যত্নে নিজের কাছে রাখেন। অপর কাহাকেও তাহা স্পর্শ করিতেও দেন না। যেন চুরি করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কিত। সন্ধ্যার পর আশ্রমে বসিয়া যখন আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন, তখনও ভগবৎপ্রসঙ্গ একবারও করেন না। জিনিষপত্রের মহার্ঘতা ইত্যাদির কথা, জল কোন্ স্থানে ভাল, কোন্ স্থানে মন্দ, ইত্যাদির কথা, কে ধনী

কোন কালে তাঁহাকে টাকা দিয়াছে ইত্যাদির কথা, জয়পুরের রাজা আসিবে এবং আসিয়া অবশ্য তাঁহাকে নিত্য পাঁচমূর্ত্তির খোরাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে, এবং ঐ রাজার মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার সময় তাঁহাকে অবশ্য অনেক অর্থ দিবে ইত্যাদির কথা লইয়া ব্রজবাসীদিগের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেন। কখনও বা সামান্য কারণে অথবা অকারণে রাগ করিয়া কোন শিষ্যকে চিম্‌টা দ্বারাই আঘাত করিলেন এবং নানাবিধ অশ্লীল কথা বলিয়া বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে গালি দিতে লাগিলেন। যে কেহ পয়সা দেয় তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অমুক ব্যক্তি কিছু দেয় না, সে কোন কর্ম্মের লোক নহে, এই বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন, এবং সাধারণতঃ অভয়বাবুর প্রতি খুব স্নেহ এবং আমার প্রতি কিছু কঠোর ও ভিন্ন ভাব দেখাইতে লাগিলেন। * * * তাঁহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে প্রয়াগরাজ হইতে আমি যে ধারণা লইয়া গিয়াছিলাম, তৎসমস্ত তিরোহিত হইল। দিন দিনই নূতন নূতন কার্য্য দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, ইনি অতি সাধারণ শ্রেণীর লোক। লেখাপড়াও বিশেষ জানেন না, বিশেষ কোন যোগৈশ্বর্য্যও ইহার নাই। গ্রামেও খুব প্রাচীন বৈষয়িক লোক যেরূপ থাকে, ইহার অবস্থাও আমি তদ্রূপই দেখিতেছি। কোন প্রকার পার্থক্য বোধ হইতেছে না। কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে আবার প্রয়াগে আমার নিজের সম্বন্ধেই যে সকল কথাবার্ত্তা তিনি বলিয়াছিলেন পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, সেই সকল কথা মনে হইয়া ইঁহাকে তদ্রূপ সাধারণ লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম, প্রয়াগে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক হইতে পারে। আবার ভাবিলাম, যদি ইঁহার কোন সাধন-ঐশ্বর্য্য না থাকে, তবে সমস্ত সাধু সম্প্রদায় ইহাকে এত সম্মান করিয়া অগ্রগণ্য করিয়া মেলায় স্থান করিতে

গেলেন কেন। একবার মনে হইল যে ইনি বয়োবৃদ্ধ এবং ব্রহ্মের মহন্ত পদ পাইয়াছেন, এই নিমিত্ত অপর সাধুগণ তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকিতে পারেন। আবার মনে হইল যে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন, অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ সাধুদিগের মধ্যে মেলাস্থানে আছেন এবং বয়োবৃদ্ধও অনেক সাধু আছেন। ইঁহারা কি কেবল ইঁহার বার্দ্ধক্য দেখিয়া ইঁহার এমন সম্মান করিতেন। এইরূপ নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক আমার মনে সর্ব্বদা চলিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিলাম না কেবল তাঁহার আচরণ সকল দেখিয়া যাইতে লাগিলাম, এবং মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলাম। অবশেষে শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি কথা একদিন হঠাৎ আমার স্মরণ হইল মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে লীলা করিতেছিলেন, তখন নানা অলৌকিক কার্য্য তিনি করিয়া থাকিলেও সে সকল কার্য্য এমন ভাবে করিতেন যে, কেহই তাঁহাকে সাধারণ বালক অপেক্ষা অধিক কিছু মনে করিত না। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহার চরিত্রে মোহপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সামান্য মানব বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। পরে কেবল তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাদের ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। এই সকল শ্রীমদ্ভাগবতের কথা স্মরণ হইয়া আমার মনে হইল যে ইনি যদি তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্ হইয়া ব্রহ্মরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, তাহাও তো অসম্ভব নয়। তাহা হইলে অবশ্য ইঁহার কার্য্যকলাপ লোকের বিচার-শক্তির অতীত হইতে পারে এবং সমস্ত কর্ম্মই লীলা মাত্র হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় আশঙ্কা করিলাম যে ইনি এইরূপই হইয়াছেন ইহাই বা আমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিতে পারি? আমার নিজের এমন চক্ষু নাই যে ইঁহার অবস্থা চিনিয়া লই। অবশ্য তিনি এইরূপ পুরুষ হইলে আমি

যেরূপ সদ্‌গুরু চাই, তিনি তাহাই। কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপে না জানিয়া কিরূপে ইঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারি। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি অবশেষে স্থির করিলাম যে আমি বৃন্দাবন দেখিতে আসিয়াছি, বৃন্দাবনই এইবার দেখা হইল; অন্য কোন মনের বিষয় কাহারও নিকট কিছু বলিব না। আর ইনি যদি তদ্রূপই পুরুষ হন, তবে আমার মনের এই সমস্ত চিন্তা ও সন্দেহ অবশ্যই জানিতেছেন, এবং আমাকে যদি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি নিজে নিজেই তাহা প্রকাশ করিবেন এবং আমাব সন্দেহ যাহাতে দূর হয়, তাহা কবিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আমি স্থির হইলাম।

"ইহার দুই তিন দিবস পরে অভয়বাবুর ভ্রাতা হরিনারায়ণবাবুর লিখিত এক পত্র আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকটেই বসিয়া আছি, এমন সময়ে সেই পত্রখানা গেল। অভয়বাবু পোষ্ট কার্ডে লিখিত সেই পত্রখানি পড়িয়া আমাকে দিলেন, আমি তাহা পড়িতে লাগিলাম। অভয়বাবুর নিকট কলিকাতা হইতে সর্ব্বদাই পত্র যায়, কিন্তু কোন পত্রের বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কোন কথা কখনও জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পোষ্ট কার্ড পত্রখানা আমি পড়িতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "ইস্‌মে ক্যা লিখা হ্যায় বাতাও"। এই পত্রে হরিনারায়ণবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি কিনা। বাস্তবিক তৎপূর্ব্বে কিম্বা পরে আর কোন পত্র কখনও তিনি আমার নিকট লিখেন নাই, এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে যে আমার কখনও ইচ্ছা হইয়াছে তাহাও আমি কখনও তাঁহার কিংবা অপর কাহারও নিকট বলি নাই। কেন যে কেবল এই মাত্র কথা জিজ্ঞাসা

করিয়া তিনি আমাকে পত্র লিখিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পত্রে কি কি লেখা আছে তৎবিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি বলিব ভাবিতেছি এমন সময়ে শ্রীযুক্ত অভয়বাবু তাঁহাকে বলিলেন, ইহাতে লেখা আছে "বাবুজী আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, আমার ভাই এই পত্র লিখিয়াছে।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "হাঁ উন্‌কো লিখ্ দেও কি ইনকা দীক্ষা চামসে মিল গিয়া।" অভয়বাবুকে এই কথা বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইস্ বক্ত তুম্‌কো দীক্ষা নেহি দেয়েঙ্গে। তোমারি স্ত্রীকি সঙ্ শ্রাবণ মাইনামে ফের হঁয়া আইও, ওস্ বক্ত তুম দোনোকা এক সঙ্গ দীক্ষা দেয়েঙ্গে।" এই কথা শুনিয়া আমার চিন্তা দূর হইল। আমি মনে মনে বলিলাম আমার ত এই সময়ে দীক্ষা লইতে মতিই হয় নাই, এই সময়ে দীক্ষার কথা বারণ করিলেন ইহা ভালই হইল। ইঁহার প্রতি আমার সন্দেহ দূর হইলে পরে যেরূপ হয় দেখা যাইবে।

"ইহার দুই তিন দিবস পরেই আমরা শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় ফিরিলাম। আশ্রমে থাকাকালীন আমার প্রতি কিঞ্চিৎ কঠোর ভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ব্যবহার করিতেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু আশ্রম হইতে যখন বিদায় লইয়া আসি তখন তিনি আমার প্রতি একবার এমন ভাবে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন যে আমার সর্ব্বশরীর যেন মধুময় হইয়া গেল, এবং তাঁহাকে একমাত্র স্নেহ ও প্রেমেরই আধার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টিতে আমার হৃদয়ে এক অদ্ভুত প্রেমের সঞ্চার হইল এবং কলিকাতা আসিয়া পৌঁছা পর্য্যন্ত ইহা আমার অন্তরে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কিন্তু তৎপর দুই এক দিনের মধ্যেই ইহা পুনরায় তিরোহিত হইয়া গেল এবং আমি পূর্ব্বের শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম।

"শ্রীবৃন্দাবনে থাকাকালীন কথা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন যে সাধকের পক্ষে তিন চারিটি উপদেশ পালন করা অশেষবিধ কল্যাণকর, যথা :—

(১) চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে নিদ্রিত না থাকা।

(২) ভিতরসে কাম করনা, নিন্দা স্তুতি কো নেই দেখনা।

(৩) সদা শুদ্ধ রহনা। ইহার অর্থ নিষ্পাপ ও নিষ্কপট হওয়া আমি বুঝিয়াছিলাম। অন্যান্য কথাও বলিয়াছিলেন এই স্থলে এই তিনটি কথারই বিশেষ উল্লেখ করিলাম।

"আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমোক্ত উপদেশটি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলাম যে, অনভ্যাস বশতঃ তাহাতে অনেক সময়েই অকৃতকার্য্য হই এবং যখন কৃতকার্য্য হই তখন মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠে ও আমার ওকালতি ব্যবসার কার্য্য করিতে কিঞ্চিৎ শারীরিক কষ্টও বোধ হয়। আমার শরীরের স্বভাবতঃ বায়ু প্রধান ধাত। বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতে একদিনের জন্যও আমার সুনিদ্রা হয় নাই। পূর্ব্বে যোগীসম্প্রদায়ে থাকা কালে যে সকল প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া আগ্রহের সহিত সাধন করিতাম, তাহাতে আমার শরীরে বায়ুর গতি এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমার সুনিদ্রা একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। শেষ রাত্রে ঠাণ্ডার সময়ে একটু নিদ্রার শান্তি পাইতাম, কিন্তু তৎকালেও নানাবিধ স্বপ্ন মাত্র হইত। সুতরাং শেষ প্রহরে জাগরণের চেষ্টা করাতে অনেক সময় অকৃতকার্য্য হইতাম এবং কৃতকার্য্য হইলেও সারাদিন মস্তিষ্ক গরম থাকিত। কিন্তু চেষ্টা করিতে তথাপি ক্ষান্ত হইতাম না। এই অবস্থায় আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে আমার একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। ঘরের ভিতরে জানালার ঠিক সংলগ্ন স্থানে মশারি টাঙ্গাইয়া শয়ন

করিয়া আছি, শেষ রাত্রে নিদ্রাবেশ হইয়াছে। তখন একজন কেহ আমাকে 'উঠ' বলিয়া আমার উপরে একটি ছোট ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলিল, ঢিলটি আমার গায় আসিয়া পড়িল। আমি তখনই উঠিলাম এবং ঢিলটি হাতে করিয়া লইলাম, কিন্তু জানালার বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, আরও দেখিলাম যে মশারির কোন স্থানে কোন ছিদ্র হয় নাই। ইহাতে ঢিল কিরূপে মশারির ভিতরে আসিয়া আমার গায়ে পড়িল তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তৎপরে আর এক দিবস খোলা ছাদের উপর শুইয়া আছি, শেষ রাত্রে অতি মৃদুস্বরে কেহ আমার নাম করিয়া দুই তিন বার ডাকিল। সেই মৃদুস্বরের ডাক শুনিয়া আমি উঠিয়া দেখিলাম চারিদিক নিস্তব্ধ, কোনও জনপ্রাণী কোন দিকে দৃষ্ট হইল না, অবাক হইয়া চিন্তা করিতে করিতে ছাদে বেড়াইতে লাগিলাম।

"এই সকল ঘটনার মূল কারণ কি তৎসম্বন্ধে আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি যে দৈবপ্রাপ্ত মন্ত্র পূর্ব্বে জপ করিতাম, তাহাই তখনও জপ করিতাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি আমার আস্থা যে জন্মে নাই, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রাবণ মাসে যাইয়া দীক্ষা লইতে যে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ ছিল কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মে নাই, সুতরাং সেই বাক্যে আমার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না, এবং শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া বিষয়েও তখন আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। আমি মনের কষ্টেতেই—কবে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইব, এই চিন্তাতেই দিনপাত করিতেছিলাম। দিনের বেলায় ব্যবসায়-কর্ম্ম করিতাম, কিন্তু সন্ধ্যার পর আর তৎসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিতাম না, এই বিষয়ের চিন্তাতেই আমার সময় যাইত। বোধ করি তন্নিমিত্তই ভগবান্ আমার প্রতি

দয়ার্দ্র হইলেন এবং আমার সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত আমার অভাবনীয় রূপেই উপায় সৃষ্টি করিলেন। আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক দিবস ছাদের উপর শুইয়া আছি, শেষ রাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিলাম এবং বসিবামাত্র দেখিলাম যেন আকাশ ভেদ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি আমার সম্মুখে ছাদের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করিয়া তখনই একটি মন্ত্র আমার কর্ণকুহরে উপদেশ করিলেন। মন্ত্রোপদেশ করিয়া তিনি আকাশপথে উড্ডীন হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। আমাকে ঐ ছাদের উপরে এইরূপে দীক্ষা দিয়া যখন তিনি যান, তখন সেই স্থানে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুরও মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অন্তর্হিত হইলে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যেন আমার অন্তরের প্রত্যেক স্তরে স্তরে তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল সংশয় আমার ছিল তৎসমস্ত তখন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি বোধ করিতে লাগিলাম যে সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার জীবন ধন্য হইল এবং আমি অভিলষিত সদ্‌গুরু লাভ করিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে চৈত্রমাসে গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্র দর্শনে যে সকল সন্দেহ আমার উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত মুহূর্ত্তমধ্যে তিরোহিত হইল, তাঁহাকে পূর্ণজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম।

"অতঃপর শ্রাবণ মাসের শেষভাগে আমার স্ত্রী ও একটি বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্রীযুক্ত [illegible]বাবুর সমভিব্যাহারে আমি প্রসন্নচিত্তে শ্রীবৃন্দাবনে গেলাম এবং আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে অভিবাদন করিলাম। তিনি তখন আমাকে বলিলেন যে ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমী

তিথিতে আমি এবং আমার স্ত্রী উভয়কে তিনি দীক্ষা দিবেন। তখন জন্মাষ্টমীর ৮।১০ দিন বাকী ছিল। এই যে কয়দিন আশ্রমে রহিলাম, তখনও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সাধারণ আচার-ব্যবহার ঠিক পূর্ব্ববৎই দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর সেই সকল আচরণ আমার সংশয় জন্মাইতে পারিল না। আমি মনে করিতে লাগিলাম ইহা তাঁহার লীলা মাত্র আমার বুদ্ধির গম্য নহে। যিনি এখানে থাকিয়াও সহস্র মাইল দূরস্থিত কলিকাতায় আমাকে দৃষ্টি করিতে সমর্থ এবং তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রবোধিত ও দীক্ষিত করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তাঁহার নিকট আমার আত্মসমর্পণ করিতে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই। এইরূপ ভাবিয়া আমি পুনবায় দীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিলাম, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে জানাইলাম যে পূর্ব্বে কলিকাতায় ছাদের উপর অবস্থিত হইয়া যখন দীক্ষা দিয়াছেন তখন আর পুনবায় দীক্ষার প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন, "হাঁ, পুনরায় দীক্ষা দিব।" আমি তাহাতে পুনরায় দীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী, অভয়বাবু ও আমার নিকট বলিলেন যে তাঁহার দীক্ষা একবার দেশস্থ গুরুর নিকট হইয়াছে, সেই মন্ত্র তাঁহার অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তিনি পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহাতে শ্রীযুক্ত অভয়বাবু তাঁহাকে প্রতিদিনই সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষার মাহাত্ম্য বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বরাত্রেও অভয়বাবুর সহিত তাঁহার কথোপকথন হইল; তিনি বলিলেন, অনেকদিন তিনি তাঁহার প্রাপ্ত মন্ত্র রটন করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার অতিশয় প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। তিনি সেই মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র জপ করিবেন না। আমি তাঁহাকে এই বিষয়ে

বিশেষ কিছু বলিতাম না, কারণ আমার ধারণা হইয়াছিল যে, যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন জন্মাষ্টমীর দিন আমার সহিত এক সঙ্গে তাঁহার দীক্ষা দিবেন, তখন যেরূপেই হউক স্ত্রীর দীক্ষা হইবে।

"অতঃপর জন্মাষ্টমীর দিবস প্রাতে আমরা সকলে শৌচ ও স্নানাদি করিয়া আসিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাকে বলিলেন, বাজার হইতে নূতন বস্ত্র, তুলসীকাষ্ঠের মালা এবং গোপীচন্দন আনিতে হইবে; অদ্য তোমাদের দীক্ষা হইবে। আমি এই কথা শুনিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে টাকা আনিতে ঘরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমিও দীক্ষা গ্রহণ করিব। আমার জন্যও কাপড় এবং মালা আনিবে।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি না বলিয়াছিলে আর দীক্ষা গ্রহণ করিবে না?" তিনি বলিলেন, "আমার পুনরায় তো দীক্ষা নিবার ইচ্ছা ছিল না সত্য, কিন্তু আজ প্রাতঃকাল হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কেমন এক আবেগ আমার ভিতর হইতে আসিয়াছে। তুমি যখন দীক্ষা গ্রহণ করিবে, তখন আমিও গ্রহণ করিব।"

"তখন আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের মহিমা চিন্তা করিতে করিতে বাজারে গেলাম এবং এক জোড়া নূতন বস্ত্র, দুইটি তুলসীকাষ্ঠের মালা এবং কিছু গোপীচন্দন লইয়া আশ্রমে আসিলাম। পরে পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাকে দীক্ষা দান করিলেন। প্রথমে একটি মন্ত্র আমার কর্ণকুহরে তিনবার উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, এই মন্ত্র সচরাচর জপ করিবে। পায়ে জুতা রাখিয়া ইহা কখনও জপিবে না। এই মন্ত্র আমাকে অর্পণ করিয়া পুনরায় আর একটি মন্ত্র, যাহা পূর্ব্বে কলিকাতায় ছাদের উপর আবির্ভূত হইয়া আমাকে দিয়াছিলেন বলিয়াছি, সেই মন্ত্রটি পুনরায় আমার কর্ণকুহরে উচ্চারণ করিয়া উপদেশ করিলেন। কিন্তু এই মন্ত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া দিলেন যে "ইহার জপ করিতে হইবে না, ইহা

কালক্রমে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিবে, ইহার জপ আপনা হইতেই হয়, করিতে হয় না।" আমার দীক্ষার পর আমার স্ত্রীকেও দীক্ষা দিলেন, কিন্তু আমার উভয় মন্ত্র হইতে তাঁহার মন্ত্র পৃথক্‌। আমার সাক্ষাতেই তাঁহার দীক্ষা হইল। এইরূপে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কৃপালাভ করিয়াছি।"

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বাংলা ১৩০১ সনের ৯ই ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর দিন। ইং ১৮৯৪ সাল, ২৫শে আগষ্ট) চৌরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ও চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণবের আচার্য্য মহন্ত পূর্ণজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের নিকট পূর্ণ দীক্ষালাভ করেন। জন্মাষ্টমীর দু' একদিন পরেই ব্রজপরিক্রমা আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উভয়েই তাঁহাদের গুরুদেবের সঙ্গে এইবার পরিক্রমায় গেলেন। পরিক্রমা শেষ হইলে আশ্রমে আরও কয়েকদিন বাস করিয়া গুরুদেবের অনুমতি লইয়া পূজার ছুটির শেষভাগে উভয়ে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

উকিলরূপে

শ্রদ্ধেয় দেশনেতা ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার আত্ম-জীবনীতে (Memories of My Life and Times P 321) একস্থলে লিখিয়াছেন —'Though his practice was not as large as that of some of his contemporaries in the Calcutta High Court, he was recognised as one of the very best lawyers in the profession, taking his place in the estimates of many of those who worked with him, only next to that of Sir Rash Behari Ghosh But financially he did not succeed as well as some other vakeels in the front rank of the profession And the reason was that Tara Kishore never allowed his legal work to interfere in any way with the regular pursuit of his religious duties".

"তাঁহার সমসাময়িক উকিলগণের কাহারও কাহারও মত অত বেশী পসার তাঁহার না থাকিলেও, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিগণের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য হইতেন এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণের অনেকের মতে উকিল হিসাবে সার রাসবিহারী ঘোষের পরেই ছিল তাঁহার স্থান। কিন্তু উপার্জ্জন বিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য ব্যবহারজীবিগণের কাহারও কাহারও মত সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই যে ওকালতি কার্য্যের জন্য তিনি কখনই তাঁহার নিত্য নিয়মিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতে দিতেন না।"

এইস্থলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে উকিল হিসাবে কয়েকটি কথাই বলা হইয়াছে, তাহা একে একে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ তৎকালীন অনেক শ্রেষ্ঠ উকিলগণের মতে উকিল হিসাবে তাঁহার স্থান একমাত্র সুবিখ্যাত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের পরেই ছিল, একথা অত্যুক্তি নহে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাতাশ বৎসরকাল ওকালতি করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম হইতে তাঁহার সহিত একত্রে কাজ করিয়াছেন, এরূপ প্রাচীন উকিল বড় কেহ এক্ষণে জীবিত নাই, দু' একজন যাঁহারা আছেন তাঁহারা একান্ত বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত অসমর্থ। সুতরাং এরূপ কাহারও অভিমত সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। অপেক্ষাকৃত পরে যাঁহারা ওকালতি আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে অন্ততঃ দশ পনের বৎসরকাল উকিলরূপে দেখিয়াছেন ও অধিকন্তু তাঁহার সহিত সুপরিচিত ছিলেন, এরূপ যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মতকেই আমরা স্বর্গীয় দেশনায়ক পাল মহাশয় বর্ণিত "estimates of many of those who worked with him" (তাঁহার সহকর্ম্মীদের অনেকের মত) বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কয়েকজনের অভিমত পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ও মহামান্য ভারত গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব আইন-সচিব (ল-মেম্বার) মাননীয় সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৪৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'শ্রীসুদর্শন' পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইবার আমার প্রথম সুযোগ ঘটে। আমি তখন কলিকাতা হাইকোর্টে উকিল হইবার জন্য শিক্ষানবিশী করি, তখনকার সরকারী উকিল খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র মহাশয়ের

নিকটে. * * * তারাকিশোরবাবু তখন বার বৎসরের উকিল। নোয়াখালি নিবাসী আমার একজন বাল্যকালের সহপাঠী মুসলমান বন্ধু তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি লইয়া একটা মোকদ্দমার সূচনা হওয়ায় ঢাকার সুবিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় ও পূর্ব্ববঙ্গের অপরাপর কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ উকিলের অভিমত সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় ডাঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের অভিমত লইবার জন্য আসিয়া আমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। মুসলমান আইনের কয়েকটি জটিল প্রশ্ন সংঘটিত বিসংবাদ—ব্যাপারটা কিছু বেশী গোলমাল-সংযুক্ত ; প্রশ্নগুলির উত্তর তত সহজসাধ্য নহে। রাসবিহারী বাবু নিজের অভিমত দিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা অন্য কাহারও অভিমত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি কিনা। তদুত্তরে বলিলাম যে, আমরা তাঁহার মন্তব্যের উপরই নির্ভর করিয়া কার্য্য করিব, বিশেষতঃ যখন তাঁহার অভিমতের সহিত অপর কয়েকজনের অভিমতের মিল হইয়াছে। তাহাতে তিনি আমাদিগকে উপদেশ দেন যে, আমাদিগের উচিত তারাকিশোরবাবুর সহিতও পরামর্শ করা ; কারণ তারাকিশোরবাবু মুসলমানী আইনে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি আরও এই কথা বলিলেন যে, যদি তারাকিশোরবাবুর অভিমত অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে তিনি নিজের অভিমত সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিবেন। এই কার্য্যোপলক্ষে আমি আমার ঐ বন্ধুসহ তারাকিশোর-বাবুর বাটীতে যাই ও তাঁহার সহিত পরিচিত হই। প্রথম পরিচয়ে তাঁহাকে মাত্র একজন বড় উকিল বলিয়াই বুঝিলাম, কিন্তু তাঁহার ভিতরে আইনের জ্ঞান ভিন্ন অপর কোনও বড় জিনিষ আছে কিনা, তাহা বুঝিবার কোনও সুযোগ হয় নাই, ক্ষমতাও ছিল না।

"রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনেক সময়ে আমাকে বলিয়া দিতেন যে,

অমুক এজলাসে অমুক উকিল সওয়াল জবাব করিতেছেন, তাহা যেন আমি শুনি, এবং এইভাবে তারাকিশোরবাবুর বক্তৃতা শুনিবার জন্যও অনেক সময়ে বলিতেন। এইরূপে আমার শিক্ষানবিশীর সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আমি উকিল হইলাম। উকিল হইয়া যখন আমি উকিল লাইব্রেরীতে স্থান পাইলাম তখন হইতে তারাকিশোরবাবুকে আরও বেশীক্ষণ ও বেশী লক্ষ্য করিয়া দেখিবার সুযোগ হইল। লাইব্রেরীতে যে স্থানে আমি বসিতাম ঠিক তাহার সম্মুখেই কিছুদূরে তিনি বসিতেন ও আদালতে কাজ না থাকিলে লাইব্রেরীতে বসিয়াই পড়াশুনা, কাগজ দেখা বা নিজের অন্যান্য কাজ করিতেন।

"তারাকিশোরবাবুর পসার-প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উকিলদিগের মধ্যে তিনি আরও উচ্চস্থান অধিকার করিলেন, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর একজন উকিল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ওকালতির বক্তৃতা যাঁহারা শুনিতেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেন যে, যুক্তিগুলি অতি সুন্দরভাবে তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী যথাযথভাবে সাজাইয়া অপরের নিকট উপস্থিত করিবার একটা বিশেষ রকম ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তদুপরি তাঁহার বুদ্ধির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা, চিন্তার গভীরতা এবং চিত্তের একাগ্রতা, এই গুণগুলি একত্রিত হইয়া তাঁহার কর্মজগতের সকল প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিত। ওকালতি কার্য্যে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন; মোকদ্দমার কাগজগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়া ও তৎসন্নিহিত বিষয়গুলি বিশেষ যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ ও যথাযথভাবে অনুধাবন করিয়া আবশ্যকীয় বৃত্তান্তগুলি লিখিয়া রাখিতেন। সুতরাং কার্য্যকালে তাঁহাকে কোন কথা বলিয়া বা স্মরণ করাইয়া দিবার কোনই আবশ্যক হইত না। যদি কেহ তাঁহাকে উকিল হিসাবে লক্ষ্য

করিয়া দেখিতেন বা তাঁহার ওকালতির কার্য্যকলাপের বিষয় সমালোচনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন যে, তিনি একজন বড় দরের পরিশ্রমী, বিদ্বান্, জ্ঞানী ও কার্য্যক্ষম উকিল ওকালতি ভিন্ন যে তাঁহার মধ্যে আর কিছু থাকিতে পারে বা থাকিবার স্থান আছে ইহা তাঁহার ওকালতির কার্য্য দেখিলে বোধ হইত না।

"আমার মনে আছে, একটি দেওয়ানী মোকদ্দমায় আমি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সহিত কাজ করি ও সেই মোকদ্দমায় অপর পক্ষে ছিলেন তারাকিশোরবাবু। মোকদ্দমাটা একটা খাস (Second) আপীল, অর্থাৎ সে আপীলে আইন-ঘটিত কোনও কথা না থাকিলে ফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। তারাকিশোরবাবু ছিলেন আপীলাণ্টের পক্ষে। মোট কথা এই যে, তিনি নিম্ন আদালতের রায়ে আইন-ঘটিত কোনও দোষ বা ভ্রম সাব্যস্ত করিতে না পারিলে আমরাই জয়লাভ করিব। আমরা এরূপ কোনও দোষ বা ভ্রম পাই নাই। কিন্তু আমাদের পরামর্শ শেষ হইলে রাসবিহারীবাবু বলিয়াছিলেন, 'নাই ত কিছু বলিয়াই বোধ হইতেছে, কিন্তু অপর পক্ষে তারাকিশোর আছে'।"

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত পত্রিকার ১৩৪৪ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় লিখিয়াছেন, "তিনি উদাসীন প্রকৃতি হইলেও ওকালতি কার্য্য যাহা করিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ও পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন ও অধিক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিগণই তাঁহার গুণের ও শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতেন। একটি হিন্দু আইন-সংক্রান্ত জটিল মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত তারাকিশোরবাবু আপীলাণ্ট পক্ষে উকিল ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় প্রতিপক্ষের উকিল ছিলেন।

কয়দিন যাবৎ উভয় পক্ষের বক্তৃতা শ্রবণান্তে ঐ মোকদ্দমায় আপীলাণ্টের জয়লাভ হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমার শুনানীর সময়ে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবু অনেকের নিকট বলিয়াছিলেন যে,—'এই কঠিন মোকদ্দমায় তারাকিশোর আপীলাণ্ট পক্ষে যেরূপ সুন্দর সওয়াল জবাব করিয়াছে, এ কাজে আমাকে নিযুক্ত করিলে আমিও সেরূপ করিতে পারিতাম না'।"

"তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সময়ে তর্কশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন করিয়াছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি তাহার সমধিক ফল পাইয়াছিলেন। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চিন্তার গভীরতা এবং চিত্তের একাগ্রতা তাঁহার সমস্ত কাজই সহজ করিয়াছিল। তিনি মোকদ্দমার কাগজ-পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িতেন এবং আবশ্যকীয় সমস্ত বৃত্তান্ত মোকদ্দমার কাগজের উপর টুকিয়া রাখিতেন। বৃত্তান্তের অনুধাবন বিষয়ে তাঁহার যেরূপ নিপুণতা ছিল, আইন সম্বন্ধেও তাঁহার তদ্রূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। একাধারে এই দুইটি গুণের সংযোগ থাকায় ওকালতি ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি যখন যে কাজ হাতে লইতেন, তাহা সম্পূর্ণ মনঃসংযোগের সহিত করিতেন এবং সেজন্য সকল লোক তাঁহার অনুরক্ত হইত।

"তিনি উন্নত চরিত্র ও কর্মকুশলতার বলে উকিল সমাজের স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা হেতু তিনি হাইকোর্টের জজদিগের অনুরাগ ও অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত নরিস সাহেবের কোর্টে তাঁহার অনেকগুলি মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল। তিনি বৃন্দাবন যাইবার প্রয়োজন জানাইয়া শ্রীযুক্ত জজ বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যেন তাঁহার মোকদ্দমাগুলির শুনানী না হয়। শ্রীযুক্ত জজ সাহেব আদর করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—'তারাকিশোর!

তুমি চলিয়া গেলে আমরা কি করিয়া কাজ করিব?' জজ সাহেব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।"

এই জজ সাহেবটির সম্বন্ধে একটি ঘটনা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিজমুখ হইতে শুনিয়াছি। ইনি একটু রুক্ষ স্বভাবের লোক ছিলেন, বাজে কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিলে চটিয়া যাইতেন এবং জুনিয়ার উকিলেরা অনেক সময় এরূপ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মাঝে মাঝে ধমকাইতেন। যেদিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইঁহার এজলাসে প্রথম কাজ করিতে গেলেন, সেদিন তিনি উঠিয়া সওয়াল আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই নরিস সাহেব অযাচিতভাবে তাঁহাকে কতকগুলি উপদেশ দিলেন—কি করিয়া উপযুক্তভাবে বিচারকের নিকট নিজের বক্তব্য বলিতে হয়, জুনিয়ার উকিলেরা সাধারণতঃ কিরূপ বাজে কথা বলিয়া সময় নষ্ট করেন, তাহাতে আদালতের মূল্যবান্ সময় নষ্ট হয়, অথচ কাজ অগ্রসর হয় না; সেজন্য তাহা কিরূপ বিরক্তিজনক, এই সকল বিষয়ে প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া ঝাড়া বক্তৃতা দিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নীরবে সকল কথা শুনিলেন, তারপর উঠিয়া সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেন, "But, my Lord, you have not heard a word of my case as yet" (কিন্তু, হুজুর, আপনি আমার বক্তব্যের একটি কথাও ত এখনও শুনেন নাই)। তিনি তখন নূতন উকিল, একজন জুনিয়ারের নিকট হইতে এইরূপ জবাব পাইয়া সাহেব স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, বিচারকদ্বয়ের অন্যতর সাহেব মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে লাগিলেন। এইরূপে অপ্রতিভ হইয়া নরিস সাহেব আর কোন কথা কহিলেন না। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও অতিশয় দক্ষতার সহিত সংক্ষেপে সকল কথা যেটির পর যেটি হইলে ঠিক্ হয়, তেমনিভাবে গুছাইয়া নিজের বক্তব্য অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিলেন। অল্পের মধ্যে

যুক্তিযুক্তভাবে সকল কথা গুছাইয়া বলিবার যে একটি বিশেষ ক্ষমতা তাঁহার ছিল, ইহা শুধু সার মন্মথনাথ নহেন, সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন। নরিস সাহেব তাঁহার তেজস্বিতা দেখিয়া এবং নিজে যেমনটি চান, ঠিক্ তেমনি ধরণের কাজ তাঁহার নিকট পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। নিজে অত্যুৎসাহবশতঃ অনুপযুক্তস্থলে ঐরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন ভাবিয়া লজ্জিতও হইলেন ও তদবধি তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। পরে ক্রমে তাঁহার অন্যান্য গুণের ও চরিত্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "ওকালতি কার্য্যে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন।" তাঁহার কার্য্য দেখিয়া বাহিরের লোকে সকলেই এইরূপ মনে করিতেন, কিন্তু তাঁহার পারিবারিক জীবনের সহিত যাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, বাড়ীতে অল্প সময়ই তিনি ওকালতির কার্য্যে দিতে পারিতেন। সন্ধ্যার পর আর ব্যবসায়ের কার্য্য করিতেন না—সকালে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কাজ করিতেন। ইহার রহস্য এই যে, মক্কেলের কাজের জন্য তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়া প্রচুর শ্রমস্বীকার করিতেন, তজ্জন্যই তাহাতে সময় বেশী লাগিত না। স্বভাবতঃ তিনি তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী ছিলেন, তদুপরি সাধনফলে তাঁহার চিত্ত একাগ্র হইয়াছিল। ইহার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করিবার তাঁহার এক আশ্চর্য্য শক্তি জন্মিয়াছিল। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "পাতঞ্জল দর্শন অধ্যয়নের ফলে আমার আইনজ্ঞানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।" মৈমনসিংহ সহরের শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নিয়োগী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, "একদিন তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া কাগজপত্র বিছান রহিয়াছে দেখিলাম। তিনি

কতকগুলি নথিপত্র হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতেছেন।” এরূপ অনেকেই দেখিয়াছেন। এইরূপই তাঁহার অভ্যাস ছিল—ইহাতেই তাঁহার মামলা তৈয়ারী হইয়া যাইত। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে জটিল সমস্যাগুলিরও সমাধান হইয়া যাইত। তিনি নিজে এক সময়ে এসম্বন্ধে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “শ্রীভগবানই কৃপা করিয়া এইরূপ করিয়া দিতেন, বাবা; নতুবা সময়ে কুলান আমার অসাধ্য হইত যে।” প্রবীণ উকিল বর্ত্তমানে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাম্পরিপোর্টার শ্রীযুক্ত রামতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ওকালতি ত্যাগের প্রাক্কালে রাসবিহারীবাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “কারাকিশোর, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, তিন চার লাখ টাকা লইয়া যাইতে পারিবে। আমি আর বেশীদিন কাজ করিব না।” বাস্তবিক ওকালতিতে রাসবিহারীবাবুর পরে তাঁহার সমকক্ষ উকিল আর কেহ ছিলেন না একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

আইনজ্ঞান, ওকালতি-প্রতিভা ও শক্তিমত্তা বিষয়ে যাঁহারা উকিল হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না, এমন কয়েকজন তাঁহার অপেক্ষা অধিক পসারসম্পন্ন ও উপার্জ্জনশীল ছিলেন। দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এ বিষয়ে যে কারণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আংশিক কারণমাত্র। ইহার বাস্তবিক কয়েকটি হেতু ছিল। শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজী মহারাজের শিষ্য তদানীন্তন হাইকোর্টের অন্যতম উকিল (এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, ওকালতি করেন না) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র খাঁ মহাশয় লিখিয়াছেন, “তিনি যখন ওকালতি করিতেন, তখন তাঁহার চেয়ে বেশী পসারসম্পন্ন উকিলকে কেহ মোকদ্দমা দিতে গেলে তাঁহাদের প্রায় সকলেই পারিশ্রমিক না লইয়া মোকদ্দমার কাগজ

দেখিতেন। কিন্তু তারাকিশোরবাবুর সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে, তাঁহার নিকট কোন মক্কেল মোকদ্দমার কাগজ লইয়া গেলে তিনি পারিশ্রমিক না লইয়া মোকদ্দমার কাগজ দেখিতেন না (অর্থাৎ শুধু কাগজ দেখিবার জন্যই একটি আলাদা ফি লইতেন)। আপীলের বা মোশনের জন্য কাগজ দেখিয়া যদি মনে করিতেন যে, মোকদ্দমা চলিবে, তবে সে মোকদ্দমা লইতেন, নতুবা লইতেন না। আর তাঁহার চেয়ে বেশী পসারসম্পন্ন অনেক উকিল যে ফি নিতেন, তিনি তদপেক্ষা বেশী পারিশ্রমিক লইতেন (অর্থাৎ উচ্চহারে 'ফ লইতেন)। এই দুই কারণে তাঁহার পসার বেশী হয় নাই।" শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় যে কারণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও সত্য, ওকালতির কার্য্যে তিনি অল্প সময়ই দিতেন, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই তাঁহার অধ্যাত্মচিন্তায় অতিবাহিত হইত, সে দিকের ক্ষতি করিয়া ব্যবসায়ের কাজ বাড়াইতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। স্বরচিত তাঁহার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থে তিনি এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে পরে যথাস্থানে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিব। এতদ্ব্যতীত কোন মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া বুঝিলে তিনি কখনই তাহা লইতেন না এবং অনেক বিপন্ন দরিদ্র ব্যক্তির কার্য্য তিনি বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দিতেন। এই সকল কারণে তাঁহার যোগ্যতানুরূপ পসার ও উপার্জ্জন হইত না। শেষের দিকে বিশেষতঃ ১৩২২ সালে (১৯১৫ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার বিপুল পসার ও উপার্জ্জন হইয়াছিল, কিন্তু এই অবস্থাতেই তিনি ওকালতি ও সংসার ত্যাগ করেন।

এ যাবৎ যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে তাঁহার ওকালতি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু উকিলরূপে তাঁহার পরিচয় দিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। উকিলরূপে তাঁহার চরিত্র তাঁহার এই প্রতিভা

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা, তাঁহার অসাধারণ সততা। অনেকে মনে করেন, মিথ্যার আশ্রয় না লইলে ওকালতি করা যায় না, মিথ্যা মামলা বাদ দিতে গেলে "ঠক্ বাছ্‌তে গাঁ উজাড" হয়,—ব্যবসা চলে না, মক্কেল পাইলে তাহার দাবী ন্যায্য কি অন্যায্য তাহা বিচার্য্য নহে, নির্ব্বিচারে যে কোন প্রকার যুক্তি দিয়াই হউক তাহার পক্ষ সমর্থন করাই উকিলের কাজ। এ সকল ধারণা যে সত্য নহে, তাহার প্রমাণ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের জীবন হইতে পাওয়া যায়।

যশোহর জিলার নলদী গ্রামের জমিদার ৺রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়দিগের রামলাল মিত্র নামে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি খুব বৃদ্ধাবস্থায় এখনও জীবিত আছেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার ওকালতি কালের শেষের দিকে যখন একাদিক্রমে চার পাঁচ বৎসর রজনীবাবুদের এষ্টেটের বাঁধা উকিলরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সময় ইনি তাঁহাদের মোকদ্দমাদির তদ্বিরকারক ছিলেন। রামবাবু বলিয়াছেন, "চারি পাঁচ বৎসর এই এষ্টেটের কাজ লইয়া তাঁহার নিকট আমার প্রায় সর্ব্বদাই যাইতে হইত, কারণ আমাদের দু' চারিটি মামলা হাইকোর্টে সর্ব্বদাই থাকিত। প্রথম যেদিন কাগজ দেখাইতে তাঁহার নিকট গেলাম, সেদিনকার তাঁহার প্রথম কথাটি আমার বিশেষ-রূপে স্মরণ আছে। কাগজ হাতে লইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মোকদ্দমায় কোনরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা আছে কিনা? আমি উত্তর করিলাম, 'এই মোকদ্দমায় আছে কিন্তু আমাদের পক্ষে নাই।' তখন আর কোন কথা না বলিয়া কাগজ উল্টাইতে লাগিলেন। পরে দেখিয়াছি এটি তাঁহার অভ্যাসগত ছিল। কোন মোকদ্দমা লইয়া মক্কেল উপস্থিত হইলে প্রথমেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ওরূপ প্রখর ব্যক্তিত্বশালী তেজস্বী লোকের সামনে দাঁড়াইয়া তাহা মিথ্যা কথা

বলা সহজ নহে, সুতরাং সাজান অসত্য মোকদ্দমা লইয়া যাহারা আসিত অথবা যাহাদের পক্ষে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি থাকিত, তাহারা এই প্রশ্নে থতমত খাইয়া যাইত, স্বচ্ছন্দে উত্তর দিতে না পারিয়া আমতা আমতা করিত। তাহাদের সেই ভাব দেখিয়া ও কাগজদাষ্ট মিথ্যা মামলা তিনি ধরিয়া ফেলিতেন এবং কাগজ ফিরাইয়া দিতেন। এইরূপ ভাবে মামলা ফেরত দিতে আমার চোখের সামনে আমি অন্ততঃ আট দশ বার দেখিয়াছি।" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটেও শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মিথ্যা মামলা কখনই নিতেন না—যত মক্কেল আসিত সকলের কাজ নিলে অপরিমিত টাকা হইত।

আর একটি কথা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছি। কোন মামলা সম্পর্কে স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে যত নজীর পাওয়া সম্ভব, তাহা সাধারণতঃ বিচারকেরা অবগত থাকেন না উভয় পক্ষের উকিলগণই তাহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করেন। সচরাচর এরূপ হয় যে, কোন বড় আইনজ্ঞ উকিল দেখিলেন যে, প্রতিপক্ষের উকিল স্বপক্ষে যে নজীর আছে, তাহার সমস্ত বলিতে পারেন নাই এবং বিচারকও তাহা অবগত নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সাধারণতঃ সে কথার আর উল্লেখ করেন না, নিজের পক্ষের কথাই মাত্র বলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কখনই এ রকম করিতেন না। বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে নিজের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে যাহা কিছু বলিবার আছে, তৎসমস্তই বলিতেন, এবং অনন্তর আপাতবিরুদ্ধ নজির গুলি যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি যখন সওয়াল জবাব করিতেন, তখন সমস্ত প্রাণমন দিয়া করিতেন। সাধারণ উকিলগণের ন্যায় অর্থের বিনিময়ে ব্যবসায়ের কাজ করিবার মত করিয়া করিতেন না। এই জন্যই যে তর্কটি তাঁহার



[illegible]

মনঃপূত নয়, সেরূপ তর্ক তিনি করিতে পারিতেন না। শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর লিখিত আর একটি কথা অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়াছি *। তাহা হইতে দেখা যায় মক্কেলের কাজও তিনি ভগবৎসেবা মনে করিয়াই করিতেন। এইজন্য এবং অসত্য মোকদ্দমা লইতেন না বলিয়া, নিজের যুক্তিব ন্যায্যতাসম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় ধারণা থাকিত এবং এই দৃঢ় ধারণা থাকিত বলিয়াই, বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের সকল কথা সরল ও সহজভাবে বিচারকেব নিকট প্রকাশ করিতে দ্বিধা কবিতেন না। নিজেব পক্ষ অন্যায্য জানিয়াও, পয়সার জন্য মক্কেলের হইয়া তর্ক কবিতে হইলে এরূপ কখনই করা যায় না। ইহার আর একটি ফল হইত। তিনি এই প্রণালীতে সওয়াল জবাব করায় বিচারক-দিগের অনেক সময় বিশেষ সুবিধা হইত এবং এজন্য জজেরা অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন।

যে মোকদ্দমা চলিবে না বলিয়া বুঝিতেন, কেবল অর্থলাভের জন্য সে মামলা তিনি যে লইতেন না, ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোক্ত রামলাল মিত্র মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "একদিন এষ্টেটের কাজে তাঁহার ওখানে গিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, তিনি নিজের টেবিলে কাজ করিতেছেন, এমন সময় ঢাকা জিলার একজন লোক (নাম ভুলিয়া গিয়াছি) আসিয়া আড়াইশত টাকা ও কতক-গুলি নথিপত্র দিয়া গেলেন। এই সময়ে মামলাসম্বন্ধীয় কাজের জন্য তারাকিশোরবাবুর ওখানে আমার রোজই যাইতে হইত। দুই একদিন পরেই দেখি সেই ব্যক্তি আবার উপস্থিত হইলে উনি তাহার কাগজ ও দুইশত টাকা ফেরত দিয়া বলিলেন, 'এ মামলায় কিছু নাই। এ মামলা চলিলে আপনি হারিয়া যাইবেন, সুতরাং আপনার

* ১৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মোকদ্দমা আমি লইব না। আপনার কাগজ দেখিতে আমার যে সময় গিয়াছে তাহার জন্য আড়াইশত টাকা নিতে পারি না। তাহার উপযুক্ত মূল্য পঞ্চাশ টাকা'।"

ইনি আরও বলিয়াছেন, "একবার আমাদের একটি বড় মোকদ্দমায় তাঁহার দৈনিক ফি প্রত্যহ দিয়া পারিয়া উঠিব না মনে করিয়া তাঁহার সহিত একটি চুক্তি করি। কথা হয় যে, মোকদ্দমায় যতদিনই লাগুক আমরা তাঁহাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ মোট চারি হাজার টাকা দিব, তিনি তাহাতে সম্মত হন। পরে কার্য্যকালে দেখা গেল যে যতদিন লাগিবে বলিয়া প্রথমে আমরা অনুমান করিয়াছিলাম, মোকদ্দমাটি তত সহজে শেষ হইল না, তদপেক্ষা অনেক বেশী দিন আমাদের মামলার জন্য তাঁহার খাটিতে হইল। তখন আমরা লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। আমার মনিব (৺রজনীবাবু) আরও দুই হাজার টাকা তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই উহা লইতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, 'একবার যে কথা ঠিক হইয়াছে, তাহার অন্যথা করা যাইতে পারে না।' তিনি যে রকম দৃঢ়চিত্ত লোক, যাহা একবার বলিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করা যাইবে না বুঝিয়া আমরা এক কৌশল অবলম্বন করিলাম। এই সময়ে বৃন্দাবনে তিনি ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে-ছিলেন। ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ঠাকুরের নাম করিয়া দিতে চাহিলে তিনি আর 'না' বলিতে পারিলেন না। এইরূপে আর দুই হাজার টাকা দেওয়া হইল।

"লোকে মামলা মোকদ্দমা করুক, স্বয়ং উকিল হইয়াও ইহা তিনি চাহিতেন না। সম্ভব হইলেই বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসা ঘটাইবার চেষ্টা করিতেন। পক্ষকে মামলা মিটাইয়া ফেলিবার উপদেশ দিতে এবং স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দিতে

তাঁহাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। সন্ধ্যার পর মক্কেলের কাজ করিতে আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই।"

এক সঙ্গে অনেক মামলা তিনি হাতে লইতেন না। অধ্যাত্মচিন্তার ও সাধন ভজনের ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় এবং বেশী কাজ নিলে সকল কাজে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারিবেন না বলিয়া এরূপ করিতেন। যে কাজ হাতে লইতেন, অখণ্ড মনোযোগ দিয়া তাহা করিতেন। 'মক্কেল-রূপী ভগবানের সেবা করিতেছি' এই বুদ্ধিতে মক্কেলের কাজ করিতেন বলিয়া ইহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। প্রবীণ উকিল, বর্ত্তমানে হাইকোর্টের ষ্ট্যাম্প রিপোর্টার শ্রীযুক্ত রামতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "তিনি বেশী case পাইলে রাখিতেন না—proper attention (উপযুক্ত মনোযোগ) দিতে পারিবেন না বলিয়া অনেক মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিতেন। আমি তখন জুনিয়ার উকিল, এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও আমার হয় নাই, এরূপ অবস্থায়, কি ভাবে জানি না আমার উপর তাঁহার একটু আস্থা জন্মিয়াছিল। তিনি মনে করিতেন, মক্কেলের কাজে আমি যথাসাধ্য মনোযোগ দিই, শৈথিল্য করি না। ইহার ফলে তিনি মধ্যে মধ্যে চিঠি দিয়া আমার নিকট মক্কেল পাঠাইয়া দিতেন। ফৌজদারী মামলা করিতে তিনি পছন্দ করিতেন না। আমাকে যে সকল case পাঠাইতেন, তা সবই ফৌজদারী আপীল।"

অনেক গরীব লোকের মোকদ্দমা তিনি বিনা পারিশ্রমিকে করিতেন। এক ব্রাহ্মণ খুনী মামলায় পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন ও তাঁহার চেষ্টায় পরে অব্যাহতি লাভ করেন। ইনি অনেক টাকা তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এক পয়সাও লন নাই, বলিয়াছিলেন "আপনার যে প্রাণরক্ষা হইল, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট। আপনার টাকা আমি চাই না।" এই ঘটনা বাবাজী মহারাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অন্নদাকিশোর

চৌধুরী মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, "দাদার কাছে কখনও শুনি নাই যে অমুক মামলাটায় আমি জিতিয়াছি।" তিনি সেবা-বুদ্ধিতে নীরবে নিজের কার্য্য করিয়া যাইতেন মাত্র, অর্থ অথবা সম্মান কিছুরই দিকে লক্ষ্য করিতেন না। কাগজ দেখিবার জন্য আলাদা ফি লইবার নিয়মও তাঁহার ঠিক 'অপরিবর্ত্তনীয়' ছিল না, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাও লইতেন না।

উকিলরূপে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্রের আর একটি দিক আছে। তাহা বড়ই মধুর ও চিত্তাকর্ষক। শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন—"হাইকোর্টে আসিয়াও তিনি তাঁহার শিক্ষকতা জীবনের সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখানেও প্রায় পাঠশালা করিয়া অনেক নব্য উকিলকে কাজ শিখাইতেন। তাঁহার অনুগ্রহে অনেকে কর্ম্ম-জীবনে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহার জীবন হইতে সকলেই উপদেশ ও উদাহরণ পাইত। কোন নব্য উকিল কর্ত্তব্যকার্য্যে ত্রুটী করিলে তিনি তাহাকে রীতিমত শাসন করিতেন। তাঁহার উপদেশ এই ছিল যে 'কোন কার্য্যের ভার পাইলে তাহা যথাশক্তি নির্ব্বাহ করিতে হইবে তখন টাকা পাইয়াছ কি না সে বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিবে না।' তাঁহার সাহায্যে অনেক নব্য উকিলের জীবিকার সংস্থান হইত। তিনি প্রত্যেক মোকদ্দমায় কাহাকেও না কাহাকেও সহকারীভাবে নিযুক্ত করিতেন। পরন্তু অনেক সময়ে নিজ হইতেও তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি প্রকৃত অশ্বত্থবৃক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার স্নেহ ও আশ্রয় অনেকের জীবনধারণের উপায় ছিল।

"ওকালতি বৃত্তি * * * * তাঁহার ধর্ম্মভাবকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। বরঞ্চ তিনি হাইকোর্টে নূতন একটি ভাবের সঞ্চার

করিয়াছিলেন। সেজন্য অনেকে তাঁহার নিকট ঋণী। হাইকোর্টের লাইব্রেরীতে তিনি কার্য্যতঃ একটি সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। কাছারীর কাজের মধ্যে বা শেষে যে সময় তাঁহার অবকাশ থাকিত, তাহা সৎ-প্রসঙ্গেই কাটিত। তাঁহার উপদেশ ও আদর্শে অনেকের মনে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, ইহাতে অনেকে ওকালতির শুষ্ক তর্ক ও বৈষয়িক তাড়নার মধ্যেও প্রীতি ও শান্তির আস্বাদ পাইতেন। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং হাইকোর্টে ও তাহার বাহিরে তাঁহার সহিত সৎপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন। নব্যতন্ত্রের অনেক ব্যক্তিও তাঁহাদের সঙ্গের এবং সৎপ্রসঙ্গের ফল পাইতেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের প্রভাবে অনেকের মনে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা সংসারের তাড়নার মধ্যেও শান্তিরসাস্বাদের সুযোগ পাইয়াছিলেন।"

সার মন্মথনাথও লিখিয়াছেন, "একদিন আমি দুইজন বিচারকের সমক্ষে একটা দেওয়ানী মোকদ্দমার সওয়াল জবাব করিতেছিলাম,—কোনও একটা বিষয় সম্বন্ধে আইনটা কি ও তাহা কিভাবে প্রযোজিত হইবে, এইরূপ একটা কথার তর্ক হইতেছিল। আমার মনে এই ধারণা ছিল যে, আমি যে কথা বলিতেছিলাম তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও তৎসম্বন্ধে কোনও বিশেষ যুক্তি-প্রমাণ বা নজিরের আবশ্যক হইতে পারে না। বিচারকেরা কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, পরন্তু আমাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, আমি আমার স্বপক্ষে কোনও নজির দেখাইতে পারি কি না। আমি একটু বিরক্ত হইয়াই উত্তর করিলাম যে, দুই আর দুই একত্র করিলে যাহা হয় তাহার আর নজির কোথায়

পাইব ? তবে যদি তাঁহারা পাঁচ হয় সাব্যস্ত করেন তাহা হইলে ঐ দিন হইতে তাঁহাদের সাব্যস্তই একটা ভাল নজির হইবে। তারাকিশোরবাবু ঐ সময়ে ঐ এজলাসে উপস্থিত ছিলেন—তখন দুইটা বাজিতে পনের বিশ মিনিট বিলম্ব ছিল। তিনি উঠিয়া লাইব্রেরীতে গমন করিলেন, পরে দুইটার সময় যখন আমি লাইব্রেরীতে গেলাম, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মোকদ্দমাটা শেষ হইয়া গিয়াছে কি না। আমি উত্তরে বলিলাম যে, আমি তখনও সওয়াল জবাব শেষ করি নাই। তিনি আমাকে বলিলেন যে, আমি যে তর্ক করিতেছিলাম তাহা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক, কিন্তু আমার কথাটা একটু রূঢ় হইয়া গিয়াছে এবং অকারণ এইরূপ রূঢ় কথা না বলিলেই ভাল হইত। কারণ মানুষ অনেক সময়ে নিজের সম্মুখে অতি নিকটে অবস্থিত জিনিষও দেখিতে পায় না, বা অতি সহজ বিষয়ও উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং তজ্জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। এই পনের বিশ মিনিট মধ্যে তিনি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক দেখিয়া রাখিয়াছিলেন ও সেগুলি বিচারক-দ্বয়কে দেখাইবার জন্য আমাকে পরামর্শ দিলেন।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ওকালতি সম্বন্ধে সম্ভবতঃ অনেক কথাই বলিবার আছে যাহা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। উপসংহারে একটি কথা মনে হয়। যখন জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন কখনও বা নিজে আসিয়া, কখনও ভক্ত জ্ঞানী মহাপুরুষ-গণকে প্রেরণ করিয়া তত্তৎযুগের প্রয়োজনানুসারে ঈশ্বর জগতে ধর্ম্ম-সংস্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই ধরণের মহাপুরুষ ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। উত্তরকালে বঙ্গসন্তানগণই বিশেষভাবে তাঁহার কৃপা-প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক কারণে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। বর্ত্তমানে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাঁহাদের ধর্ম্ম

বিষয়ে কথঞ্চিৎ অনুসন্ধিৎসা জন্মিয়াছে (সৌভাগ্যক্রমে ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে), তাঁহাদিগের একটি বিশেষ প্রয়োজন এই যে, তাঁহারা সকল কথাই যুক্তির সাহায্যে বুঝিয়া লইতে চাহেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে যাহা সুপ্রতিষ্ঠিত নহে, তাহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালী বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। অপর পক্ষে বিশ্বাসপূর্ব্বক সাধন ও আচরণ না করিতে পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের অন্য কোন পন্থাও নাই। বস্তুতঃ বুঝিয়া লইতে পারিলে দৃঢ় বিশ্বাস করিবার পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মবিষয়ক নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ও তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের ও তাঁহাদের অনুগামী এক বৃহত্তর সমাজের যে সকল বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তিনি যুক্তিমূলে তৎসমস্তেরই সুন্দর সমাধান করিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত তরুণসমাজের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ* এখন সুপ্রসিদ্ধ, ইহার পাঠকবর্গ সকলেই অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের যুক্তি সমূহ কিরূপ হৃদয়গ্রাহী, সূক্ষ্ম ও সারবান্। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া অসংখ্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অনেক সন্দেহের নিরসন হইয়াছে, বহু প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে, ধর্ম্মসাধনের উৎসাহবৃদ্ধিরও পথ সুগম হইয়াছে। এজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার শিষ্য অথবা শিষ্য নহেন এরূপ অসংখ্য বাঙ্গালী আজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। ওকালতি করা কালে যে সূক্ষ্ম তর্ক করিবার ও নিজস্ব বিশিষ্ট প্রণালীতে যুক্তিসমূহ সাজাইয়া উপস্থাপিত করিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল, তদ্দ্বারা এই বিষয়ের বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল মনে হয়।"

* ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা, দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, গুরুশিষ্য-সংবাদ, ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত, বেদান্তের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি। ইহার মধ্যে দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা তৃতীয় খণ্ড—বেদান্ত দর্শন, গুরুশিষ্য সংবাদ ও জীবন-চরিত এই তিনখানি গ্রন্থের হিন্দী সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিবারিক ও সামাজিক জীবন

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, কায়মনোবাক্য তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিতেন, নিজের অর্থ, সামর্থ্য ও সমগ্র শক্তি সেই এক পথেই নিয়োজিত করিতেন। একথা পূর্ব্বেও একাধিকবার বলিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (বাংলা ১২৯৫ হইতে ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত) কলিকাতা বাসের সুদীর্ঘ সাতাশ বর্ষ কালের গার্হস্থ্য-জীবনের মূল কথাটি বুঝিতে হইলেও সেই একই কথা স্মরণ করিতে হইবে *।

* "Tarakishore is so made that he can never do anything by half. When he felt drawn to the Brahmo Samaj, without a moment's hesitation he threw off his Brahminical thread and started to practise, regardless of all costs or consequences every-thing that was considered right or good in the ideals and estimates of the Samaj. The same fidelity to what appealed to him as true that had drawn him to the Brahmo Samaj, drove him, a few years later back to the old Hindu orthodoxy. From an aggressive and radical Brahmo, Tarakishore became in later life a sincere Hindu, strictly following all the disciplines, physical and psycho-physical as well as social and ethical, enjoined upon every devout Brahmin by ancient Hindu law and scripture."

Memories of My Life and Times, by Bepinchandra Pal (Pp. 320-21).

যখন তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিয়া দেশে গেলেন, তৎপূর্ব্বেই তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রে অনাস্থার ভাব বহু পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল এবং আর্য্য ঋষিদের প্রতি তাঁহার চিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা আমরা জানি। অতঃপর ক্রমেই তাঁহার এই ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীহট্টে অবস্থান কালে তাঁহার চেষ্টায় তত্রস্থ হিন্দুসভার প্রাণ সঞ্চার হইল ও অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীহট্টবাসীকে চমকিত করিয়া দিয়া সে প্রাণে তরঙ্গ উঠিল— কীর্ত্তনের বন্যায় সহর ভাসিয়া গিয়া দূর-দূরান্তরের স্থানকেও রসসিক্ত করিল। তিনি হিন্দু সমাজকে ও হিন্দু সমাজ তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে আপন বলিয়া গ্রহণ করিলেন, বাহিরেও তিনি প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলেন। সেদিন তাঁহার এই ভাবের বিশেষ পরিপুষ্টি সাধিত হইল। অনন্তর তিনি অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে শাস্ত্র-

---

ইহার বঙ্গানুবাদ :—

তারাকিশোরের প্রকৃতি এরূপভাবে গঠিত যে, আংশিক ভাবে কোন কার্য্য তিনি করিতে পারেন না। তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধা না করিয়া তাঁহার উপবীত পরিত্যাগ করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি ও কলাফল অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত সমাজের আদর্শানুযায়ী যাহা কিছু ভাল ও যুক্তিযুক্ত তৎসমস্তই আচরণ করিতে লাগিলেন। যাহা তাঁহার নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইত, তাহার প্রতি যে নিষ্ঠাহেতু তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন, সেই সত্যের প্রতি নিষ্ঠা দ্বারাই চালিত হইয়া কয়েক বৎসর পরে তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় গ্রহণ করিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ও নিতান্ত চরমপন্থী ব্রাহ্ম হইতে তারাকিশোর পরবর্ত্তী জীবনে একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেন এবং তখন তিনি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রতি যে সমস্ত কায়িক ও মানসিক আচরণ এবং সামাজিক ও নৈতিক কর্ত্তব্য বিহিত আছে, তৎসমস্তই যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতেন।

চর্চ্চা আরম্ভ করেন ও তৎফলে তাঁহার শাস্ত্রবিশ্বাস আরও দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে। যিনি একদিন কাশীতে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচারে শাস্ত্রবচনকে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য করেন নাই, দেব-দর্শন করিয়া পূজা করিতে রাজী হয়েন নাই, সিদ্ধ মহাপুরুষ ভাস্করানন্দ স্বামিজীকেও অভ্রান্ত মীমাংসক-রূপে গ্রহণ করিতে চাহেন নাই তিনি যখন ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া সদ্‌গুরুলাভাশায় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন বুঝা যায় ইতিমধ্যে তাঁহার শাস্ত্র-বিশ্বাস কত গভীর ও দৃঢ়মূল হইয়াছিল। ঠিক্ কোন্ সময়ে যে শ্রুতিকে অপৌরুষেয় অভ্রান্ত সত্য বলিয়া তিনি জানিয়াছিলেন, তাহা আজ নির্ণয় করা অসম্ভব, কিন্তু এই ক্রমোন্নতির পরাকাষ্ঠা এবং এই ভাবের সত্যপ্রতিষ্ঠা হইল সেইদিন, যেদিন তিনি পূর্ণজ্ঞ ব্রহ্মর্ষিকে সদ্‌গুরু-রূপে লাভ করিলেন। তাই অতঃপর কলিকাতাবাসকালে তাঁহাকে দেখিতে পাই প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের উপদেশ ঠিক্ ঠিক্ অনুসরণ করিয়া বাহ্য ব্যবহারে আদর্শ গৃহী ও অন্তরে আদর্শ শিষ্যরূপে বৎসরের পর বৎসর দিনাতিপাত করিতেছেন।

আর শাস্ত্রও তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। গুরুকৃপায় শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম এই সময়ে তাঁহার অন্তরে প্রকটিত হইয়াছিল, শাস্ত্র-নিহিত সত্য সকল তাঁহার চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল *। কলিকাতা বাস কালেই গুরুকৃপালব্ধ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাসম্বলিত ষড়্‌দর্শন তিনি প্রকাশিত করেন।

হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, দৌলতপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা

* এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে প্রদত্ত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের এই বিবরক উক্তি পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় ১৩৪৪ সালের কার্ত্তিক, সংখ্যা 'শ্রীসুদর্শন' পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "তাঁহার বাটীতে ৺নারায়ণের নিত্যসেবা হইত, কতকগুলি অভাবগ্রস্ত বিদ্যার্থী ও আত্মীয়-স্বজন তাঁহার বাটীতে আশ্রয় পাইত। এতদ্ব্যতীত অতিথি অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং সাধু, সন্ন্যাসী অনেক সময়ে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইতেন এবং তিনি যত্নের সহিত তাঁহাদের সেবা করিতেন। তাঁহার পত্নী তপস্বিনী, ভক্তিমতী ও প্রকৃতই তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি প্রীতি ও দক্ষতার সহিত দেবসেবা, অতিথিসেবা এবং সমগ্র গৃহকর্ম্ম করিতেন।"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার উপনয়নের পর বাংলা ১৩০২ সালে বাবাজী মহারাজের কলিকাতার বাসায় পড়িবার নিমিত্ত আসেন। তিনি বলেন, "বাংলা ১৩০৭ সালে শ্যামবাজার রামচন্দ্র মিত্র লেনের বাসা হইতে উঠিয়া বাগবাজারের ৪৭নং বসুপাড়া লেনের বাড়ীতে আসা হইল *। তদবধি ঠাকুরসেবার ভার আমার উপর পড়িল। এই সময়ে তাঁহার বাসার ঠাকুর মন্দিরে একটি বাণলিঙ্গ, শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের ফটো, একটি শালগ্রাম ও একটি গোপাল মূর্ত্তি ছিলেন। দীক্ষার পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই দধিবামন নামক শালগ্রামটি ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই গোপাল বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবন হইতে তাঁহাদের গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া আনিয়াছিলেন। সকলে মিলিয়া বিশেষ নিষ্ঠাপূর্ব্বক, প্রীতি ও আন্তরিকতার সহিত এই বিগ্রহ সকলের সেবা করিতেন, ফলে বাড়ীটি তীর্থের ন্যায় হইয়াছিল। স্থানের কোন বিশেষ প্রভাব বশতঃ অথবা শ্রীভগবানের কোন বিশেষ মহিমা প্রকটিত থাকাতে, তীর্থস্থানে

* এই বসুপাড়া লেনের বাসাতেই অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বাংলা ১৩২২ সালের কার্ত্তিক মাসে সংসার ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন।

গেলে লোকের মন সহজেই পবিত্র ও সংভাবাপন্ন হয়, ইহাই তীর্থের তীর্থত্ব, এই প্রভাব এখানেও ছিল।

বরিশালের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মহিন্তা মহাশয় লিখিয়াছেন, "তাঁহার বাড়ীতে গিয়া অনেক সময়ই আমাব মনে হইত যেন কোন মঠ বা আশ্রমের ভিতরে আছি। ঠাকুর কোঠায় শ্রীশ্রীশালগ্রামদেব ছিলেন ও শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজেব ফটো ছিল। এই ঠাকুবেরই দৈনিক সেবা-পূজা হইত। * * * আমাব তখন এই দিকে কোনই ধারণা ছিল না—আমার মন ছিল ভাল ভাল জিনিষেব প্রসাদ পাইবাব দিকে। ঠাকুর অপেক্ষা ভাল জিনিষের প্রসাদই আমার অধিক প্রিয় ছিল। অবশ্য আরতির সময় সেখানে যাইতাম, কাবণ আমাব ঐ বাদ্যটুকু কাণে খুব মধুব লাগিত এবং অনেকে একত্র হইয়া স্তোত্র পাঠেব স্বরটুকুও মধুর লাগিত, আর যাইতাম ঐ স্থানে ইঁহারা সকলে মিলিয়া কি করেন, তাহা দেখিতে কৌতূহলী হইয়া।"

বাবাজী মহারাজেব গুরুভ্রাতা প্রেসিডেন্সী কলেজেব ভূতপূর্ব্ব গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাস মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীমৎ সন্তদাসজীর বাড়ীতে নিত্যই ঠাকুরের ভোগ হইত, এই ভোগ প্রাণহীন বাহ্যক্রিয়া মাত্র ছিল না, ইহা ছিল যুগপৎ জ্ঞানী ও বিশ্বাসী ভক্তের ভোগ। একপক্ষে মন্ত্র ও গঙ্গাজল তুলসীদ্বারা স্থূলভাবে ভোগ্যবস্তুর ভগবানে অর্পণ এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভগবান্ লীলামূর্ত্তিরূপে অলৌকিক ভাবে এই ভোগ্যবস্তুর সহিত মিলিত হইয়া ভোগ্যরস সকল আস্বাদন করিবেন। পক্ষান্তরে ইহা অন্তঃকরণের ভিতর দিয়া বুদ্ধি, প্রাণ ও মনের সম্মিলিত ভাবে নিবেদন—ঠাকুর, তুমিই লীলাচ্ছলে অচেতনবৎ হইয়া বিবিধ ভোগ্যরসরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ, তুমিই লীলাচ্ছলে আপন চিৎশক্তিকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ঐ সকল ভোগ্যরস

ভোক্তারূপে ভোগ করিতেছ, আবার তুমিই দানরূপে ভোগ্যবস্তু প্রভুরূপী ভগবানে অর্পণ করিয়া আপনাকে আপনি কৃতার্থ মনে করিতেছ *। এইরূপ ভোগ নিবেদনই তত্ত্বজ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের সম্মিলন, ইহাই দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ এবং যুগপৎ সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা। এইরূপ ভাবে ভোগ দান করিতে পারিলে জড় ভোগ্যবস্তুর জড়তা ও মলিনতা দূরীভূত হয়, অচেতন সচেতন হইয়া যায় এবং ভোগ্যরসের আনন্দদায়িনী শক্তি বহুপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীমৎ সন্তদাসজীর বাগবাজারের বাড়ীতে আমি অনেকবার ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছি এবং আমার কোন কোন গুরুভ্রাতা ভগিনীও সময়ে সময়ে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা অনেকেই তাঁহার বাড়ীর ভোগের প্রসাদের বিশিষ্টতা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। তিনি নিজে যেরূপ জ্ঞানী ও ভক্ত ছিলেন, তাঁহার পত্নীও তদনুরূপ প্রেম এবং ভক্তিবিশ্বাস সহকারে রুগ্নদেহেও ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা স্বয়ং করিতেন, এইরূপ স্থলে প্রসাদ যে জীবন্ত ও জাগ্রত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কাহাকেও কাহাকেও এই সময় বলিয়াছিলেন, "আমার গুরুদেব জাগ্রতভাবে এইস্থানে আছেন।" বস্তুতঃ তাঁহার গুরুদেবের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান কালেও এবাটীর অনেকে এখানে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজে এবং মাতাঠাকুরাণী ত পুনঃ

* শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কর্তৃক উপদিষ্ট আমাদিগের ভোগ নিবেদন প্রণালীর (সম্প্রদায় প্রচলিত প্রণালীই তিনি উপদেশ করিয়াছেন) ভাব এই প্রকার এবং তন্মধ্যে এই গীতোক্ত মন্ত্রটি আছে :—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥"

পুনঃ পাইয়াছেন*, অন্য লোকেও পাইয়াছেন। কালিকচ্ছ নিবাসী পণ্ডিত ৺দ্বারকানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় ইঁহাদের মধ্যে একজন। কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া তিনি এই বাসাতে মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। কোন সময়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকেও এই কথা বলিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া অবধি তিনি অতিশয় ভক্তিসহকারে ঠাকুরঘরে গিয়া ফটোর নিকট প্রণামাদি করিতেন। একদিন তিনি আসিয়া অতি গদ্গদভাবে বাবাজী মহারাজকে বলিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ সম্বন্ধে আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "অপরদিন অপেক্ষা পণ্ডিতমহাশয়ের সেই দিনকার আকৃতির ও ভাষার বিশেষত্ব আজিও মনে পড়ে।"

প্রথম প্রথম ঠাকুরসেবা ভক্তির সহিত হইলেও ঠিক নিয়মানুসারে হইত না—হয়ত সকল নিয়ম তাঁহারা জানিতেন না কিংবা কোন কোনটি প্রথমতঃ অবশ্য পালনীয় বলিয়া মনে হয় নাই। তাঁহার শ্রীগুরুদেব ইহা কৃপাপূর্ব্বক নিজেই সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে বাসায় তুলারাম নামক একটি চাকর ছিল। লোকটি অতি সরল প্রকৃতি ও দেববিগ্রহে ভক্তিমান্ ছিল। সে রোজ সন্ধ্যাকালে প্রতি কোঠায় ধূনা দিত ও প্রদীপ দেখাইত। একদিন সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় ধূপবাতি দিবার সময় তুলারাম অত্যন্ত ভয় পাইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট বলিল যে, বাবাজীর ফটোর অনুরূপ একজন লোক আসিয়া তাহার নিকট হইতে ধূপপাত্র কাড়িয়া লইয়া বলিয়াছেন, "তোমরা সন্ধ্যার সময় আরতি কর না কেন?" এবং এই কথা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন—ধূনাচিখানিও আর পাওয়া যাইতেছে না। পরে সে রাত্রে

* শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ লিখিত তাঁহার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থে এইরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে।

শুইতে যাইবার সময় ধুনাচিখানি নীচের তলায় চৌবাচ্চার উপর পাইয়াছিল। এই ঘটনার পরদিন হইতেই নিয়মিতভাবে প্রতিদিন ঠিক্ সন্ধ্যার সময়ে ঠাকুরের আরতি করা হইত ও কিছুকাল পরে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমের ন্যায় আরতির অন্তে সকলে মিলিয়া স্তোত্রপাঠের নিয়মও প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রত্যেক পূজাপার্ব্বণে উৎসব হইত, বাড়ীতে যাহারা ছিলেন তাঁহারা ত যোগ দিতেনই, বাহির হইতেও ধর্ম্মবন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন, প্রতি পর্ব্বেই খুব সমারোহ এবং যথেষ্ট আনন্দ হইত। শ্রীহট্টের ন্যায় কলিকাতার বাসাতেও অভাবগ্রস্ত আত্মীয়স্বজন, দেশের লোক, ছাত্র, মক্কেল প্রভৃতি অনেক লোক থাকিতেন। ইহাদের মধ্যেও যাহাতে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হয় তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা যত্নবান্ ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাবাজী মহারাজের কলিকাতা অবস্থানকালে বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "রাত্রি তিনটার সময় তিনি উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইতেন। আমাদিগকেও জাগাইয়া দিয়া যাইতেন—আমাদেরও সকলের গঙ্গাস্নানে যাইতে হইত এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে যার যার কাজে যাইবার নিয়ম ছিল। জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রিতে প্রায় সকলকেই উপবাস করিতে হইত, অনেক লোকে প্রসাদ পাইত। প্রতি বৎসর সরস্বতীমূর্ত্তি আনিয়া পূজা হইত, পূজান্তে আমরা সকলে অঞ্জলি দিতাম। গ্রহণাদিতে গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি জপ করিতেন, আমাদিগকেও তদ্রূপ করিতে আদেশ দিতেন। * * প্রায় সমস্ত পর্ব্ব পার্ব্বণেতেই খুব আনন্দ হইত।"

অন্নবিত্তের আন্তরিকতার সহিত শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সেবা বিরল হইলেও কোন কোন স্থলে আজিও উহা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু

তাঁহাকেই মালিক জানিয়া নিজে দাসভাবে, সেবকমাত্র-জ্ঞানে অবস্থান খুব অল্প লোকেরই জীবনে দেখা যায়। পরন্তু ইহাই ঋষি-উপদিষ্ট গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের মূল নীতি। অবশ্য ইহার ক্রমোন্নতি আছে। ঋষিঋণ পরিশোধার্থ শ্রদ্ধাসহকারে শাস্ত্রচর্চ্চা করিলে সেবিত বিগ্রহের কৃপায় শীঘ্রই তাঁহার মহিমার জ্ঞান চিত্তে প্রতিভাত হয়, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের বোধ জন্মে; তখন সাধক আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগৎকে তাঁহারই বিভূতিজ্ঞানে নিজেকে অতিথি, আত্মীয়, কুটুম্ব, পরিজন, আশ্রিত, অভ্যাগত, দেশ, সমাজ এমন কি পশুপক্ষী উদ্ভিদ পর্য্যন্ত সকলের সেবক বলিয়া সর্ব্বদা বোধ করেন, এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম ভগবৎসেবায় পরিণত হয়। আর এইরূপভাবে সকলকেই ভগবদ্রূপজ্ঞানে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম দ্বারা ভগবৎ-সেবা করিতে করিতে কালাতিপাত করাই আর্য্যঋষিশাসিত গৃহস্থজীবনের সনাতন আদর্শ। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সংসার-জীবনের ইহাই মূল রহস্য, এই ভাবাবলম্বনেই তাঁহার সর্ব্ববিধ সাংসারিককর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত। বাংলা ১৩৪২ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবর্ত্তক' পত্রে হাইকোর্টের প্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র খাঁ মহাশয় লিখিয়াছেন, "তিনি 'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ' ভগবান্ মনুর এই আদেশ জনকরাজার ন্যায় পালন করিতেন। * * তাঁহার অতিপ্রাকৃত জীবনের বিশেষত্ব এই ছিল যে, সাংসারিক কাজকে ভগবৎসেবা মনে করিয়া তিনি প্রীতির সহিত সাংসারিক কাজ করিতেন। আমাদের ন্যায় অধম উকিলকে তিনি উপদেশ দিতেন যে, 'সমুদয় জীবই ভগবদ্বিগ্রহ। মক্কেলের কাজ করিতে মনে করিবে না যে, মক্কেলের নিকট ফি বাবদ যে টাকা পাইয়াছি, তাহার বিনিময়ে মক্কেলের কাজ করিতেছি। মনে এই ভাব রাখিবে যে, মক্কেলরূপী ভগবানের সেবা করিতেছি।' সাংসারিক কাজে এই ভগবৎসেবার ভাব মনে রাখার চেষ্টা করিতে তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন।"

উত্তরকালে শিষ্যদিগকেও এই উপদেশ তিনি সর্ব্বদাই দিতেন। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালে যে এই ভাবাশ্রয়েই তিনি চিরদিন চলিয়া আসিয়াছেন, তাহার পরিচয় তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে আমরাও মধ্যে মধ্যে পাইয়াছি। আমাদের কোনও গুরুভ্রাতা একদিন আমাদের সাক্ষাতে সাংসারিক নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সাধনভজন করিতে সময় পান না, এইরূপ কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বাবা! আমি ত সমস্ত কাজ করিয়াও সাধনভজনের কোনপ্রকার অসুবিধা বোধ করিতাম না। দুইবেলা ত নিয়মিতরূপে ভজন করিতামই, তাহা ছাড়া সমস্ত সময়ই আমার ভজন চলিত। আমি সমস্ত বস্তুকেই ভগবদ্রূপ বলিয়া ধারণা করিতাম এবং প্রত্যেক কার্য্যই ভগবৎসেবার নিমিত্ত বোধ করিতাম।"

আরও নানা সূত্রে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের তৎকালীন মনোভাবের সুন্দর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত গুরুকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ও পূর্ব্বোল্লিখিত আশুবাবুর লিখিত বিবরণ হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"তাঁহার বাসায় বাবু হইতে চাকর পর্য্যন্ত সকলেরই একরূপ আহার ছিল, দুই রকম রান্না হইত না। একদিন তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিলেন, 'টাকা পয়সার বড়ই অনটন, সকলকে দুধ দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে আমারও দুধ বন্ধ করিতে হইবে।' এই কথায় গৃহিণী লজ্জা পাইলেন এবং দুধের ব্যবস্থা একরূপই রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

ইহা যে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ অথবা শিষ্টব্যবহার মাত্র নহে, এই বৃত্তির উৎস যে তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নিহিত ছিল, তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"বাসায় ছাত্র তখন চৌদ্দ পনরজন থাকিত, কখন কখন কয়েকজন কমও থাকিত। আত্মীয় স্বজনেরাও তীর্থোপলক্ষে অথবা অন্যান্য কারণে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাসায় কিছুদিন অবস্থান করিতেন। একবার তাঁহার আত্মীয় কুমিল্লা কান্দিরপাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয় * কোন কার্য্য উপলক্ষে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। তিনি দেখিলেন, ছাত্রেরা যাহার যখন ইচ্ছা, একজন দুইজন করিয়া খাইয়া যায়, খাইবার সময় সকলে মিলিয়া একসঙ্গে বসা অথবা কেহ কাহাকেও ডাকিয়া নিয়া আসা ইত্যাদি কিছুই করে না। মক্কেলেরা কেহ কেহ আসিয়া বাসায় থাকার প্রয়োজন হইলে বাবাজী মহারাজের অনুমতি না নিয়াই থাকিয়া যায়, তিনি কাহাকে কাহাকেও হঠাৎ দেখিয়া এরূপও জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কবে আসিয়াছ? কোথায় আছ? ইত্যাদি। বামুনঠাকুর, ঝি, চাকর, অথবা ছাত্রদের কোন আত্মীয়-স্বজন কখনও আসিয়া এখানে থাকার প্রয়োজন হইলে অনেকস্থলে তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা করে না। এ সকল এই আত্মীয় ভদ্রলোকটির ভাল লাগিল না, বিশেষতঃ ছাত্রেরা আহারের সময় তাঁহাকে ডাকিয়া আনিত না। বড়দিদি † প্রতিদিনই তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া খাওয়াইতেন, ইহাতেও তিনি একটু ক্ষুব্ধ ছিলেন। এক ছুটির দিনে অবকাশ পাইয়া ভদ্রলোকটি একটু অনুযোগসহকারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে সকল কথা জানাইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিলেন, তারপর হাসিয়া উত্তরে বলিলেন, "আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সে সকলই সত্য। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না এস্থলে দোষ কাহার—তাহাদের কি আমারই! আমি সর্ব্বদাই মনে করিতেছি

* ইনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চতুর্থ ভগিনীপতি। এখনও জীবিত আছেন।

† অর্থাৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী।

এ বাটীর মালিক ঠাকুর, ইহারা দশজন যেমন, আমিও তেমনই একজন। স্বয়ং ঠাকুরই ইহাদিগকে খাওয়া-পরা দিতেছেন, আমি কখনও দিই না। সুতরাং কিজন্য আর তাহারা আমার অপেক্ষা করিবে ?"

"বাস্তবিক 'মালিক আমি নই' তাঁহার এই ভাবটি আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি।"

"একদিন পাচক ব্রাহ্মণ রান্না করিতে আসিতে পারিবে না বলিয়া ঝি বাসার সকলকে এই কথা জানাইলে সকলেই টাল বাহানা করিতে লাগিল। অবশেষে 'বাবুজী' মালার ঝুলি গলায় রান্নাঘরে ঢুকিলে অপর সকলেই রান্না করিতে ছুটিলেন।"

"যিনিই তাঁহার সংস্রবে আসিতেন, তিনিই তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইতেন। সকলেই মনে করিত, তিনি আমাকে যেরূপ ভালবাসেন, এরূপ আর অন্য কাহাকেও বাসেন না।"

"কখনও অভাব বোধ করিতে তাঁহাকে আমরা দেখি নাই, অথবা তদ্রূপ কোন কথা মুখে প্রকাশ করিতে শুনি নাই। টাকা পয়সা যখন যাহা পাইতেন, তৎসমস্তই বড়দিদির নিকট আনিয়া দিতেন। বাজার হাট বড়দিদিই করাইতেন। বামুন ঠাকুর, ঝি, চাকর, সহিস, কোচোয়ান ইত্যাদির বেতন এবং ছেলেদের স্কুলের বেতন ইত্যাদি সমস্ত তিনিই দিতেন, বাবাজী মহারাজ কোন বিষয়ে খোঁজ রাখিতেন না। অনটনের সময়ে কখনও অর্থের অভাবের কথা তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিতেন, "চলিয়া যাইবে, কিছুই আটকাইবে না।" আমরা বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছি, ফলতঃ ঘটিতও তাহাই। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যহ বৈকালে জলখাবারের পয়সা দেওয়া হইত, যাহার যাহা ইচ্ছা কিনিয়া খাইত। একদিন দিদির হাতে পয়সা না থাকায় তাহাদিগকে জলখাবারের পয়সা দিতে পারেন নাই, বাবাজী মহারাজ হাইকোর্ট হইতে ফিরিলে তাঁহাকে এই কথা

বলিবামাত্র তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এর জন্য ভাবনা কি ? এখনই রান্না চড়াইয়া দিলে সকাল সকাল সকলে ভাতই খাইতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাদি সারিয়া নিজেই উনুন ধরাইয়া রান্না করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় কোন সূত্রে দশটি টাকা আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহা হইতে সকলকে জলখাবারের পয়সা দিলেন। পূজার বন্ধ হইলে প্রতিবৎসরই শ্রীবৃন্দাবন যাইতেন, এমন অনেক সময় দেখিয়াছি যে, রওয়ানা হইবার পূর্ব্বক্ষণে আবশ্যকীয় টাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। টাকার জন্য কখনও কোন কাজ আটকাইতে দেখি নাই।

"আজকালের মত ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না—কোনরূপে টাকা সঞ্চয় কখনও করিতেন না। যাহা পাইতেন, তাহা সমস্তই খরচ হইয়া যাইত। পরের দিনের ভাবনা তিনি কখনও ভাবিতেন না; আজ যাহা খরচের প্রয়োজন তাহা করিতেনই, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার ত্রুটি করিতেন না।"

"একবার বড়ই টাকার অভাব অনুভূত হইতে লাগিল, দৈনন্দিন খরচই চলিয়া উঠিতেছে না, কোন দিক হইতে টাকা পয়সাও পাওয়া যাইতেছে না। তিনি (বাবাজী মহারাজ) মনে ভাবিলেন, 'এরূপ হইবার কারণ কি?' পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার গৃহিণী প্রায় একশত টাকা পুঁটুলী করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, 'সেই জন্যই ত ঠাকুরজী আর অন্য টাকা যোগাইতেছেন না!' এই বিষয় লইয়া গৃহিণীকে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, 'ফকিরীতেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, ফিকিরীতে নয়!' তাঁহার সাংসারিক জীবন ফকিরীতেই ছিল, ফিকিরীতে নয় *!"

* পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই সকল অংশ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গুরুভ্রাতা

একান্তভাবে শ্রীভগবানে নির্ভরশীল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সাংসারিকজীবনের ও চরিত্রের এই মধুর দিকটি তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয় প্রভৃতি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় 'শ্রীসুদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বাবাজী মহারাজের এই ফকিরী জীবন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এত উপার্জ্জন, এত ব্যয়, এত দান—সবই রাজোচিত, প্রকৃতই রাজোচিত উপচার দ্বারা শ্রীভগবৎসেবা তিনি চিরদিন করিতেন—কিন্তু নিজের অভ্যাসগুলি তাঁহার একান্ত অনাড়ম্বর, অতি সাদাসিধা অথচ সাধকোচিত ছিল। গুরুদাসবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, তাঁহার সাংসারিক জীবন ফকিরীতেই ছিল। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের ধারা অতঃপর বিবৃত করিতেছি।

পূর্ব্ববৎ সন্ধ্যার পর আর সাংসারিক কাজকর্ম্ম সাধারণতঃ করিতেন না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভজন করিতেন। শেষের দিকে দেখা যায়, একক্রমে বসিয়া ভজন করিতে এত অধিক সময় আর পাইতেন না—ওকালতির কার্য্য ব্যতীত শাস্ত্রচর্চ্চা ও লোকসেবার্থ শাস্ত্রবাণী প্রচারের জন্য যে সকল অমূল্য গ্রন্থ তিনি এই সময়ে লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্যও অনেক সময় দিতে হইত। শ্রীবৃন্দাবন আশ্রম সংক্রান্ত কার্য্যও মধ্যে মধ্যে থাকিত, এসকলের কথা পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। যাহা হউক, গুরূপদেশে তিনি পরে প্রধানতঃ শেষরাত্রি

গুরুদাসবাবু ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ভ্রাতা আশুতোষবাবু, এই উভয়ের প্রেরিত লিপিদ্বয় হইতে স্থানে স্থানে গৃহীত। কোন্ অংশ কাহার লিখিত, তাহা পাঠক " " এই প্রকার উদ্ধার চিহ্ন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর প্রসঙ্গে "তাঁহার গৃহিণী" অথবা "বড়দিদি" এইরূপ ভাষাপ্রয়োগের পার্থক্য হইতে সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

ও প্রাতঃকালের দিকে বসিয়া ভজনের কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতিদিন রাত্রে সাড়ে নয়টার তোপ পড়িলে * তাঁহার গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ লাগিত। অতঃপর প্রসাদ পাইবার পর রাত্রি এগারটায় কিংবা সাড়ে এগারটায় সাধারণতঃ শুইতে যাইতেন। অল্পক্ষণই নিদ্রা যাইতেন, পুনরায় তিনটায় উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া নিজের গাড়ী থাকা সত্ত্বেও পদব্রজেই গঙ্গাস্নানে যাইতেন। স্নানান্তে গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়াই তর্পণ করিতেন, তারপর শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া ভজনে বসিতেন ও দু'এক ঘণ্টা একক্রমে জপ করিতেন। একটি পাথরের কুণ্ডা (খুব মোটা বাটির মত) ও একখানি মোটা নিমের ডালের লাঠি তাঁহার ছিল। প্রত্যহ প্রাতে জপ ও পূজা সমাপনান্তে কিছু ভাঙ, ভালরূপে খোসা ছাড়ান কয়েকটি গোলমরিচ, কয়েকটি গোলাপের পাঁপড়ি ও শশার বীচি সেই পাথরের কুণ্ডার মধ্যে ফেলিয়া নিমের লাঠিটি দ্বারা নিজহাতে পিষিতেন, পরে আবশ্যক মত জল তাহাতে দিয়া সরবৎ প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরজীর ভোগ লাগাইয়া তাহা পান করিতেন। এইরূপে ভাঙ পিষিবার সময় একখানি ছোট গীতা সম্মুখে খোলা থাকিত, তিনি মনে মনে পাঠ করিতেন। অতঃপর মক্কেলের কাজ করিবার জন্য বৈঠকখানায় যাইতেন।

১৩৩২ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবর্ত্তক' পত্রে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র খাঁ মহাশয় লিখিয়াছেন "আমার সহিত প্রথম পরিচয়ের সময় তিনি বড় কাঠিয়া বাবার শিষ্য হইয়াছেন। শেষ রাত্রে উঠিয়া প্রায় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সাধন ভজন করেন। যাহারা কেবল সংসারের কাজ

---

* তখন রাত্রি সাড়ে নয়টায় ও বেলা একটায়, এই দুইবার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হইতে তোপ পড়িত।

করে, তাহারা প্রাতঃকালে যে সময় কাজ আরম্ভ করে, তিনিও সেই সময় ওকালতির কাজ আরম্ভ করিয়া সমস্তদিন সম্পূর্ণ সাংসারিকের ন্যায় সংসারের কাজ করিতেন। প্রথম রাত্রেও যে সাধন ভজন করিতেন, তাহাতে সংসারের কাজের কোন ক্ষতি হইত না। যাহারা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিত না, তাহাদের জানার উপায় ছিল না যে, তিনি প্রতিদিন নিয়মতভাবে দীর্ঘকাল সাধন ভজন করেন। তাঁহার নিকট খুব প্রত্যুষে কেহ কোন কাজের জন্য গেলেও দেখিতেন যে, তিনি ওকালতি আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার এই চরিত্র আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, সংসারী লোক ইচ্ছা করিলে সমস্ত দিন পরিশ্রমী সংসারীর ন্যায় সংসারের কাজ করিয়াও সাধন ভজনের জন্য যথেষ্ট সময় পাইতে পারে।"

উৎসাহ এবং ক্ষিপ্রকারিতা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। শেষ বয়সে যখন তাঁহার শরীর অপটু হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। স্বভাবসিদ্ধ ক্ষিপ্রকারিতার জন্য এবং যখন যে কাজ করিতেন, তাহাতে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারিতেন বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র এত কাজ সারিয়া সকাল সকাল মক্কেলের কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন কঠিন প্রশ্ন সমাধানপূর্ব্বক মক্কেলদিগের অনেক কাজ সম্পাদন করা সম্ভবপর হইত।

মক্কেলের কাজ সারিয়া পুনরায় স্নান করিতেন। এবার বাটীতে কলের জলেই স্নান করিতেন, স্নানান্তে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক কোন একটা গন্ধতৈল একটু মাথায় দেওয়া তাঁহার একটি অভ্যাস ছিল। অনন্তর প্রসাদ পাইয়া কোর্টে যাইতেন—প্রসাদ পাইয়া বলিলাম এইজন্য যে, বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর নিয়মিত সেবা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহার নিকট নিবেদিত প্রসাদ ভিন্ন তিনি অন্য কিছুই গ্রহণ করিতেন না।

প্রথম প্রথম অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ভাড়াটিয়া গাড়ীতেই কাছারী যাইতেন, পরে ১৩০৪ সালে একখানি ভাল ব্রুহাম গাড়ী খরিদ করেন। কোর্টে গিয়া কিভাবে সময় কাটাইতেন সে সমস্তই পূর্ব্বাধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

হাইকোর্টে যাইবার সময় অবশ্য উকিলের পোষাকেই যাইতেন, কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য তাঁহার কোনদিন ছিল না। রূপার চেইনওয়ালা একটি ওয়াচ ঘড়ী ছিল, তাহাই ব্যবহার করিতেন, কোর্টেও উহাই লইয়া যাইতেন। মফঃস্বলে যখন মোকদ্দমা চালাইতে যাইতেন, তখনও অতি সাধারণ একটি সাদা পেণ্টুলন ও একটি চাপকান মাত্র পরিয়া কাছারীতে উপস্থিত হইতেন, সাধারণ লোকে দেখিয়া মনে করিতে পারিত না যে, ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বড় উকিল, পরে সওয়াল শুনিয়া ও পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত। কেবল কাছারীতে যাইবার সময় ব্যতীত অন্য সময় মোজা অথবা জামা ব্যবহার করিতেন না। কোথাও বেড়াইতে যাইতে হইলে একখানি পাতলা চাদর, চটিজুতা (অনেক সময়ই কাঠের শুকতলাওয়ালা ক্যাম্বিশের চটি) ও একগাছি লাঠি লইয়াই বাহির হইতেন। জজ, ব্যারিষ্টার কিম্বা কোন উকিলের বাড়ীতে কোন উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ হইলে অনেক সময় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেও এই বেশেই যাইতেন, কিন্তু কোথাও খাইতেন না। তামাক খাইবার জন্য একটি ছোট হুঁকা তাঁহার ছিল, অন্যত্র নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে চাকরে অনেক সময় তাহা সঙ্গে নিয়া যাইত, তিনি অপরের হুঁকায় কখনও তামাক খাইতেন না। মোকদ্দমাদি উপলক্ষে স্থানান্তরে গেলেও দৃঢ়প্রযত্নে নিজের সমস্ত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া চলিতেন। কোর্ট হইতে ফিরিয়া কিছু জলযোগ করিতেন। কয়েকখানি লুচি ঘৃতে ভাজা বেগুন

দিয়া খাইতেন, কখনও আলুসিদ্ধ গোলমরিচচূর্ণ ও ঘৃতসহযোগে আহার করিতেন।

শ্রীযুক্ত আশুবাবু বলেন, "কাছারী হইতে ফিরিয়া বাবাজী মহারাজ পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় আমাকে পড়াইতেন। বিশ্রাম একরকম করিতেনই না।" একপ্রকার সেবার কার্য্য হইতে কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলে যেটুকু বৈচিত্র্য হয়, তাহাই তাঁহার বিশ্রামের কাজ করিত। আর একটি কথা মনে হয়। প্রিয় আরাধ্য দেবতার সেবাজ্ঞানে সমস্ত কর্ম্ম করিতেন বলিয়া তাঁহার চিত্তে শান্তি ও আনন্দ থাকিত, তাহাতে বিশ্রামের অভাব অনুভূত হইত না, রাত্রির নিদ্রাটুকুই শরীরের বিশ্রামের পক্ষে যথেষ্ট হইত।

গৃহীর আর এক অবশ্য পালনীয় অঙ্গ সাধুসেবা। অতিশয় আগ্রহ ও যত্নসহকারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইহা করিতেন। পূর্ব্ববর্ণিত প্রবন্ধে 'শ্রীসুদর্শন' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় সুযোগ পাইলেই সাধু-দর্শন করিতেন। কখনও কখনও কলিকাতায় সাধুসমাগম হইত; তখন তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার অনুগত লোক কেহ উপস্থিত থাকিলে তাহাকেও সঙ্গে লইয়া সাধু-দর্শন করিতে যাইতেন। এক সময়ে তাঁহার বন্ধু উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে মহাত্মা "খাকীবাবা" আসিয়াছিলেন। চৌধুরী মহাশয় সেখানে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন এবং সারাদিন প্রায় সেখানে ছিলেন।"

তাঁহার নিজের বাটীতেও সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম মধ্যে মধ্যে হইত। তাঁহারা আসিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অতিশয় আনন্দিত হইতেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন। এক সময়ে মহাত্মা পাহাড়ী বাবা আসিয়া বোসপাড়ার বাসায় মাসাধিককাল অবস্থান

করিয়াছিলেন। একদিন বাবাজী মহারাজকে সঙ্গে লইয়া একখানি ঠিকা গাড়ী করিয়া তিনি তাঁহার এক শিষ্যের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। শিষ্যটি তাঁহাকে পঁচিশ টাকা প্রণামী দিলেন। ফিরিবার সময় টাকাগুলি তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রে বাঁধা ছিল। বাসায় ফিরিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিবার কিছুক্ষণ পরে সকলের লক্ষ্য পড়িল পাহাড়ী বাবার টাকা বাঁধা চাদরখানি গাড়ীতে রহিয়া গিয়াছে, নামিবার সময়ে ভ্রমক্রমে তাহা উঠাইয়া আনা হয় নাই। পাঁহাড়ী বাবা এই কথা বাবাজী মহারাজকে জানাইবা মাত্র, তিনি সেই গাড়ীখানি খুঁজিয়া দেখিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। অনেক খোঁজ করিয়াও সেই গাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই দিন অপরাহ্নে কাছারী হইতে ফিরিয়াই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পাহাড়ী বাবার নিকট গেলেন এবং পঁচিশটি টাকা তাঁহার পাদমূলে অর্পণ করিয়া করজোড়ে বলিলেন, "মহারাজ। আপনার টাকা আমি গাড়ী হইতে তুলিয়া আনি নাই এই অপরাধ আমারই হইয়াছে, এই টাকা আপনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন।" শ্রীযুক্ত পাহাড়ী বাবা কথঞ্চিৎ আপত্তি করিয়াও তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে ইহা গ্রহণ করিলেন। এই মহাত্মা অর্থলোভী ছিলেন না, কিন্তু যেরূপ আন্তরিকতা ও আগ্রহের সহিত বাবাজী মহারাজ অনুনয় করিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই।

দেবসেবা ও সাধুসেবার ন্যায় অতিথিসেবা এবং ব্রাহ্মণ-সজ্জনের সেবাও তিনি অতিশয় আগ্রহ সহকারে করিতেন। অতিথি অভ্যাগতের সমাগম বাটীতে সর্ব্বদাই হইত। তাঁহার গৃহে কিরূপ অবারিত দ্বার ছিল এবং কিরূপ মনোভাব লইয়া তিনি অতিথি অভ্যাগতের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই স্থানে

তাঁহার ব্রাহ্মণসেবার কথা বলিব। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা অনেকে তাঁহার বাটীতে যাইতেন। তখনকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার গৃহে অনেকবার আসিয়াছেন। ইঁহাদিগকে তিনি কখন কখন আহ্বান করিয়াও লইয়া যাইতেন। এরূপ কেহ গৃহে আসিলে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন ও সর্ব্বদা যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন এবং আন্তরিক যত্ন সহকারে তাঁহাদের সৎকার করিতেন। ১৩৪২ সালের পৌষমাসের 'প্রবর্ত্তক' পত্রে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কবত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "কালকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি শ্রীহট্ট নিবাসী ৺ভাবাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমাব আলাপ পবিচয় ছিল। তাঁহাব যৌবনাবস্থায় কোন কোন কার্য্যের জন্য তিনি অনুতাপ কবিয়াছিলেন এবং তিনি গুরুকৃপা লাভে যে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার মোহ বিদূরিত হইয়াছে, শাস্ত্রের প্রতি যে অবজ্ঞা বৈদেশিক শিক্ষা ও অজ্ঞজনের প্রতি উৎকর্ষ-জ্ঞান বশতঃ হইয়াছিল তাহা তাঁহার অপনীত হইয়াছে—এই কথা যখন তিনি বর্ণনা করিলেন, তখন তাঁহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ, বাক্য বাষ্প-গদগদ। তাঁহার এই ভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে দেখি নাই। শ্রীহট্ট নিবাসী আমার ভক্ত ছাত্র ধর্ম্মাচারে একনিষ্ঠ ৺নবকুমার শাস্ত্রী আমাকে যখন তাঁহার নিকট লইয়া যান, তখনকার তাঁহার ভাব আমি উপরে বর্ণনা করিলাম। তিনি তখন "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" লিখিয়াছেন, "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যাও" লিখিয়াছেন—সুতরাং তিনি তখন অবিদ্যা হইতে মুক্তি লাভে অগ্রসর। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ তখনও হয় নাই। সর্ব্বত্যাগের আন্তরিক ইচ্ছা তখন যে তাঁহার অন্তর্নিহিত ছিল, ইনি তাহার ইঙ্গিত না করিলেও তাহা আমার অনুমান হইয়াছিল। আমি তাঁহার সহিত

সেই এক দিন মাত্র আলাপেই বুঝিয়াছিলাম, ইঁহাব প্রকৃত শাস্ত্র শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। আমাদিগের ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়ে শাস্ত্রে বিশ্বাসী ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক আছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের গভীরতা ও দৃঢ়তার পরীক্ষা প্রায়ই হয় না। * * বহরমপুরের তল বাহিনী গঙ্গাস্রোতের ন্যায় তাহা ক্রমেই গভীরতা ও বেগে হ্রাস পাইতেছে কিনা, তাহা বলা কঠিন না হইলেও বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের সেই শ্রদ্ধা যে গভীরতা ও দৃঢ়তার পরীক্ষোত্তীর্ণ, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। * * * আমার প্রতি চৌধুরী মহাশয়ের আদর আমি ভুলিব না। তাঁহার শাস্ত্রকথা আমার প্রতি প্রশ্ন এবং তৎপরে আমাকে অর্ঘদান দ্বারা অর্চনা, তাহাও ভুলিবার নহে।"

বাড়ীতে কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। তাহাদের মধ্যে তিনটির নাম রাখিয়াছিলেন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। কোনটিকে তিন বেলায়ই দোহন করিতে হইত। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মহিন্তা লিখিয়াছেন, "গঙ্গা নাম্নী যে গাভীটি ছিল, তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। সকালে দোহনকারী আসিয়া বিগ্রহের সেবার জন্য দুগ্ধ দোহন না করা পর্য্যন্ত সে বাছুরকে দুধ দিত না, দোহনের পর বাছুরকে খাইতে দিত।" দোহনেরও বিশেষত্ব ছিল, অনেক গৃহস্থের বাটীতে যেমন যতদূর পারা যায় দুহিয়া লওয়া হয়, সেরূপ কখনও করা হইত না। বাছুরের জন্য সর্ব্বদাই যথেষ্ট দুধ রাখিয়া দেওয়া হইত, বাছুরের যাহাতে কষ্ট না হয়, সেদিকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকিত বলিয়া অপর সকলকে বাধ্য হইয়া লক্ষ্য রাখিতে হইত—ক্রমে অবশ্য সকলেরই এই অভ্যাস এবং শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল। এই গাভীটি প্রায় সময়ই ছাড়া থাকিত, তাহার বাছুরও বাঁধিয়া রাখা হইত না। সময় সময় তাহারা উপরের বৈঠকখানা ঘরে—যেখানে বসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মক্কেলের কাজকর্ম্ম করিতেন,

সেখানে তাঁহার নিকট যাইতে চেষ্টা করিত। গোসেবার কিছু কিছু কাজ তিনি করিতেন এবং উহাদিগকে ঠিকমত আহার দেওয়া হইয়াছে কিনা, সে বিষয় স্বয়ং তত্ত্বাবধান করা তাঁহার একটি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল।

গার্হস্থ্যধর্ম্মের আর একটি প্রধান অঙ্গ গুরুজন সেবা—বিশেষতঃ পিতৃমাতৃসেবা, শ্রযুক্ত বাবাজী মহারাজ বিশেষরূপেই করিয়াছিলেন। অন্যান্য গুরুজন—প্রধানতঃ মাতুলবংশীয় যাঁহারা ছিলেন ও তাঁহাদের যেরূপ সেবা তিনি করিয়াছিলেন তাহা পরে বর্ণনা করিব। প্রথমতঃ তাঁহার পিতৃমাতৃসেবার কথা বলিব। তাঁহার নিজের মাতা তাঁহার বালককালেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই যথাস্থানে বলিয়াছি। তাঁহার প্রথম বিমাতার দেহান্তের কথাও তৎস্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পিতৃদেব হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় ১২৯৯ সালে দেহত্যাগ করেন। এক্ষণে তাঁহার দ্বিতীয়া বিমাতা ইচ্ছাময়ী দেবীই কেবল জীবিতা ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রথম বয়সে কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিবার পর হইতে পুনঃ পুনঃ এমন কি একরকম ধারাবাহিক ভাবেই পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন ইহাই পাঠক জানেন, কিন্তু পিতাপুত্রের মধ্যে সম্বন্ধের ইহাই প্রকৃত রূপ নহে। প্রকৃত অবস্থাটি বুঝিতে হইলে তৎকালীন বঙ্গসমাজের অবস্থাবিপর্য্যয়ের কথা কিছু আলোচনা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও বিবরণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় প্রকাশিত বহুগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট থাকায় * এবং সাময়িক পত্রাদিতেও

* শিবনাথ শাস্ত্রীকৃত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত তাঁহার আত্ম-জীবনী ("Memories of My Life and Times"), অমৃতলাল সেন প্রণীত "গোস্বামী প্রভুর জীবনী", যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত" প্রভৃতি।

এ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হইয়া থাকে বলিয়া বাহুল্য বোধে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম না, প্রাসঙ্গিকভাবে সামান্যতঃ উল্লেখ করিব মাত্র। গতানুগতিক স্থিতিশীল বঙ্গসমাজে তখন বহুদিক্ দিয়া ভাঙ্গন ধরিয়াছে একদিকে নবাগত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তদনুসারিণী চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া দেশের শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদলের অধিকাংশের উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামিতা আর জনকতক সমাজহিতৈষণাপ্রণোদিত কিন্তু মাত্রাজ্ঞানহীন সংস্কার প্রচেষ্টা, অপরদিকে রক্ষণশীল বৃদ্ধদলের পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস ও ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এই উভয়ের সংঘাতে সাধারণ সমাজের বিক্ষুব্ধ চঞ্চলতা, উভয়দিকেই শক্তির অদ্ভুত প্রকাশ ও সারা বাঙ্গালা জুড়িয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী সঙ্ঘর্ষ ফলে অত্মবিস্মৃত, আর্য্যধর্ম্মের বহিরাবরণমাত্রসম্বল গতানুগতিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের কিয়দংশে সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন, বাঙ্গালীর প্রতিভার অদ্ভুত বিকাশ ও জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব উন্নতি অবশেষে প্রাচীনের অভ্যন্তর হইতে যথার্থ সনাতনবাদের পুনরভ্যুদয় অন্ধ অনুচিকীর্ষা হইতে যুক্তিযুক্ত সামঞ্জস্যের ভিত্তিভূমির দিকে সংস্কারান্দোলনের গতি ও তাহার প্রখরতা হ্রাস, তৎস্থলে রাজনৈতিক আন্দোলনের বেগ বৃদ্ধি এবং ব্রাহ্মসমাজের কায়সঙ্কোচ—এ সকলই গত শতাব্দীর ইতিহাসের কথা, এবং বহু গ্রন্থে সুপ্রচারিত হইয়া শিক্ষিতসমাজের সুবিদিত। কিন্তু ইহা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না হইলেও ইহার অন্তরালে বাঙ্গালীর ব্যষ্টি জীবনে এক একটি গ্রামে, মহকুমায় বা জিলায়—কখন বা ততোধিক স্থান ব্যাপিয়া, এক একটি বংশের ভরসাস্থল কোন উদীয়মান শক্তিশালী যুবকের ভাবপরিবর্ত্তনে তথাকার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূজনীয় তারাকিশোরের

পিতা নিজের বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে পুত্রকে বিপথগামী হইতে দেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পিতার সহিত তাঁহার সাময়িক বিচ্ছেদ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তেজস্বিনী মাতা তাঁহাকে প্রথমতঃ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেশনেতা বিপিনচন্দ্রের পিতা আচারব্যবহারে আজীবন স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়াও কার্য্যতঃ কোনদিন তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহযত্ন হইতে বঞ্চিত করেন নাই। ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা অবশেষে নিজেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। একটু অনুধাবন করিলে এই সকল আপাতবৈচিত্র্যের মধ্যে একটি গূঢ় ঐক্যের সন্ধান পাইয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। তাহা এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশাভরসাস্থল তরুণের নিকট কল্পনাতীত আঘাত পাইয়া পরিবারে ও সমাজে ঝড় উঠিয়াছে, কিন্তু পিতাপুত্রের অন্তরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের জীবনেও ইহাই ঘটিয়াছিল, পরন্তু একটু বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ঋষিদিগের ধর্ম্মের প্রতি পুনরায় আস্থার উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃভক্তি প্রবলতর বেগে তাঁহার জীবনে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং ধর্ম্মই চিরদিন তাঁহার জীবনের প্রধান বস্তু ছিল বলিয়া পিতার সহিত বিরোধের কালেও কোনদিনই ইহা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। কারণ সকল ধর্ম্মেই পিতৃমাতৃভক্তির উপদেশ আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পিতৃদেবো ভব", "মাতৃদেবো ভব", এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে গার্হস্থ্য জীবনে তিনি ইহাই হইয়াছিলেন।

যাহাকে অবলম্বন করিয়া তরুণ পিতামাতার চিত্তে অপত্যস্নেহের প্রথম উন্মেষ হয় ও একটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতিলাভ হয়, সাধারণতঃ প্রথম যৌবনে জাত সেই প্রথম সন্তান সকল মাতাপিতারই সমধিক স্নেহের পাত্র হয়। তদুপরি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শৈশবেই অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া পিতার অনেক উচ্চ আশা

ভরসার আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন। যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, তখন হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় সত্যই বিশ্বাস করিলেন যে, ছেলে বিগড়াইয়া গেল, বিপথগামী, বিধর্মী ও ম্লেচ্ছ হইয়া গেল, তাহাকে দিয়া আর কোন আশা নাই। চৌধুরী মহাশয় স্বভাবতঃ ক্রোধী এবং জেদী লোক ছিলেন। সুতরাং একদিকে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ, অপরদিকে কুলে কলঙ্ক, দেশে অখ্যাতি এবং প্রচুর সামাজিক উপদ্রব, যে পুত্রের জন্য সহ্য করিতে হইল তাহার উপর পিতা যে খড়্গহস্ত হইবেন, ইহা স্বাভাবিকই। কিন্তু ইহাও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, তজ্জন্য পুত্রকে বর্জ্জন কখনও করেন নাই, বরঞ্চ যাহাতে তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া 'সৎপথে' ও স্বমতে আনা যায় তজ্জন্য অসীম চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও পিতার প্রকৃতিই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যে ও কৈশোরে তিনি পিতার ন্যায়ই ক্রোধী এবং জেদী ছিলেন। যাহা ধরিতেন, তাহা ছাড়িতেন না। তাঁহার কোপন-স্বভাব সম্বন্ধে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় ১৩৪২ সাল পৌষ মাসের 'প্রবর্ত্তক' পত্রে লিখিয়াছেন, "যে রাগী লোকটাকে ঝি-চাকর হইতে বন্ধু-বান্ধব পর্য্যন্ত সকলেই ভয় করিত, সে হইল মাটির মানুষ।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্রের এই পরিণতিটিই তাঁহার বিশেষত্ব, একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে ইহা প্রচুর শিক্ষা ও অনুপম আনন্দ দান করে। তথাপি একেবারে 'মাটির মানুষ' তিনি কোন দিনই হইয়া যান নাই। কলিকাতায় অবস্থানকালে গার্হস্থ্য জীবনে এবং পরবর্ত্তী কালেও দেখা যায় এই প্রকৃতি তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু এক পরিবর্ত্তিত নূতন আকারে। সর্ব্বত্র বাসুদেব দর্শন করিয়া সকলকেই আদর করিতেন ও মর্য্যাদা দিতেন, সামান্য সামান্য বিষয়েও অপরের মত লইতেন

ও তাহার মধ্য হইতে সারটুকু গ্রহণ করিয়া নিজের পথে চলিতেন। পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত ও পূর্ব্ব সঙ্কল্পের সংশোধন করিতেও তাঁহাকে দেখিয়াছি, ছিল শুধু সত্য বিষয়ে অনমনীয় দৃঢ়তা। ক্রোধের সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ পরিবর্ত্তনই ঘটিয়াছিল। তাহার তেজটুকুই ছিল, বিষটুকু ছিল না, উষ্ণতাটুকু ছিল, অনিষ্টকারিতা ছিল না। এ সকলের বহু দৃষ্টান্তই পাঠক অতঃপর পাইবেন বলিয়া এই প্রসঙ্গের আর অধিক বিস্তার এ স্থলে করিব না।

পিতা জেদী এবং ক্রোধী, পুত্রও তদনুরূপ; স্নেহাধিক্যহেতু পূর্ব্ব-অভ্যাসবশে এবং সেকালের আবহাওয়া অনুসারে পিতা অতিমাত্রায় শাসনশীল ও অধিকারপ্রয়াসী, পুত্র নিজের স্বতন্ত্র মত বিষয়ে সতর্ক ও দৃঢ়। এরূপ ক্ষেত্রে একেবারে ঝগড়া না থাকা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত হেমকিশোর চৌধুরী মহাশয় বলেন, "বাবা 'ঠাকুরদাদা'কে * ভালবাসিতেনও যেমন, শাসনও করিয়াছেন তেমন, আবার ঠাকুরদাদা বাবার সহিত ঝগড়া মধ্যে মধ্যে করিতেন, কিন্তু মানিতেনও খুব।" উভয়ের অপেক্ষাকৃত তীব্র বিরোধ আরম্ভ হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১২৮৩ সাল), যখন বাবাজী মহারাজের 'বিধর্ম্মী' হইবার খবর তাঁহার পিতা পাইলেন, আর ইহা শেষ হয় খুব সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের অল্প পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পিতৃনির্দ্দেশানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইবার পর। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সুদীর্ঘ দশ বৎসর কালের মধ্যে তাঁহাদের সম্বন্ধ প্রায় কখনই তিক্ত হয় নাই, অথবা কখনও সম্পর্ক-চ্ছেদ হয় নাই। অনুরূপ অবস্থার মধ্যে ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার পিতা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনা করিলেই

* শ্রীহট্টে এবং পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'ঠাকুরদাদা' বলে।

মনে উদিত হয়। মাতার আহ্বানে (পিতার নহে) শাস্ত্রী মহাশয় দেশের বাটীতে গিয়াছেন, পিতার সাক্ষাৎ নাই। তিনি বাহির হইয়াছেন পুত্রকে মারিবার জন্য ভাড়াটিয়া গুণ্ডার খোঁজে, পরে আবার এই পিতাই পুত্রের পন্থানুসরণ করিয়া সপরিবারে ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। অপর দিকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি হরকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের আপাতকঠোর ব্যবহার যে কেবল একটি বহিরাবরণমাত্র, ইহার অন্তরালে যে মাতৃহারা পুত্রের প্রতি অবিরল স্নেহধারা সর্ব্বদা প্রবাহিত, হৃদয় যে উন্মুখ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল আবার তাঁহাকে আপন করিয়া পাইবার নিমিত্ত—ইহার আভাস একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে সদাই পাওয়া যাইত। এই দশবৎসর তিনি ব্যাকুলভাবে সদ্ব্যবহার ও প্রবোধ দ্বারা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে ফিরাইতে অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, আর সে চেষ্টার পরিণামে পুরস্কারও মিলিল, পুত্রকেই আপনার করিয়া তিনি পাইলেন।

আবার পুত্রের দিকে চাহিলে দেখি, ব্রাহ্ম অবস্থাতেও পিতাকে একই বাসায় লইয়া বাস করিতেছেন, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে শুধু পিতার অনুরোধে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহারই টানে দেশের বাটীতে যাইতেন, পত্রে জ্বরের সংবাদ পাইবামাত্র কাশীতে চলিয়া গেলেন, তাঁহার বাক্যপালনার্থে দেবদর্শন পর্য্যন্ত করিলেন *** কত আর বলিব? হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট না হইয়াও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দৃশ্যতঃ ভণ্ডরূপ প্রতীয়মান হইতেও প্রস্তুত হওয়া, কিছুকাল পর্য্যন্ত উভয় সমাজ বর্জ্জিত ভাবেই একাকী অবস্থানের সঙ্কল্প, তাঁহার নিজমুখে বর্ণিত তৎকালীন মনোভাব, তারপর হবিগঞ্জ আদালতে একান্ত উপহাসাস্পদ হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও কেবল পিতৃবাক্য পালনার্থ বিনা লাইসেন্সে ওকালতি করিতে যাওয়া—এসকল একত্রে স্মরণ করিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

তারপর যখনকার কথা বলিতেছি, সেই কলিকাতা বাসকালের প্রারম্ভেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের হিন্দুত্বাভিমুখী আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহাকে এই সময়ে দেখা যায়, যথার্থ শাস্ত্রবিশ্বাসী গৃহস্থরূপে। সুতরাং এই সময়ে তিনি শাস্ত্রোপদিষ্ট পন্থাতেই পিতৃদেবের প্রতি ব্যবহার করিতেন, পিতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও সেবা করিতেন।

১২৯৫ সালে পূজার পর, কার্ত্তিক কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসে (ইং ১৮৮৮, নভেম্বর) শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীহট্টের ওকালতি ছাড়িয়া, পত্নী এবং দুইটি বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্নদাকিশোর ও হেমকিশোরকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন, আসিয়া রাজা লেনের একটি বাটীতে বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা সঙ্গে আসেন নাই। তিনি আসিলেন মাস পাঁচেক পরে। আসিয়াই নিজে দেখিয়া শুনিয়া ৮০নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে এক নূতন বাসা ঠিক করিলেন ও উদ্যোগী হইয়া বাসা বদলাইলেন। এই বাসাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অনেক দিন ছিলেন। এই সময়েই তাঁহার পিতা দেখিতে পান যে, দুইজন সন্ন্যাসীর নিকট দুইটি বাণলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে এবং বাসায় তাঁহাদের অর্চ্চনা হইতেছে। তাঁহার ইহা বিশেষ আপত্তিজনক বোধ হইল এবং তিনি জিদ করিয়া বাবাজী মহারাজকে বলিলেন, "তুমি কিছুতেই দুইটি বিগ্রহ একত্রে রাখিতে পারিবে না। ইহা গৃহস্থের পক্ষে অমঙ্গলজনক।" অবশেষে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া অগত্যা একটি বাণলিঙ্গ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থ এক শিবমন্দিরে দিয়া আসিলেন এবং তাঁহার সেবাপূজার নিমিত্ত মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ইহার পর হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় কয়েক মাস এখানে থাকিয়া পুনরায় বাঁকেএর বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর যতদিন তিনি

জীবিত ছিলেন এইরূপে বামেএর বাটীতে কিছুকাল থাকিতেন এবং কলিকাতায় পুত্রের বাসাতেও কিছুদিন থাকিতেন। কলিকাতায় যখন আসিতেন, তখন একাদিক্রমে চারি পাঁচ মাস থাকিতেন। তিনি পাচক ঠাকুরের হাতে খাইতেন না, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁহার জন্য পৃথক্‌ভাবে রান্না করিতেন। ইহার উপর চৌধুরী মহাশয় আবার এক উৎকট নিয়ম করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার আহারের পূর্ব্বে যে জলগ্রহণ করিবে, তাহার হাতে তিনি খাইবেন না। কি ভাবিয়া তিনি এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। অগত্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সকাল হইতে সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া প্রতিদিন শ্বশুরকে রান্ধিয়া খাওয়াইতেন। চৌধুরী মহাশয় নিজের অভ্যাসমত প্রতিদিন বেলা এগারটার পর গঙ্গাস্নানে যাইতেন—বামেএর বাটীতে সকাল বেলায় নানা সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার এইরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কোনদিন বা গঙ্গায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। তাহার পর স্নানান্তে বাসায় ফিরিয়া তিনি গরম গরম অর্দ্ধসিদ্ধ শক্ত ভাত খাইতেন, সে রকম ঠিক না হইলে ফেলিয়া দিতেন, আহার করিতেন না। নিত্যই অন্নব্যঞ্জন গরম অবস্থায় তাঁহাকে দিতে হইত বলিয়া মাতাঠাকুরাণী এইরূপ সময়েই রান্না করিতেন। আহার শেষ করিয়া শ্বশুর বিশ্রাম করিতে গেলে তবে তিনি প্রসাদ পাইতেন। বেলা আড়াইটা তিনটার পূর্ব্বে আর তাহা হইয়া উঠিত না। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদী অন্নই তিনি নিত্য গ্রহণ করিতেন। বেলা এগারটার পূর্ব্বেই আহারাদি সারিয়া বাবাজী মহারাজ প্রত্যহ কাছারী যাইতেন, তাঁহার পাতের ভাত ততক্ষণে শুকাইয়া কড়কড়ে হইয়া থাকিত। মাতাঠাকুরাণী শক্ত ভাত খাইতে পারিতেন না, সুতরাং ইহাতেও

তাঁহার কষ্ট হইত। তথাপি তিনি সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও দিনের পর দিন নিষ্ঠার সহিত শ্বশুরের সেবা ও নিজের নিয়ম পালন করিতেন। কিন্তু শরীরে তাহা সহিল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমাগত পিত্ত পড়াইয়া, অনেক বেলায় খালিপেটে রান্না করিয়া ও অবেলায় শুকনা ভাত খাইয়া তিনি দারুণ পিত্তশূল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। বহু চিকিৎসাতেও ইহা পরে আর সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নাই। আমরণ পেটের পীড়ায় তিনি কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন *।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সকলই দেখিতেন এবং বুঝিতেন, কিন্তু পিতৃদেবকে কখনও ইহা লইয়া একটি কথাও কহেন নাই। স্ত্রীর ক্লেশে অন্তরে বেদন বোধ করিলেও পিতৃদেবের সেবা যে এত কষ্ট করিয়াও পত্নী সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহাতে সন্তুষ্ট হইতেন এবং অন্তরে বিশ্বাস করিতেন যে, স্ত্রী ইহার শুভফল পরিণামে অবশ্যই লাভ করিবেন।

---

* শ্রীযুক্ত বাবাজীমহারাজ কথাপ্রসঙ্গে একসময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন :—

"স্ত্রী বড় কষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তিনি ত রান্না করিতেন। আমি বেলা দশটা এগারটার সময় আহার করিয়া কাছারী চলিয়া যাইতাম, সেই রান্না সকালে হইত। * * আমার পিতা সকালে খাইতেন না, বেলা এগারটার পর তিনি স্নানে যাইতেন, তখন তাঁহার জন্য স্ত্রী রান্না চড়াইতেন। বাবার আদেশ ছিল তাঁহার রান্নার পূর্ব্বে কেহ জলগ্রহণ করিলে তিনি তাহার হাতে খাইবেন না। বেলা দুইটা আড়াইটার সময়ে খাইতেন। তিনি শক্ত ভাত গরম গরম অর্দ্ধসিদ্ধ খাইতেন, সেরূপ না হইলে ফেলিয়া দিতেন। স্ত্রী বেলা আন্দাজ তিনটার সময় আমার পাতে যাহা থাকিত (তাহা ততক্ষণ কড়কড়া হইয়া যাইত) আর বাবার প্রসাদী শক্ত ভাত খাইতেন। তিনি আবার শক্ত ভাত খাইতে পারিতেন না। এই রকম উপবাস করিতে করিতে পিত্ত পড়িয়া তাঁহার শূল বেদনা হইল এবং আজীবন তাহা ভোগ করিলেন। (রান্না কিন্তু বড় সুন্দর করিতেন। আমার পিতার এক জ্ঞাতি খুড়া [illegible] [illegible] বাসায় থাকিতেন। তাঁহার মেয়ের বাড়ী কাছে ছিল, কিন্তু মেয়ের ছেলে হয় নাই বলিয়া সে

এইরূপে সর্ব্বতোভাবে পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেও একটি বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পিতার শাসন মানিতেন না। কেন যে পিতা-পুত্রে ঝগড়া বাধিত, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় থাকিতেন। কোর্ট হইতে ফিরিবার পর তাঁহার নিকট বাবাজী মহারাজ প্রায়ই যাইতেন। এক একদিন ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইত। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার জন্য জাগিয়া বসিয়া থাকিতেন। শ্রীযুক্ত জগৎবাবুর অপরাপর শিষ্যগণের সহিত সন্ধ্যার পর সাধনের বৈঠকে যোগদান করার ফলেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ ঘটিত। তাঁহার পিতা ইহাতে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইতেন। তথাপি ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গ করা হইতে বাবাজী মহারাজ বিরত হইতেন না। তাঁহার এইরূপ ধর্ম্মবন্ধুর সংখ্যা অধিক ছিল না, কিন্তু ইঁহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আন্তরিক ও গভীর ছিল। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাসাতেও আসিতেন ও তাঁহার সহিত একত্রে বসিয়া পরস্পর ধর্ম্মালাপাদি করিতেন। এরূপ কখনও হইত যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বাটীতে নাই, তাঁহার কোন কোন ধর্ম্মবন্ধু আসিয়া তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁহার পিতা ইঁহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার

বাড়ীতে খাইতেন না। তিনি বলিতেন, "এমন একদিনও হইল না, যে দিন বলিতে পারিলাম যে রান্না খারাপ হইয়াছে।") পিত্ত পড়িয়া গিয়া শূল বেদনা হইলেও খুব নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়া গিয়াছেন। অন্য কেহ ঐ অবস্থায় সেই ভাবে সেবা করিতে পারিত বলিয়া মনে করি না। * * * শেষ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন শ্রীশ্রীঠাকুরজী। অশুভের দ্বারা শুভ করিয়াছেন। এত ক্লেশে জেলিয়াও ভাল করিয়া লইয়াছেন। খুব পেঁচ দিয়া মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মের যা কিছু দুষ্কৃতি সব হইতে খালাস হইয়া নির্ম্মল হইয়া গিয়াছেন, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

করিতেন, কখনও কখনও অপমানজনক বাক্যাদি বলিয়াছেন, এমনও ঘটিয়াছে। ইহা লইয়া পিতাপুত্রে পরে ঝগড়া বাধিত। শ্রীযুক্ত হেমকিশোরবাবু বলেন, "কয়েকদিন পর্য্যন্ত উভয়ের বাক্যালাপ বন্ধ থাকিত। ঠাকুরদাদা বাবার নিকট চিঠি দ্বারা তাঁহার বক্তব্য জানাইতেন। এই সকল চিঠির আমিই বাহক ছিলাম। কয়েকদিন এইরূপ চলিয়া পরে মিটিয়া যাইত।"

দেশে বাবাএর বাটীতে তাঁহাদের "বারমাসে তের পার্ব্বণ" হইত। সমারোহ করিয়াই প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজা হইত ও তদুপলক্ষে প্রতিবৎসর কলিকাতা হইতে সকলে পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইতেন। ১২৯৮ সালে এইরূপে পূজার ছুটিতে দেশে গিয়া বন্ধের শেষে যখন ফিরিতেছিলেন, তখন চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদিগকে আগাইয়া দিবার নিমিত্ত নৌকা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ষ্টীমার ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কাহারও বারণ না মানিয়া তুলিয়া দিবার জন্য ষ্টীমারেও উঠিলেন, কিন্তু সময় মত নামিতে পারিলেন না, ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। জাহাজের দোতলা হইতে নৌকার মাঝিকে ডাকিয়া পরের ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইতে বলিয়া দেওয়া হইল। সেখানে তিনি নামিয়া অনেক অপেক্ষা করিয়া নৌকা আসিলে তাহাতে চড়িয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু এই ঘটনায় ঠাণ্ডা লাগিয়া খুব সর্দ্দিকাশি হইল। বাড়ীতে গিয়াও তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অগ্রাহ্য করার ফলে এবং তদুপরি আবার অনিয়ম অত্যাচার করায় কয়েক মাস অল্প অল্প ভুগিয়া পরে হাঁপানীর উপদ্রব হইল। দেশে কিছুকাল চিকিৎসা চলিল, কিন্তু রোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ছাড়া তাহাতে আর কিছু ফল হইল না। অবশেষে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবেন স্থির করিয়া ১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দেশের বাটীতে গেলেন।

চৌধুরী মহাশয় তখন শয্যাগত, উত্থানশক্তি নাই। খুব বড় একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, এই অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া সমস্ত পবিবারবর্গ সমেত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কলিকাতা অভিমুখে বওয়ানা হইলেন, অভিপ্রায় ছিল সমস্তপথ সেই নৌকাতেই আসিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠিল না। বর্ষাকালে ওদেশ জলে ডুবিয়া যায়, খাল, বিল, মাঠ ভাসিয়া নদীর সঙ্গে একাকার হইয়া যায়, প্রভেদ এইটুকু মাত্র যে নদীতে স্রোত থাকে, মাঠের জলে স্রোত থাকে না। কাজেই জলপথে বিভিন্ন স্থানেব মধ্যে দূরত্ব খুব কমিয়া যায়। কারণ নদীপথ দিয়া ঘুরিয়া আসিবাব আর আবশ্যকতা থাকে না, সমস্ত স্থান জলময় বলিয়া একটানা সোজা পথেই আসা যায়। এইরূপ সোজা জলপথে সাবাদিন চলিয়া আসিয়া নৌকা যখন বুড়িগঙ্গার কূলে পৌছিল, তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। বুড়িগঙ্গা পার হইবার সময় আকাশে মেঘ করিয়া ঝড় উঠিল। মাঝিরা ভয় পাইয়া গেল, এ অবস্থায় পাড়ি ধরিতে কিছুতেই রাজি হইল না। বাবাজী মহারাজ দেখিলেন তখনই দিন থাকিতে থাকিতে নদী পার না হইলে ঝড়বাদলে রাত্রে পাড়ি দেওয়া আরও কঠিন হইবে, সারারাত্রি হয়ত এখানেই থাকিতে হইবে, অথচ নদী পার হইতে পারিলে বিলের মধ্য দিয়া সারা রাত্রিও নৌকা চালান যাইবে। কঠিন রোগগ্রস্ত পিতাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় লইয়া যাইতেছেন, এরূপ অবস্থায় পথে অপেক্ষা করিতে তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। বলিলেন, "এ অবস্থায় দেরী কিছুতেই করা যাইতে পারে না। আষাঢ় মাস, বর্ষাকালের ঝড় বাদল অনেক সময় দু'তিন দিনও থাকে। তোমাদের যদি সাহস না হয়, আমিই হাল ধরিতেছি, তোমরা দাঁড় ধর।" এই বলিয়া নিজেই গিয়া হাল ধরিয়া পাড়ি দিলেন। দেখাদেখি সাহস পাইয়া আরও কয়েকখানি বড় বড় মালের নৌকা তাঁহাদের পিছনে পিছনে পাড়ি ধরিল। নদী পার

হইয়া যখন নৌকা হাওরের মধ্যে পড়িয়াছে, সেই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। যে মাস্তুলে পাল খাটান ছিল, সেই মাস্তুলটি ভাঙিয়া গিয়া পাল জলে পড়িয়া গেল ও নৌকা কাৎ হইয়া তাহাতে অনেকখানি জল প্রবেশ করিল। নৌকার মধ্যে সোরগোল পড়িয়া গেল, মেয়েরা কেহ কেহ কাঁদিয়া উঠিলেন, চৌধুরীমহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তুই আমার ভরা ডুবি করিবি। গোষ্ঠীশুদ্ধ আজ এখানে জলে ডুবাইলি ॥" বাস্তবিক বিপদ কিছু ঘটিল না, তৎক্ষণাৎ কয়েকজন বলিষ্ঠ মাঝি হাওরের মধ্যে নামিয়া পড়িল ও পাল উঠাইয়া, নৌকা সোজা করিয়া, জল ছেঁচিয়া, মাস্তুল আবার বাঁধিয়া শীঘ্রই সব ঠিক করিল। নৌকা আবার হাওরের অগভীর জলের মধ্য দিয়া সোজা পথে পাল ভরে দ্রুত চলিল। বিপদ হইল না, কিন্তু ইহার একটি ফল এই হইল যে, অতঃপর তাঁহারা যখন বর্ষায় স্ফীতকায়া তীব্রস্রোতা পদ্মার বিপুল জলরাশির সম্মুখীন হইলেন, তখন সকলের সমবেত নিষেধ উপেক্ষা করিয়া আর নৌকা চালাইবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জিদ করিতে পারিলেন না। সেই রাত্রি সেখানেই নৌকা বাঁধিয়া থাকা হইল। কাছেই একটি পাটের গুদাম ছিল। মাঝে মাঝে মাল লইবার জন্য ষ্টীমার সেখানে আসিত। কর্ম্মচারীদের নিকট সেই রাত্রেই খোঁজ লইয়া জানা গেল, পরদিন সকালে ষ্টীমার আসিবার কথা। তখন বাকী পথ ষ্টীমারে আসাই স্থির হইল। সেই ষ্টীমারে যাত্রীও লইত। পরদিন যথাসময়ে ষ্টীমার পৌঁছিলে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া সকলে ষ্টীমারে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। বাবাজী মহারাজের বিশেষ অনুরোধে ষ্টীমারের একজন কর্ম্মচারী তাঁহার কেবিনটি ছাড়িয়া দিলেন ও সেইখানে রুগ্ন চৌধুরী মহাশয়কে আনিয়া রাখা হইল। নৌকার মাঝিদিগকে যথাযোগ্য অর্থ দিয়া বিদায় দেওয়া হইল। গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত এইরূপে সকলে ষ্টীমারে চড়িয়া আসিলেন। এখানে

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বিপুল চেষ্টা ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া চব্বিশ ঘণ্টার নোটীশ ব্যতিরেকেই রুগ্ন পিতার জন্য গাড়ী রিজার্ভ করিলেন। কিন্তু এই সকল কার্য্য করিতে এত বিলম্ব হইয়া গেল যে, শেষে যখন সকলকে গাড়ীতে উঠাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন, তখন গাড়ীর সময় আর ছিল না। রুগ্ন পিতাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া গাড়ীতে উঠাইবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন বাধ্য হইয়া পরবর্ত্তী ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল এবং উপযুক্ত স্থানাভাবে নৌকা ভাড়া করিয়া তাহাতে সকলকে রাখিলেন। অতঃপর পুনরায় গাড়ী রিজার্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ট্রেণে সকলেই কলিকাতায় আসিলেন।

পরদিনই কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণকে ডাকিয়া দেখান হইল। রোগীকে একেবারে কাশী লইয়া যাওয়ার কথাই হইয়াছিল, কিন্তু ডাক্তারেরা অনুমোদন না করাতে আর তাহা হইল না, কলিকাতাতে রাখিয়াই চিকিৎসা চলিতে লাগিল। প্রথমে কিছুদিন ডাক্তারি চিকিৎসা করিয়া ফল না হওয়াতে কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। তৎকালীন খ্যাতনামা চিকিৎসক সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কলিকাতায় স্যালজার সাহেব নামে একজন অতি বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ ছিলেন। তিনি জাতিতে জার্ম্মাণ ছিলেন। একদিন তাঁহাকে আনা হইলে তিনি রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, "যন্ত্রণার উপশমের জন্য আমি ঔষধ দিব বটে, কিন্তু ইহার আর আড়াই মাসের অধিক আয়ুঃ নাই।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাদিগকে কোন সময়ে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পরে কার্য্যতঃ এই জার্ম্মাণ ডাক্তারের কথাই খাটিয়াছিল। বাবাজী মহারাজ পিতার চিকিৎসার নিমিত্ত অর্থব্যয় এবং সেবা শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না। প্রায় প্রথম হইতেই সারাদিনরাত্রি

কাহাকেও রোগীর নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা পাখা করিতে হইত। পালাক্রমে রাত্রিজাগরণ সকলে করিতেন। বিশেষতঃ বাবাজী মহারাজের বিমাতা ৺ইচ্ছাময়ী দেবী ও মাসতুত ভ্রাতা ৺কুমারচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় অধিকাংশ সময় রাত্রি জাগরণ করিতেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে ওকালতির কার্য্য করিতেই হইত, এজন্য রোগীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া সেবাশুশ্রূষায় তত যোগ দিতে পারিতেন না, তথাপি যথাসাধ্য করিতেন।

চিকিৎসা অথবা শুশ্রূষার কোনও ত্রুটি না হইলেও, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে কাশী মিত্রের ঘাটে একজন সাধু থাকিতেন, সকলে তাঁহাকে 'ব্রহ্মচারীজী' বলিতেন। একদিন রাত্রি প্রায় বারটার সময় অনাহূত ভাবেই তিনি হঠাৎ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, "অবস্থা ভাল নয়, একাদশী কাটাইবেন কিনা সন্দেহস্থল। শীঘ্র গঙ্গাযাত্রা করান উচিত।" তৎপরদিনই সকলে আহারাদির পর পাল্কী করিয়া চৌধুরী মহাশয়কে কাশী মিত্রের ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল ও সেখানে গুহবাবুদের Moribund Houseএ রাখা হইল। বাটীর প্রায় সকলেই সেখানে রহিলেন, কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও পূর্ব্বোল্লিখিত কুমারচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় রহিলেন। সেই রাত্রেই রোগ বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইলে "ব্রহ্মচারিজী"কে ডাকিয়া আনা হইল এবং তাঁহার পরামর্শ মত অনতিবিলম্বেই "অন্তর্জ্জলী"র ব্যবস্থা করা হইল। এইরূপে ১২৯৯ সালের ৩রা ভাদ্র স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের সমক্ষে শ্রীযুক্ত হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় গঙ্গায় অন্তর্জ্জলী অবস্থায় সজ্ঞানে পরলোকগমন করিলেন।

পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া, পরিবারস্থ সকলকে

লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দেশে রওয়ানা হইলেন। প্রায় তিন সহস্র টাকা ব্যয়ে দেশের বাটীতে মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ হইল *। এই সময়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রাদ্ধদিবসের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার সমস্ত পাওনাদারগণকে অনুসন্ধানপূর্ব্বক ডাকাইয়া আনিয়া পিতার সমস্ত ঋণ নিঃশেষে পরিশোধ করিয়াছিলেন। এতৎসম্পর্কিত একটি ঘটনা তিনি সময় সময় উপদেশচ্ছলে আমাদিগকে বলিতেন। তাহা এই :—তাঁহার পিতার দেহান্তের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি বলিয়া উঠেন, "ওর মছলন্দ্‌কে বিদায় কর্। মছলন্দকে বিদায় কর্। ওর পাওনা মিটাইয়া ওকে বিদায় কর্।।।" এইরূপ কয়েকবারই বলিয়াছিলেন। বিকারের প্রলাপ মনে করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি এই কথায় তত মনোযোগ করেন নাই ও পরে ইহা আর স্মরণও ছিল না। পরে বামৈএর বাটীতে যখন পিতার পাওনাদার সকলকে মিটাইয়া দিতেছিলেন, তখন অন্যান্যের মধ্যে মছলন্দ্‌ নামক সেই লোকটিও আসিয়াছিল। সে জাতিতে মুসলমান জোলা, তাহার সহিত ইঁহাদের অনেকদিনের লেনদেন ছিল। ৺চৌধুরী

* ৺হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় এক উইল করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহাই তিনি এই উইল মূলে পুত্রগণকে ও পত্নীকে ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে যাহার যেরূপ পাইবার কথা তিনি তদ্রূপই পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ৺চৌধুরী মহাশয় হস্তক্ষেপ করেন নাই। উইল দ্বারা তিনি চারি পুত্রের প্রত্যেককে পাঁচশত টাকা, ও স্ত্রীকে পাঁচশত টাকা দিয়াছিলেন ও এতদ্ভিন্ন নিজের শ্রাদ্ধের জন্য পাঁচশত ও পরে তীর্থশ্রাদ্ধের জন্য পাঁচশত টাকা রাখিয়া যান ইহা দ্বারা এই সময়ে শ্রাদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহ হইবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একত্র মায়ের টাকা অথবা ভাইদের অংশের টাকা গ্রহণ করেন নাই।

মহাশয়ের জমাখরচের খাতায় বাবাজী মহারাজ দেখিলেন, তাহার হিসাব শোধই লিখা আছে, সুতরাং তিনি তাহার প্রার্থিত টাকা দিতে ইচ্ছুক হইলেন না। সে লোকটি বলল "আপনাদের অনেক নুন খাইয়াছি, এ টাকা যখন আপনাদের স্মরণই নাই, তখন থাকুক, আমি আর উহা চাই না তবে আমার প্রাপ্য ঠিকই।" বাবাজী মহারাজের এক কাকা উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন 'খাতাতেই ভুল আছে, ও যাহা বলিতেছে তাহা ঠিকই ও টাকা পাইবে, এই পাওনার বিষয় আমি জানি।' এই সময়ে চৌধুরী মহাশয় মৃত্যুর পূর্ব্বে যা কথা বলিয়াছিলেন তাহা তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের স্মরণ হইল তখন তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাকে টাকা দিয়া দিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সমস্ত ঋণ যত্নপূর্ব্বক পরিশোধ করিতে উপদেশ দিতেন, বলিতেন, "নতুবা উহা মৃত্যুকালেও লোককে ক্লেশ দেয়।"

এক বৎসর পরে পিতার সপিণ্ডীকরণ সমাপন করিয়া, ১৩০০ সালের ভাদ্রমাসে, পূজা উপলক্ষে হাইকোর্ট বন্ধ হইলে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মাসাধিক কাল বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নিজের আভ্যন্তরিক এক বিশেষ অবস্থার জন্য দুই বৎসর পূর্ব্বে ১২৯৮ সালে তাঁহার তীর্থভ্রমণের কিরূপ বলবতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল তাহা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, নিজের আন্তরিক ইচ্ছার জন্য ও পিতৃদেবের গয়ায় পিণ্ডদান ও তীর্থশ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজনে এই সময়ে বাবাজী মহারাজ সপরিবারে তীর্থভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। এই তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার বিমাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তিনটি, তাঁহার মাতুল, মাতুলানী,

বৈমাত্রেয় ভগিনী দুইটি, ভগিনীপতি, আমি, আমার বাবা, মা, মাসী ও একটি জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী প্রভৃতি ষোল জন গিয়াছিলেন।

"তখন প্রায় তীর্থেই পাণ্ডাদের খুব উৎপীড়ন ছিল, সুতরাং কয়েক স্থানেই তাঁহার সঙ্গে গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার সঙ্গে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের সঙ্গেও অনেক স্থানে এরূপ গোলযোগ বাধিত, কিন্তু তাঁহার ন্যায়সঙ্গত পরাক্রম দেখিয়া পরে সকলেই বাধ্য হইয়া সদ্ব্যবহার করিত। তিনি কোন স্থানে কোনদিন অন্যায়ের সমর্থন করেন নাই, বা ভীত বাঙ্গালীর মত উৎকোচ দিয়া নিরুপদ্রব হওয়ার চেষ্টা কখনও করেন নাই। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য শেষকাল পর্যন্ত আমি অনেক স্থলে লক্ষ্য করিয়াছি। মাসেকের উর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত বৈদ্যনাথধাম, গয়া, কাশীধাম, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগরাজ, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কনখল, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।"

দেশের বাড়ীতে কেহ না থাকিলে বাড়ীঘর জমিজমা সব নষ্ট হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় বিমাতা ইচ্ছাময়ী দেবী দেশের বাটীতেই রহিয়া গেলেন, কলিকাতায় আসিয়া ছেলেদের নিকট বাস করিলেন না, মধ্যে মধ্যে আসিতেন মাত্র। দেশের বাটীতে তাঁহার নিকট একটি চাকর থাকিল, মেয়েরা কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে আসিতেন। আর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পূজার ছুটিতে প্রতিবৎসর একবার করিয়া দেশে যাইতেন। পাশের বাড়ীর একজন জ্ঞাতির উপর বিমাতাকে তত্ত্বাবধান করার এবং বাড়ী ও জমিজমা দেখিবার ভার দিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত চলিল। দেশে যাহা জমিজমা ছিল, তাহার আয় হইতেই বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র সংসার

ও বারমাসে তের পার্ব্বণের (সে সকল পূর্ব্বের ন্যায়ই এখনও হইত) ব্যয়নির্ব্বাহ হইবার কথা কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না, এই পাঁচ বৎসরে কিছু ঋণ হইয়া গেল। কাজেই অতঃপর বৈমাত্রেয় ভাইদের মধ্যে এক-জনকে বিষয়-সম্পত্তি দেখিবার নিমিত্ত বাড়ী পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মধ্যম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হেমকিশোরকেই ১৩০৪ সালে দেশে পাঠাইলেন ও তিনি সেখানে মায়ের নিকট থাকিয়া বিষয়সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসে অন্নদাকিশোরের বিবাহ হইল এবং ইহার পর বৎসর (১৮৯৯ খৃঃ) তিনি এণ্টান্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। অতঃপর তিনিও দেশে চলিয়া গেলেন এবং উভয় ভ্রাতা একত্রে কিছুকাল দেশের বাটীতে বাস করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মতান্তর আরম্ভ হওয়ায় খুব সম্ভবতঃ ১৩০৯ সালে হেমকিশোর আবার কলিকাতায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তদবধি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সংসার ত্যাগ করার সময় পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত তাঁহার আশ্রয়েই বাস করিয়াছিলেন। কলিকাতা আসার অব্যবহিত পরেই তিনি খুব পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল সেই রোগভোগ করেন। খবর পাইয়া দেশের বাটী হইতে ইচ্ছাময়ী দেবী আসিয়া কিছুকাল কলিকাতার বাসায় ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার চিকিৎসার্থ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বে এবং পরেও তাহা করিয়াছেন। বৈমাত্রের ভ্রাতাগণকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন। শ্রীযুক্ত হেমকিশোরবাবু এই সকল বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বলেন, "তথাপি কোন দিনই তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে সাহসী হই নাই।"

ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজনাদি পোষ্যবর্গ অধিকসংখ্যায় উপস্থিত

সুতরাং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কলিকাতার সংসারও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ব্যয়ও তদনুসারেই বাড়িতেছিল। ১৩০১ সালে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসা পরিবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। এই বৎসরই ভাদ্রমাসে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার দীক্ষা হয়। দীক্ষাগ্রহণার্থ বৃন্দাবন যাইবার প্রাক্কালে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসা একেবারে উঠাইয়া দিয়া গেলেন। জিনিষপত্র অধিকাংশ তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের বাসায় রাখিয়া গেলেন। দীক্ষান্তে ফিরিয়া আসিয়া শ্যামবাজারের ৯।২নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেনের বাসায় উঠেন। এই বাসাতেই প্রথম শ্রীশ্রীশালগ্রাম দেবকে আনিয়া তাঁহার সেবা আরম্ভ করেন। সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে এই বাড়ীটি অনেকটা বড় ছিল এবং এখানে আসিয়া অনেকগুলি ছাত্রকে বাসায় স্থান দিয়াছিলেন।

অনেক দিন হইতেই তিনি শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণে জ্ঞান থাকিলে শাস্ত্রচর্চ্চার সুবিধা হইবে বলিয়া এই সময়ে তিনি একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "১৩০২ সালে তাঁহাকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইবার নিমিত্ত বলদেব সার্ব্বভৌম নামক একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তিনি অতি সরল প্রকৃতির বৃদ্ধ লোক ছিলেন, তোৎলাইয়া কথা বলিতেন। প্রতিদিন রাত্রি আটটার আসিয়া তিনি তাঁহাকে পড়াইতেন। শনি ও রবিবারে বেলা দুইটায় আসিতেন। সাত আট দিন পড়াইবার পর একটি সূত্র পড়াইবার সময়ে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'বাবু! আর একটু আগাইয়া গেলে এই সূত্রটি ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন, এখন মোটামুটি বুঝিয়া যাউন।' পণ্ডিতজী চলিয়া গেলে তিনি

ভাবিলেন, 'ইনি এরূপ বলিলেন কেন ? আচ্ছা, আমি নিজেই একবার দেখি।' ভাবিয়া সেই স্থানটি নিজেই দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন বুঝিতে কোন কষ্ট হইল না, এইরূপ ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রকরণটিই পড়িয়া ফেলিলেন। পরদিন পণ্ডিতজী পড়াইতে আসিলে বাবাজী মহারাজ প্রথমেই পূর্ব্বদিনের স্থলটি ও তাহার পরের কতকগুলি সূত্র বিশদভাবে পণ্ডিতজীর নিকট ব্যাখ্যা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা ঠিক হইয়াছে কিনা। ব্যাখ্যা শুনিয়া পণ্ডিতজী বলিলেন, 'আপনাকে কে ইহা এইরূপে বুঝাইয়া দিল' ? তিনি বলিলেন, 'আমাকে কে আর বুঝাইয়া দিবে ? আমি নিজেই বুঝিয়া নিয়াছি।' তখন পণ্ডিতজী বলিলেন, 'বড় আশ্চর্য্য কথা, আপনার ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে।' এই দিন আর পাঠ হইল না। পরদিন রবিবার ছিল। মধ্যাহ্ন প্রসাদ পাওয়ার পর বৈঠকখানার ঘরে বিছানায় বাবাজী মহারাজ অল্পক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতেছেন, একটু তন্দ্রাও আসিয়াছে, আমি তাঁহার পা টিপিতেছি, এমন সময় পণ্ডিতজী আসিয়া তাঁহার পায়ের দিকে মাথা দিয়া প্রণাম করিবার মত অবস্থায় রহিলেন। ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম। এই সময় তিনিও হঠাৎ জাগিয়া পণ্ডিতজীর এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিত মহাশয়। আপনি এ কি করিতেছেন ?' এবং দুই হাতে তাঁহাকে তুলিয়া প্রণাম করিলেন। তখন পণ্ডিতজী বলিলেন 'বা-া-া বা ··· বু ···· আ · · মি, আপনাকে পড়াইতে পারিব না। আপনি মহা-পণ্ডিত।' বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন, 'না, না, আপনিই পড়াইতে পারিবেন।' পণ্ডিতজী কিছুতেই স্বীকার করিলেন না ও বলিলেন, 'আমি আপনাকে একজন কলিকাতা-নিবাসী খুব ভাল পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দিব।' অগত্যা তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং কয়েক দিন পর হইতেই পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতমহাশয় দ্বারা আনীত অপর একজন

পণ্ডিতের নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মাস ছয়েকের মধ্যেই তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শেষ করিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবেন মনঃস্থ করিয়া বানিয়াচঙ্গ নিবাসী তর্কপঞ্চানন উপাধিধারী একজন অধ্যাপককে নিযুক্ত করতঃ আট দশ দিন তাঁহার নিকট ভাষা পরিচ্ছেদ পড়িয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্র তোতা পাখীর মত মুখস্থ করিবার বিষয় নহে। পদার্থগুলি ভিতর হইতেই ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এই বলিয়া আর ন্যায়শাস্ত্র পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিলেন না। ইহার পর আর কোন পণ্ডিতের নিকট তিনি কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই। পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু কৃত পাতঞ্জল দর্শন ও সাংখ্য দর্শন নিজে নিজে তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছি। সমস্ত দর্শন, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনেক গ্রন্থই তাঁহার নিকট ছিল। নিজে নিজে এই সকল গ্রন্থ তিনি পড়িতেন দেখিয়াছি।

"এই সময় হইতে আমি এবং তাঁহার দেশের গুরু গোপাল ভট্টাচার্য্য তাঁহার নিকটে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতাম। প্রতিদিন সূত্রবৃত্তি ও পদসাধন প্রণালী ইত্যাদি বঙ্গানুবাদ করিয়া বৃহৎ খাতায় লিখাইয়া দিতেন। এইরূপে আমাদের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল।"

১৩০৪ সালে পুনরায় বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া ৪০নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজারে আসিলেন। এই নূতন বাসাটি বেশ বড, দোতলায় প্রকাণ্ড হলে বৈঠকখানা, নিম্নতলে অনেকগুলি ঘর, পাকের ঘর, খাইবার ঘর ইত্যাদি ব্যতীতও সেখানে আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত, অভ্যাগত, বিদ্যার্থী ছাত্র, চাকর, সহিস, কোচোয়ান প্রভৃতি সকলেরই স্থান হইত। গরু থাকিবার জায়গাও ছিল। উপরেও অনেকগুলি ঘর থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দির ও নিজেদের সকলের শয়নের স্থানও কুলাইয়া যাইত।

এই বাস আর পরিবর্ত্তন করেন নাই, ১৩০২ সালে সংসার ত্যাগকাল পর্য্যন্ত এখানেই বাস করিয়াছিলেন। এই বাসাতে তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ এক সময়ে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার সংসার-যাত্রা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা প্রমদা দেবী * বলেন, "ছাত্র কেহ বাস করিবার জন্য উপস্থিত হইলে কাহাকেও ফিরাইয়া দিতেন না। যতক্ষণ জায়গায় কুলাইত, ততক্ষণ কোন ছাত্রকে 'না' বলিতেন না। কেহ থাকিবার জন্য আসিলে বলিতেন 'যাও, নীচে গিয়া দেখ সেখানে আর স্থান আছে কিনা। শুইবার জায়গা থাকিলে আমার কোন আপত্তি নাই।' সুরেন্দ্র নামক একটি ছেলে একবার বলিল, 'অন্য ছেলেরা খাটের উপর শোয়, আমি খাটের তলাতেই শুইব। আমি কোথাও জায়গা পাইতেছি না, আমাকে আপনার রাখিতেই হইবে।' শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রথমতঃ আপত্তি করিয়া অবশেষে তাহার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া রাজী হইলেন। ইহার কয়েকদিন পরে একদিন আশু আসিয়া বলিল, 'দিদি! সুরেন্দ্র খবরের কাগজ পাতিয়া শোয়, ওর বিছানা নাই।' তখন মাঠাকুরাণী দুইখানি কাঁথা দিলেন, তাহা সুরেন্দ্রকে দেওয়া হইল। এ রকম মধ্যে মধ্যে ঘটিত। কচিৎ কখনও অন্যত্র থাকিয়া এ বাসায় খাইত, এরকম ছাত্রও দুই একটি দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (যিনি এখন প্রতিপত্তির সহিত কলিকাতায় কবিরাজী ব্যবসায় করিতেছেন) ছাত্রাবস্থায় শ্যামবাজারে কোন বাসায় থাকিতেন এবং এই বাসায় রোজ খাইয়া যাইতেন। অতিথিরা ও আত্মীয়স্বজনেরা আসিয়া যাহার যতদিন ইচ্ছা থাকিত। এক ব্রাহ্মণ বোসপাড়ার বাড়ীতে

* ইনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম সম্পর্কে আত্মীয়া, বোসপাড়া লেনের বাসায় তাঁহার আশ্রয়ে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

আসিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুকাল থাকিতেন। রসুইয়া ঠাকুর একদিন একটু ঝাঁঝের সহিত তাহাকে বলিল, "একদিন ধ'রে এখানে প'ড়ে আছ কেন?" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহা শুনিতে পাইয়া ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কেন তুমি ওকে খিট খিট করছ? সাধুরজীর বাড়ীতে ঠাকুরজী এসেছেন। সে ওর নিজের ভাগ্য খাচ্ছে।" তিনি যে নিকটেই ছিলেন ও তাহার কথা শুনিতে পাইবেন ইহা রসুইয়া ঠাকুর জানিত না।

"বিমাতাকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত যত্ন করিতেন। দেশের বাটী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া তিনি এক এক সময় এক সঙ্গে কয়েক মাসও থাকিতেন। বাবাজী মহারাজের বাসায় একটি বড় সুন্দর রীতি ছিল। প্রত্যহ আরতির পর শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে প্রণাম করিয়া সকলেরই গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে হইত। এই সময়ে আমরা সকলেই এবং ছাত্রেরাও তাঁহাকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম করিতাম। তিনিও নিত্যই ভক্তি সহকারে বিমাতাকে প্রণাম করিতেন। তাঁহার তখনকার ভাব আমাদের সকলেরই চিত্ত কত গভীরভাবে স্পর্শ করিত তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রণাম করা বিষয়ে আমাদের কখনও ভুল হইলেও তাঁহার কখনই হইত না।

"একদিন তাঁহার কাছারী যাইবার পোষাক পরা হইয়া গিয়াছে, এমন সময় জানিতে পারিলেন, মার রান্না চড়ে নাই। তখন কাছারী যাওয়া স্থগিত রাখিয়া বিমাতার জন্ত রান্নার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকল ব্যবস্থা হইয়া তাঁহার রান্না চড়িয়া গেলে তবে কাছারী গেলেন। এইরকম এক একদিন হইত। কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া মায়ের পছন্দ মত জলখাবারের ব্যবস্থা প্রত্যহ নিজে করিতেন।

"মায়ে পোয়ে ঝগড়াও কোন কোন সময় হইত। একদিন পড়াশুনায়

অমনোযোগের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা তরণীকিশোরকে প্রহার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিমাতা কলিকাতার বাসায় ছিলেন। তিনি ইহাতে রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি আমার ছেলেকে মারিতে পারিবে না।" বাবাজী মহারাজও সমানভাবে উত্তর দিয়া বলিলেন, "আমার বাপের ছেলে আমি মারিব, তাতে তোমার কি?" যেখানে ভিতরে এত দরদ, সেখানে এরকম ঝগড়া টিকে না। মাকে ক্রমেই নরম হইতে হইত। এক একদিন বিমাতা নরম হইতেন না, বরং রাগ করিয়া না খাইয়া থাকিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে বাবাজী মহারাজ নিজেই নরম হইয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিতেন, তখন তাঁহার রাগ পড়িত ও তিনি খাইতেন।

"পূর্ণশশী নামে একটি ঝি ছিল। সে অনেক বৎসর এই বাসায় কাজ করিয়াছিল। সে কাজে যেমন মজবুত, বকিতেও তেমন পটু; দ্রুতহস্তে সুন্দর ঝরঝরে কাজ করিত, আবার একটুতেই রাগিয়া ঝগড়া করিয়া বকিয়া ঝকিয়া অনর্থ বাধাইত। মধ্যে মধ্যে সে রাগ করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত, আবার দু-চারিদিন পরে ফিরিয়া আসিত ও থাকিবার জন্য সাধিত। তাহার ঝগড়ার চোটে মাঠাকুরাণী অস্থির হইয়াছিলেন বলিয়া এক একবার তিনি আর তাহাকে রাখিতে চাহিতেন না। তখন বাবাজী মহারাজ বলিতেন, "রাখ, রাখ, শরণাগতকে পরিত্যাগ করিতে নাই, দয়া করিতে হয়।" একটি স্বভাব তাঁহার আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়াছি, যে প্রকৃত কাজের লোক, তাহার অনেক দোষ তিনি সহ্য করিতেন।

"অনেকগুলি গরু ছিল, নিত্যই যথেষ্ট দুধ হইত। রাত্রে দধি পাতিয়া রাখা হইত, সকালে দই টানিয়া মাঠাকুরাণী মাখন তুলিতেন, সেই মাখন হইতে ঘৃত প্রস্তুত হইত, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগে লাগিত। দই টানিয়া সকাল বেলায় যে ঘোল হইত, তাহা দুপুরে

ভাতের সঙ্গে সকলে খাইত। দুপুরে কাহাকেও দুধ দেওয়া হইত না, রাত্রে সকলকেই দুধ দেওয়া হইত। কেবল বাবাজী মহারাজ দুবেলাই দুধ খাইতেন, তিনি ভাত খুব কম খাইতেন, দুধই বেশী খাইতেন। আর একটি স্বভাব তাঁহার দেখিয়াছি, গৃহে যে জিনিসই আসুক, সকলকে না দিয়া তিনি খাইতেন না। একদিন শ্রীমতী মুক্তি * সকালে দই টানিয়া ঘোল করিয়াছিলেন। তখন একজনের পরিমাণ মাখন বাবাজী মহারাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়া বাকী ঘৃত করিবার জন্য দেন। তিনি আহারের সময় পাতে মাখন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলকে মাখন দেওয়া হইয়াছে কিনা? জানিলেন কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। সেদিন ছুটির দিন, ছুটির দিনে তাঁহার খাইতে দেরী হইত, তখন অন্য সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তখন আর দিবারও উপায় ছিল না। তিনি তখন মাখন খাইলেন না, পরে রাত্রে সকলকে মাখন দেওয়া হইলে তবে খাইলেন।

"একবার কয়েকটি গরু একসঙ্গে গর্ভবতী হওয়ায় দুধ কমিয়া গেল। মাঠাকুরাণী একদিন বলিলেন, "দুধ আজকাল কম হইতেছে, আর ত আমি সকলকে দিয়া কুলাইতে পারি না। সকলকে দুধ দেওয়া এই সময় বন্ধ করিলে ভাল হয়।" ইহাতে বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন, "যা দুধ আছে তাহাই সকলকে ভাগ করিয়া কিছু কিছু দেও।" মা বলিলেন, "তাহাতে তোমার দুধ কম পড়িয়া যাইবে। তুমি ত অন্য কিছু বেশী খাও না, দুধই খাও। তাহা অত কম করিলে এত মাথার খাটুনি খাটিতে পারিবে কি?" তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "এক কাজ কর। দুধ যাহা হয়, তাহাতে বেশ খানিকটা জল মিশাও,

* শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কনিষ্ঠা ভগিনী, ইনি এক সময়ে কিছুকাল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের বাসায় ছিলেন।

তারপর জ্বাল দিয়া জলটা মারিয়া নিও। তাহা হইলে আসল দুধ যতটুকু তাহাই, কিম্বা তাহার চেয়ে কিছু বেশী থাকিবে। সকলকেই কিছু কিছু দিতে পারিবে।” সকলকে দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়া নিজের দুধ ঠিক রাখিবার ব্যবস্থায় তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না।

কেহ কোন বিশেষ অন্যায় করিলে বিশেষরূপ শাসন করিতেন, উপযুক্ত স্থলে কোন সময় প্রহারও করিতেন, আবার পরমুহূর্ত্তে সেই লোককেই ডাকিয়া আনিয়া আদরও করিতেন। ইহাতে সকলেই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। মার খাইবার পর তাঁহার স্নেহের পরিচয় পাইয়া তাহার মনের ব্যথা সারিয়া যাইত। তিনি রাগী লোক মনে করিয়া সকলেই ভয়ে ভয়ে থাকিত, অথচ তাঁহার স্নেহেরও অন্ত ছিল না। তাহা জানিত বলিয়া সকলে আবদার করিতেও ছাড়িত না। মাঠাকুরাণী বলিতেন, “তোমার মারিতেও আলস্য নাই, আবার আদর দিতেও আলস্য নাই।”

“ছুটির দিনে তাঁহার খাইতে দেরী হইত, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার আদেশ ছিল ছুটির দিনে যেন কেহ তাঁহার জন্য অপেক্ষা না করে, ঠাকুর চাকরও যেন সময় মত খাইয়া নেয়। তিনি বলিতেন, “ওরা সারাদিন পরিশ্রম করে, দুপুর বেলায় একটু বিশ্রাম না করিলে পারিবে কেন? আবার খানিক সময় পরেই এত লোকের জন্যে ত রাঁধিতে হইবে।” কাজেই ছুটির দিনে ঠাকুর চাকরেরাও তাঁহার আগে খাইয়া লইত। রামলগন বলিয়া একটি চাকর ছিল। সে একদিন দুপুরে খাইতে বসিয়া দেখে যে, ঘোল নাই। চীৎকার করিয়া উপরে মাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিল, “মা! ঠাকুর আমাকে ঘোল দিতেছে না। এত ভাত কি করিয়া খাইব?” ঠাকুর বলিল, “আজ অনেক অতিথি আসিয়াছিলেন, সব ঘোল ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ কোথা হইতে দিব?’

কথা শুনিয়া রামলগন রাগ করিয়া সমস্ত ভাত উঠানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল, দেখিয়া ত সকলের চক্ষু স্থির। সে দিন রবিবার, বাবাজী মহারাজ বেলা করিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন, ঠিক এই সময়ে তিনিও ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, উঠানময় ভাত ছড়ান, উপরে যাইবার পথ নাই। তিনি বলিলেন, 'এখানে এত ভাত কেন?' প্রথমতঃ ভয়ে কেহই কথা কহিল না, সকলেই ভাবিলেন, আজ রামলগনের অদৃষ্টে চাবুক আছে। অবশেষে দুইবার জিজ্ঞাসা করাতে মাঠাকুরাণী উপর হইতে বলিলেন, "ও তোমার গুণধর চাকরের কীর্ত্তি, ঘোল নাই বলিয়া ভাত খাইবে না।" রামলগন কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "বাবু! আজ আমার ঘোল নাই, এত ভাত খাই কি দিয়া?" সকলেই ভাবিয়াছিলেন, কর্ত্তা এ কথা শুনিয়া খুব রাগ করিবেন ও রামলগনকে শাসন করিবেন, কিন্তু হইল ঠিক বিপরীত। কথা শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন এবং উপরে মাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো ছেলের আবদার মাঝে মাঝে শুনতে হয়, ওকে উপর হইতে একটু দুধ আনিয়া দাও।"

"তাঁহার রাগের ভয়ে মাঠাকুরাণী অনেক সময়ে পরিজনবর্গের অপরাধ গোপন করিয়া যাইতেন। কখনও বা জিজ্ঞাসা করিলেও নীরব থাকিতেন, কিছুতেই কথা কহিতেন না। একবার পর পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত বাবাজী মহারাজের জন্ত যে পৃথক ভাত রান্না হইত, তাহা অতিরিক্ত বেশী হইতে লাগিল। খাইতে বসিয়া একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার চাউল মাপিয়া দেয় কে?" মাঠাকুরাণী নিকটেই ছিলেন, কিন্তু বারংবার প্রশ্ন করা সত্বেও কিছুতেই কথা কহিলেন না। অবশেষে বাবাজী মহারাজ তখনকার মত নিজেই চুপ করিয়া গেলেন। পরে এরূপ নীরব থাকিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে মাঠাকুরাণী বলিলেন

"তখন আমি যদি বলিতাম, কে চাউল মাপিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে ধমকাইয়া তুমি একটা অনর্থ বাধাইয়া তুলিতে। ওদিকে পূর্ণশশী, সেও বড কম পাত্রী নহে, হয়ত এজন্য ঝগড়া করিয়া বাড়ীতে একটা কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিত, হয়ত রাগিয়া আবার কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। তার চেয়ে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। ইহাতে তুমি আমার উপর একটু রাগিয়া থাকিবে, তাহাই বরঞ্চ ভাল মনে হইল।" বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তুমি কি মনে কর আমি যে ইহাদিগকে শাসন করি, তাহা ক্রোধবশতঃ করি? তাহা নহে। ইহাদিগের মঙ্গলের জন্যই এরূপ করি। ইহাদিগকে চিরদিন চাকুরী করিয়াই খাইতে হইবে। আজ না হয় তুমি এ সকল সহ্য করিতেছ, কিন্তু এদের স্বভাবের সংশোধন না হইলে অন্যত্র চাকুরী করিবার সময় তাহারা ত এ রকম সহ্য করিবে না।"

বাস্তবিক তিনি যে ক্রোধবশতঃ লোককে শাসন করিতেন না, তাহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই করিতেন এ কথা অন্যেও অনুভব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "পড়াইবার সময় আমাকে এক একদিন প্রহার করিতেন, কিন্তু পরে এমন স্নেহ করিতেন যে, একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতাম। তাঁহার কুলগুরুকেও * পড়াশুনার জন্য সময় সময় ধমক দিতে ত্রুটি করিতেন না। প্রহারে শক্তি-সঞ্চার হয়, তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যে প্রশ্নের উত্তর

* শ্রীহট্টের লাখাই গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ইনি বানিয়াচঙ্গের চৌধুরীদের কৌলিক গুরুবংশের সন্তান। চৌধুরীদিগের কুলপ্রথানুসারে বাবাজী মহারাজ কোন এক সময়ে কুলগুরুর নিকট শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সময়ে ইনি বাবাজী মহারাজের কলিকাতার বাসায় থাকিয়া টোলে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন।

দিতে পারি নাই, প্রস্তাবের পর সেই প্রশ্নের উত্তর সময় সময় আপনা হইতেই মনে উদিত হইয়াছে।

"একদিন হাইকোর্ট হইতে বাসায় আসিয়া অন্যান্য দিনের মত তাঁহার রূপার চেইনযুক্ত ওয়াচ ঘড়িটি বাড়ীর ভিতরের টেবিলের উপরে রাখিয়াছিলেন। পরদিন দেখা গেল, ঘড়ীটি সেখানে নাই, আমরা অনেক খুঁজিয়া তাহা পাইলাম না। ছাত্রদের মধ্যে এই নিয়া নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। কেহ বলিল যে, অমুক ঘড়ীটি দেখিবার সময় হাত হইতে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহা ফেলিয়া দিয়াছে, ইত্যাদি। তিনি কেবল খুঁজিয়া দেখিবার জন্যই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া কাহাকেও কিছু বলা বা কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা প্রভৃতি কিছুই করিলেন না, এইরূপে দিন পনর অতীত হইয়া যাওয়ার পর একদিন একটি বৈষ্ণব শ্রেণীর লোক বাসায় আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি একটি নিমা * বাহিরে শুকাইতে দিয়াছিলেন, তাহা না পাওয়ায় বাবাজী মহারাজ কোর্ট হইতে আসিবামাত্র তাঁহাকে নিমার কথা জানাইলেন। তিনি তখনই বাসার উড়িষ্যা-দেশীয় চাকরটিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ইহার যে নিমা তুমি নিয়াছ, তাহা নিয়া আইস।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া চাকরটি অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিয়া 'আমি নেই নাই' বলিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। তিনি খুব ধমকাইয়া বলিলেন, 'নিমা তুমি না দিলে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত চাবুক মারিয়া রক্তপাত করিব।' তবুও সে নিমা না দেওয়ায় চাবুক মারিতে লাগিলেন, অগত্যা সে বাধ্য হইয়া তাহার শুইবার ঘরের একটা ভাঙ্গা বাক্স হইতে নিমাটি বাহির করিয়া দিল। দেওয়া মাত্রই তাহাকে বলিলেন, "তুমি ঘড়ীটি শীঘ্র বাহির কর। নতুবা আবার চাবুক মারিব।"

* একপ্রকার জামা, ফতুয়া।

সে তখন কাঁদিয়া বলিল, "বাবু আমি চাকর মানুষ, আমি ঘড়ী দিয়া কি করিব? আমি ঘড়ী নেই নাই।" তৎপরে তিনি আবার চাবুক মারিতে আরম্ভ করিলেন তখন একেবারে নিরুপায় হইয়া ঐ চাকরটি তাহার নিজের বালিশ ছিঁড়িয়া তুলার ভিতর হইতে ওয়াচ ঘড়ীটি বাহির করিয়া দিল। তিনি ঘড়ী পাইয়া বলিলেন, "আর যদি কখনও এরূপ কাজ কর, তবে পুলিশে ধরাইয়া দিব।' তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য অনেকে বলিলেন। তিনি বলিলেন যে অন্যস্থানে গেলে আবার চুরি করিবে। এখানে থাকিলে আর কখনও চুরি করিবে না, এই বলিয়া তাহাকে বাসায়ই রাখিয়া দিলেন।"

অপরের দুর্জ্ঞেয় বিষয় যে তিনি অনায়াসে জানিতে পারিতেন, তাহা অনেকের প্রদত্ত বিবরণ হইতেই পাওয়া যায়। শ্রীযুক্তা প্রমদা দেবী বলেন, "গঙ্গাস্নানের যোগ উপলক্ষে বাড়ীতে দেশ হইতে বহু স্নানার্থী লোক আসিতেন, এক এক সময় তাঁহাদের সংখ্যা এক শতেরও অধিক হইত। তখন এত লোকের ব্যবস্থা করিতে মাতাঠাকুরাণী ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন, তাঁহার হাতের টাকায়ও অনটন হইত। তখন বাবাজী মহারাজ বলিতেন, 'ঠাকুরজীই ব্যবস্থা করিবেন'। কখন কখন বলিতেন, 'ঠাকুরজী অমুকদিন টাকা দিবেন। ঠিক্ সেই দিনেই টাকা আসিত।" যোগীসম্প্রদায়ে থাকিয়া দীর্ঘকাল তীব্র তপশ্চরণের ফলে তাঁহার যে অলৌকিক শক্তিলাভ হইয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা তাহারই কথঞ্চিৎ প্রকাশ বলিয়া মনে হয় *।

* হাইকোর্টের প্রবীণ এডভোকেট শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র খাঁ মহাশয় ১৩৪২ সালের মাঘ মাসের 'প্রবর্ত্তক' নামক মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "ওকালতি সময়েই সাধন ভজনে তিনি উচ্চভূমিতে উঠিয়াছিলেন। সাধন ভজনের উচ্চ ভূমিতে না উঠিলে কেহ জাতিস্মর হন না অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে কি কি করিয়াছেন, তাহা স্মরণ হয় না। ওকালতি

উক্ত মহিলা আর একটি ঘটনার কথা বলিয়াছেন। তাহা এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি। "১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসে আমার শ্বশুর মহাশয়কে গঙ্গালাভের জন্য কলিকাতা আনা হয়। আমার জ্যেঠতুত ভাসুর ও আমি, আমার শাশুড়ীর সঙ্গে আসিয়াছিলাম। আমরা আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের বাসায় উঠি। তখন তিনি ও মাঠাকুরাণী বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা না থাকায় আমরা আসিয়া আলাদা পাক করিয়া খাইতাম। ৺পূজার পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবন হইতে ফিরিলেন। আসিয়া এই ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'তোমরা আলাদা খাইতেছ কেন? আজ হইতে আমার সঙ্গেই খাইবে।' তারপর আমার শ্বশুরকে দেখিয়াই বলিলেন, "ইনি আর দুদিনের বেশী বাঁচিবেন না। যখন গঙ্গালাভের জন্য এসেছেন, তখন কাল ভোরেই তোমরা ইঁহাকে কাশীমিত্রের ঘাটে গঙ্গাযাত্রার ঘরে নিয়া যাও।" আমার স্বামী সেইখানে ছিলেন, একথা শুনিয়া তিনি মনে করিলেন, "ইনি ত ডাক্তার কবিরাজ নহেন, ইঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে

আমলেই তিনি জাতিস্মর ছিলেন। কোন একটি দুর্গম তীর্থ, যেখানে তিনি এজন্মে তখন পর্যন্ত যান নাই, সেই তীর্থের এরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, যিনি ঐ তীর্থে যান নাই, তিনি তদ্রূপ বর্ণনা করিতে পারেন না। তিনি অনিচ্ছায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ইহা তাঁহার পূর্বজন্মের স্মৃতি। আমার একটি যুবক বন্ধুকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ঐ যুবকের মনে ধর্মভাব ছিল। তিনি ওকালতি আমলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাহাকে তিনি দীক্ষা দিবেন। ঐ যুবকও তাঁহাতে বিশেষ অনুরক্ত ছিল এবং তাঁহার নিকট নানা আবদার করিত। অনেক পীড়াপীড়িতে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে ঐ যুবক পূর্বজন্মে তাঁহার নিকট আত্মীয় ছিল। দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইয়াও বহুবৎসর দীক্ষা না দেওয়ায় ঐ যুবক দীক্ষা লওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। তিনি বলিতেন "সময় হইলেই দীক্ষা দিব। পরে তিনি ঐ যুবককে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন এবং নানাপ্রকার বিপদে তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন।"

গঙ্গাযাত্রা করান যায়? যদি তারপর বেশীদিন বাঁচেন, তবে কি বিপদ হইবে?" এই ভাবিয়া তিনি পরদিন প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ না করিয়া, খুব সকালেই বাটীর কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে চলিয়া গেলেন। অভিপ্রায় এই যে কবিরাজ মহাশয়কে আনিয়া দেখাইয়া তারপর যাহা হয় করিবেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে আমিও উঠিয়া স্নান করিতে গেলাম। মাঠাকুরাণী আসিয়া রোগীর নিকট বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি উপরে গিয়া বাবাজী মহারাজকে বলিলেন, 'তোমার মেসো মহাশয় গোলোক যাত্রা করিলেন।' বাবাজী মহারাজ তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়াই তাঁহাকে বাহির করিলেন ও তাঁহার একটু পরেই দেহত্যাগ হইল।

"ঘণ্টাখানেক পরে আমার স্বামী আসিয়া দেখেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তারপর নিজেই সমস্ত যোগাড় করিয়া শ্মশানে লইয়া গেলেন। অনেক বেলায় সব কাজ শেষ করিয়া আমার শাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া ফিরিলেন। সেই দিনই আমাদিগকে বলিলেন 'তোমরা কাশী চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া শ্রাদ্ধ কর।" তাহাতে আমার স্বামী বলিলেন, "আমি অত টাকা কোথায় পাইব?" বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "দেখ, বিধাতার ইচ্ছায় হ'য়ে যাবে। আমিও কিছু সাহায্য করিব। আমি দিদিমার কাছে প্রতিশ্রুত আছি যে, বৌমাকে তাহাকে দেখাইব।" অর্থাৎ আমার বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী কাশীতে ছিলেন, তাঁহার কথাই বলিলেন। সেই দিনই সমস্ত যোগাড় করিয়া ও টাকা দিয়া তিনি নিজের গাড়ীতে করিয়া আমাদিগকে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিলেন ও তারপর নিজে দেশে রওনা হইলেন।"

সকলের সেবা করাই যেন তাঁহার একমাত্র কাজ ছিল। আত্মীয়-

অনাত্মীয়, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, বালক-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকল লোকের সম্পদে, বিপদে, সকল অবস্থায় নিজের চেষ্টা, অর্থ, উপদেশ, এমন কি শাসন দ্বারাও—সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিতে তিনি সদাই উদ্যোগী ছিলেন। তৎকালে তাঁহাকে যাহারা দেখিয়াছেন ও ঘনিষ্টভাবে জানিতেন এমন লোক আজও জীবিত আছেন, তাঁহাদের অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও আলাপ করিয়া ইহার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহার অর্দ্ধেকও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতে গেলে গ্রন্থ বিপুলায়তন হইয়া পড়িবে। যে সকল বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতেই পাঠক ইহা বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, নিজের সাধনভজন করিয়া, সংসারের সমস্ত পরিজনের এমন কি গাভীগুলিরও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ও সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া, রোগীর শুশ্রূষা করিয়া, নিজে পড়িয়া, অপরকে স্বয়ং পড়াইয়া, প্রয়োজনমতে বন্ধুবান্ধবকে বিবিধপ্রকারে সাহায্য করিয়া, গ্রন্থ লিখিয়া ও নিজে তাহার প্রুফ দেখিয়া—এত রকমের এত কাজ করিয়া তিনি যে ওকালতির কাযা করিতে কিরূপে সময় পাইতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীযুক্ত আশুবাবু সত্যই বলিয়াছেন, "বিশ্রাম তিনি একরকম করিতেনই না *।"

এই বৎসরই সামুদ্রিক বিদ্যায় পারদর্শী বাবাজী মহারাজের কোনও

* বিগত প্রয়াগের কুম্ভের সময় ব্রজবিদেহী মহন্তস্বরূপে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মেলাস্থানে আসন করিয়াছিলেন, এই সময় মেলার প্রথমভাগে তাঁহার শরীর কয়েকদিন একটু অসুস্থ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী ও অপর কয়েকজনের নিকট নিজের শারীরিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্য কথার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "দেহে আলস্য নাই, বাবা।" শ্রীযুক্ত ব্রজবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "সে ত আপনার কোনদিনই ছিল না।"

বন্ধু তাঁহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুযোগ আছে, যদি গুরুকৃপায় নিতান্ত তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু না হয়, তবে তাঁহার নিজের কোন অঙ্গহানি অবশ্যই হইবে। এমন কি, এই দুর্ঘটনার তারিখ পর্যন্ত সেই গণক নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। যাহা হউক এই ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যরকম ফলিয়া গিয়াছিল। রাত্রে উপুড় হইয়া শয়ন করিবার অভ্যাস শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ছিল। একদিন রাত্রে শয়ন করিবার সময় গড়গড়ার নলের মুখটি হঠাৎ তাঁহার বাম চক্ষুর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যায় ও চক্ষু হইতে অজস্র রক্তপাত হইতে থাকে। এই ব্যাপারে ডাক্তার কালী বাগচি মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে অনেক-দিন ছিলেন। পরে ক্ষত সারিয়া গেলেও এই চক্ষে আর দেখিতে পাইতেন না।

চোখের যন্ত্রণা হইতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য এইসময় তিনি নিয়মিতভাবে প্রত্যহ মহাভারত শ্রবণ করিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে একসময়ে কথাপ্রসঙ্গে তিনি এই সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ সময় মহাভারত শুনিতে শুনিতে তিনি এতদূর তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, শ্রুত বিষয়ের ছবিগুলি যেন স্পষ্টরূপে মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিত, চোখের যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন। এই বলিয়া বলিলেন, "বাবা। ভগবান্ কিসের ভিতর দিয়া কি করেন, বলা যায় না। চোখে আঘাত দ্বারা অসহ্য যন্ত্রণা দিলেন বটে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়া জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। ভগবান্ প্রত্যেক কার্য্যের দ্বারা মঙ্গলই বিধান করেন, ইহা নিশ্চয় জানিবে।"

কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিজমুখে আমরা শুনিয়াছি, এই সময়ে একবার তাঁহার মনে হইল "এত খাটিতেছি, তাই এত ব্যয় চলিতেছে, আমি

যদি কখনও অসুস্থ হইয়া পড়ি তখন কি হইবে? কিরূপে চলিবে?" কি রকম করিয়া যে চলে তাহা যেন তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্যই শ্রীভগবান অনতিবিলম্বে ইহার ব্যবস্থা করিলেন। সত্যই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন ও কয়েকমাস ধরিয়াই রোগভোগ করিলেন, কিন্তু সংসার চলিবার অসুবিধা হইল না, প্রয়োজনীয় ব্যয় পরিমাণ অর্থ আপনা হইতে উপস্থিত হইত। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর ও বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ৺কামাখ্যাচরণ নাগ মহাশয় এই সময়ে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় এত বড় সংসার, এত লোকজনের জন্য এই বিপুল ব্যয় কিরূপে চলিবে ইহা ভাবিয়া স্বভাবতই তাঁহার উদ্বেগ জন্মিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভাই! তোমার কোন ভয় নাই, শ্রীশ্রীঠাকুরজী ঠিক চালাইয়া নিতেছেন। আইন-ঘটিত কঠিন প্রশ্নসমূহ সম্বন্ধে আমার মত লইবার জন্য লোকে আমার নিকট আসিয়া আমার মত লইয়া যায় ও তজ্জন্য টাকা দেয়। আমি বিছানায় পড়িয়া থাকিলেও এইরূপে রোজগার হইতেছে।" কামাখ্যাবাবু ইহা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কামাখ্যাবাবু আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহাও এইস্থানে উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের বন্ধুবাৎসল্য অনুকরণীয়। এই সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত কামাখ্যাবাবুর অতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। এই ভদ্রলোক কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিতেন ও তাঁহার নিকট হইতেও সর্ব্বদা সেইরূপ স্নেহ ও প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। একবার ছাত্রাবস্থায় ইঁহার প্রবল শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, তৎসহ স্বাস্থ্যভঙ্গও হয়, তখন বাবাজী মহারাজ নিজ ব্যয়ে ইঁহাকে দার্জ্জিলিঙে স্বাস্থ্যলাভের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হইল বটে কিন্তু শিরঃপীড়া সারিল না, দেশে ফিরিবার পর

আবার মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল। কবিরাজী চিকিৎসায় উপশম হওয়া দূরে থাকুক, যেন কিছু বাড়িল বলিয়াই বোধ করিলেন। তখন বাবাজী মহারাজের উপদেশে স্বকিয়া ষ্ট্রীটের হরনাথ রায় এল্ এম. এস্. নামক একজন হোমিওপ্যাথের নিকট যান। ইঁহার ব্যবস্থাপিত ঔষধে বিশেষ উপকার হইল। অতঃপর কিছুকাল পর্যন্ত মফঃস্বলে কয়েকটি স্কুলে ইনি হেডমাষ্টারী করেন, সে সময়েও তিনি চারিবৎসর পর্যন্ত ঔষধ খাইয়াছিলেন। কামাখ্যাবাবু বলেন, 'ঔষধ ফুরাইলে তারাকিশোর-দার নিকট চিঠি লিখিতাম, আর তিনি বড় বড় শিশি ভরিয়া ট্রাইটুরেশন (গুঁড়া) ডাকে আমার নিকট পাঠাইতেন।" কামাখ্যাবাবু তরুণ বয়সেই শ্রীশ্রী কৃষ্ণানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সাধনভজন করিতেন ও কখন কলিকাতায় থাকিয়া টিউশনি করিতেন, কখন দু-চারিদিন বাড়ীতে থাকিতেন, কখনও বা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই সময় তাঁহাকে জোর করিয়া বলেন, "এরূপভাবে তুমি থাকিতে পারিবে না, হয় সন্ন্যাসী হও, নতুবা বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হও।" ইহার পরই তিনি বিবাহ করেন ও নানাস্থানে স্কুলে চাকুরী করেন।

কামাখ্যাবাবু বলেন "কাশীর বাড়ী কিনিয়া দেওয়ার জন্য আমার খাতির ছিল *। তারাকিশোর-দা তাঁহার গৃহিণীকে বলিতেন, "ওর

* বাড়ীটি প্রথমতঃ তাঁহার গুরুদেব পরিব্রাজক স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রতিষ্ঠিত কাশী যোগাশ্রমের সম্পত্তি ছিল। যোগাশ্রমের ট্রাষ্টিগণ যে সময়ে উহা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন, সেই সময়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও কাশীতে একটি বাড়ীর সন্ধান করিতেছিলেন। কামাখ্যাবাবুর মধ্যস্থতায় বাড়ীটি কেনা হয়। তখন ইঁহার নিরবলম্ব "ভ্রাম্যমান" অবস্থা, অর্থাৎ কিছুরই ঠিক ছিল না, কোন নির্দিষ্ট কাজ ছিল না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বাবাজী মহারাজের ইচ্ছায় কাশীতে তিন চারি মাস থাকিয়া তিনি বাড়ীটি মেরামত করান;

জন্যে কাশীর বাড়ী হয়েছে, মনে রাখতে হয়। ওকে যত্ন কোরো।" তার বাড়ীতে খাইয়াছি বহুদিন, অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান তাঁহার একটি অভ্যাস ছিল। যতরকম উদ্ভট্টি রান্না, তাই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে খেতাম, খোঁসাম্লির ডাল, লাউয়ের খোসার বড়া, কচু ভাজা এই সব। অত বড় হাইকোর্টের উকিল, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পেলাম কিনা খোঁসাবির ডাল, কিন্তু খেয়ে দেখি স্বাদ অমৃতের মত *। তিনি বলিতেন "তোমরা যে সব জিনিষ ফেলে দাও, আমরা তার কিছু ফেলি না †।" একদিন বলিলেন, "কুমড়োর বীচির বড়া খেয়েছ?" আমি বল্লাম 'না"। তিনি বলিলেন, "খুব সুন্দর হয়" তার গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কামিখ্যো কুমড়োর বীচির বড়া খায় নি, ওকে একদিন খাওয়াতে হয়।" তিনিও তেমনি, বাহির হইবার সময় দেখি সিঁড়ির ধারে বসিয়া কুমড়োর বীচির খোসা ছাড়াইয়া শাঁস বাহির করিতেছেন। দু'জনে এক জায়গায় খাইতে বসিতাম, এইসব বিচিত্র রান্না হইত, খোঁসাবির ডাল, লাউডগা ভাতে, এই সব দিয়া আনন্দ করিয়া খাইতাম। কাশীর বাড়ী হবার পর

বাবাজী মহারাজ টাকা পাঠাইতেন তিনি ওখানে থাকিয়া দেখিয়া কাজ করাইতেন। পরে সব খরচের হিসাব দিয়া বাবাজী মহারাজকে চিঠি দিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি কি তোমার কাছে হিসাব চেয়েছি

* এই প্রসঙ্গে ১৪০-৪১ পৃষ্ঠায় বিবৃত শ্রীযুক্ত সারদাবাবুর লিখিত বাবাজী মহারাজের বাড়ীর প্রসাদ সম্বন্ধীয় কথাগুলি স্মরণীয়।

† বাবাজী মহারাজ খুব সুন্দর রাঁধিতে পারিতেন। তাঁহার হাতের রান্নার খুব স্বাদ হইত। পরেও আমরা দেখিয়াছি বেগুনের বোঁটা তিনি ফেলিতে দিতেন না, তরকারির মধ্যে দিতে বলিতেন। আলুর খোসা, কাঁচকলার খোসা, এমন কি কচুর পাতা, কচুর খোসা পর্যন্ত দিয়া তরকারি, বড়াভাজা প্রভৃতি করিবার প্রণালী বলিয়া দিতেন এবং সে সকল রান্নার স্বাদ খুব সুন্দর হইত।

বৃন্দাবন যাবার পথে কাশীতে দু'একদিন থেকে যেতেন, আর সেটা প্রায়ই পড়িত পূজার মধ্যে, বিজয়ার দিন নৌকা ভাড়া করিয়া বাড়ীর সকলকে নিয়া গঙ্গায় বেড়াইতেন, আমি কাশীতে থাকিলে আমারও ডাক পড়িত, খুব আনন্দ হইত। এ সময়ও আমার নিমন্ত্রণ হইত, এই কয়দিনের মধ্যে অন্ততঃ একদিন আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। একবার বলিলেন "কাল যেয়ো। একটা নূতন জিনিষ খাওয়াব।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "কি ?" তিনিও হাসিয়া বলিলেন, "সিজেড়ার খোসার ঘণ্ট, ঠিক মোচার ঘণ্টের মত লাগিবে।" তাঁহার মুখ হইতে বাহির না হইলে কথাটা ঠিক বিশ্বাস করিবার মত নয়। পরদিন গেলাম, দেখি সত্যই সিজেড়ার খোসার ঘণ্ট, আর সত্যই তার স্বাদ মোচার ঘণ্টের মত।"

বাবাজী মহারাজের বিশেষ প্রার্থনায় ও তাঁহার প্রতি স্নেহাতিশয্য-বশতঃ তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ ১৩১১ সালে তাঁহার কলিকাতার বোসপাড়ার বাটীতে আসিয়া মাসাধিক-কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁহার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থের ১৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সংসারাশ্রমে অবস্থানকালের একটি প্রধান কার্য্য শাস্ত্রপ্রকাশ। তাহারও সূচনা এই সময়েই হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "১৩১০ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বাবাজী মহারাজ আমাকে পাতঞ্জল পড়াইতে আরম্ভ করেন। কোর্ট হইতে ফিরিয়া বেলা পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় আমাকে পড়াইতেন। আমি সম্যক্ ধারণা করিতে অসমর্থ বলিয়া আমাকে একখানা বড় খাতা করিতে আদেশ করেন এবং প্রতিদিন কোন কোন স্থলে বিচার সহ সূত্র ও ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ লিখাইয়া দিতেন। এইরূপে

আমার পাতঞ্জল দর্শন পড়া শেষ হইতে কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। শেষ হইবার পর দৈনিক লিখার খাতাখানা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বারা অনেকের উপকার হইতে পারে এবং ইহার কয়েক মাস পর হইতেই তিনি ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা লিখাইতে আরম্ভ করেন। "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রন্থের ত্রিশ পৃষ্ঠার পাদটীকায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও লিখিয়াছেন, 'বস্তুতঃ যোগসূত্রাধ্যয়নপ্রার্থী একটি বিদ্যার্থীর অধ্যাপনোপলক্ষেই এই গ্রন্থরচনা প্রথম আরম্ভ হয়। পরে বিষয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া ইহাকে সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং অপর সকল দর্শনও ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।" শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও লিখিয়াছেন, "কোন মাস হইতে গ্রন্থ লিখা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। ১৩১৬ সালের মাঘ মাসে শ্রীযুক্ত কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ দেহরক্ষা করিবার অল্পকাল পরেই লিখা আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ কোর্ট হইতে ফিরিবার পর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত লিখাইতেন। বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে তিনি বলিয়া যাইতেন, আমি তাহা লিখিয়া লইতাম। সকালেও কোন কোনদিন লিখাইতেন, সাধারণতঃ ছুটির দিনেই ইহা সম্ভবপর হইত, কাছারী খোলার দিনে কদাচিৎ কোনদিন হইত। আফিস বন্ধের দিনে গঙ্গাস্নান ও প্রসাদ পাওয়ার সময় ছাড়া প্রায় সমস্ত দিনই লিখাইতেন। বিশ্রাম বড় একটা করিতেনই না। সাধারণ একখানা চিঠি লিখিতে আমরা চিন্তা ভাবনা করিয়া লিখি, কিন্তু এত বড় বিরাট গ্রন্থ লিখিতে গিয়া তাঁহাকে খুব কমই চিন্তা ভাবনা করিতে দেখিয়াছি। তিনি মুখে অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আর আমি লিখিয়া যাইতাম, মাথা তুলিবার অবসরও খুব কম হইত। আমার অনুপস্থিতি সময়ে শ্রীযুক্ত গুরুকান্ত

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ গ্রন্থ লিখার কাজ করিতেন।" শ্রীযুক্ত গুরুকান্ত বাবুর নিকট শুনিয়াছি, বিচ্ছিন্নভাবে তিনবৎসর কালের মধ্যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়া মুদ্রিত হয়। সমস্ত গ্রন্থগুলি লিখা শেষ হইবার পর একসঙ্গে ১৩১৮ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রন্থগুলি এক্ষণে বঙ্গদেশে সুপরিচিত। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" ভারতের প্রাচীন গৌরবের অপূর্ব্ব বর্ণনা সহ হিন্দুধর্ম্মের সারার্থব্যঞ্জক। সম্প্রদায় নাস্তিকবাদের খণ্ডন সহ সকল দর্শনশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঋষিদিগের উপদিষ্ট আচার ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সংশয় বর্ত্তমান যুগে সাধারণতঃ লোকের চিত্তে জন্মিয়া থাকে, যুক্তি ও বিচারবলে তৎসম্বন্ধীয় সুন্দর সমাধান ইহাতে আছে। এই গ্রন্থমালার আর তিন খণ্ড "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা" নামে অভিহিত। প্রথম খণ্ডে বৈশেষিক দর্শন, ন্যায়দর্শন, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের কিয়দংশ ও সাংখ্যদর্শন, (সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ও তত্ত্বসমাস) বঙ্গানুবাদ ও প্রয়োজনীয় স্থলে বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। ইহা প্রথম প্রকাশিত হইলে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরাস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে ইহাই এতদ্দেশে প্রচলিত ধারণা, পরন্তু বাবাজী মহারাজ ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও সাধারণতঃ দুর্ব্বোধ্য সাংখ্যশাস্ত্র তাঁহার ব্যাখ্যায় অতি সুখবোধ্য হইয়াছে।

বাস্তবিক কি প্রকার মনোভাব লইয়া তিনি এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রন্থের

* তৎপ্রণীত তাঁহার গুরুদেবের জীবন চরিত গ্রন্থখানি এই গ্রন্থমালার অন্তর্গত নহে, তাহা এই সময়ে লিখিতও হয় নাই, ১৩২২ সালে ইহা লিখিত হয় এবং ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হয়।

ভূমিকায় স্বয়ং খ্যাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'পণ্ডিতসমাজে কাহারও সহিত আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। আমার পাণ্ডিত্যের অভাব এতই অধিক [illegible], সাধারণ ব্যাকরণশাস্ত্রেও আমার ব্যুৎপত্তি অতি অল্প। তবে আমার ভাগ্য অতি অসাধারণ কারণ আমি মহৎকৃপা লাভ করিয়াছি, সেই কৃপাবলে, অতি দুর্ব্বোধ্য দর্শনশাস্ত্রসকলও, স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তাহাদের গোপনরক্ষিত জ্ঞানামৃত আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমিই স্বয়ং বিস্মিত হইয়াছি। হিন্দু পণ্ডিতসমাজে অবশ্য ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত [illegible], শ্রীভগবান বেদব্যাস, মহর্ষি কপিল, পতঞ্জলি এবং গৌতম প্রভৃতি সিদ্ধর্ষিগণ [illegible] "আপ্ত" পুরুষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত মত-বিরোধ থাকা অসম্ভব। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আপাততঃ যে সকল বিরোধ তাঁহাদের উপদিষ্ট গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহার অবশ্য কোন না কোন মীমাংসা আছে। আমার হৃদয়ে শ্রীগুরুকৃপায় দর্শনশাস্ত্র সকলের সামঞ্জস্য-স্থাপনসমর্থ একপ্রকার মীমাংসা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পণ্ডিত সমাজে প্রকাশিত হইলে তদ্দ্বারা মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহা এই গ্রন্থে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দেশ কাল-পাত্র অনুসারে ধর্ম্মশিক্ষা ও প্রচার প্রণালীরও অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, সুতরাং যদিও অজিজ্ঞাসিত হইয়া এবং অপাত্রে ব্রহ্মবিদ্যা অর্পণ করা বিষয়ে শাস্ত্রে নিষেধ আছে জানি, তথাপি পূর্ব্বের সামাজিক গঠন প্রণালীর এক্ষণে বহুল পরিমাণে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এক্ষণে আর ব্রহ্মবিদ্যা-সম্পন্ন সিদ্ধর্ষিদিগের আশ্রমসকল প্রকটিত নাই, সুতরাং জিজ্ঞাসু হইয়া যে লোকে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিবে, এমন সুব্যবস্থাও এক্ষণে নাই। বিশেষতঃ কিছুকাল যাবৎ ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম লুপ্ত হইবারই উপক্রম দৃষ্টতঃ বোধ হইতেছে। অতএব হিন্দুধর্ম্মের ও শাস্ত্রের পক্ষে আপৎ-

কালই এক্ষণে উপস্থিত বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা সাধারণসমক্ষে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত করিলাম বলিয়া পণ্ডিতমহোদয়গণ যেন আমার প্রতি অরুষ্ট না হয়েন। আপৎকাল উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণও অপাত্রের দান গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব পণ্ডিতসমাজের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমি অপণ্ডিত বিষয়ী লোক হইলেও, জাতীয় বিদ্যার এই আপৎকালে, গ্রন্থকার অযোগ্য লোক বলিয়া এই গ্রন্থের আলোচনা করিতে যেন তাঁহারা কুণ্ঠিত না হয়েন। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের একপ্রকার সামঞ্জস্য মীমাংসা আমি এই গ্রন্থে করিয়াছি। তাঁহাদের চিন্তাশক্তি এই বিষয়ে স্বাধীনভাবে প্রবর্ত্তিত হইলে হয়ত ইহা অপেক্ষা উত্তম মীমাংসা তাঁহারা ভগবৎকৃপায় আবিষ্কার করিতে পারিবেন। অতএব আমার সহিত বিরোধের কোন বিষয় নাই। আমি পণ্ডিত নহি এবং অভ্রান্ত নহি, সুতরাং আমার কোন স্থলে ভ্রমে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে. অতএব পণ্ডিত মহোদয়গণ অনুকম্পাপূর্ব্বক আমার ভ্রমপ্রমাদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, গ্রন্থোক্ত বিষয়ালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা।"

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "সাংখ্য লেখা শেষ হইলে বাবাজী মহারাজ ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এই সাংখ্যদর্শনের পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে পড়িতে দেন। তর্করত্ন মহাশয় কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া তাঁহার সঙ্গে বিচার আরম্ভ করেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলিবার পর অবশেষে তর্করত্ন মহাশয় উঠিয়া দুই হাতে বাবাজী মহারাজকে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ ভাষায় বলিলেন, "বাবু! এই জিনিষ আপনি কোথায় পাইলেন?" উত্তরে বাবাজী মহারাজ সজলনেত্রে বলিয়াছিলেন, "ইহা গুরুকৃপা, আমার নিজের শক্তি কিছুই নাই,

শ্রীগুরুদেব আমার ভিতর দিয়া যাহা বলাইয়াছেন, তাহাই আমি বলিয়াছি।"

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ (দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার দ্বিতীয় খণ্ড, ইহারও দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে) মহর্ষি বেদব্যাসকৃত ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং গ্রন্থের সারার্থব্যঞ্জক ভূমিকা সম্বলিত পাতঞ্জলদর্শন। মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত এই দর্শনশাস্ত্রখানি পরম উপাদেয় ও যোগবিষয়ে মূল প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। বেদের বিভাগকারী, মহাভারত ও বেদান্তদর্শন প্রণেতা স্বয়ং বেদব্যাস ঋষি তাহার যে ভাষ্য লিখিয়াছেন তাহা যে অপরাপর ভাষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; বাস্তবিক এই ব্যাসভাষ্য মূল গ্রন্থেরই সমান মূল্যবান। অথচ এই ভাষ্য এতদ্দেশে অধুনা সুপ্রচারিত নহে। একণে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় লোকসাধারণের পক্ষে ইহা সুলভ হইয়াছে।

চতুর্থ গ্রন্থ বেদান্ত দর্শন (দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় খণ্ড, ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে)। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকৃত বেদান্তের ভাষ্য ইতিপূর্ব্বে কখনও বঙ্গভাষায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বেদান্তের এই ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, যে সকল স্থানে শাঙ্করভাষ্যের সহিত ব্যাখ্যা-বিরোধ আছে তত্তৎস্থলে শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত বিচার, দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার এই তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা অথবা বিচার—সর্ব্বত্রই দেখা যায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কদাপি কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীন ঋষিদিগের রচনা সাধারণতঃ প্রাঞ্জল, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও সর্ব্বত্র তাহার সরলার্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধনার দিক

প্রতি বৎসর পূজার বন্ধের সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবন গিয়া তাঁহার গুরুদেবকে দর্শন করিতেন। যে বৎসর পূজার ছুটির প্রারম্ভে বৃন্দাবনে যাইতেন সেই বৎসর তাঁহার সঙ্গে ব্রজপরিক্রমায় যাইতেন, এবং যে বৎসর বন্ধের শেষভাগে যাইতেন সেই বৎসর দীপমালের সময় * গিরিরাজ পরিক্রমায় তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। ১৩০১ সাল (তাঁহার দীক্ষার বৎসর) হইতে ১৩১৩ সাল পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর কালের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দুইবার সস্ত্রীক তাঁহার গুরুদেবের সহিত ব্রজপরিক্রমায় গিয়াছেন এবং ছয়বার গিরিরাজের দীপমালা দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গুরুদেবের শরীর অতিশয় প্রাচীন হইয়া পড়ায় ১৩১৪ সালের পর হইতে তিনি আর ব্রজপরিক্রমায় যাইতেন না, ব্রজধামের মহন্তপদও এই কারণেই ত্যাগ করেন। দীপমালের একদিন পূর্ব্বে চতুর্দ্দশী তিথিতে গিরিরাজের নিকটস্থ নিম্বগ্রাম নামক স্থানে প্রতিবৎসর একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামটি ভগবান নিম্বার্কাচার্য্যের তপস্যার স্থান। এইখানে এই তিথিতে তিনি তাঁহার আশ্রমস্থ বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণপূর্ব্বক তদুপরি আকাশে শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই তিথিতে নিম্বগ্রামে তদুপলক্ষে

---

* কার্ত্তিক অমাবস্যায় (শ্যামাপূজার দিন) গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে খুব আড়ম্বরের সহিত দীপদান করা হয়। ব্রজবাসিগণ দলে দলে আসিয়া তাহা দর্শন করেন। তাঁহারাও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে খুব ভক্তিসহকারে পরিক্রমা করেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে তাঁহারা গিরিরাজ বলিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর উৎসব হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দীপমালের সময় গিরিরাজে গিয়া তাহাও দর্শন করিতেন।

ব্রজের বনপরিক্রমায় সাধারণতঃ গৃহস্থেরা সাধুদের সঙ্গে যাইতে পান না। সাধুগণের, গৃহস্থদিগের এবং গোকুলিয় গোঁসাইদের তিনটি পৃথক্ দল তিনটি বিভিন্ন দিনে পরিক্রমায় বাহির হয়। গৃহস্থদের পরিক্রমা শীঘ্র শীঘ্র শেষ হয় বটে কিন্তু শ্রীভগবানের সকল লীলাস্থল ও সমুদায় তীর্থ দর্শন হয় না, কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থান মাত্র দর্শন হয়। তাঁহার গুরুদেবের বিশেষ অনুগ্রহে বাবাজী মহারাজ সস্ত্রীক এবং কোন কোন বার তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সাধুদের সঙ্গেই যাইতে পারিয়াছেন। সাধুমণ্ডলী কোন আপত্তি করেন নাই, বরং প্রীতিসহকারে অনুমোদন করিয়াছেন। বাবাজী মহারাজ খুব উৎসাহের সহিত চলিতেন প্রত্যহ তিন ক্রোশ, চারি ক্রোশ, কোন দিন বা পাঁচ ক্রোশ পথ চলিয়া তবে বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে হইত। সঙ্গীয় যাত্রিগণ অনেকে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। পৌঁছিয়াই প্রথমে তাঁহার গুরুদেব শ্রীযুক্ত কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের বড় ছাতা ও শ্রীশ্রীঠাকুরজীর জন্য তদপেক্ষা ছোট আর একটি ছাতা মাটিতে বসাইবার বন্দোবস্ত করিতেন। ছাতার মধ্যে যাহাতে জল না যাইতে পারে, তজ্জন্য পরদা ঝুলাইয়া ও চারিদিকে নালা খনন করিয়া দিতেন তারপর তাঁহাদের নিজের বাসের জন্য যে একটি ছোট তাঁবু তাঁহার গুরুদেব দিয়াছিলেন, সেইটি খাটাইতেন এবং সকলের বিশ্রামের জন্য প্রথমেই যে সকল বন্দোবস্তের আবশ্যক, তাহার অধিকাংশই স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। এই সকল কার্য্য খুব দ্রুত ও নিপুণতার সহিত করিতেন। ইহাতে তাঁহার যেমন উৎসাহ ছিল, তেমনি দক্ষতা ছিল। অতঃপর তাঁহার গুরুদেবের ব্যবহারের জন্য দূর হইতে কলসী ভরিয়া জল

আনিতেন। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজী নামক বাবাজী মহারাজের এক কনিষ্ঠ সাধু গুরুভ্রাতা তাঁহার গুরুদেবের পুরাতন আশ্রমে সেবায়েতরূপে বর্ত্তমান অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নিকটে বাবাজী মহারাজের এই সময় ব্রজপরিক্রমা কালের কয়েকটি ঘটনা শুনিয়াছি। তাহাতে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া তাহা এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

একবার, সম্ভবতঃ ১৩১১-১২ সালে, তাঁহার ওকালতির উপার্জ্জন খুব কমিয়া গেল। বহু ছাত্র এবং আত্মীয়-স্বজনকে বাসায় রাখিয়া প্রতিপালন করিতেন—এখন আয় কমিয়া গেলেও সহসা এসকল ব্যয় কমাইতে পারিলেন না। নিজেদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা প্রণালী ত চিরদিনই সরল অনাড়ম্বর ছিল, সুতরাং সেইদিকেও ব্যয়-সঙ্কোচের উপায় ছিল না। কাজেই আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়ায় ঋণ হইতে লাগিল। তাঁহার গুরুদেবের সেবার্থ মাসিক পঁচাত্তর টাকা করিয়া পাঠাইতেন, তাহা এখনও নিয়মিতরূপে ঋণ করিয়াই পাঠাইতে লাগিলেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও পূজার বন্ধে বৃন্দাবনে আসিলেন। প্রয়োজনানুরূপ অর্থ হাতে না থাকায় প্রায় তিনশত টাকা এজন্যও ঋণ করিতে হইল। বৃন্দাবনে অবস্থান কালে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগের জন্য প্রতিদিনই তিনি বাজার হইতে ফলমূলাদি কিছু না কিছু কিনিয়া আনিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,"বাবুজী! মৌনী গৌ অনকে লিয়ে জো ভুস লে আয়া বহ আচ্ছা নেহি হৈ। তুম বুছ্ ভুস্ লে আও।" * (বাবুজী! মৌনী গরুর জন্য যে ভুস আনিয়াছে তাহা ভাল নয়, তুমি

* গুরুদেব তাঁহাকে স্নেহ করিয়া বাবুজী বলিতেন। মৌনী আশ্রমস্থ জনৈক সাধু। ভুস—গমের শস্য নিবার পর গাছটি খেতলাইয়া ভুস্ প্রস্তুত হয়। ইহা গরু প্রভৃতির খাদ্য।

কিছু ভুস্ নিয়া আইস ।। তাঁহার গুরুদেব স্বেচ্ছায় কখন কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না, আজ স্বয়ং এইরূপ বলাতে তাঁহার চিত্ত অতিশয় উল্লসিত হইল ও তিনি তৎক্ষণাৎ ভুস্ আনিতে চলিলেন। আশ্রম হইতে বাহির হইয়া অল্প দূর অগ্রসর হইলেই দেখিলেন, রাস্তা দিয়া কয়েক গাড়ী ভুস যাইতেছে, দেখিয়া স্বতঃই তাঁহার মনে হইল, গুরুদেবের প্রভাবেই এইরূপ ঘটিয়াছে। ইহাতে তিনি আরও আনন্দিত হইলেন এবং তিন গাড়ী ভুস্ প্রায় যাট টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া আসিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে পুনরায় তাঁহার গুরুদেব বলিলেন, 'তুম জো ভুস লে আয়া সো তো আচ্ছা নেহি হৈ। তুম ইন সব কে লিয়ে রোজ ঘাস লে আনা।" (তুমি যে ভুস্ আনিয়াছ, তাহাও ভাল নহে, ইহাদের জন্য তুমি রোজ ঘাস নিয়া আসিও)। যিনি কাহারও নিকট কিছু চাহেন না, যাঁহার কোন অভাবই নাই, সেই গুরুদেব তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ এরূপ বলাতে তাঁহার যেরূপ মনোভাব হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। নিজেকে ধন্য বোধ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাস আনিতে চলিলেন। গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে তদবধি প্রত্যহই ঘাস আনিতে লাগিলেন। যে পরিমাণ ঘাস আনিতেন, গাভী তাহার সমস্ত খাইতে পারিত না। যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তৎসমস্ত তাঁহার গুরুদেব প্রত্যহ ছাদের উপর রাখিয়া দিতেন এবং কম্বল দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন। প্রত্যহ বৃষ্টিতে ভিজিয়া কয়েকদিন পরে ঘাস ও কম্বল উভয়ই পচিয়া গেলে সমস্তই ফেলিয়া দিলেন। বাবাজী মহারাজ সবই দেখিতেন, কিন্তু কিছুই বলিতেন না। তিনি নির্ব্বিচারে প্রসন্নভাবে গুরুদেবের আদেশ পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

আর এক দিন তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া তাঁহার গুরুদেব নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন, "মৌনী শালা খুট খুট করতা রহতা হৈ। নাজ

কাজ কুছ নেহি হৈ। সব বরবাদ হো গিয়া, ক্যায়সা চলেগা ?" (তরিতরকারী সব বাড়ন্ত, খোরাক বরবাদ হইতেছে, কি করিয়া চলিবে ?)। প্রকাশ্য ভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া না বলিলেও তাঁহাকে শুনাইয়াই কথাগুলি বলিলেন। বাবাজী মহারাজ তৎক্ষণাৎ বাজারে গিয়া গম, যব, ছোলা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে কিনিয়া লইয়া আসিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার গুরুদেব সকলকে বলিলেন, "দেখ, বাবুজী নাজ লে আয়কে ভর দিয়া।" (দেখ, বাবু কত জিনিষ আনিয়া ভরিয়া দিয়াছেন)। এইরূপে বাবাজী মহারাজ কলিকাতা হইতে যে টাকা আনিয়াছিলেন সমস্তই খরচ হইয়া গেল। এই অবস্থায় তাঁহার গুরুদেব পুনরায় একদিন বলিলেন, "বাবু, তুম লোগন কো রুটি খানে মে তকলিব হোতী হৈ। বাজার সে কুছ চাউল লে আও" (বাবু, তোমাদের রুটি খাইতে কষ্ট হইতেছে, বাজার হইতে কিছু চাউল নিয়া আইস)। তাঁহার হাতে এ সময়ে একটি পয়সাও ছিল না। ব্যাস নামক একটি লোকের দোকান হইতে তিনি সর্বদা জিনিষ আনিতেন। অগত্যা তাহার দোকান হইতে এক বস্তা চাউল ধারে কিনিলেন এবং কিছু টাকাও হাওলাত নিয়া আসিলেন।

অনন্তর ব্রজপরিক্রমায় যাইবার সময় উপস্থিত হইল। বাবাজী মহারাজ যেবার তাঁহার গুরুদেবের সঙ্গে পরিক্রমায় যাইতেন, সেইবার জিনিষপত্র লইবার জন্য একখানি, এবং মাঠাকুরাণী প্রভৃতি চড়িয়া যাইবার জন্য একখানি, এই দুইখানি বয়েলের গাড়ী * ভাড়া করিয়া লইয়া যাইতেন। এবৎসরেও তাহাই করিলেন। পরিক্রমাকালীন খরচের জন্য ব্যাসের নিকট হইতে আবার ঋণ করিতে হইল।

পরিক্রমায় যাত্রাকালে আর একটি ব্যাপার ঘটিল—আর একদিক দিয়া তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। যাত্রার সকল আয়োজন

* বলদের গাড়ী।

সম্পূর্ণ হইয়াছে, আশ্রমের বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে এবং মাঠাকুরাণী সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের গুরুদেব যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিলেন। মাঠাকুরাণীকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাই, বাবুজী কাহা হৈ ?" তিনি উত্তর করিলেন, "ভিতরে আছেন, একটু কাজ সারিয়া এখনই আসিবেন।" ইহাতে গুরু মহারাজ বলিলেন, "তুম আভি উনকো বোলায়কে লে আও।" (তুমি এখনই উহাকে ডাকিয়া আন)। মাঠাকুরাণী এই কথা শুনিয়া তখনই আশ্রমের ভিতরে চলিয়া গেলে তাঁহাদের গুরুদেব তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং গাড়োয়ানকে বেগের সহিত চালাইতে আদেশ দিলেন। অতঃপর বাবাজী মহারাজ ও মাঠাকুরাণী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। মাঠাকুরাণী সেই দিন প্রাতে সহরের মধ্যে অনেক স্থানে 'ঠাকুর' দর্শন করিতে গিয়াছিলেন—সেজন্য অনেক পথ হাঁটিয়া ক্লান্ত ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার বেশী হাঁটিবার অভ্যাসও ছিল না। তিনি বলিলেন, "মথুরা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে আমি পারিব কি ? এখন কি করা যায় ?" বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "এখন ত দেরী করা যায় না, কিছুদূর হাঁটিয়া চল, তারপর একটা ব্যবস্থা হইবে। হয়ত গাড়ী কোন কারণে আগাইয়া গিয়া আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া আছে।" অতঃপর দু'জনে হাঁটিয়াই চলিলেন। ক্রমে মথুরার বড় রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিলেন, কিন্তু তখনও গাড়ী দেখা গেল না। সম্মুখে তাকাইয়া মাঠাকুরাণী বলিলেন, "গাড়ী ত দেখা যায় না।" পথে কয়েকখানি টাঙ্গা যাইতেছিল। "তুমি না হয় টাঙ্গায় চড়িয়া এস, আমি আগে আগে যাইতেছি" বলিয়া বাবাজী মহারাজ চলিতে লাগিলেন। উনি হাঁটিয়া যাইবেন, আর নিজে টাঙ্গায় চড়িবেন, এ প্রস্তাবে মাঠাকুরাণী সম্মত হইতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে উহার

পরেই বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে একদিন সন্ধ্যার পর মাঠাকুরাণী বাহিরে শৌচে গিয়াছেন, এমন সময় ঝড় ও মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। বাবাজী মহারাজ এই সময়ে ভজন করিতেছিলেন বলিয়া এ ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিলেন না। এদিকে তাঁহাদের গুরুদেব রামফল নামক আশ্রমের একটি চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন "রামফল! বাহারকা খিড়কী বন্ধ্ কর দেও।" রামফল বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে। একটু পরেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপিতে কাঁপিতে অন্ধকারে কোনক্রমে পথ ঠিক্ করিয়া মাঠাকুরাণী দরজার নিকট আসিলেন। আসিয়া দেখেন দরজা বন্ধ। অনেক ডাকিলেন, কিন্তু ঝড় ও বৃষ্টির শব্দে তাহা কাহারও কর্ণগোচর হইল না। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ঝড়বৃষ্টি থামিলে তাঁহার গুরুদেব রামফলকে পুনরায় বলিলেন, "রামফল! দেখ্ তো বাহার যো চাকর হৈ, ওতো উড় গিয় নেহি?" রামফল দরজা খুলিয়া দেখে মাই বাহিরে বসিয়া কাঁপিতেছেন, কথা কহিবার শক্তি নাই, একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিল। আগুন জ্বালিয়া অনেক শুশ্রূষা করিলে তিনি সুস্থ হইলেন। বাবাজী মহারাজ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, "তুমি মনে কোনপ্রকার অসন্তোষ আনিও না। গুরুদেব অন্তর্য্যামী, তিনি এ সমস্ত নিশ্চয়ই আমাদের কল্যাণের জন্য করিতেছেন।" মাঠাকুরাণী আজ সন্ধ্যায় গুরুদেবকে প্রণাম করিতে পারেন নাই। একটু পরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি নিজে হইতে বলিলেন "মাই! এবার আসিবার পর হইতে তোমাদের দু'জনকেই আমি নানারকমে পরীক্ষা করিয়াছি। তোমরা সব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছ। * *

তোমাদের প্রতি আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। তোমরা কোন চিন্তা করিও না, তোমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।" * * মাঠাকুরাণী যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গেলেন, প্রাণভরা উদ্বেল আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই পরমস্নেহময় পিতার চরণে প্রণত হইয়া পড়িলেন।

কলিকাতায় ফিরিবার দিন উপস্থিত হইল। গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় তিনি সুধাবর্ষী দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কুছ্ চিন্তা নেহি হৈ, আনন্দসে চলা যাও, আনন্দ্ হো জায়েগা।" কথা শুনিয়া উভয়ের অন্তর মধুময় হইয়া গেল। দু'জনের কেহই আর অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না,—আনন্দাপ্লুত চিত্তে সজলনেত্রে আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া পুনরায় ঋণ করিয়াই সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। গুরুদেবের আশ্রমে মাসে মাসে যে পচাত্তর টাকা পাঠাইতেন তাহাও নিয়মিতরূপে প্রতিমাসের প্রথমেই পাঠাইতেন। এইরূপে ক্রমে যখন ঋণজালে অতিশয় জড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন অভাবের শেষ সীমায় আনিয়া শ্রীভগবান্ ইহার ব্যবস্থা করিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে একটি বড় মোকদ্দমা পাইলেন, সেজন্য অনেকদিন কাজ করিতে হইল। ফলে পারিশ্রমিক স্বরূপে যে টাকা পাইলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গিয়াও কিছু উদ্বৃত্ত হইল। এখন হইতে তাঁহার উপার্জ্জন ক্রমেই অধিক হইতে লাগিল এবং আর কখনও অর্থাভাব হয় নাই।

তাঁহার গুরুনিষ্ঠা যে কত গভীর ছিল এই কয়েকটি ঘটনায় তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। বাস্তবিক কোন বর্ণনাই তাঁহার গুরুভক্তির পরিচয় দিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুতরাং আর দুই একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

বরিশালের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মহিন্ত্রা মহাশয় এই সময়ে একবার বাবাজী মহারাজের কলিকাতার বাসায় গিয়া কিছুদিন ছিলেন। একদিন তিনি ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেড়াইয়া বাসায় কেবল ফিরিয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দ নামক একটি বালক দৌড়িয়া আসিয়া হর্ষোৎফুল্লভাবে তাঁহাদিগকে বলিল "আজ বৃন্দাবন হইতে বাবাজীর পত্র আসিয়াছে।" তাঁহারা দোতলায় উঠিতেই মাঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনিও প্রীতিপ্রফুল্লমুখে প্রথমেই এই খবরটি দিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কোর্ট হইতে ফিরিলেই তাঁহার হাতে পত্রখানি দেওয়া হইল, দেখা গেল যে তাঁহার সমস্ত দিনের ক্লান্তির চিহ্ন তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইয়া মুখশ্রী এক অপূর্ব্ব আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই পত্র আসা উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দের প্লাবন বহিয়া গেল। মহিন্ত্র মহাশয় লিখিয়াছেন "তখন ইহা দ্বারা একটুও প্রভাবান্বিত হই নাই, এত আনন্দের অর্থও কিছু বুঝি নাই। তখন আমি তরুণ যুবক, জীবনে ধর্ম্মভাবেরও বিশেষ স্ফুরণ হয় নাই। * * * সেদিন ইহা বুঝি নাই, আজ বুঝি। আজ ভাবি কি সুগভীর সেই প্রেম! বাবাজীর পত্র আসাটা একটা মহা আনন্দের ব্যাপার, উহা আসিলেই উল্লসিত হইতে হয়! * * *" বাস্তবিক যে অপূর্ব্ব গভীর প্রেম এই সাধারণ ঘটনায় অতি সহজ সরল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে, বাস্তবজীবনের সহিত পরিচয় থাকিলেই তাহা অনুভব করা যায়।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত গুরুকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "তাঁহার গুরুভক্তি ছিল অসীম। বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে কোন জরুরী খবর পাইলে তিনি তখনই বৃন্দাবনে রওনা হইয়া যাইতেন।" বাবাজী মহারাজের

অন্যতম গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাস মহাশয় লিখিয়াছেন "শ্রীমৎ সন্তদাসজী বহুবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে ব্রজপরিক্রমা করিয়াছিলেন, শেষবারে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণবাবু, নগেন্দ্রবাবু, আমি প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার সঙ্গে ব্রজপরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলাম। এইবার গুরুদেব বার্দ্ধক্য বশতঃ পাল্কীতে চড়িয়া পরিক্রমা করিতেছিলেন। এই সময়ে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, সন্তদাসজী শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্বচ্ছন্দতার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। পরিক্রমা-পথে নন্দঘাট হইতে যমুনা দিয়া নৌকায় মাঠগ্রামে যাওয়া যায়। অভয়বাবু, নগেন্দ্রবাবু এবং আমি সেইদিন বাবাজী মহারাজকে নৌকায় যাওয়ার জন্য নিবেদন করিলাম; কিন্তু সন্তদাসজী তৎপূর্ব্বে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, নৌকাপথে বহু বিলম্ব হইবে এবং তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের দৈহিক ক্লেশ হইবে। বাবাজী মহারাজ আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই ক্লেশ স্বীকার করিলেন এবং আমরা সেদিন যমুনাবক্ষে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গলাভ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিলাম। আমরা আপন আপন আনন্দের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু সন্তদাসজী শ্রীশ্রীগুরুদেবের সেবা-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।"

তাঁহার গুরুদেবের কোন বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা, তাঁহার প্রতি তাঁহার 'বাবা'র অসাধারণ কৃপার কথা বহু বার কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। সেই সকল কথা বর্ণনাকালে তাঁহার গদগদভাব, উদ্গতাশ্রু দীপ্ত মূর্ত্তি তাঁহার গুরুপ্রেম ও গুরুনিষ্ঠার পরিচয় দিত।

যখন তিনি কাতর ব্যাকুলতার সঙ্গে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া সত্য সত্যই চিরবাঞ্ছিত সদ্‌গুরুকৃপা লাভ করিলেন, তখন যে তাঁহার অবস্থা জন্মান্ধের নয়নলাভ অথবা একপুত্রা মাতার বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট সেই পুত্রকে পুনরায় লাভ অপেক্ষাও বেশী হইয়াছিল, পাঠক একটু নিবিষ্ট-

চিত্তে অনুধাবন করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহা ত কেবল একটি দিক্, আর তাহারও আরম্ভ মাত্র। ইহার পরে ক্রমে গুরুদেবের মহিমার পুনঃ পুনঃ পরিচয় পাইয়া, গুরুতত্ত্ব প্রকট হইলে, শ্রীগুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্, জগদ্‌গুরু ও নিজের অন্তরাত্মা বলিয়া জানিবার ফলে ইহা উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিয়া অবশেষে যে কি বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল তাহার আভাস হৃদ্গত হওয়া কেবলমাত্র সেই কল্যাণময় পরমপিতারই করুণাসাপেক্ষ, অন্য কোন প্রকারেই তাহা হইবার নহে!

শ্রীবৃন্দাবনে যে বাগিচায় তাঁহার গুরুদেব থাকিতেন, তথায় সর্পবহুল অল্পায়তন গৃহগুলি দেখিয়া একটু ভাল করিয়া আশ্রমবাটীখানি নির্ম্মাণ করিতে স্বভাবতঃই তাঁহার ইচ্ছা হয়, ও তিনি সেখানে ঠাকুর মন্দির প্রস্তত করাইতে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি কলিকাতা হইতে টাকা পাঠাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার গুরুমহারাজই নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া মন্দির প্রস্তুত করান। অতঃপর শ্রী১০৮ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীযুক্ত হরিমোহনবাবুকে পাঠাইয়া জয়পুর হইতে যুগল-বিগ্রহ আনাইয়া ঐ মন্দিরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে (১৩০৪ সালে) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার সমস্ত কার্য্য শ্রীযুক্ত রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজই পরিচালনা করেন। সেই প্রতিষ্ঠার দিন প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী ভূমিকম্প হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃন্দাবনে তাঁহারা উহা টের পান নাই। পরে সংবাদ পাইলেন যে, মথুরাতেও ভূমিকম্প হইয়াছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার দুই এক দিন পরে দ্বিপ্রহরের পর আশ্রমের একটি ঘরে তিনি বসিয়া আছেন, তাঁহার গুরুদেব ধুনীর ঘরে ধুনীর নিকট বসিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার গুরুদেব উঠিয়া আসিয়া তিনি যে ঘরে বসিয়াছিলেন, তাহার দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বাবুজী!

শোন মেরী বাত, তোমারা যো ঠাকুরজী ছিঁয়া বৈঠা হ্যায়, ওয়ে ভারী কেরামতি ঠাকুর, ঠাকুরজী তুমকো বর দেয়েঙ্গে, তোমারা মন্মে যো কুচ্ হোয়, ইস বক্ত্ যাও, উনসে মাঙ্গ লেও।" তিনি বলিলেন "বাবা, আপনার সন্তুষ্টিই আমার বাঞ্ছনীয়। আপনি সন্তুষ্ট হইলে আমার কোন বিষয়ে কি অভাব থাকিতে পারে? আমি আর কি বর মাগিব?" ইহাতে তাঁহার গুরুদেব বলিলেন "হাঁ, তোমারী বাত সাচ হ্যায়, লেকী কুচ্ পরোক্ষাভি করলেনা চাহিয়ে, হাম কহতে যাও ইস বক্ত্ যো কুচ্ বর তোমারা মন্মে হোয় ঠাকুরজীসে মাঙ্গ লেও।" তিনি তাঁহার এই আদেশ শুনিয়া আর কিছু না বলিয়া ঠাকুর মন্দিরে গেলেন এবং ঠাকুরজীকে দণ্ডবৎ করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন "হে প্রভো! গীতায় তুমি বলিয়াছ,

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥' *

এই সকল শ্লোকে যে সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে মনুষ্যদেহে যতদূর পর্য্যন্ত অবস্থা লাভ হইতে পারে তাহাই আমি পাইতে ইচ্ছা করি। তোমার কৃপায় ইহাই হউক, আমি অন্য কিছু চাই না।" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তিনি ঠাকুরজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পূর্ব্বে

* অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে স্থিত প্রসন্নাত্মা পুরুষ কোন বিষয়ের জন্য শোক করেন না এবং কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষাও করেন না; সমস্ত প্রাণীতে তাঁহার সমদর্শন উপজাত হয় এবং তৎপর তিনি মৎসম্বন্ধিনী পরাভক্তি লাভ করেন। আমি যে প্রকার এবং আমার যথার্থ স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ক তত্ত্বের সহিত পরাভক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আমাকে জ্ঞাত হয়েন, এই প্রকার আমাকে তত্ত্বের সহিত অবগত হইয়া তৎপর আমাকেই প্রবিষ্ট হয়েন।



বড়বিদেহী মহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস এর চিত্র, বাবাজী মহারাজ

কৌপীন ধারণ পরে ... অবস্থা। | পৃ ২১৪

যে গৃহে যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীযুক্ত দাদাগুরুজী মহারাজ (কাঠিয়া বাবা) তখন ধুনীর নিকটেই আসীন ছিলেন। তিনি নিজ আসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলে তাঁহার গুরুদেব পুনরায় উঠিয়া আসিয়া ঐ ঘরের দরজায় দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "তোমারা অভীষ্ট সিদ্ধ হোগা, তোমারা ঋদ্ধি সিদ্ধিকা কভী টুটা নেহী পড়েগা, মহন্থাইভী মিলেগা।"

ক্ষণকাল থামিয়া পুনরায় বলিলেন, "ভগবৎ দর্শনভি তুমকো মিলেগা। যদি মহ্ বাত সাচ্চা নহী হোয়, তো হাম্‌ভী সাচ্চা সাধু নেহী হৈ।" তাঁহার বর সকল শুনিয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ অবাক্ ও স্তম্ভিত হইলেন *।

* ইহার অনেকদিন পূর্বে একটি ঘটনায় এই ব্যাপারের সূচনা হয়, কথা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাঁহার গুরুদেবের দেহাবসানে তাঁহার স্থানে বসিবার উপযুক্ত কাহাকেও না দেখিয়া, সিদ্ধ সামর্থী মহাপুরুষদিগের যে ধারা স্মরণাতীত কাল হইতে এযাবৎ অব্যাহত-রূপে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা আজ লুপ্ত হইতে চলিল ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইত। একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে সুযোগ পাইয়া শ্রীযুক্ত দাদাগুরুজী মহারাজকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের যে ধারা তোমাতে পর্যন্ত অব্যাহতরূপে চলিয়া আসিয়াছে আজ কি তুমি তাহা লোপ করিতে চাও? নতুবা আমাদের মধ্যে তোমার অবর্তমানে তোমার আসনে গিয়া বসিতে পারে, এরূপ কোন উপযুক্ত সামর্থী পুরুষ দেখিতেছি না কেন?" শ্রীযুক্ত দাদাগুরুজী মহারাজ এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে একটু যেন দুঃখিত ভাবেই বলিলেন, "বাবা, হাম ক্যা করেঙ্গে, সুপাত্র নেহী মিলতা হ্যায়।" বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "মহারাজ, সুপাত্র কাহাকেও করিয়া লইবার কি সামর্থ্য তোমার নাই?" তিনি তৎক্ষণাৎ তেজের সহিত উত্তর করিলেন, "কোঁ নেহী সামর্থ্য? হ্যায় জরুর।" তাহাতে বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তবে কাহাকেও সুপাত্র করিয়া লও না কেন?" ইহাতে শ্রীযুক্ত দাদাগুরুজী মহারাজ কিছুক্ষণ

ব্রজধাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। ইহার পর আর যে কয়বার বাবাজী মহারাজ ব্রজপরিক্রমায় গিয়াছেন, প্রতিবারেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দগ্রাম, বর্ষাণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁহার সহিত কিছু না কিছু লীলা করিয়াছেন। এই সকল ঘটনা তিনি সচরাচর কাহাকেও বলিতেন না। কদাচিৎ কথাপ্রসঙ্গে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় কয়েকটি ঘটনা আমাদিগকে বলিয়াছেন। তাহার দুই একটি এই স্থলে বর্ণনা করিতেছি।

ব্রজপরিক্রমার পথে নন্দগ্রাম একটি প্রধান স্থান। এখানে পৌঁছিয়া সাধুগণ প্রথমতঃ মন্দিরে গিয়া নন্দবাবা, যশোদা মায়ী এবং কৃষ্ণ-বলরামের মূর্ত্তি দর্শন করেন, তদনন্তর গ্রামের অপরপ্রান্তস্থিত কুণ্ডের তীরে গিয়া আসন স্থাপন করেন। গ্রামের মধ্য দিয়া পথ। একবার পরিক্রমাকালে সাধুজমাত নন্দগ্রামে পৌঁছিলে এই সকল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ গ্রামের এই রাস্তা দিয়া কুণ্ডের দিকে যাইতেছিলেন। পথিপার্শ্বস্থ একটি খাবারের দোকানের নিকট উপস্থিত হইলে একদল ব্রজবালক তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া বলিল "বাবু, হাম্ সব্‌কো কুছ্ জিলাবী খিলায় দেও (বাবু! আমাদের কিছু জিলাপী খাওয়াও)।" তখন দোকানে জিলাপী তৈয়ারী ছিল না। বাবাজী মহারাজ শীঘ্র কিছু জিলাপী তৈয়ারী করিয়া দিতে বলিলে দোকানদার সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ কড়া চড়াইয়া দিল। এই সময়ে আর দুইটি বালক সেখানে উপস্থিত হইল; ইহাদের মুখশ্রী, বিশেষতঃ চোখ দু'টি এত সুন্দর যে তাহাদের দিকে চাহিয়া বাবাজী মহারাজ আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। যতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল, ততক্ষণ তাহাদিগকেই

তাঁহার উপর স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া নীরব রহিলেন; পরে যেন স্বগতভাবে বলিলেন, "হাঁ, হাম্ কিসিকো কম নেহে।"

দেখিতে লাগিলেন। খুব শীঘ্রই জিলাপী প্রস্তুত হইয়া গেল। তখন এই ছেলে দুইটি ঈষৎ বঙ্কিম হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল "বাবা, ইয়ে সব বড়া উপদ্রব বাচাইয়া, তুম হাম দোনোকে জিলাবী দে দেও, হম্ সবকো বাট দেয়েঙ্গে *।" বালক দুইটির রূপ যেমন মনোহর, কণ্ঠস্বর ও কথা বলিবার ভঙ্গীও তেমন মিষ্ট। ইহাদের কথা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার মনে হইল যেন ইহারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলরাম। জিলাপী তৈয়ার হইয়া গেলে তাহা লইয়া আর কাহাকেও না দিয়ে সেই ছেলে দুইটিকেই দিলেন, কেন তাহাদের কথা শুনিবেন এরূপ কোন বিচার মনে উঠিল না। তাহারা সমস্ত বালকদিগকে বাঁটিয়া দিলেন, নিজেরাও কিছু খাইলেন। ইহার পরই বালক দুইটি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, কেহ আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। তখন বাবাজী মহারাজ বুঝিতে পারিলেন যে, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলরামই আসিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া গেলেন। এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার দেহমন ভরিয়া গেল—ব্রজবালক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম স্বয়ং আসিয়া যে তাঁহাকে দর্শন দিয়া গেলেন ইহাতে নিজেকে ধন্য বোধ করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

আর একবারের কথা। তখন পরিক্রমার পথে সেরগড হইতে নন্দঘাটে যমুনা পার হইয়া মাঠগ্রামে যাইতে হইত। কোন কোন বৎসর সেরগড় হইতে গিয়া যমুনার বন্যার জন্য নন্দঘাটেই রাত্রে থাকিতে হইত। এই বৎসরও বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় অত্যন্ত কাদা হওয়ায় বয়েলের গাড়ী সে পর্য্যন্ত যাইতে বেলা পড়িয়া গেল। বৃষ্টি হওয়ায় যমুনাতেও

* বাবা, তুমি আমাদের দু'জনকে জিলাপী দেও, আমরা সকলকে বণ্টন করিয়া দিব। নতুবা ইহারা বড় উৎপাত করিবে।

জল খুব বাড়িয়াছিল। সুতরাং যমুনা পার হওয়া সম্ভব হইল না, সে রাত্রি সেখানেই অপেক্ষা করিতে হইল।

সেদিন একাদশী। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একাদশীর ব্রত করিতেন, তবে নির্জ্জলা করিতেন না, ফলমূলাদি কিছু খাইতেন। বেলাশেষে যখন সকলে নন্দঘাটে পৌঁছিলেন, তখনও তিনি কিছু খাইতে পান নাই। সাধুরা সকলেই একাদশী করেন, কিন্তু তাঁহারা পথে গ্রামবাসী গৃহস্থদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া খাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যে গঙ্গা নাম্নী গাভীটি থাকিত, তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া তাঁহার গুরুদেবের আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একেলা তিনিই অভুক্ত ছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার আহারার্থ খাদ্যসামগ্রী, অন্ততঃ কিছু দুধ সংগ্রহ করিবার জন্য গ্রামে লোক পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পরিক্রমা পথে সকলে এক একটি বিশ্রাম স্থানে উপস্থিত হইলে ছাতা লাগান, তাম্বু খাটান প্রভৃতি প্রাথমিক প্রয়োজনের অনেক কাজ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বন্দোবস্ত করিতেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এদিনও এই সকল সম্পন্ন করিয়া তিনি স্নানে যাইবেন, এমন সময় যাহাদিগকে দুধের সন্ধানে গ্রামে পাঠান হইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে দুধ পাওয়া গেল না। তখন অগত্যা তিনি ভাবিলেন, আজ গাছের পাতা খাইয়া থাকিবেন। বাহির হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু যাহার পাতা বিশেষ বিস্বাদ নয় এবং খাওয়া যাইতে পারে এমন কোন গাছ সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। দেখিলেন বেশীর ভাগই লেবু গাছ, একটু পরে দেখিলেন দূরে একটি জলাশয়, সেখানে সিঙ্গাড়ার (পানিফলের) লতা রহিয়াছে। এই পাতা হয়ত খাওয়া যাইবে, হয় ত ফলও দুই চারিটি মিলিবে ভাবিয়া সেখানে স্নান করিতে চলিলেন। স্নানান্তে পাতা তুলিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছেন এমন সময় লক্ষ্য পড়িল সূর্য্যাস্ত হইয়া

গিয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর বৃক্ষাদির পত্রচ্ছেদন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। সুতরাং পাতা না তুলিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। "আজ আমার কিছু খাওয়া বোধ হয় ভগবদিচ্ছা নয়" ভাবিয়া আহারের চিন্তা ত্যাগ করিলেন। অতঃপর ঠাকুরজীর আরতির অন্তে নিশ্চিন্ত চিত্তে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভজন করিয়া প্রায় মধ্যরাত্রে বিশ্রামার্থ কেবল শয়ন করিয়াছেন এমন সময়ে কোথা হইতে একটি বালক এক লোটা দুধ লইয়া আসিয়া হাঁকিতে লাগিল, "বাবুজী কাঁহা হৈ? বাবুজী কাঁহা হৈ?" তাঁহার গুরুদেবও এই সময়ে শয়ন করিয়াছিলেন, ছেলেটির স্বর শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়া নিকটস্থ বালকদাস নামক একটি সাধুকে বলিলেন, "বালকদাস, বাবুকো দেখায় দেওতো!" এই কথায় বালকদাসজী ছাতার বাহিরে আসিলে ছেলেটি তাঁহার হাতে লোটাটি দিয়া বলিল, "বাবুকে লিয়ে যহ্ দুধ লে আয়া, উন্‌কো দে দেও।" বলিয়াই অন্তর্হিত হইয়া গেল। বালকদাসজী দুধ আনিয়া বাবাজী মহারাজকে দিলে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কে আনিল দেখিতে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার গুরুদেব বলিলেন, "আরে দুধ পিলে, তুমারে লিয়ে হি যহ দুধ আগয়া।" তখন তিনি ঐ দুধ পান করিলেন, দেখিলেন—তাহাতে মিশ্রী, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি মিশ্রিত আছে। পান করিয়া তাঁহার চিত্ত অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এত স্বাদ অনুভব করিলেন যে, তেমন স্বাদ দুধে আর কখনও পান নাই। দুধের লোটাও আর পরে কেহ লইতে আসেন নাই। সাক্ষাৎ ভগবানই তাঁহার জন্য এই দুধ বহিয়া আনিয়াছিলেন!

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন, "বাবা, এইরূপে গুরুদেবের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলাম এবং কলিকাতায় ওকালতি ব্যবসাও করিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় আমার একবার এমন তীব্র বৈরাগ্য

আসিল যে আমি মনে মনে স্থির করিলাম, আমার এখন সংসারে থাকার অবস্থা নয়। সুতরাং আমি সংসার-সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট গিয়া সাধু হইব এবং তাঁহার শ্রীচরণের সেবা করিয়া অবশিষ্ট জীবনকাল অতিবাহিত করিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে * এই সমস্ত মনের ভাব জ্ঞাপন করিলাম এবং আমার স্ত্রীর ভবিষ্যতে ভরণপোষণের উপযুক্ত এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার উপর তত্ত্বাবধানাদির ভার অর্পণ করিলাম। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং আমাদের উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মপথে পরস্পরের আনুকূল্য করিবার ভাব ছিল। সুতরাং তিনি আমার এই সদুদ্দেশ্যে বাধা দিতে ইচ্ছা করিলেন না, আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যেদিন এইরূপে সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া সাধু হওয়া বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলাম, সেই দিন রাত্রে আমি যে ঘরে শয়ন করিতাম সেই ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য দরজা খুলিবামাত্র দেখিলাম সম্মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার বদন প্রসন্ন, নয়নদ্বয়ে করুণার স্রোত অবিরত ধারে প্রবাহিত হইতেছে। জ্যোতিতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়াছে। তখন আমার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ স্রোত বহিতে লাগিল, সমস্ত জগৎকে আনন্দময় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। অবশভাবে অশ্রুপূর্ণনেত্রে শ্রীভগবান্‌কে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, তিনি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। আমার অন্তরে আনন্দের

* বন্ধুটির নাম শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী; বাবাজী মহারাজের প্রতিবেশী ছিলেন; একসঙ্গে হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন এবং যোগীসম্প্রদায়ে একসঙ্গে যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি বাবাজী মহারাজের সহিত কয়েকবার ব্রজ-পরিক্রমায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রণীত "ব্রজে চৌরাশী ক্রোশ বন-পরিক্রমা" নামক পুস্তিকায় ব্রজ-পরিক্রমার অতি সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে।

স্রোত তখনও বহিতে লাগিল, কয়েকদিনই সেই স্রোত চলিয়াছিল। সংসারকে দুঃখময় অতএব পরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ হওয়াতে আমার যে তীব্র বৈরাগ্য আসিয়াছিল, সমস্ত সংসারকে আনন্দময়রূপে দর্শন করিয়া সেই ভাব আর রহিল না। বরঞ্চ আমার শয়নকক্ষেই যে তিনি দর্শন দিয়াছেন ইহাতে আপাততঃ আমার সংসারে অবস্থানই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইবার ইচ্ছাও ইহার ফলে তিরোহিত হইয়া গেল এবং পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইহার কয়েক মাস পরে পূজার বন্ধে শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট আসিয়া এই সব বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিলেন, "যহ দর্শন বহুত ভাগসে মিলতা হৈ। লেকিন যহ দর্শন ছায়া দর্শন হৈ, ইসকে পরে ঔরভী দর্শন হৈ।" (এ দর্শন বহু ভাগ্যে মেলে; কিন্তু ইহা ছায়া দর্শন, ইহার পর আরও দর্শন আছে)।

অতঃপর নিয়মিত ভজন সাধন করিয়া, নির্ব্বিশেষে সকলের সেবা করিয়া, এবং তাঁহার গুরুদেব যে বলিয়াছিলেন নব-নির্ম্মিত আশ্রম সম্পূর্ণ হইলে তিনি নিজে আসিয়া সেখানে বসিবেন ও তাঁহাকে কাজ ছাড়াইয়া আনিয়া নিজের কাছে বসাইবেন—সেই দিনের অপেক্ষা করিয়া, বাবাজী মহারাজ কাল কাটাইতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বৃন্দাবনে আশ্রম-নির্ম্মাণ

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালের একটি প্রধান কার্য্য শ্রীবৃন্দাবনে বৃহৎ মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা। তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুদেব যে স্থানে থাকিতেন, তথায় মন্দির ও আশ্রম ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও জয়পুর হইতে যুগলবিগ্রহ আনাইয়া স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরে সেই বিগ্রহযুগলকেই নূতন আশ্রমে আনিয়া স্থাপন করা হয়। এই নূতন আশ্রমটির নাম 'নিম্বার্কাশ্রম'। ব্রজবাসীরা সাধারণতঃ নিম্বার্কাশ্রমকে "কাঠিয়া বাবাকা আস্থান" ও ছোট পুরাতন আশ্রমকে "কাঠিয়া বাবাকা পুরাণা আস্থান" বলিয়া থাকে। শুনা যায়, বহুবৎসর পূর্ব্বে আমাদের নূতন আশ্রমের স্থানটি দেখাইয়া (তখন ইহা পতিত জমি মাত্র ছিল) শ্রীযুক্ত দাদাগুরুজী মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এখানে এক বৃহৎ আশ্রম ও মন্দির হইবে ও সেখানে বহু সাধুসেবা হইবে।" উত্তরকালে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীই যেন আশ্রমরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজ ১৩১৬ সালের ৮ই মাঘ দেহরক্ষা করেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার অনুমতি ও অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই নূতন জমি খরিদ করিয়া সেখানে বৃহদাকারে নূতন মন্দির ও আশ্রমবাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। শ্রীযুক্ত মাতাদিন সুকুল নামে



বৃন্দাবনের মহন্ত শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

কাঠের কৌপীন ... পায়ের অবস্থা পৃঃ ২২২

বাবাজী মহারাজের একজন ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু ছিলেন। দশ হাজার টাকার মধ্যে হইতে পারে, এইরূপ একটি দালানের নক্‌সা (plan) ইঁহার দ্বারা তিনি করাইয়া লন এবং তদনুসারে প্রথমতঃ কার্য্য আরম্ভ হয়। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও তিনি কলিকাতা হইতে টাকা পাঠাইতেন এবং তাঁহার গুরুদেব তত্ত্বাবধান করিয়া নির্ম্মাণকার্য্য করাইতেন। ইহার অল্পকাল পরে, নির্ম্মাণকার্য্য কিছু অগ্রসর হইলে তাঁহার গুরুদেব মানবলীলা সম্বরণ করেন। অতঃপর একজন স্থানীয় কণ্ট্রাক্টরের উপর কার্য্যভার দেওয়া হয়। ইহাকে পুরাণো আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর মন্দিরের সম্মুখে ডাকাইয়া আনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলেন, "দেখ, এই বাড়ী ঠাকুরজীর, মনোযোগপূর্ব্বক এবং সদ্ভাবের সহিত সমস্ত কাজ করিবে, এ কাজে প্রবঞ্চনা করিলে তোমার কখনও ভাল হইবে না।" ইনি তাহাতে সম্মত হন। সর্ত্ত থাকে যে, তিনি প্রতিবৎসর পূজার সময়ে, সম্ভব হইলে অন্য সময়েও গিয়া কাজ দেখিবেন, কোনস্থানে কাজ খারাপ বা অপছন্দ হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া পুনরায় ঠিক্ করিয়া গাঁথিতে হইবে। অনন্তর তাহাকে প্ল্যান বুঝাইয়া দিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং মধ্যে মধ্যে টাকা পাঠাইতে থাকেন। আশ্রম নির্ম্মাণকার্য্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে *।

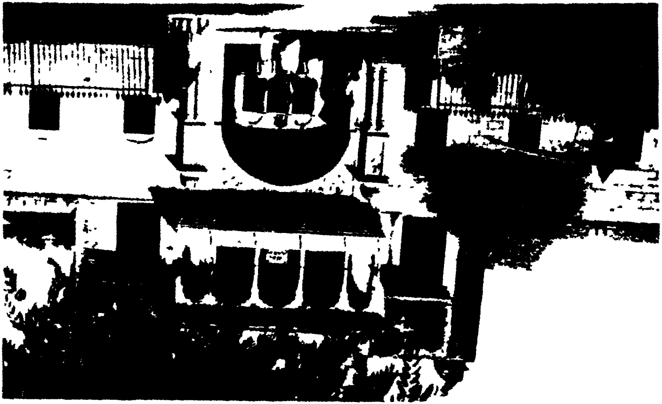
* অর্থাভাবে মধ্যে মধ্যে কাজ কিছুকাল বন্ধও থাকিত। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা শুনা যায়। একবার অনেকদিন পর্য্যন্ত বাবাজী মহারাজ কিছু টাকা পাঠাইতে না পারায় কণ্ট্রাক্টরের অনেক টাকা বাকী পড়িয়া যায়। টাকা পাইবে কিনা ভাবিয়া তাহার চিন্তা হইল, ব্রজবাসীরাও কেহ কেহ তাহাকে বলিতে লাগিল "বাঙ্গালীবাবু তোমাকে কি দিবে, এক পয়সাও দিবে না।" অতঃপর তিনি কাজ আর করিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, কে তাহাকে বলিতেছে, "তোর কোন ভয় নাই, তুই সমস্ত টাকা পাবি, এক পয়সাও বাকি থাকিবে না, তুই মন্দির

প্রতিবৎসর পূজার সময় গিয়া ঐ কাজ দেখিতেন *, অমনোনীত অংশ কখন কখন ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইত। এতদ্ব্যতীত আর একটি ব্যাপার ঘটিত, প্রতিবৎসরই গিয়া কাজের প্ল্যান অনেকটা বাড়াইয়া দিয়া আসিতেন †। তাঁহার মনে হইত, "এইখানটা আর একটু না বাড়াইলে চলে না, ওখানে এই কাজটুকু করিলে ঠাকুরজীর সামনেট দেখিতে বেশ সুন্দর হইবে, সুতরাং ওটা করিতেই হয়, এই বারান্দাট আর একটু লম্বা না হইলে মানায় না" ইত্যাদি। এমন আবেগ ভিতর হইতে আসিত যে শেষ পর্য্যন্ত সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়া আসিতেন, ইহাতে পূর্ব্বের গঠন কিছু কিছু বদলাইতে এবং মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিতেও হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রায় ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে বিরাট আশ্রম প্রস্তুত হইয়া উঠিল এবং বিলম্বও প্রধানতঃ এই কারণেই

কর।" ইহার কয়েকদিন পরেই এক মোকদ্দমায় অনেক টাকা পাইয়া শ্রীযুক্ত সারদা মহারাজ কণ্ট্রাক্টরের তৎকালীন দেনা শোধ করিয়া দেন।

* কণ্ট্রাক্টরও প্রয়োজনানুসারে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ ও উপদেশ লইয়া যাইতেন। তখনও যতটুকু যেরূপ কার্য্য হইয়াছে, তাহার নকসা দেখিয়া কোন স্থান অমনোনীত হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া করিবার কথা বলিয়া দিতেন ও তাহাই করা হইত।

† তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সারদাবাবু লিখিয়াছেন "তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবনে সুবৃহৎ আশ্রম নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হাতে অধিক টাকা ছিল না। তাঁহার ওকালতির আয় হইতে এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুরূহ মনে করিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা নগেন্দ্রবাবু ও আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম 'আপনার হাতে বেশী টাকা নাই, তথাপি ঋণ করিয়াও আশ্রমের কার্য্য এত বাড়াইতেছেন কেন?' উত্তরে তিনি বলিলেন 'শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশ্রম নির্ম্মাণের কার্য্য তিনি যেরূপেই হউক সম্পন্ন করিবেন।' বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, যেন অলৌকিক ভাবে অল্পদিন মধ্যে ওকালতি ব্যবসা দ্বারাই আশ্রমনির্ম্মাণ ও ঠাকুর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আসিয়া গেল।"



হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি নিজে আমাদিগকে এক সময় বলিয়াছিলেন, "বাবা! তখন ভাবিয়া অবাক্ হইতাম, এ কি হইতে চলিল! অথচ এরূপ আবেগ ভিতর হইতে আসিত যে, তাহা বোধ করিতে পারিতাম না। এখন ত দেখ, ইহাতেই কুলায় না। ঠাকুরজীর কাজ ঠাকুরজীই করাইয়া লইয়াছেন!"

এইরূপে ন্যূনাধিক সাত বৎসর পরে ১৩২১ সালের শেষভাগে সুবৃহৎ আশ্রমবাটী নির্ম্মিত হইয়া উঠিল। শ্রীবৃন্দাবন সহরের বহির্ভাগে একপ্রান্তে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে স্বল্পদূরে লাইনের পার্শ্বে জয়পুর রাজার মন্দিরের পশ্চাদ্বর্ত্তী রাস্তার পশ্চিম দিকে পূর্ব্বদ্বারী আশ্রমবাটী, সম্মুখে সুবৃহৎ তোরণ, তোরণের উভয় পার্শ্বে দুই সারি ঘর, ভিতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গন, চকমিলান চারিদিকে আঁটা আশ্রমবাটী, মধ্যস্থলে নাতিবৃহৎ জগমোহন ও নাটমন্দিরযুক্ত উচ্চ মন্দির। মন্দির ও জগমোহনের মেঝে মার্ব্বেল পাথরে বাঁধান। উত্তর ও দক্ষিণে দরদালানের মত বারান্দা, সেখানে ঘর নাই, বানরের উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ত লোহার শিক দিয়া আঁটা *। তোরণের ঠিক উপরিভাগে দোতলায় একটি বড় ও দুইটি ছোট ঘর আছে।

১৩২২ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৯১৫, ১৭ই মে) সোমবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে এই মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অপূর্ব্ব, অভাবনীয় উৎসব হইয়াছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শিগণের নিকট তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

* আশ্রমে অবারিত সাধুসেবা প্রবর্ত্তিত হইবার পর ইহার দক্ষিণাংশে "সন্তনিবাস" অর্থাৎ সাধুদের থাকিবার জন্য স্থান হইয়াছে এবং পরে মন্দিরের পশ্চিমদিকে পশ্চিম পার্শ্বে আরও কতকগুলি ঘর ও বারান্দা প্রভৃতি হইয়াছে। শেষের দিকে বাবাজী মহারাজ এই পশ্চাৎ দিকের ঘরেই থাকিতেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "কিছুদিন পূর্ব্বেই মন্দির সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তারাকিশোর বাবু চারিদিকে নিমন্ত্রণ করিতে ছুটিলেন। তিনি দেশ হইতে অনেক লোক আনিলেন, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে গোস্বামী প্রভু ও কাঠিয়া বাবার সমস্ত শিষ্যকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহা বাদে তিনি এক আশ্চর্য্য নিমন্ত্রণ করিলেন, যাহা আজকালকার দিনে কেহই করে না, বিশ্বাসও করে না। কালীঘাটের মা কালীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, পুরী গিয়া জগন্নাথ-দেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার পথে গয়ায় গিয়া গদাধরকে নিমন্ত্রণ করিলেন ও কাশীতে বিশ্বেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করিলেন।"

আর একটি কথা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন। "১৩২২ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার অক্ষয় তৃতীয়া দিনে তিনি বৃন্দাবনে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন অবধারণ করিলেন, তখন তাঁহার হাতে টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না। আশ্রম প্রতিষ্ঠার খরচ দূরে থাকুক, ঠিকাদারের নিকট দেনাই প্রচুর ছিল। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তাহা দেখিয়াই যেন ভক্তবৎসল ভগবান্ টাকার যোগাড় করিয়া দিলেন। একসঙ্গে কতকগুলি মফঃস্বলের মোকদ্দমা উপস্থিত হইল এবং কলিকাতাতেও কালীকৃষ্ণবাবুর বাটীর মামলায় দৈনিক চারি শত দশ টাকা করিয়া ফিস্ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে টাকার যোগাড় হইয়া গেল।

"এই উৎসবে যাওয়ার জন্য বহুস্থানে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়াছিলেন। আমি এবং অন্যান্য অনেকে এই সকল নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই সকল পত্রে ইহাও লেখা ছিল যে, সকলকে পত্র দিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই, সুতরাং তুমি তথাকার সকলকে জানাইবে, এই উৎসবে যদি কেহ আসেন, তবে অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

"এই নিমন্ত্রণ ব্যাপার উপলক্ষে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা এই স্থলে লিপিবদ্ধ না করিয়া পারিলাম না। একদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে বাবাজী মহারাজ শয়নকক্ষে বসিয়া আমাকে দিয়া কয়েকখানি নিমন্ত্রণ-পত্র লিখাইতেছিলেন, এ ঘরে তাঁহার স্ত্রীও (আমার বড়দিদি) উপবিষ্টা ছিলেন। দিদি বলিলেন, "মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে, আমার মা, ও গণশার মার * এই উৎসবে যাওয়ার জন্য কত আগ্রহ ছিল, তাঁহারা আর দেখিতে পাইবেন না।" ইহার কিছু পূর্ব্বে আমার মা কাশীলাভ করিয়াছিলেন এবং এই ভগিনীও পরলোকগমন করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে বাবাজী মহারাজ বলিলেন 'হাঁগো! তাঁহারাও প্রতিষ্ঠায় যাইবেন।' তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'তাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন, এখন আর তাঁহারা প্রতিষ্ঠায় যাইবেন!' বাবাজী মহারাজ বলিলেন, 'তুমি বিশ্বাস কর, তাঁহারা যাইবেন!' ইহাতে তাঁহার স্ত্রী আর প্রতিবাদ করিলেন না, একটু স্বগতঃভাবেই বলিলেন, 'এখন তাঁহারা গেলে আমরা ত আর দেখিতে পাইব না!!' আমি প্রত্যক্ষতঃ এই কথাবার্ত্তায় যোগ দিই নাই, কিন্তু বড়দিদি যাহা বলিতেছিলেন, আমিও দুঃখিত চিত্তে তাহাই ভাবিতেছিলাম। পরন্তু বাবাজী মহারাজের কথার উপর আমার বিশ্বাস ছিল, সুতরাং আমি মনে করিলাম তাঁহারা যাইবেনই, কিন্তু আমরা দেখিব না! ইহা ভাবিয়া একটু দুঃখ যে না রহিয়া গেল, তাহা নহে। যাহা হউক, অতঃপর আর একথা হইল না, পত্র লিখিবার কার্য্য চলিতে লাগিল।

"মন্দির প্রতিষ্ঠার পর বাটী ফিরিবার সময় উৎসবের প্রসাদ লাড্ডু, কচুরী প্রভৃতি আমরা অনেক সঙ্গে আনিয়াছিলাম। আমাদের গ্রামের

* আমার অপর এক দিদিকে (সহোদরা) তিনি এই নামে ডাকিতেন। ভাগিনেয়ের নাম গণেশ।

পার্শ্ববর্ত্তী আন্দিউড়াগ্রামে আমার জ্ঞাতি সম্পর্কে খুড়তুত এক জেঠী ভগিনীর বাড়ী। তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উৎসবের প্রসাদ দিবার জন্য একদিবস তাঁহাদের বাড়ী গিয়াছি, তিনি আমাকে অতিশয় আদরের সহিত বসাইলেন এবং বলিলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি জেঠাইমা * আমাকে বলিতেছেন যে, "আমি বৃন্দাবনে মন্দির প্রতিষ্ঠায় গিয়াছিলাম, তোমার জন্য প্রসাদ আনিয়াছি, নাও।" এই কথা শুনিবামাত্র বাবাজী মহারাজ যে পত্র লিখাইবার সময় বলিয়াছিলেন 'তাঁহারাও যাইবেন', সে কথা আমার মনে পড়িল, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল ও চোখে জল আসিল, ভাবিলাম ধন্য প্রভু তোমার লীলা! এইরূপে ছাড়া পরলোকগতা মাতার বৃন্দাবনে গিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করা দর্শন করিবার উপায় আমার মত অন্ধের আর কি আছে?"

উৎসব উপলক্ষে বৃন্দাবনে যাইতে যাঁহারা ইচ্ছুক এমন সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও দেশস্থ বহু লোক কলিকাতার বাসায় একত্রিত হইলেন, আসিবার খরচ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজই দিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগের, কলিকাতাস্থ নিমন্ত্রিতবর্গের এবং অন্যান্য স্থান হইতে যাঁহারা সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের বৃন্দাবন যাইবার জন্য বাবাজী মহারাজ কয়েকখানি গাড়ী রিজার্ভ করিলেন। মোগলসরাই, হাতরাস প্রভৃতি ষ্টেশনে পূর্ব্বেই লোক পাঠাইয়া রসুই করিয়া এই সকল যাত্রিগণের জন্য পথে খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হইল। তাহা ছাড়া প্রতি গাড়ীতে জলখাবার ও শিশুদের জন্য দুগ্ধাদি সরবরাহ করিবার জন্য উপযুক্ত লোকের উপর ভারার্পণ করা হইল। এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কয়েকদিন পূর্ব্বেই বৃন্দাবন রওনা হইয়া গেলেন। একজন

* ইনি আমার মাকে জেঠাইমা বলিতেন।

বলিয়াছেন, "যাহার পক্ষে যে পরিমাণ সম্ভব মিঠা কুমড়া লইয়া যাইবার জন্য আমাদের নিকট পূর্ব্বেই পত্র দিয়াছিলেন এবং তদনুসারে আমরা বহু বস্তা মিঠা কুমড়া নিয়া গিয়াছিলাম। বাবাজী মহারাজের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত জানকী সামন্ত মহাশয় ধনী লোক। তিনি বৃন্দাবনে দান করিবার নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বেই কারেন্সী হইতে কয়েক শত টাকার নূতন পয়সা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাও বস্তাবন্দী হইয়া এই যাত্রীদের একদলের (পূর্ব্বোক্ত বিপিনবাবুদের দলের) সঙ্গে চলিল।

আশুবাবু বলেন "মন্দিরের সম্মুখের রাস্তার অপর পার্শ্বস্থিত জয়পুরের রাজার মন্দিরে সকলের থাকিবার স্থান করা হইয়াছিল। এই মন্দির সংলগ্ন দালানগুলি বেশ বড় এবং প্রত্যেকটিতেই অনেকগুলি ঘর আছে, মন্দিরটি তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখানে বহুসংখ্যক লোকের স্থান হইল। ইহাদের ব্যবহারের জল তুলিবার জন্য বহু মজুর নিযুক্ত ছিল। লোকসকলের থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ, জলখাবার, সরবৎ, শিশুদের দুগ্ধ ইত্যাদি বিলি করিবার নিমিত্তও আমাদের মধ্যে বহু লোক নিযুক্ত ছিল। জ্যৈষ্ঠমাসে বৃন্দাবনে ভীষণ গরম পড়ে, অনেক সময় 'লু' * চলে, বেলা দশটার পর রাস্তায় পা দেওয়া যায় না। উভয় মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী সেই অতি উত্তপ্ত বালুকাময় পথ লঙ্ঘন করিবার জন্য কতকগুলি কাপড়ের জুতার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন গরুর গাড়ী বোঝাই করা তরকারী, বরফ, চিনি, আটা, ময়দা প্রভৃতি আসিত।"

সোমবারদিন সকালে পুরাণা আস্থানে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল †।

* অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ। খালি গায়ে লাগিলে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট করে, কখনও কখনও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে।

† শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর ভক্তশিষ্য সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন মহাশয় ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের মর্ত্ত্যলীলা বর্ণন উদ্দেশ্যে একটি সুললিত গান রচনা করিয়া এই দিবস স্বয়ং গাহিয়াছিলেন।

তারপর সকলে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীউ ও শ্রীশ্রীরাধারাণীজী বিগ্রহ-যুগল এবং শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের তৈলচিত্র লইয়া মহা-সমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া নগরভ্রমণে বাহির হইলেন *। এদিকে পত্রপুষ্পপতাকাদি দ্বারা মনোহররূপে সুসজ্জিত নূতন আশ্রমে চারিজন বিখ্যাত পণ্ডিত বেদীর উপর নানাপ্রকার মণ্ডলাদি অঙ্কিত করিয়া বৃহৎ যজ্ঞারম্ভ করিলেন। মহা উৎসাহে কাজ চলিতে লাগিল, সকল দিকেই আনন্দ, সবারই প্রাণ আনন্দে ভরপুর। বিপিনবাবু বলেন "এই পবিত্র মহৎ কাজে আমরা কিঞ্চিৎ খাটিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছিলাম।" এইরূপ মনোভাব লইয়া ব্রজবাসী ও বাঙ্গালী, সাধু ও গৃহস্থ বহু লোক কাজে ব্রতী হইলেন। সাধুদিগের কর্মপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা বিস্ময়কর! বস্তুই তাঁহাদের হাতে, সহস্র সহস্র লোকের উপযোগী রান্না হইতেছে, বিরাট ব্যাপার, অথচ কোথাও একটু চেঁচামেচি হাঁকডাক নাই, নীরবে, যেন কলের মত সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন আর প্রচুর খাদ্যবস্তু প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। দেখিলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠে। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শোভাযাত্রীদল ফিরিলে অভিষেকের কার্য্য আরম্ভ হইল। যুগলবিগ্রহের অভিষেকের জন্য বহুতীর্থোদক পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীশ্রীদাদাগুরুজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজিউ ও শ্রীশ্রীরাধারাণীজীকে সেই নানা-তীর্থোদকাদি দ্বারা প্রচুর বাদ্যোদ্যমের মধ্যে অভিষেক করা হইল; অনন্তর সেই জলের দ্বারা শ্রীশ্রীগরুড়দেবের ও শ্রীশ্রীমহাবীরজীর

* শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের পূর্ব্বপ্রকাশিত মতানুসারে এই সকল মূর্ত্তি (যাহা পূর্ব্বে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুরাণা আখাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন) আনিয়া এই সময়ে নূতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করা হয়।



[illegible]

[illegible]

মূর্ত্তিযুগলকে অভিষেক করিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করা হইল। তিনদিনে এই বিরাট অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল।

অগণিত লোকে প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। সাধুসেবা, দরিদ্রসেবা, কাঙ্গালীবিদায় প্রভৃতি সকলই হইল। কলিকাতা হইতে বন্দোবস্ত করিয়া যে পয়সা গিয়াছিল, তাহা কাঙ্গালীদিগকে বিতরণ করা হইল। ব্রজবাসীরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। নবনির্ম্মিত আশ্রমেই নিমন্ত্রিত লোকসকল বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছিলেন। কার্য্য শেষ হওয়ার পরও বহু লুচি, লাড্ডু, কচুরী, মণ্ডা, মিঠাই উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, তাহা বহুলোকে বাড়ীতে নিয়া গিয়াছিলেন; বঙ্গদেশ হইতে যাহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারাও ফিরিবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে প্রসাদ সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা অন্তে, মনঃপ্রাণ সেখানে রাখিয়া, অবিলম্বে সেখানে গিয়া স্থায়ীভাবে থাকিবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা লইয়া, ত্রিশ হাজার টাকার উপর ঠিকাদারের দেনার ভার * মাথায় করিয়া বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

---

* প্রতিষ্ঠার খরচের জন্য দেনা বিশেষ হয় নাই বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু তখন কন্ট্রাক্টরের দেনা শোধ হয় নাই, তাহারই এই পরিমাণ অবশিষ্ট ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

বানপ্রস্থ

সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া একান্তে সাধন-ভজন করিবার সঙ্কল্প তাঁহার অন্তরে অনেক দিন হইতেই ছিল। তাঁহার গুরুদেব দেহে থাকিতে দুই তিনবার তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গুরুদেব অনুমতি দেন নাই, তখনও সময় হয় নাই—সংসারে থাকিয়া তাঁহার আরও অনেক কর্ম্ম করিতে হইবে—এই সকল কথা বলিয়া তখনকার মত নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্ব্বে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কথা বর্ণনা উপলক্ষে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ১৩৪২ সালের পৌষমাসের 'প্রবর্ত্তক' পত্রে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "সর্ব্বত্যাগের আন্তরিক ইচ্ছা যে তখনই তাঁহার অন্তর্নিহিত ছিল, ইনি তাহার ইঙ্গিত না করিলেও আমার অনুমান হইয়াছিল।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাকে দর্শন দিয়া একবার তাঁহার সংসারত্যাগের উদ্যম নিবৃত্ত করেন, একথা তাঁহার নিজমুখে আমরা শুনিয়াছি ও পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র খাঁ মহাশয় ১৩৩২ সালের ফাল্গুন মাসের 'প্রবর্ত্তকে' লিখিয়াছেন "ত্রিশ হাজার টাকার দেনা স্কন্ধে লইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি সর্ব্বদা ভগবানের নিকট কাতরভাবে নিবেদন করিতেন 'প্রভু, এই দেনা শোধ না হইলে তো আমি কেবল তোমার সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারি না, আর কতদিন আমাকে এই ওকালতির বন্ধনে রাখিবে?' আমাদের

সঙ্গে দেখা হইলেই বলিতেন 'ভগবান্ আর কতদিনে আমাকে সংসার হইতে ছুটি দিবেন? এই ত্রিশ হাজার টাকা দেনা শোধ না হইলে তো আমি বৃন্দাবনবাসী হইতে পারি না।' * * *"

এই বর্ণনা হইতে তাঁহার এই সময়ের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার গুরুদেব এক সময়ে বলিয়াছিলেন, নূতন আশ্রম প্রস্তুত হইলে তিনি সেখানে গিয়া বসিবেন এবং তাঁহাকেও সংসার ছাড়াইয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিবেন, * তিনি এই আপ্তবাক্যের উপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখিয়া সংসারের যথাকর্ত্তব্য করিয়া উপযুক্ত দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে দিনও নিকট হইয়া আসিয়াছিল, হয়ত ঋণ না থাকিলে আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পর আর ফিরিয়া আসিতেন না। ঋণ মুক্তির পরিপন্থী বলিয়া ঋণপরিশোধের উপর তিনি চিরদিনই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। ইহার পর দেখা যায়, গুরু-কৃপায় অতি শীঘ্রই এই ঋণ শোধ হইয়া গেল; শুধু বৃন্দাবনের ঠিকাদারের ঋণ নহে, সর্ব্বপ্রকার ঋণ শোধ করিয়া, সংসারের সর্ব্বকর্ত্তব্য সমাপন করিয়া, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন-শূন্য অবস্থায়—অন্তরে, বাহিরে যথার্থ উপযুক্ত অবস্থা উপস্থিত হইলে, তিনি সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। সংসারের বাঁধন ছিঁড়িয়া তাঁহাকে যাইতে হইল না, সকল বাঁধন খসিয়া পড়িল, সংসারই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। একেবারে মুক্ত করিবেন বলিয়া এইরূপ ভাবেই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে লইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই সকল আমরা ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিতেছি।

* "আমি এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলাম 'মহারাজজী। তুমি আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে নূতন মন্দির প্রস্তুত হইতেছে, সেই মন্দিরে তুমি গিয়া বসিবে এবং আমাকেও কার্য্য ছাড়াইয়া আনিয়া তোমার পাশে রাখিবে; * *"—শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কৃত তাঁহার গুরুদেবের জীবন-চরিত, ২১৬ পৃঃ।

গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,

"আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

অস্যার্থ :—

যোগাবস্থালাভেচ্ছু মননশীল পুরুষের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মকেই ঐ অবস্থালাভ বিষয়ে কারণ বলা যায়, এবং যিনি যোগ অবলম্বন করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার ঐ অবস্থায় নিশ্চিত অবস্থিতির পক্ষে শম অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপশূন্য সমাধিতে স্থিতিই কারণ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৩ ॥"

[ইহার পরে সমস্ত ষষ্ঠ অধ্যায় ধরিয়া শ্রীভগবান্ এই সমাধিযোগ অবলম্বন করিবার উপায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন এবং ইহার ঠিক পরেই চতুর্থ শ্লোকে তৃতীয় শ্লোকোক্ত যোগারূঢ় অবস্থার ব্যাখ্যা করিতেছেন।]

"৪। যখন পুরুষ সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগসঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে এবং ঐ সকল বিষয় প্রাপক কর্ম্মে আসক্তচিত্ত হয়েন না, তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায় ॥ ৪ ॥"

ইহাতে দেখা যায়, এইপ্রকার যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক সমাধিযোগ অবলম্বনের চেষ্টা বিহিত নহে। বাস্তবিক পক্ষে কেহ সংসার ত্যাগ করিলেই সংসার তাহাকে ত্যাগ করে না, সংসারাসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বেই বাহ্যতঃ সাংসারিক কর্ম্মত্যাগ করিয়া সংসার হইতে দূরে বনে কিম্বা অপর কোথাও গিয়া একান্তে আসনে স্থিত হইয়া সমাধিযোগের প্রয়াস করিলেই তাহা সফল হয় না, সংসার চিত্তে থাকিয়া যাওয়াতে চিত্তে তাহা উদিত হইয়া সাধককে ভ্রষ্ট

করে—কাহাকেও কাহাকেও সংসারেই ফিরিয়া আসিতে হয়। আসক্তিশূন্য-চিত্তে সংসারের সহিত যোগ-সূত্রটি ছিন্ন হইলে এরূপ হয় না; সাধক সহজেই সমাধিযোগ লাভ করেন। ভোগ্য বিষয়ে ও তদুৎপাদক কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য এই "যোগারূঢ" অবস্থা লাভ হইলে "শম" অবলম্বনীয় এবং তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই যোগারূঢ় অবস্থা লাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগই অবলম্বনীয় (তাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে) ইহাই স্পষ্টভাষায় গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন।

সংসারকর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক একান্তে ধ্যানাভ্যাসে রত হইবার উপযুক্ত কাল সম্বন্ধে ইহাই মুখ্য কথা হইলেও, অনুকূল অবস্থা বিষয়ে আর একটি কথা আছে বলিয়া মনে হয়। কোনও মানুষের চিত্ত যতটুকু ছোট বস্তু বলিয়া আমরা সাধারণতঃ মনে করি, ইহা বাস্তবিক তত ক্ষুদ্র বস্তু নহে। বিশ্বমানবের চিত্তের সহিত—প্রকৃতপক্ষে বিশ্বেরই সহিত, "সূত্রে মণিগণা-ইব" ইহার যোগ আছে এবং এই যোগের কারণ আসক্তি নহে, এ যোগ স্বাভাবিক, নিত্য, অবিনাশী। সুতরাং সাধকের চিত্ত আসক্তিশূন্য হইলেও অপর কাহারও যদি তাঁহার প্রতি আসক্তি, তাঁহার নিকট হইতে কোন কিছু প্রাপ্তির বলবতী আশা, তাঁহার নিকট ন্যায়তঃ কিছু পাইবে এইরূপ বলবান্ সংস্কার প্রভৃতি থাকে, সে যদি এসকল কারণে প্রবলভাবে তাঁহাকে পিছু টানিতে থাকে, তাহা হইলে ত্যাগী সাধকের চিত্তে কিছু বিক্ষেপ জন্মাইবার পক্ষে ইহারও ফল অবশ্যম্ভাবী এবং শুদ্ধ চিত্তেই তাহা অধিকতর অনুভূত হইবার সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সুতরাং কোনও সাধকের সম্পূর্ণ অনাসক্তচিত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, যদি বাহ্যতঃ এই সকল কারণেরও অবসান ঘটে, তাহা হইলে সংসারত্যাগের পক্ষে তাঁহার যথার্থ উপযুক্ত সময় ও সম্পূর্ণ অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ইহাই হইয়াছিল।

ইহার সাত বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী ১৯০৮ সালে দেশস্থ পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁহার যে অংশ ছিল, তাহা এক দানপত্র করিয়া বাবাজী মহারাজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে সমানাংশে ভাগ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাই বিষয়বাসনা ত্যাগ প্রমাণিত হয় না সত্য, কিন্তু এ যাবৎ তাঁহার সাংসারিক জীবনের সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিয়াছি তৎসমুদয় বিচার করিলে এতদিনে অথবা ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার যে বিষয়-ভোগবাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে ধারণা করা যায়। ঋণপরিশোধ প্রভৃতি বাহ্যিক অনুকূল অবস্থা আসিবার জন্যই যেন তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এই সময়ে পাবনা, বরিশাল প্রভৃতি মফঃস্বলের নানাস্থানে কতকগুলি বড় বড় মোকদ্দমায় তাঁহার যাইতে হইয়াছিল। এই সকল মোকদ্দমা করিয়া তিনি বহুসহস্র টাকা পাইয়াছিলেন। মাসিক দশ হাজার টাকার উপরেও তাঁহার এই সময়ে উপার্জ্জন হইতেছিল। এই বৎসর বর্ষাকালে তাঁহাদের দেশে খুব দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ও তদুপলক্ষে দেশের বহুলোকে তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র দেন। তিনিও প্রত্যেককে তাহার প্রার্থনানুরূপই দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দানের এই বিশেষত্ব আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তাহার অভাব মোচনের মত করিয়াই দান করিতেন।

জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র—এই চারিমাসকাল মধ্যে তাঁহার এত উপার্জ্জন হইল যে, দেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগকে বহু টাকা দান করা সত্ত্বেও শ্রীবৃন্দাবন আশ্রম নির্ম্মাণ জন্য তাঁহার ঠিকাদারের প্রাপ্য সম্পূর্ণ শোধ হইয়া গেল। একটি বিশেষ প্রসঙ্গে এই কথা তাঁহার নিকট আমরা পরে শুনিয়াছি। ঈশ্বরার্থে ব্যয় করিয়া কেহ বিপদগ্রস্ত হয় না, তাঁহার

সেবায় অকাতরে কেহ কিছু দিলে শ্রীভগবান্ তাহার অনেক বেশী তাহাকে আবার দেন, এই উপদেশ তিনি বহু লোককে দিয়াছেন। তিনি বলিতেন "বাবা! ঠাকুরজী কাহারও নিকট ঋণী থাকেন না।" দৃষ্টান্ত-স্বরূপে নিজজীবনের এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেন, তাঁহার ওকালতির সাধারণ উপার্জ্জনে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যে বিপুল ঋণ দীর্ঘকালেও পরিশোধ করা দুঃসাধ্য হইত, তাহা কেমন করিয়া চারি মাসের মধ্যেই পরিশোধিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা বলিতেন।

অবশেষে ভাদ্রমাসে পূজার বন্ধের প্রাক্কালে (আগষ্ট, ১৯১৫) যেদিন হাইকোর্ট ছাড়িয়া আসিলেন, সেদিন সেখানে যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল তাহা ভুলিবার নয়। বার লাইব্রেরীতে সমব্যবসায়িগণের উপর তাঁহার কিরূপ প্রভাব ছিল, সেখানে তিনি যে এক নূতন আব-হাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ও তাঁহার আদর্শ চরিত্রের জন্য সেখানে সকলে এমন কি প্রবীণগণও তাঁহাকে কিরূপ ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নব্য উকিলদিগের অনেককেই তিনি কাজ শিখাইয়াছিলেন, ইহাদের সহিত তাঁহার একটা আন্তরিক ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ ছিল, ইহারা তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা ও সস্নেহ ব্যবহার সর্ব্বদা পাইতেন, ইহাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া যেদিন তিনি এই সমাজ হইতে চিরবিদায় লইতে চাহিলেন, তখন সেখানে যে শ্রদ্ধাপূত, অশ্রুসজল, বিষাদ-মলিন ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। একজন শ্রদ্ধা-ভাজন প্রত্যক্ষদর্শী * লিখিয়াছেন "১৯১৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যেদিন তিনি হাইকোর্ট পরিত্যাগ করিলেন সেদিনের কথা আমরা কখনও ভুলিব

* হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইনি তৎকালে উকিল ছিলেন।

না। তিনি একটা মোকদ্দমা শেষ করিয়া লাইব্রেরীতে আসিয়া বসিলেন, আমরা শুনিলাম তিনি আর ওখানে আসিবেন না, সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন। আমরা তখন দলে দলে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বিদায় লইতে লাগিলাম। এই সময়ে সার রাসবিহারী ঘোষ ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে উদ্যত হইলেন। তিনি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, 'কি করেন, কি করেন, আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ।' সার রাসবিহারী উত্তর দিলেন, 'বয়সে বড় হইলে কি হয়, আপনি আমা অপেক্ষা কত বড় তাহা আমি আপনাকে বুঝাইতে পারিব না। আপনি আমাকে আপনার পায়ের ধূলা দিন।' "

ইহার পরে আর দুইটি মাস মাত্র তিনি সংসারে ছিলেন, নানাদিকে যেসকল অবশ্য কর্ত্তব্য ব্যাপারে তিনি জড়িত ছিলেন তৎসমস্তের বন্দোবস্ত করিতে যতদিন লাগিয়াছিল, ততদিনই মাত্র ছিলেন। এই সময়ে একটি চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল। দেশস্থ বহু দুঃস্থ আত্মীয় স্বজন এবং বহু অপর লোককেও তিনি মাসিক নিয়মিতরূপে অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি ভাবিলেন, ইহারা এতদিন সাহায্য পাইয়াছেন, এখন আমি হঠাৎ চলিয়া গেলে, অর্থ সাহায্য বন্ধ হওয়াতে অভাবে পড়িয়া ক্লেশ পাইবেন। তখন ইহারা আর আমার সংসার-ত্যাগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারিবেন না, অথবা তাহার সাফল্যকামনা করিবেন না, কেহ কেহ হয়ত আমার প্রত্যাবর্ত্তনও প্রার্থনা করিবেন। এরূপ অবস্থায় এতগুলি লোকের সমবেত ও ক্লেশোদ্ভূত আন্তরিক প্রার্থনা বৈরাগ্যের পথে আমার আত্মোন্নতির অন্তরায় স্বরূপ হইবে, এবং ইহাতে সাধনভজনের ব্যাঘাতও জন্মিতে পারে এইরূপ ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে এককালীন কিছু অধিক সাহায্য করতঃ তাহাদের অনুমতি লইয়া

বৃন্দাবনে যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন। পূজার জন্য হাইকোর্ট বন্ধ হইবার কয়েকদিন পরেই, ইতিপূর্ব্বে বরিশালে যে একটি মোকদ্দমা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইলেন এবং গৃহের আসবাবপত্রাদি বিক্রয় করিয়াও কিছু টাকা হইল। ইহা হইতে কলিকাতায় তখন তাঁহার যে সকল খুচরা দেনা ছিল, তাহা পরিশোধ করিলেন। সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া তিনি দেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেশে গিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজন এবং অপর প্রতিপাল্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং যাঁহার যেরূপ প্রয়োজন, তদনুসারে প্রত্যেককেই এককালে কিছু অধিক পরিমাণ অর্থ দান করিলেন। শ্রীযুক্তা মুক্তিদা দেবী বলেন, "তিনি গৃহস্থাশ্রম ছাড়িবার সময় সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে এবং অপর লোককেও অঋণী করিয়া গিয়াছেন।" যাঁহারা ঋণের জন্য কষ্ট পাইতেছিলেন, তাঁহাদিগের ঋণ ত পরিশোধ করিয়াছিলেনই, তদুপরি কন্যার বিবাহ, পুত্রের উপনয়ন প্রভৃতি যাহার যাহা প্রয়োজন ছিল, তদনুপযোগী দানই সকলকে করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগকে মাসিক সাহায্য করিতেন, তাঁহাদের সকলকেই কিছু বেশী করিয়া এককালীন দান করিলেন। এইরূপে সকল প্রার্থিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, মধুরবাক্যে তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবার অনুমতি লইয়া আসিলেন। এই সময়ে তাঁহার বিমাতৃদেবী তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবন যাইয়া থাকিবার জন্য বিশেষরূপ জিদ্ করিয়াছিলেন। সংসার ত্যাগ করিবার পক্ষে তখনও তাঁহার উপযুক্ত সময় হয় নাই বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। অতঃপর ইনি নিজ পুত্রগণের নিকটেই রহিলেন।

দেশ হইতে ফিরিয়াই কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে গৃহস্থাশ্রম হইতে চিরবিদায় লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ধন-সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, নিঃশেষে বণ্টন করিয়া দিয়া বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবার তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়াও তাঁহার অবশিষ্ট রহিল না। গৃহের আসবাবপত্র, পুস্তক, আলমারী প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষ ইতিপূর্ব্বেই বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল, * বাকী যাহা ছিল তৎসমস্ত বন্ধু-বান্ধব, আশ্রিত প্রভৃতি উপস্থিত সকলকে বিতরণ করিয়া দিলেন। সরস্বতী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড পণ্ডিত পূজনীয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ কাব্যতীর্থ সাহিত্য-শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সংসার ত্যাগের স্মরণীয় দিনে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন "সেই দিন যেন আমি পুনরায় ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রব্রজ্যা স্বচক্ষে দেখিলাম। ঘর বাড়ী গাড়ী সব সাজান ছিল। বন্ধুবান্ধবকে যদৃচ্ছা দান করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিলেন, 'তোমাদের যার যা প্রয়োজন হয়, লইয়া যাইও।' শুধ বস্ত্রাঞ্চলে একজন কয়েকখানি নোট বাঁধিয়া দিয়াছিল †, ভাবভোলা স্তিমিত নয়নে তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই।"

একান্ত নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্নে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা চালাইয়া স্বীয় গুরুস্থানে থাকিয়া ভগবদ্ভজনে কালাতিপাত করিবেন এইরূপ মনোভাব লইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা

* "সংসারের সমস্ত সামগ্রী, পুস্তকাদি, আসবাবপত্র সমস্ত বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সঞ্চিত হইল ও তাঁহার নিজের যাহা কিছু অর্থ ছিল, তাহার সমস্তই আশ্রিত ও প্রতিপাল্য-গণকে দান করিয়া একেবারে নিঃসম্বল হইয়া * * * সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিলেন।" (১৩৪৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'শ্রীবৃন্দাবন' পত্রিকায় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত "ব্রজবিদেহী স্মরণে" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)।

† ইহা দ্বারাই শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার পাথেয় সঙ্কুলান হইয়াছিল।



[illegible]

[illegible]

করেন। আদর্শ সহধর্ম্মিণী চিরদিনের সেবিকা শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী সঙ্গে চলিলেন। প্রস্থানের প্রাক্কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয় নারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা যাহাতে নিরুদ্বেগে চলে, তদুপযুক্ত ব্যবস্থা কিছু করিয়াছেন কিনা। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উত্তরে বলিয়াছিলেন "দাদা! এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন ভগবানকে সিন্দুকের মধ্যে বদ্ধ করিতে না হয়!"

---

* পাটনা বি. এন্. কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত। তিনি এই ঘটনা শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন। "ভগবান্‌কে সিন্দুকের মধ্যে বদ্ধ না করিতে হয়" অর্থাৎ অর্থকেই যেন ভগবান্‌রূপে না দেখি—ভগবন্নির্ভরতা ছাড়িয়া অর্থের উপরই যেন নির্ভর না করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীবৃন্দাবনে বাস, নিরবচ্ছিন্ন তীব্র সাধনা ও সিদ্ধি

১৩২২ সালের ৩০শে কার্ত্তিক (১৬ই নভেম্বর, ১৯১৫) গৃহত্যাগপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং অতঃপর সস্ত্রীক এখানেই বাস করিতে লাগিলেন। স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবাপূজা করিতেন ও অন্যান্য অনেক সেবার কার্য্য করিতেন, বাকী সময় ধ্যান জপ করিয়া কাটাইতেন, বিশ্রাম অল্পই করিতেন। শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী যথার্থ সহধর্ম্মিণীরূপে সর্ব্ববিধ সেবার কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেন। আশ্রম পরিষ্কার রাখিতেন, রন্ধন করিতেন ও যথাসাধ্য ভজন করিতেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পূর্ণসন্ন্যাস লাভ করিবার পর যখন শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী কাশীর বাটীতে আসিয়া থাকিলেন, সেই সময় আশ্রমে ঝাড়ু দেওয়া হইতে রন্ধন, শ্রীশ্রীঠাকুরজীর পূজা, এমন কি তদুপরি রোগীর শুশ্রূষা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য বাবাজী মহারাজকে অনেক সময় একাকী স্বহস্তে করিতে হইয়াছে, তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ভজন করিতেন, নিদ্রা যাইতেনই না।

আমরা যখন তাঁহার চরণাশ্রয় লাভ করি, তখন তাঁহাকে কোনপ্রকার সাধন করিতে দেখি নাই—তাহার বহু পূর্ব্বেই তাঁহার সাধন সমাপ্ত হইয়াছিল। ১৩২২ সালে অথবা তৎপরে আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার তপশ্চর্য্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এরূপ লোকও এখন বিশেষ কেহ জীবিত নাই। এইজন্য তাঁহার জীবনের এই অংশটি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই, ইহা অপেক্ষাকৃত গোপন রহিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত

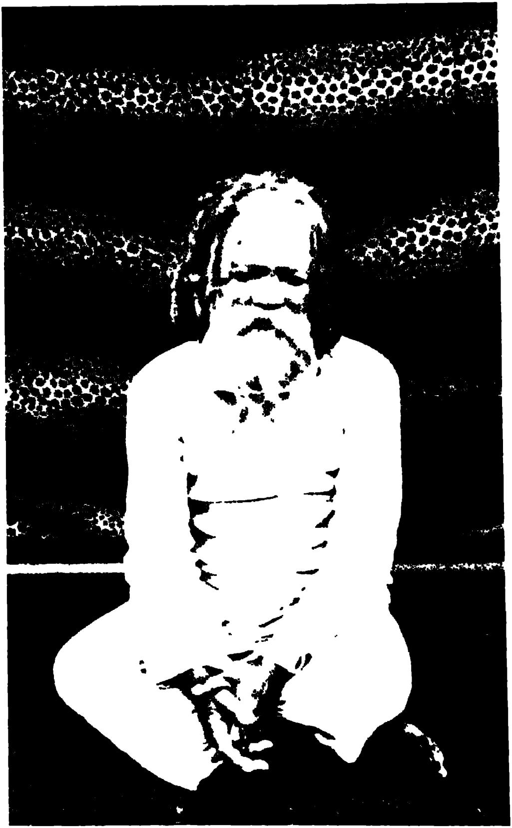
রাঘবদাসজী নামক তাঁহার একজন প্রাচীন ব্রজবাসী সাধু গুরুভ্রাতা এখনও বর্ত্তমান আছেন। বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এই সময়ের সাধন সম্বন্ধে ইঁহার কথিত বিবরণ, অথবা কথাপ্রসঙ্গে কখন কখন তাঁহার নিজমুখে যাহা শুনা গিয়াছে, তাহাই মাত্র আমাদের সম্বল। তিনি নিজে স্বীয় সাধন সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করিতেন না; এসম্বন্ধে নীরব থাকাই তাঁহার স্বভাব ছিল। যখনই এসম্বন্ধে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকট তুলিয়াছি, তখনই—সেই মুহূর্ত্তেই নীরব হইয়া গিয়াছেন। অভ্যাসমত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিয়াছেন "বাবা! আমার সাধন ভজন কিছু ছিল না! গুরুকৃপাতেই আমার সমস্ত হইয়াছে।" আর এই কথা প্রায় সর্ব্বদাই সজল চক্ষে, এমন স্বরে বলিতেন যে তাহাতে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইত। আজও তাঁহার সেই সময়কার মূর্ত্তি স্মরণ হইলে চক্ষে জল আসিয়া পড়ে।

তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেন প্রাচীন ঋষিদিগের দিকে, আপন গুরুদেবের দিকে। আমাদিগকে বলিতেন, "তপস্যা করিয়া কিরূপে ভগবান্‌কে লাভ করিতে হয়,তাহা বুঝিতে হইলে আমার বাবাকে দেখ।" পুরাণে দেখা যায় এক একজন ঋষি বহু বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যার ফলে অবশেষে ভগবানকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। স্ব-প্রণীত তাঁহার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন কত দীর্ঘকাল ধরিয়া, আশৈশব সংসার ও লোকসমাজের সহিত সম্পর্কশূন্য জীবনের একটি দিন একটি মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয় না করিয়া কিরূপ অতি তীব্র একনিষ্ঠ সাধনের ফলে তিনি অবশেষে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন! সাধনের কথা উঠিলেই তাঁহার লক্ষ্য পড়িত এই দিকে, এইটিই তাঁহার স্বাভাবিক ছিল। তাঁহার বিরাট ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কঠোর সাধন আমাদের নিকট আদর্শস্থানীয় হইলেও তাঁহার নিজের

সর্ব্বদাই উক্তরূপ ধারণা ছিল। সাধন প্রসঙ্গে তিনি পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা হইতেই আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাঘবদাসজী বলিয়াছেন, "মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার পর আমি তাঁহাকে দিন রাত্রি কোন সময়ে শয়ন করিতে দেখি নাই। প্রায় সমস্ত সময়ই ধ্যান লাগাইয়া থাকিতেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি ছটাক যবের আটার রুটি একবার মাত্র আহার করিতেন। ডাল তরকারী, এমন কি একটু লবণ পর্য্যন্ত ইহার সহিত গ্রহণ করিতেন না; এই সময়ে তিনি মৌনী ছিলেন। আহারের এই নিয়ম ছাড়িবার পরেও অতি সামান্য আহার করিতেন।"

এসময়ে তিনি এত অল্প সময় শুইয়া থাকিতেন এবং তাহা এত গভীর রাত্রে যে, তাহা অন্যের নজরে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সম্বন্ধে প্রকৃত কথা তাঁহার নিজ মুখেই আমরা শুনিয়াছি। অতিরিক্ত বায়ুপ্রধান ধাতুর জন্য গৃহস্থাশ্রমে থাকা কালেই তাঁহার প্রায় নিদ্রা হইত না। একথা স্ব-প্রণীত তাঁহার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে আসিয়াও সেই অবস্থাই তাঁহার ছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভজন করিতেন। তাহার পর কিছুকাল শয়ন করিতেন। আবার শেষরাত্রে উঠিতেন। একদিন প্রত্যূষে মন্দিরে গিয়া দেখিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরজীর অলঙ্কার চুরি হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় তাঁহার মনে হইল, "আমি ভজন ছাড়িয়া নিয়মিতরূপে যে শয়ন করি, ইহা বোধ হয় শ্রীশ্রীগুরুদেব ইচ্ছা করেন না। নিদ্রা ত আমার একরূপ হয়ই না। তবে আর কেন আলস্য করিয়া পড়িয়া থাকিয়া এই সময়টুকু নষ্ট করি?" এই সময় হইতে তিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ভজন করিতেন। শেষরাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর মঙ্গলারতি



করিবার জন্য পূজারীকে জাগাইয়া দিয়া অত্যল্পকাল একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেন মাত্র।

তাঁহার এই সময়ের আহার-সম্বন্ধীয় একটি নিয়মের কথাও আমরা তাঁহার নিজমুখ হইতে কথাপ্রসঙ্গে শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীভগবৎ প্রসাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "বাবা, ভগবান্ কৃপা করিয়া ভক্তজননিবেদিত ভোগ অমৃতময় করিয়া দেন। আমি এক সময়ে শুধু মহাপ্রসাদ * পাইব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। যেদিন হইতে এইরূপ অন্ন প্রসাদ মাত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতেই নিবেদিত অন্নের এক অভূতপূর্ব্ব অমৃতময় স্বাদ পাইতে লাগিলাম।" কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া গলদশ্রুলোচনে গদগদস্বরে বলিলেন, "বাবা, তিনি কখনও বিস্বাদ বস্তু আমাকে খাওয়ান নাই।"

এতদ্ব্যতীত তাঁহার এই সময়ের সাধন বিষয়ে আরও দুই একটি কথা আমরা জানি। দিনেরও অধিকাংশ সময় ভজন করিতেন। ধ্যান জপ করিয়া শরীর ক্লান্ত হইলে উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। আশ্রমস্থ শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর নিয়মিত সেবা করিতেন। বহুকালাবধি পূজা, শৃঙ্গার হইতে বাঁধা, বাসনমাজা পর্য্যন্ত সেবার প্রায় সর্ব্ববিধ কর্ম্মই স্বহস্তে করিয়াছিলেন। আশ্রম-সংক্রান্ত নানাকর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে ক্রোধ প্রভৃতি উপজাত হইতে পাবে বলিয়া যতদূর সম্ভব তাহা হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার জন্যই মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সময়ের সাধন জীবনের যে বিবরণ পাইয়াছি, তাহা গীতোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির বর্ণিত অবস্থার সহিত সুন্দর মিলিয়া যায়।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ১৮ ॥ ৫১

---

* অর্থাৎ অন্নপ্রসাদ।

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ১৮॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৮॥ ৫৩ *

এসম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে। সাধনা ও তপশ্চর্য্যার একটি বাহ্যরূপ থাকিলেও, প্রধানতঃ ইহা অন্তরের জিনিষ। সাধারণ লোকেরই মনের খবর পাওয়া যায় না, অপরের অন্তরে কি চিন্তা উদিত অথবা নিবৃত্ত হইতেছে, তাহার আভাষমাত্র আমরা অনুমান করিতে পারি এবং এইরূপ অনুমানও সকল ক্ষেত্রে সফল হয় না। এরূপ অবস্থায় লোকোত্তর-চরিত মহাপুরুষগণ যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধতন রাজ্যে বিচরণ ও বাস করেন, তাঁহাদের অন্তরের খবর কি করিয়া পাওয়া যাইবে? মহাপুরুষেরা সাধন ফলে যে সকল অবস্থা উত্তরোত্তর লাভ করেন ও যে সকল ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য। এই সকল অবস্থা শাস্ত্রে নানাস্থানে বর্ণিত থাকিলেও, কেবল বাহ্যলক্ষণদৃষ্টে শ্রেষ্ঠ সাধকগণের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নির্ণয় করা আমাদিগের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে।

শ্রীযুক্ত দাদাগুরুজী মহারাজ (পরমারাধ্য শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ) বলিয়াছেন "হাতীকা দো দাঁত রয়তা হায়, এক বাহার দেখানে কী, দুসরা ভিতর আপনা খানে কী, ভিতর কা দাঁত

* বঙ্গানুবাদ—বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ধারণার দ্বারা চিত্তকে নিশ্চল করতঃ, শব্দাদি বিষয়ের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া, কাহারও এবং কিছুর উপর অনুরাগ ও দ্বেষ পরিহার করতঃ, নির্জ্জন স্থানবাসী, অল্পাহারী হইয়া থাকা, শরীর ও মনকে সংযমনপূর্ব্বক, সর্ব্বদা ধ্যান-যোগে স্থিত ও বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মভাবে স্থিত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন॥ ৫১-৫৩॥

দুসরাকো মালুম নেহী পড়তা হায়। সম্‌হুকা ভী এয়্সী দো বৃত্তি রয়তী হায়, এক বাহার দেখানে কী, দুসরা আপনা ভিতর কী ; উস্‌কা খবর কিসিকো নেহি মিল্‌তা হায়।" এই কথা তিনি সিদ্ধ মহা-পুরুষদিগের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তথাপি শ্রেষ্ঠ সাধকগণের সম্বন্ধেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য হয়। সুতরাং এই দুই কারণেই বাবাজী মহারাজের এই সময়ের সাধকজীবনের বিবরণ প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

তথাপি একটি আশার কথা আছে। তাঁহার এই সময়ের আভ্যন্তরীণ সাধনজীবনের সুনির্দ্দিষ্ট ইতিহাস পাওয়া না গেলেও, লোকচক্ষুর অন্তরালে অতিবাহিত তাঁহার জীবনের এই গোপন অংশের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাই-বার একটি সুযোগ ঘটিয়াছে। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত একখানি জীর্ণ খাতা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার দেহে থাকা কালেও এই খাতা আমরা দেখিয়াছি, তখন সাধারণতঃ ইহা তিনি সকলকে দেখিতে দিতেন না, কিন্তু কাহাকেও কাহাকেও দিয়াছেন এবং তাহা প্রসন্ন ভাবেই দিয়াছেন। ১৯২২ সনে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সারদাবাবুর বাড়ীতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন আমাদের একজন গুরুভ্রাতা এই খাতাখানি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে-ছিলেন দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন "এই! কি করিতেছিস্?" তিনি বলিলেন, "বাবা, আমার নিজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় দুই একটি উপদেশ ইহা হইতে লিখিয়া লইতেছি।" ইহাতে বাবাজী মহারাজ বিশেষ প্রসন্ন হইয়াই বলিলেন "আচ্ছা! আচ্ছা!!"

এই খাতা তাঁহার ডায়েরী নহে, কারণ ইহাতে কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৩২৩ সালের আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যূনাধিক দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইহাতে তিনি মাঝে

মাঝে কিছু কিছু লিখিয়াছেন। লক্ষ্য করিয়া পড়িলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কথা আছে। কোথাও দেখা যায় শাস্ত্র এবং গুরুবাক্য হইতে তাঁহার সাধন জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যাহা তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া তৎকালে প্রতিভাত হইয়াছে, এমন দুই একটি অমূল্য উপদেশবাক্য লিখিয়াছেন। সম্পূর্ণ অনন্যচিত্ত হইয়া তাহাই তৎকালে নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে অতিশয় দৃঢ়-প্রযত্ন করিতেছেন ও সর্ব্বোপরি তজ্জন্য কাতরভাবে শ্রীগুরুর সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। অপর কোথাও দেখা যায়, কোন একটি নূতন অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য আনন্দ-বিহ্বল-চিত্তে গদগদ ভাবে শ্রীগুরুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রধানতঃ দুইটি কারণে এই খাতার সারাংশ জনসাধারণে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমতঃ ইহা হইতে তাঁহার এই সময়কার সাধন জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও, কি প্রণালী অবলম্বনে, কোন্ মহান্ লক্ষ্যের দিকে এই সময়ে তিনি দ্রুত অগ্রসর হইয়াছেন তাহার প্রামাণিক ও স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর দ্বিতীয়তঃ ইহার সুনির্ব্বাচিত সারাংশ প্রকাশিত হইলে তদ্দ্বারা সাধনেপ্সু জনগণের মহৎ উপকার সাধিত হইবে।

নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার এই সকল লিখা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, এই সময়ে তাঁহার চিত্তে পাশাপাশি দুইটি স্রোত বহিতেছিল। যে এক অলব্ধ বস্তুর টান যশ, মান ও সম্পদের মধ্যেও তাঁহার চিত্তকে নিত্য অসুখী রাখিয়াছিল, যাহা বিবৃদ্ধবেগ হইয়া আজ তাঁহাকে সংসারের বাহির করিয়া আনিয়াছে, সেই ভগবদভিমুখী চিত্তস্রোতের ক্রমবর্দ্ধমান বেগের পরিচয় পাওয়া যায়; আশ্রমে থাকিয়া সাধন করা কালে পরে ক্রমশঃ এই আর্ত্তি ও সাধনবেগ যে উত্তরোত্তর তীব্র হইতে তীব্রতর

হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই খাতায় নানাস্থানে সুপরিস্ফুট। ৬ই ফাল্গুন তারিখে দেখা যায় সাধন পথের আলোকবর্ত্তিরূপে উপনিষদ্ হইতে দুইটি শ্লোক সর্ব্বদা স্মরণের জন্য লিপিবদ্ধ করিলেন। তাহা আমরা পরে যথাস্থানে উদ্ধৃত করিব। তারপর লিখিতেছেন "* * * তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥ * * * অন্য কোন কথাই নাই, অন্য কোন লক্ষ্য নাই, সেই একই লক্ষ্য, একই কাম্য, ইহাই একমাত্র সেতু।" লেখার নীচে দাগটানা তাঁহার নিজের।

সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে অল্প কিছু লাভ করিয়া সাধারণ সাধকের চিত্ত তুষ্টিতে ভরিয়া যায়, ফলে সাধনের বেগ শিথিল হয়। চরম লক্ষ্যের প্রতি নিরন্তর-বদ্ধদৃষ্টি এই পুরুষের যে তাহা হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না তাহারও পরিচয় সুপরিস্ফুট। ৯ই ফাল্গুন তারিখে নিজেকে সতর্ক করিতেছেন :—"সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!! * * যেন সাধনে নিশ্চেষ্টভাব 'তুষ্টি' না আসে। ইহা যোগপ্রতিবন্ধক। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র তৃতীয় অধ্যায় ৩৮শ হইতে ৪৫শ সূত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আলস্যই বাস্তবিক সর্ব্ববিধ তুষ্টির মূল।"

এই ব্যাকুল আর্ত্তিধারার পাশাপাশি একই সঙ্গে তাহার সমকালীন আপাতদৃষ্টে প্রায় বিপরীতমুখী আর একটি স্রোত বহিতেছে দেখিতে পাই, যাহা এই ব্যাকুলতার মধ্যেও তাঁহাকে সর্ব্বদা আশ্বস্ত করিয়া সাধনে অচঞ্চল, সুপ্রতিষ্ঠ রাখিয়াছে। তাঁহার প্রতি শ্রীগুরুর যে বর ছিল "তোমার নিশ্চয়ই পরমাত্মদর্শন হইবে", "ভগবান্ সত্যই অহর্নিশি ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন" এই সকল কথা সর্ব্বদা স্মৃতিতে জাগ্রত রাখিয়া যাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত হইয়া উদ্যমহীন না হন, তদ্বিষয়ে দৃঢ়প্রযত্ন করিতেছেন।

২৬শে মাঘ তারিখে লিখিয়াছেন "গতকল্য মাঘীপূর্ণিমা গিয়াছে। দেখিতেছি ইতিমধ্যে অবস্থাসকল আসিতেছে ও যাইতেছে, স্থায়ী হইতেছে না। সকলই তোমার হাত, যেরূপে রাখিতেছ তদ্রূপেই থাকিতেছি। আর অসন্তোষ পোষণ করিতে ইচ্ছা করি না। "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ।" "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়! সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।" ইহা সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য।"

একদিকে যেমন ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাকুল আর্ত্তি তাঁহার সাধনবেগকে দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে, অপর-দিকে তেমনি ইহারই সঙ্গে পাশাপাশি গুরুবাক্যে অপরিসীম আস্থা-জনিত আশ্বাস মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চিত্তে নৈরাশ্য অথবা অসন্তোষ-জনিত অবসাদ আসিতে দেয় নাই; আর এই উভয় মনোবৃত্তির সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে একটি স্থির বিশ্বাস যে নিজের কিছুই নাই, নিজে এই যে সাধন করিতেছেন, তাহা কিছুই নহে, গুরুকৃপাই একমাত্র সম্বল—তাঁহার সাধনপথের অদ্বিতীয় পাথেয়। তাই দেখিতে পাই যখনই একটি নূতন অবস্থা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তখনই শ্রীগুরুদেবের প্রতি মর্ম্মাশ্রুসিক্ত অসীম কৃতজ্ঞতা তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিয়াছে।

একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"* * * ধন্য গুরুদেব, তোমারই কৃপায় নিত্য নূতন পন্থা প্রকাশিত হইতেছে। আহা শ্রীভগবন্মূর্ত্তিতে অদ্য দেখিলাম এই সমস্ত অবস্থাই মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে। ধন্য প্রিয়াজী! তুমিই এই তথ্য অদ্য প্রকাশিত করিয়াছ। ধন্য! ধন্য!! ধন্য!!!"

(১) দেখা যায় যে ১৩২৩ সালের ২১শে মাঘ তাঁহার একটি বিশেষ অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য শ্রীগুরুকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

করিতেছেন। (খাতার এই অংশ পরে যথাস্থানে সম্যক্ উদ্ধৃত করা হইবে।) ২৬শে মাঘ তারিখে দেখিতে পাই শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন "হে মহারাজ, তুমি সহায় হও, নতুবা নিজের কোন-প্রকার সামর্থ্য দেখিতেছি না। হৃদয়গ্রন্থি সময়মত ছিন্ন করিবে বলিয়াছিলে, এখনও কি তার সময় হয় নাই? আশাতেই এই পর্যন্ত বাঁচিয়াছি।"

পাঠকের বিবেচনার সাহায্যার্থ এই খাতার লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে কয়টি কথা এযাবৎ বলিয়াছি, তৎসমস্ত নিম্নোদ্ধৃত তাঁহার স্বলিখিত বিষয়গুলি পাঠ করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ

পথ

১। শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তদ্ধেতু সন্তোষ; বাক্য যথা—"তোমার নিশ্চয়ই পরমাত্মদর্শন হইবে, ভগবান্ সত্যই অহর্নিশি ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে আছেন" ইত্যাদি।

২। বীর্য্য—এই শ্রদ্ধা (বিশ্বাস ও সন্তোষ) হইতে নিশ্চয়ই বীর্য্য (অনলসভাব ও অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অনবরত যত্ন) উপস্থিত হইবে; তাহা না হইলে শ্রদ্ধা উপজাত হয় নাই।

৩। স্মৃতি—শ্রদ্ধা ও অনবরত যত্ন হইতে স্মৃতি (অভীষ্টের স্বরূপ বিষয়ে স্মৃতি) উপজাত হয়; না হইলে (ভজন ছাড়িলে আর অমনি বাহ্যবিষয় মনকে অধিকার করিল এইরূপ হইলে) শ্রদ্ধা ও বীর্য্যের ত্রুটি বুঝিতে হইবে।

৪। সমাধি—এই স্মৃতি হইতে চিত্তের একবিষয়িণী বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি উপস্থিত হয়; তাহা না হইলে পূর্ব্বের তিনটির ত্রুটি বুঝিবে।

৫। প্রজ্ঞা—সমাধি হইতে প্রজ্ঞা—সর্ব্বত্র জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইবে, না হইলে সমাধি হয় নাই, মূর্চ্ছা মাত্র।

৬। অসম্প্রজ্ঞাত—সমাধিজাত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে একেবারে শূন্যে স্থিতি—চিত্তের লয় নিরবলম্ব শূন্যভাব প্রাপ্তি হইবে। ইহাই গীতার "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" অবস্থা। ভাগবতের ১১শ স্কন্দোক্ত ধ্যানও এই।

৭। ভগবদ্দর্শন (পরমাত্মসাক্ষাৎকার)—এই নিরবলম্ব অবস্থায় পরমাত্মা স্বতঃ প্রকাশিত হয়েন, এই নিরবলম্ব অবস্থাই স্বরূপদর্শন বিষয়ে সর্ব্ববিধ বাধাবর্জ্জিত অবস্থা।

৪ঠা আষাঢ়

সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য

১। আদৌ শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে ধ্রুববিশ্বাস, এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তোষ জন্মে; অতএব শ্রদ্ধাকে যে সন্তোষ অর্থে ব্যাসদেব ভাষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই সত্য। এই শ্রদ্ধাই সমস্ত সাধনের মূল। ইহাই শ্রীসনৎকুমার নারদজীকে উপদেশ দিয়াছেন।

২। দোষ—পরিত্যাজ্য—পরচরিত্রানুশীলন ও নিন্দা; ইহাই বর্ত্তমানে সন্তোষের প্রধান বিঘ্ন। পরদোষদর্শনে তৎক্ষণাৎ চিত্ত মলিন হয়, অতএব দোষদর্শনই মহৎ দোষ—এক ঈশ্বরই সকল জীবের বুদ্ধির প্রেরক, অতএব দোষগুণ কিছু নাই; প্রত্যেকের প্রত্যেক কার্য্যে (ভালমন্দ সর্ব্ববিধ কার্য্যে) তাঁহারই খেলা দেখিয়া সন্তোষ ও আনন্দ অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে।

অতএব নিত্যগ্রাহ্য—নিত্য সন্তোষ। স্মরণ রাখিবে—

"সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

নিত্য পরিত্যাজ্য—পরচর্চ্চা ও পরদোষদর্শন এবং আত্মপ্রশংসা।

৩। জ্ঞান—জগন্নিয়ন্তা একমাত্র পরমেশ্বর, "যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।" গীতা ৮ম ২২।

৪। মূর্খতা—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপরকে উপদেশ দান। আপনাকে উপদেশ দ্বারা সংশোধন করিতে পারিলাম না, অথচ অপরকে সংশোধন করিব—মূর্খতা আর অধিক কি আছে? ভগবান্ কি নিয়ন্তা নহেন? স্বতঃপ্রবৃত্ত উপদেশ দান কেবল অহঙ্কারমূলক।

৫। সর্ব্বদা সাবধান—(১) "আলস্য যেন কোনপ্রকারে প্রশ্রয় না পায়" (২) কোন কর্ম্ম দূষণীয় নহে, সেবার নিমিত্ত কর্ম্ম মাথায় করিয়া করিবে, মান অপমানকে মূর্খের বিচার জানিবে।

৬। ধ্যান—(i) গুরুরূপে পরব্রহ্ম একমাত্র বন্ধু।

(ii) তিনি ব্রজনাথ (বিষ্ণু ও তৎশক্তির) ভিতর দিয়া যাইতে পথ দেখাইয়াছেন।

(iii) অনন্তরূপ—জীবের প্রতি কৃপার নিমিত্ত এইরূপ ধারণ করিয়াছেন।

(iv) তদাশ্রয় পরমাত্মা পরব্রহ্ম—যিনি এই অনন্তের অন্ত, তিনিই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় ও চিদ্ঘন।

বাহ্য ব্যবহার কালে

(ক) বর্জ্জনীয়

(১) পরচরিত্রানুশীলন, পরনিন্দা, পরদোষদর্শন।

(২) আত্মপ্রশংসা।

(৩) আলস্য।

(৪) প্রয়োজনীয় উপস্থিত কর্ম্মে মান অপমান বোধ।

(৫) কপটাচরণ।

(৬) বৈধস্থল ভিন্ন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপরকে উপদেশ দান।

(খ) গ্রহণীয়

(১) বাক্ সংযম।

(২) সরল সত্যবাক্য।

(৩) সেবারই নিমিত্ত সকল কর্ম্ম ও ভোগ, নিজের নিমিত্ত নহে।

আভ্যন্তরিক সাধন বিষয়ে

(১) সদ্‌গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, জপ।

(২) (ক) সন্তোষ (লাভালাভে, জয়াজয়ে, সুখে দুঃখে, স্তুতি নিন্দায়)

(খ) ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।

ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥

(গ) সত্য বিচার নিত্যধারণা—(স— ত —য=সত্য)

পরব্রহ্ম বিশ্ব যময়তি

(৩) ধ্যান—(ক) গুরু

(খ) ব্রজনাথ

(গ) অনন্তরূপী

(ঘ) পরব্রহ্ম—সদা এক নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানানন্দময়।

৫ই আষাঢ়

বিক্ষিপ্তচিত্ত কিরূপে একাগ্র হয়

যোগসূত্র—তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ—

(১) (২) (৩)

(১) তপঃ—(ক) শারীরিক শুদ্ধির চেষ্টা—আহার নিদ্রা প্রভৃতির নিয়ম দ্বারা—

(খ) কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মাৎসর্য্য এই সকল ইন্দ্রিয়-বিকার বর্জ্জন করা—

(২) স্বাধ্যায়—সৎশাস্ত্র—উপনিষৎ প্রভৃতি নিত্য পাঠ এবং নাম জপ—

(৩) ঈশ্বরপ্রণিধান—তাঁহাকে সর্ব্বনিয়ন্তা জানিয়া তাঁহাতে সর্ব্ব-সমর্পণ—কোন বিষয়ে নিজে মান অভিমান না লওয়া।

৬ই আষাঢ়

নিজধ্যান নিরূপণ

১। * * * মন্ত্র তোমার গুরুদত্ত প্রথম মন্ত্র, ইহা দ্বারা তোমাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ধ্যান করা উচিত।

* * * মন্ত্র দ্বিতীয়—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" ইত্যাদি বাক্যে জগৎ এবং তুমি ব্রহ্মস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছ, তাহারও বিষয় সুতরাং একই।

২। তত্ত্বপর্য্যালোচনায়ও জীব ব্রহ্মাংশ এবং জগৎও ব্রহ্মাংশ, ইহা শ্রুতি ও অপর শাস্ত্রের উপদেশ, ইহাই নিশ্চিত সত্য (সাধকের পক্ষে)।

৩। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইত্যাদি বাক্যে এবং শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরের জগন্নিয়ন্তৃত্বও সিদ্ধই আছে।

৪। ব্রহ্মের জগৎকারণত্বও সিদ্ধই আছে, ইহার নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণই তিনি।

মীমাংসা

সুতরাং যখন সমস্তই ব্রহ্ম, এবং তোমার মন্ত্রোপদেশের সারও ইহাই, তখন তোমার ধ্যানও এইরূপই হওয়া উচিত, যথা :—

(১) স্বয়ং ব্রহ্ম—

(২) অপর সকল জীবই ব্রহ্ম, সুতরাং যোগীশ্বর ও শৃগাল উভয়ই তুল্যরূপ ব্রহ্ম—সর্ব্বত্র সমদর্শনই প্রধান ধ্যানাঙ্গ।

(৩) সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মেরই কর্ম্ম, সুতরাং নিজের কর্ম্মে আত্মগ্লানি অথবা হর্ষ এবং অপরের কর্ম্মে নিন্দা বা প্রশংসা মূর্খতা ও অজ্ঞানতা মাত্র। ইহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৮ অধ্যায় ১।২ ইত্যাদি শ্লোকেও দেখিতেছি ঠিক ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব সাবধান, পরনিন্দা এবং দোষ-দর্শন বর্জ্জনীয়—বিশেষরূপে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১৯ অধ্যায় ৪৫ শ্লোক

"গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ"

১৪ই আষাঢ়

বিশেষ সাধন—সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।

১৭ই আষাঢ়

দেখিও অহঙ্কার না আসে এবং অপর দিকে হতাশাও না আসে—

"সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

৮ই শ্রাবণ

ঈশ্বরের আনন্দময়তা, সর্ব্বাত্মকতা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সর্ব্বদা উপাসনাকালে ধ্যেয় এবং আপনাকেও শুদ্ধ, নির্ম্মল, ব্রহ্মরূপে তৎকালে অভিন্নভাবে চিন্তা করিবে—ইহাই বেদান্তদর্শনেরও মীমাংসা—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি স্মরণীয়।

১৬ই শ্রাবণ

"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥"
"ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ"।

ছিন্নসংশয়ঃ :—নিশ্চয়ই ব্রহ্ম একমাত্র কর্ত্তা, সংশয় কেন ?

২৭শে পৌষ

প্রথম ব্রহ্মসাধন (বর্ত্তমানে)

১। তিনি হৃদয়াকাশের পরপারে নির্ম্মল দ্রষ্টারূপে অবস্থিত ; জগৎ আপনা হইতে প্রকাশিত করিতেছেন এবং আপনাতে লয় করিতেছেন। বর্ত্তমান্ জগৎ তাঁহারই প্রকাশ।

সংক্রান্তি

২য় সাধন

তিনি অন্তরে, তিনি বাহ্যে, তিনিই অন্তর তিনিই বাহ্য, তিনি সর্ব্ব। যখন তিনিই সর্ব্বকর্ত্তা, তখন কোন্ কার্য্য কিরূপে চলিবে, কোন্ বস্তু কিরূপ থাকিবে, তাহার চিন্তা কি নিমিত্ত ?

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ গীতা ৯ অঃ ২২।

গীতার উক্ত ধ্যান

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬ষ্ঠ, ২৫।

শ্রীমদ্ভাগবত

হংসোক্ত উপদেশ (সনকাদিকে—শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১৩ অঃ)
আমি দ্রষ্টা পরমাত্মা, দেহাদি দৃশ্যবর্গও ব্রহ্ম হইলেও দৃশ্যরূপে আমি আত্মা হইতে পৃথক্ ; ইহাতে আমিবুদ্ধিই ভ্রম, গুরুসেবা ও তত্ত্বচিন্তা দ্বারা এই ভ্রম পরিত্যাগ কর।

বর্ত্তমান ত্রিবিধ সাধন

১। বাক্য সংযম—মৌন (বাগ্‌দণ্ড)—

২। কর্ম্ম—সেবা পূজা, আশ্রম সেবা—ইহাই এইক্ষণকার গুরুসেবা (কর্ম্মদণ্ড)—

৩। মন—মনোদণ্ড—ভূমা আত্মস্বরূপে অবস্থিতির যত্ন, হৃৎপুণ্ডরীক কেন্দ্র,—ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধতম ব্রহ্মরন্ধ্র এবং অধস্তন পর্য্যন্ত ব্যাপ্তির অনুভব আবশ্যক। স্বয়ং ব্রহ্ম, নিজ এবং অপর দেহাদি (দেহ, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত) দৃশ্যরূপ ব্রহ্ম—ইহার পরিচালক ব্রহ্ম, ইহার সম্বন্ধে নিজের কিম্বা পরের কোন কর্ম্ম দোষাবহ নহে—ব্রহ্মপ্রেরিত এবং ব্রহ্মেরই বিকাশ। সুতরাং "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" বাক্য সত্য, ইহার প্রতিপালন চেষ্টা। এইরূপে নিত্য সন্তোষ সাধনই এই মনোদণ্ড। ইহাতেই মন স্থির হইবে ("এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ" ইত্যাদি) এবং অমননীয় বিষয় মনন করিবে না।

[ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের ১ম হইতে ২৭শ খণ্ডের বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া তাহা হইতে সাধনোপযোগীরূপে এইরূপ সারমর্ম্ম অবধারণ করিয়াছেন :—]

১। গুরুশুশ্রূষা, সেবা ও তদ্বাক্য পালন প্রথমে প্রয়োজন ; তদ্দ্বারা সুখের আশার নিবৃত্তি হয়।

২। তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা—সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া ধারণা প্রয়োজন ; আদেশ পালন করিতে করিতে শ্রদ্ধা জন্মে।

৩। ভূমাই সুখস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ; তিনিই মহত্তম, সর্ব্বময়, তদ্ব্যতীত কিছু নাই। ইনিই জীবের (সাধকের) আত্মা; তিনিই উপাস্য, জ্ঞাতব্য, ইহাই পরম সত্য। এতদ্বিষয়ে দৃঢ় ধারণা চাই।

৪। তাঁহার জ্ঞানেই সমস্ত জ্ঞাত হয়, সাধক আনন্দময় হয়েন এবং সম্পূর্ণ কামচারী হয়েন।

বরাহ দ্বাদশী

২১শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার

দেখিতেছি এই দেহ যেরূপ সীমাবদ্ধ ভাবিতাম, ইহা তদ্রূপ নহে, ইহার অসংখ্য স্তর আছে, প্রত্যেকটি স্তর এক একটি অনন্ত লোকের অঙ্গীভূত অংশ, ধ্যান সেই স্তরে পৌঁছিলে এই জীবদেহই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ হইয়া যায়—অতি সূক্ষ্ম অনন্ত আকাশময় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী দেহ হইয়া যায়। তাহাতে দ্রষ্টারূপে জীবাত্মা অন্তর্নিহিত; এই হৃৎপুণ্ডরীক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের হৃৎপুণ্ডরীক, ইহাতে জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যুৎপ্রভাযুক্ত অতি সূক্ষ্ম জ্যোতিরূপে ইনি প্রথম প্রকাশিত হয়েন; তৎপর এই জ্যোতিও তাঁহাতে লীন হইয়া যায়। শাস্ত্রোপদেশে অনুমান করিতেছি এই জ্যোতিলীন অবস্থায় জীবাত্মস্বরূপে নিয়ত অবস্থিতি করিতে পারিলে পরমাত্মস্বরূপ প্রকাশিত হইবে; আপাততঃ এই জীবাত্ম-অবস্থাই একপ্রকার সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত অবস্থা বলিয়া বোধ করিতেছি।

গীতায় বলিয়াছেন—

"...............নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

এই দেহই বিরাট দেহ বলিয়া অনুভব হইলে (এবং প্রত্যেক দেহই এইরূপ), ইহার (স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ—ইন্দ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্র, অহঙ্কার

এবং বুদ্ধির) সমস্ত কার্য্যই ইহার অধিনায়কের—ইহার নিয়ন্তার—জগন্নিয়ন্তার ; জীবাত্মা যিনি ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট, তিনি কেবল সাক্ষী স্বরূপ—দ্রষ্টামাত্র। সুতরাং এই ধ্যানে অবস্থিত হইলেই নির্দ্বন্দ্ব নিত্য-সত্ত্বস্থ আপাততঃ হওয়া যায়, এবং যোগক্ষেম আপনা হইতেই বর্হিত হইয়া যায়। আত্মবান্ ও এই জীবাত্মস্বরূপে স্থিত হওয়া হইলেই এক প্রকার এক অর্থে হওয়া হইল। এই জীব উক্ত নিজস্বরূপে স্থিত হইয়া তাহার, ও যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহে তিনি প্রবিষ্ট তাহার, মূল কারণ মূল আশ্রয় পরব্রহ্মের ধ্যানই এইক্ষণকার পক্ষে অবলম্বনীয় বোধ করিতেছি। এই পন্থা—"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ।"—ধন্য গুরুদেব! তোমারই কৃপায় নিত্য নূতন পন্থা প্রকাশিত হইতেছে।—আহা! শ্রীভগবৎ মূর্ত্তিতে অদ্য দেখিলাম এই সমস্ত অবস্থাই মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে।

ধন্য প্রিয়াজী! তুমিই এই তথ্য অদ্য প্রকাশ করিয়াছ।—

ধন্য! ধন্য!! ধন্য!!!

২৬শে মাঘ

গতকল্য মাঘী পূর্ণিমা গিয়াছে। দেখিতেছি ইতিমধ্যে অবস্থাসকল ক্রমাগত আসিতেছে ও যাইতেছে, স্থায়ী হইতেছে না ; সকলই তোমার হাত, যেরূপ রাখিতেছ তদ্রূপই থাকিতেছি, আর অসন্তোষ পোষণ করিতে ইচ্ছা করি না। "অসন্তুষ্টাঃ দ্বিজা নষ্টাঃ"।

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥"

ইহা সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য। আর লিখিয়া স্পষ্ট করিয়া দিলে বুঝে না, ইহাতে ক্রোধের উদয় হয়। তৎসম্বন্ধে স্মর্ত্তব্য—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥"

আর বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবে—

"যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।

নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥"

দেখিতেছি লিখিয়া সময় সময় অভিপ্রায় প্রকাশ করা এইক্ষণকার অবস্থায় বন্ধ করিতে পারিব না; কারণ আশ্রমের ভার আমার উপরে সকলে দিয়াছেন ও গ্রহণ করিয়াছি, নিজে একেবারে চুপ করিলে কার্য্যের ক্ষতি হয়। এই অবস্থায় এইক্ষণ হইতে যতদূর সম্ভব কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিব না, একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়েই করিব। ইহাতে অন্ততঃ সাধারণ আশ্রম সংক্রান্ত কার্য্যের চিন্তা দূর হইবে। নতুবা তাহারও পর্য্যালোচনা সময় সময় করিতে হয়। মহেন্দ্রের ও দ্বারিকের দ্বারা সম্যক্ কার্য্য সঙ্কুলান হয় না। কি করিব ইহাও ভগবৎ ইচ্ছা।

হে মহারাজ! তুমি সহায় হও, নতুবা নিজের একেবারে কোন প্রকার সামর্থ্য দেখিতেছি না। হৃদয়গ্রন্থি সময় মত ছিন্ন করিবে বলিয়াছিলে, এখনও কি তাহার সময় হয় নাই? আশাতেই এই পর্য্যন্ত রহিয়াছি।

ওঁ শান্তিঃ।

২৮শে মাঘ

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥

এইটিই তোমার সম্যক্ সাধন, ইহাই প্রশস্ত পন্থা।

৪ঠা ফাল্গুন

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ (মুণ্ডক-২-১-১)

বুদ্ধি হইতে ক্ষিতি পর্যন্ত এইরূপ প্রকাশিত, বুদ্ধির পর তিনি—

"এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা ....." ইত্যাদি গীতাবাক্যও স্মর্তব্য।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ (মুণ্ডক ২য়-১-১০)

৬ই ফাল্গুন

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসা নিশিতং সন্ধধীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ (মুণ্ডক ২-২-৩)

১। গোপনে স্থিত মন্ত্ররূপ ধনু লাভ করিয়া—

২। উপাসনা দ্বারা সুশাণিত নির্মল জীবচৈতন্যরূপ শরকে সন্ধান করিয়া—

৩। ভগবদ্ভাবগত চিত্তরূপ বলবান্ হস্তের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া—

(এইক্ষণে এইটির প্রধান অভাব দেখিতেছি)

৪। ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে ভেদ কর।

তৎ (ব্রহ্ম) ভাব গত (প্রাপ্ত)—এই ভেদবুদ্ধিযুক্ত অথবা স্বতন্ত্র ভাবযুক্ত চিত্তের দ্বারা হইবে না, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন (তৎ) ভাব প্রাপ্ত অথবা স্বাতন্ত্র্যরহিত তদধীনতা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত চিত্তের দ্বারা মন্ত্রকে আকর্ষণ করিতে হইবে, তবে শর লক্ষ্যের দিকে চলিবে। ধনু নোয়াইতে (নমিত করিতে) না পারিলে শর চলিবে কাহার বলে এবং লক্ষ্যই বা প্রাপ্ত হইবে কিরূপে ? কেবল ধনুকে শর লাগান যায় ; কিন্তু তাহাতে শর চলে না, ধনু নোয়াইয়া শর চালাইতে হয়। তদ্ভাবগত-চিত্ত ভিন্ন কিন্তু অপরে নোয়াইতে পারে না।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥
যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা—
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ (মুণ্ডক ২-২-৩।৪।৫)

অন্য কথা নাই, অন্য কোন লক্ষ্য নাই, সেই একই লক্ষ্য, একই কার্য্য, ইহাই একমাত্র সেতু ;

এই চঞ্চল চিত্ত লইয়া তবে কিরূপে ইহা হওয়া সম্ভব ?—"তদ্ভাবগতেন চেতসা আয়ম্য", নতুবা সেই ধনুকে নোয়ানই যায় না, তাহাতে শর কিরূপে যোজনা করিবে ?

হে গুরুদেব ! তুমিই একমাত্র ভরসা, তোমার বাক্যই একমাত্র আশা—"কর সদগুরু কা আশ, হোয় ঘটমে প্রকাশ।"

৯ই ফাল্গুন

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

ভগবানই যখন কর্ত্তা, তিনিই সব করিবেন, কালক্রমে যাহা হওয়ার তাহা সব হইবে, এইরূপ জল্পনা করিয়া যেন সাধনে নিশ্চেষ্টভাব "তুষ্টি" আসে না। ইহা যোগ প্রতিবন্ধক, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র তৃতীয় অধ্যায় ৩৮–৪৫ সূত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে—আলস্যই বাস্তবিক সর্ব্ববিধ "তুষ্টি"র মূল।

১৬ই ফাল্গুন

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম—
পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈ—
বেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ (মুণ্ডক ২য়।২।১১)
"এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (ঐ ২য়।১ম।৪)

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

ধ্যান

গর্ভিণী স্ত্রী যেমন অতি যত্নের সহিত সর্ব্বদা সশঙ্কিত ভাবে গর্ভ ধারণ করে, তদ্রূপ অতি যত্নে আদর পূর্ব্বক বীজমন্ত্রকে হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে নিয়ত ধারণ করিবে ; কখন যেন ভুলিয়া না যাও, অতি সাবধানে রক্ষা করিবে। বীজমন্ত্রই পরব্রহ্মের প্রতিনিধি স্বরূপ।

বদী চৈত্র কৃষ্ণা চতুর্থী

বীজমন্ত্র সেতুস্বরূপ, পরব্রহ্মের সহিত যোগ করিয়া দেয়, এইরূপ ধ্যান করিবে।

কৃষ্ণা পঞ্চমী

পরমাত্মা নির্ম্মল গুণবর্গের অতীত দ্রষ্টাস্বরূপ—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্"

কৃষ্ণা অষ্টমী

কিন্তু সর্ব্বাতীত দ্রষ্টামাত্রই আর দৃশ্যবর্গ—জগৎ, তুমি নিজেও তিনিই, ভিন্নভাব আনিও না. ধ্যানের সময় এবং সকল সময়েই এই ধ্যান রাখিতে যত্ন করিবে।

৩০শে চৈত্র

কৃষ্ণা পঞ্চমী

১। দোষদর্শনই প্রকৃত দোষ, সমদর্শনই গুণ।

২। অপমান স্থলে শোধনের জন্য বিশেষ কৃপা অনুভব করা চাই। অপমান প্রফুল্ল অন্তরে লইতে না পারা পর্য্যন্ত প্রকৃত জীবন আরম্ভই নয়। যখন বিশেষ নিকটে নিবেন, তখনই অপমান দিয়া থাকেন। শরীরের যাতনা অনেকেই সহ্য করে; কিন্তু অপমানের যাতনা সহ্য অল্পই করে; পরের তাচ্ছিল্য ও অপমান সহ্য করা অতি স্পৃহণীয়।

কৃষ্ণা প্রতিপদ—বদী জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ

আগামী শুক্লা দশমী (দশহরার) দিন ৫৮ বৎসর পূর্ণ হইবে; সুতরাং ভবিষ্যৎ উক্তি পূর্ণ হইতে অতি অল্প সময় অবশিষ্ট।

প্রথম ধ্যান

১। চতুর্দ্দশ ভুবনব্যাপী এই ব্রহ্মাণ্ড যে বিরাট পুরুষের দেহ তিনি ধ্যেয়। এই ভুবন তাঁহার বাহ্য দেহ, তিনি ইহার প্রাণস্বরূপ।

২। (ক) ইহারই অঙ্গীভূত তুমি

(খ) তুমি সেই বিরাটরূপী—বিরাটের প্রাণই তোমার প্রাণ।

এই ধ্যানে দেহস্থ প্রাণের আশ্রয় হৃদয়ে শক্তির ঘা লাগিতে লাগিতে তাহা বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং প্রাণ বিশেষ আশ্রয়রহিতবৎ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। তখনই যথার্থরূপে স্বয়ং যে বিরাটরূপী তাহার অনুভব হয়। স্বয়ং ভুবনব্যাপী বিরাট আকাশময় তনুবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

অতঃপর দ্বিতীয় ধ্যান

১। ব্রহ্মাণ্ডাতীত বিরাট আকাশের ঊর্দ্ধে, অধে এবং চতুর্দ্দিকে অনন্ত নিস্তব্ধ সত্তাসমুদ্র আছে—তাহাই যথার্থ মহৎ—ইহা মহাকাশ, ইহা লোকাতীত—অলোকী। (এই মহৎ অলোক আকাশই বোধ হয় বৌদ্ধদের অলোক আকাশ—শূন্য)। এই মহাকাশের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড যেন আকাশে খদ্যোতবৎ; সেই নিস্তব্ধ মহাকাশই এই ব্রহ্মাণ্ডেও ওতপ্রোত হইয়া আছে,—এই ব্রহ্মাণ্ড যেন ঐ মহাসত্ত্ব সমুদ্রের একটি ঘূর্ণাবৎ প্রকাশিত। ইহা এক অদ্বৈত, ব্রহ্মাণ্ডরূপী তোমার ঊর্দ্ধে, অধে, চতুর্দ্দিকে এবং অন্তরে ইহা এক অদ্বৈতরূপে প্রতিষ্ঠিত।

২। ক্রমশঃ—ঐ মহাকাশের বহিরঙ্গ আনন্দ, ঐ আনন্দের অনুভব-কর্ত্তা ব্রহ্ম; তুমি তাঁহারই অঙ্গীভূত, তোমার পার্থক্য নাই, কেবল সেই অনন্ত আনন্দ নিস্তব্ধভাবে অনুভব কর।

তৃতীয় ধ্যান

এই আনন্দ চিন্ময়—অনন্ত মহৎপুরুষ যাঁহার প্রকাশ, যাঁহাতে এই মহৎপদবীও অস্তমিত—মহৎ শূন্য কোন আখ্যা যাঁহার হয় না,

সেই অপ্রকাশ, এবং এই মহৎপুরুষের আশ্রয়স্থানীয় পুরাণপুরুষই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। ভূমা ধ্যানের পর কেবল সর্ব্বাতীত দ্রষ্টারূপে ইনি ধ্যেয়। এই পর্য্যন্তই পথ এইক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ্যীভূত হইতেছে।

৮ই জ্যৈষ্ঠ

সর্ব্বময় সর্ব্বনিয়ন্তা এবং নির্ম্মল (নির্লিপ্ত) সত্তারূপে ধ্যানই দেখিতেছি সর্ব্বকালে এইক্ষণ পর্য্যন্ত ফলপ্রদ। ইহার অন্তর্ভূত অপর সকল ধ্যান।

এই সঙ্গে স্মরণীয়—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্"

৭ই আশ্বিন

ললিতা সপ্তমী

কোন বস্তুতে কোন প্রকার দোষ বা অশুদ্ধি নাই; তৎসম্বন্ধে যে শাস্ত্রবাক্য ইহা কেবল জীবের অবস্থাভেদে। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে যাহা দোষ, সুস্থের পক্ষে তাহা গুণ; মনুষ্যের পক্ষে যাহা হেয়, অপবিত্র, অন্য জীবের পক্ষে তাহা উপাদেয় এবং একশ্রেণীর মনুষ্যের পক্ষে যাহা অপবিত্র, অপর শ্রেণীর পক্ষে তাহা পবিত্র, উপাদেয়। যাহা এক জীবের পক্ষে বিষ, অপরের পক্ষে তাহা অমৃত। সুতরাং বস্তুর নিজের কোন দোষ বা অপবিত্রতা নাই; অতএব পরমহংস সমস্তই পবিত্র ব্রহ্মময় দর্শন করিবেন।

এইরূপ কোন কর্ম্ম বা মানসিক ভাব নিজে দূষণীয় নহে; সকল ভাব, সকল কর্ম্ম, হয় সত্ত্ব, না হয় রজঃ, না হয় তমঃপ্রধান; তিন গুণই নিত্য ভগবৎঅঙ্গ; সুতরাং দোষ কোথায়? প্রত্যক্ষতঃও অনেক

সময় এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয় যে মিথ্যারও উপাদেয়ত্ব জগতে আছে, তদ্দ্বারা সত্যের অপেক্ষা অনেক সময় অধিক উপকার (যাহাকে জীব-জগতে উপকার বলা যায় তাহা) সাধিত হয়। সত্যের দ্বারা অনেক সময় অপকার হয়। হিংসাতে এইরূপ উপকার অনেক সময় ঘটে; যেমন অপরকে (হইতে পারে পরম সাধুকে) বিনাশ করিতে উদ্যত সর্পকে অপরে বিনাশ করিলে উপকার হয়। রাজবিচারে প্রাণদণ্ড ইত্যাদিও হিংসার কার্য্য, তাহা উপকারের নিমিত্ত। ইত্যাদি।

সুতরাং দোষদর্শনই অবিদ্যা অজ্ঞান, জ্ঞানী ব্যক্তির তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

৮ই আশ্বিন

শ্রীরাধা অষ্টমী

"হায় তো একেলা পর্ ক্যা ক্যা খেল খেলা"

কিন্তু স্মরণ রাখিবে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর ব্যবহার ও তৎপোষক বাক্য, যথা :—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

১৯শে কার্ত্তিক

প্রভু এক; বিশ্বরচয়িতা—বিশ্বকর্ত্তা—বিশ্বপ্রকাশক এক। জগতের প্রত্যেক কার্য্যের কর্ত্তা তিনি স্বয়ং এক। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক চিন্তা জগতের প্রত্যেক ঘটনা অনন্ত জগতের সহিত সম্বদ্ধ—অকাট্যভাবে সম্বদ্ধ হইয়া আছে; অনন্ত জগৎ সেই একটি ঘটনা উৎপাদন করিবার জন্য অনন্ত হস্তে অনন্ত কাল হইতে অনন্ত

আয়োজন করিতেছে। এই যে পক্ষীটি ডাকিয়া উঠিল, এই ব্যাপার এই মুহূর্তে এই স্থানে উৎপাদন করিবার জন্য ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যস্ত ; সকলে ইহার দাস হইয়া এই নিমিত্ত অনন্ত বলি আহরণ করিতেছে ; ইহার নিমিত্ত পবন বহমান হইতেছে, ইহার নিমিত্ত চন্দ্র, সূর্য্য উদয় হইতেছে ; সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বয়ং জগৎপতি ইহার কর্ত্তা, আর কে আছে যে ইঁহার দাসত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে। ধন্য জগৎপতে। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

খাতার সারাংশ যথাসম্ভব প্রকাশিত হইল। তথাপি এই সকল পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, তাঁহার সাধন অবস্থা সম্বন্ধে সকলই জানা হইল। সিদ্ধির সমীপবর্ত্তী হইলে যে সকল উচ্চ অবস্থা সাধকের প্রকাশিত হয়, তাহা চিরদিনই সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য। ফলতঃ, তাঁহার লোকোত্তর জীবনের এই গোপন-অধ্যায় যাহা স্বভাবতঃ গোপন থাকিবার, তাহা গোপনই রহিয়া গেল।

অধ্যায়ের এই অংশ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চেহারার পরিবর্ত্তন এই সময়ে অতি শীঘ্র শীঘ্র ঘটিতেছিল, এই সকল পরিবর্ত্তন সাধনজীবনে তাঁহার দ্রুত উন্নতির সূচক ছিল। যাঁহারাই তাঁহাকে এই সময়ে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই বিষয় জানেন। আর তাঁহার বিভিন্ন অবস্থার যে কয়খানি ফটো এই গ্রন্থে দেওয়া হইল তাহা হইতেও সাধারণভাবে এই বিষয় সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। ১৩২২ সালে যখন তিনি সংসার ত্যাগ করেন তাঁহার তৎকালীন চেহারার সহিত কিছুকাল পরে সাধনাবস্থার চেহারার তুলনা করিলে এতদুভয় যে একই পুরুষের

দুই বিভিন্ন অবস্থার মূর্ত্তি, পূর্ব্বে জানা না থাকিলে তাহা মনে করা কঠিন হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমে থাকাকালীন পরিচিত এক ভদ্রলোক এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে আসিয়া তাঁহারই নিকট "তারাকিশোরবাবু কোথায়" এই খোঁজ করেন। উত্তরে বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তিনি ত মারা গিয়াছেন!" ভদ্রলোকটি ইহা শুনিয়া বিশেষরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে অবশ্যই এই উত্তরের যথার্থ মর্ম্ম ও প্রকৃত ঘটনা তিনি অবগত হইয়াছিলেন।

ইহার পরে কখন কোন্ সময় তিনি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা আর এই খাতায় তিনি লিখেন নাই।

* * * * *

এই সময়ে আমি নবদ্বীপে থাকিয়া টোলে পড়িতাম। সেখানে সতীশচন্দ্র আচার্য্য নামে আমার একজন সতীর্থের সহিত একদিন জীবনে যথার্থ কল্যাণলাভের পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। কথায় কথায় তিনি বলিলেন "ভাই! এই সংসার পার করিতে পারেন এরূপ এক জনকে আমি দেখিয়াছি। আমার স্ত্রী মারা গেলে মনে অত্যন্ত বৈরাগ্য আসিল। সেই সময় সমর্থ সদ্‌গুরুর অন্বেষণে অনেক তীর্থে ঘুরিয়াছি। বৃন্দাবনে গিয়া তারাকিশোর চৌধুরী নামে এক মহাত্মার সাক্ষাৎ পাই। সে সময় তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতেছিলেন। সে কি অপরূপ তেজঃপুঞ্জ দিব্যকান্তি, তাহা তোমাকে কি বলিব? আমি তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় আকৃষ্ট হইলাম ও তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তিনি লিখিয়া এই উত্তর দিলেন "আমার সাধন এখনও পূর্ণ হয় নাই। যে পর্য্যন্ত আমার সাধন পূর্ণ না হইবে,

সেই পর্য্যন্ত আমি কাহাকেও দীক্ষা দিতে সমর্থ নহি। তুমি দুই বৎসর পরে খবর লইলে তখন এই বিষয়ের উত্তর দিতে পারিব।" *

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের তপঃপ্রভায় উজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অথবা দূর হইতে তাঁহার ত্যাগ ও তপস্যার খ্যাতি শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া আরও অনেকে তাঁহার নিকট এই সময়ে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সমস্তিপুরের (বিহার) ডাক্তার ৺হরিপদ ঘোষ, সান্তাহার রেলওয়ে ষ্টেশনের তৎকালীন কর্ম্মচারী ৺প্রসন্নকুমার ঘোষ ও ব্রজেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়গণ অন্যতম। ইঁহাদের সকলকেই তিনি অনুরূপ উত্তর দিয়াছিলেন।

তাঁহার খাতা হইতে যে সকল অংশ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৩২৪ সালের "কৃষ্ণা প্রতিপদ—বদী জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ" তারিখে লিখিয়াছেন "আগামী শুক্লা দশমী (দশহরার) দিন ৫৮ বৎসর পূর্ণ হইবে, সুতরাং ভবিষ্যদুক্তি পূর্ণ হইতে অতি অল্প সময় অবশিষ্ট।"

১৩২৫ সালের ১৯শে শ্রাবণের পর আর সাধন বিষয়ে কিছু লিখেন নাই।

ইহার পরে ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসে নাসিক কুম্ভমেলায় তিনি প্রথম দীক্ষাদান করেন। ইহার পর অল্পকালমধ্যেই আরও অনেকে, এবং পূর্ব্বোক্ত হরিপদবাবু, প্রসন্নবাবু, ব্রজেন্দ্রবাবু প্রভৃতিও তাঁহার নিকট

* এইরূপে আমি প্রথম শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের খবর পাই। ইনি অবশ্য দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে পারেন নাই, চিত্তের ব্যাকুলতা বশতঃ অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু বাবাজী মহারাজের সাক্ষাৎকারে তিনি নিজে আশ্রয়লাভ করিতে না পারিলেও তাঁহার প্রাণের প্রেরণা আমাকে যে বাবাজী মহারাজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া দিয়াছিল, একথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইঁহারই ভাবসংক্রমণের ফলে আমি বাবাজী মহারাজের কৃপা প্রাপ্ত হই, তৎপূর্ব্বে আমি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানিতাম না।

দীক্ষালাভ করেন। তখন তাঁহার সাধন সমাপ্ত হইয়াছে। সে সময়ে আর তাঁহাকে কোন প্রকার সাধন করিতে অথবা কোনরূপ অসাধারণ ভাবে থাকিতে ইঁহারা দেখেন নাই। ইঁহারা তাঁহাকে তখন যেরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ইঁহাদের নিকট শুনিয়াছি। সাধুদিগের নিয়মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর সেবা করিয়া, নানা বিষয়ের আলাপ করিয়া ও নানাকর্ম্মের পরিচালনা করিয়া—প্রয়োজনানুসারে স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া, বাহ্যদৃষ্টে অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করিতেছেন, দিনের পর দিন এমনি যাইতেছে, অথচ এই সমস্তের অন্তরালে একটি প্রশান্ত অবিচল—নিত্য-স্থির ভাব, তাহা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা লাগে না, সন্ধানীদৃষ্টির সম্মুখে তাহা সহজেই ধরা পড়ে। যখন কাজ নাই, তখন আত্মসমাহিতভাবে চুপ করিয়া থাকেন : সাক্ষাৎ শঙ্করের ন্যায় মূর্ত্তি, কাছে গেলে অন্তরে সাত্ত্বিকবৃত্তির উদয় হয়, ত ঁর সুধাবর্ষী সহাস্য দৃষ্টি যাহার উপর পড়ে, তাহার অন্তর মধুময় হইয়া যায়—ঠিক যেমনটি পরে আমরা দেখিয়াছি।

এই সকল লক্ষ্য করিলে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি হয় যে, ১৩২৫ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩২৭ সালের শ্রাবণ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কালের মধ্যে কোনও সময়ে তাঁহার গুরুদেবের বর ফলিত হইয়াছিল, তাঁহার পূর্ণ সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল। দীক্ষাদানের উপযুক্ত অবস্থালাভের জন্য অপেক্ষা ও পরে যথাসময়ে দীক্ষাদান, তীব্রাতিতীব্র সাধনসম্বেগ ও পরবর্ত্তী সর্ব্ববিধ সাধনশূন্য গুণাতীত আপ্তকামভাব সুস্পষ্টরূপে ইহাই সূচিত করে।

সপ্তম অধ্যায়

সন্ন্যাস, ব্রজবিদেহী মহন্তপদ লাভ, আশ্রমে সাধুসেবার প্রবর্ত্তন

১৩২৬ সালের ঝুলন পূর্ণিমার তিন চারি দিন পূর্ব্বে বাবাজী মহারাজের কনিষ্ঠ গুরুভ্রাতা তদানীন্তন ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজী আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি আর মহন্তাই রাখিতে চাই না, এই সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন তাহা আপনি করুন।"

এই ব্রজবিদেহী মহন্তপদের একটু ইতিহাস আছে, তাহা এই স্থলে বিবৃত করা আবশ্যক। "মহন্ত" বলিতে সাধারণতঃ লোকে কোনও মঠাধ্যক্ষ বুঝিয়া থাকেন, বাস্তবিক অধিকাংশ স্থলে এই অর্থেই মহন্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং এই পদ অনেকটা ম্যানেজার বা তত্ত্বাবধায়কের পদ। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর মহন্ত আছেন, তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়গুরু মহন্ত বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। মহৎ শব্দ হইতে হিন্দী ভাষার মহন্ত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে—ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মহাপুরুষ। ইঁহাদের পদ আচার্য্য ও নেতার পদ এবং তদ্রূপেই ইঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট কোন মঠ, আশ্রম অথবা তৎসংলগ্ন সম্পত্তি ইঁহাদের থাকিতেও পারে অথবা না থাকিতেও পারে, অনেকে বৃক্ষতলবাসী অথবা গুহাবাসীও হইয়া থাকেন। ব্রজবিদেহী মহন্ত পদ এই শেষোক্ত শ্রেণীর। এই পদের মর্য্যাদা যেমন প্রচুর, দায়িত্বও তেমনি যথেষ্ট। ইনি ব্রজধামস্থ সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলীর অবিসম্বাদিত নেতা ও সকলে ইঁহার অনুশাসন মানিয়া চলেন। ব্রজপরিক্রমাকালে সাধুজমাতের নেতৃস্বরূপে ইঁহাকেই যাইতে হয়, সর্ব্বত্র বিরোধ ও ধর্ম্ম-

বিষয়ক সন্দেহের মীমাংসা ইঁহাকেই করিতে হয়, সঙ্গীয় সাধুগণের আহারাদির ব্যবস্থাও ইঁহার করিতে হয়। এই মহন্তপদ সম্পর্কিত সম্পত্তি কিছুই নাই। সাধন-সম্পদই ব্রজবিদেহী মহন্তের একমাত্র সম্পদ, ইহা না থাকিলে এই পদে কেহ টিকিতে পারে না। যাহা হউক, শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজ দেহ পরিত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে, তাঁহার শরীর প্রাচীন হওয়ায় এবং মহন্ত হইবার উপযুক্ত কেহ তখন তাঁহার নিকট না থাকায়, তাঁহারই সম্প্রদায়ের বৃন্দাবনবাসী সাধু শ্রীযুক্ত কিশোরদাসজীকে এক বিশেষ সর্ত্তে লেখাপড়া করিয়া ব্রজবিদেহী মহন্তপদ অর্পণ করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে এই সর্ত্ত লেখা হয় যে তিনি দাদাগুরুজী মহারাজের স্থানে মহন্ত হইলেন, যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন অনাচারী না হইলে তিনিই মহন্ত থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কোন শিষ্য মহন্ত হইতে পারিবেন না। শ্রীশ্রীদাদা গুরুমহারাজেরই কোন শিষ্য তখন মহন্ত হইবেন ("তোমারি পিছে হামারি চেলামে মহন্তাই আ যায়েগা; তোমারি চেলা মহন্ত নেহি হোগা")। ১৯০৭ সনের (বাং ১৩১৪) ১৩ই আগষ্ট এই দলিল সম্পাদিত হয়। শ্রীযুক্ত কিশোরদাসজী এই সর্ত্তে স্বীকৃত হয়েন এবং তখন হইতে তিনি মহন্ত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কালিয়দহের নিকট রামগুলেলা নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। এখনও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ সেখানে বাস করিতেছেন।

তিনি মহন্ত হইবার কিছুকাল পরে শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজ দেহরক্ষা করেন। শ্রীযুক্ত কিশোরদাসজীও মহন্তাইর কার্য্য চালাইতে থাকেন। ব্রজবিদেহী মহন্তকে জন্মাষ্টমীর পর দশমী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দেড়মাস ব্যাপিয়া ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ বন-পরিক্রমা করিতে হয়। সেই নিয়মানুসারে তিনিও শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজের ন্যায় পরিক্রমা

করিতে যাইতে লাগিলেন। পরিক্রমার সময় যেখানে যেখানে জমাত পড়িত, সেই সব স্থানেই তিনি প্রত্যহ বৈকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রজবাসী অনেকে আসিয়া সেই পাঠ শ্রবণ করিতেন, এইরূপে তাঁহার ব্রজের মধ্যে খুব নাম হইল। পরন্তু এমন কিছু কিছু ঘটনাও ঘটিল যে তাহা অবগত হইয়া স্থানীয় অন্যান্য মহন্ত এবং প্রায় সমস্ত সাধুই তাঁহার বিরোধী হইতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর যখন বৃন্দাবনে অর্দ্ধকুম্ভের সময় উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার ভয় হইল যে, কুম্ভমেলায় সর্ব্বদেশীয় মহন্তগণ আগমন করিবেন এবং তাঁহাদের নিকট তাঁহার নামে স্থানীয় মহন্ত ও সাধুগণ হয়ত নালিশ করিবেন। এই ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজীকে তিনি বলিলেন—"ব্রজবিদেহী মহন্তপদ এখন তুমি গ্রহণ কর।" তখন শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজীর বয়স পঁচিশ বৎসরেরও কম ছিল। সুতরাং তিনি নিজে তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া কলিকাতাস্থ গুরুভ্রাতৃবর্গের মতামতের জন্য তাঁহাদিগকে তার করিয়া এই সংবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একদিন হাইকোর্টে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজীর নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম পাইলেন যে অন্য মহন্তরা শ্রীযুক্ত কিশোরদাসজীকে মহন্তপদ হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে মহন্ত পদে অধিষ্ঠিত করিতে চান, তাহাতে বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি তত্রত্য গুরুভ্রাতাগণের মত কি? টেলিগ্রাম পাইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখনই তাঁহার অপর এক গুরুভ্রাতা ৺নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজীকে টেলিগ্রামে জানাইলেন যে, গুরুদেব যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন,

তাহা রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। সুতরাং শ্রীযুক্ত কিশোরদাসজী জীবিত থাকিতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজী যে মহন্ত হন, ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা নয়।

ব্রজবিদেহী মহন্তপদ নির্ব্বাচিত পদ। যদিও ভবিষ্যৎ মহন্ত মনোনয়নের অধিকার বর্ত্তমান মহন্তের সর্ব্বদাই আছে, তথাপি মনোনীত ব্যক্তির মহন্তাই সাধুমণ্ডলীর অনুমোদন-সাপেক্ষ। সুতরাং তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাওয়া সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজী শ্রীবৃন্দাবনের অর্দ্ধকুম্ভে সমবেত মহন্তগণের অনুরোধে মহন্তপদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৩২১ সালের ১৯শে ফাল্গুন তারিখে এই ঘটনা হইল। ইহার কয়েকদিন পরেই বৃন্দাবনের মেলা উঠিয়া হরিদ্বারে গেল। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজী ব্রজবিদেহী মহন্তরূপেই হরিদ্বারে গেলেন। শ্রীযুক্ত কিশোরদাসজীও তথায় গেলেন, কিন্তু কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুই একদিন মধ্যেই দেহত্যাগ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজী হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অন্তে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলে কিশোরদাসজীর শিষ্যগণ অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তখন অল্পবয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ; সুতরাং মহন্তাইএর কার্য্য চালাইতে তিনি পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন; বিশেষতঃ পরিক্রমার সময়ই অতিশয় অসুবিধা হইত। এইরূপ অসুবিধার মধ্যেই ১৩২২, ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালের পরিক্রমা সম্পূর্ণ হইল। পর বৎসর (১৩২৫ সালে) তিনি আর পরিক্রমায় গেলেনই না। এইরূপ অবস্থায় ঝুলন পূর্ণিমার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরোধ করিলে তিনি চিন্তিত হইলেন।

প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমীর দুই তিন দিন পরেই ব্রজের বনপরিক্রমা আরম্ভ হয়। সাধুমণ্ডলীর নেতৃস্বরূপে ব্রজের মহন্তকে সঙ্গে যাইতে হয় ও সর্ব্বদা সাধুদিগের আহারের ব্যবস্থা, আহার্য্য সামগ্রী বণ্টন, সর্ব্ববিষয়ে

নির্দ্দেশদান, বিবাদ নিষ্পত্তি প্রভৃতি নেতার কার্য্য করিতে হয়। ঝুলন পূর্ণিমার পরের অষ্টমীই জন্মাষ্টমী, সুতরাং এই সময়ে পরিক্রমার অতি অল্প সময়ই বাকী ছিল। এরূপ অবস্থায় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজী আসিয়া মহন্তাই ত্যাগের ইচ্ছা জানাইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অগত্যা বলিলেন, "পরিক্রমার আর মাত্র ১৩।১৪ দিন বাকী আছে, এই পরিক্রমা আপনি চালাইয়া আসুন, পরে যদি আপনি একান্তই মহন্তাই না রাখেন, তবে অন্য কোনপ্রকার বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিব।" শ্রীযুক্ত জয়রামদাসজী নামক তাঁহাদের এক অল্পবয়স্ক গুরুভাই ছিলেন। শ্রীযুক্ত দাদাগুরুজী মহারাজের দেহান্তের পর কোন কারণে আশ্রমে থাকিতে না পারিয়া তিনি গিয়া অন্যত্র ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মনে করিলেন, তাঁহাকেই সংবাদ দিয়া আনাইয়া মহন্তপদে অভিষিক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। এই মহন্তপদ আমাদেরই ঘরে গুরুপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাঁহাকে মহন্ত করিতে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি শ্রীযুক্ত বিষ্ণু-দাসজীকে বিশেষ অনুনয় পূর্ব্বক নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন। তিনিও তখনকার মত আর বিশেষ জিদ না করিয়া পরে এই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবেন বলিয়া স্বস্থানে * চলিয়া গেলেন। পরদিবস তিনি নিজে আর না আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে চিঠি দ্বারা জানাইলেন যে তিনি মহন্তপদ নিশ্চিতই ছাড়িলেন, উপরন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে মহন্তাই লইতে অনুরোধ জানাইলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মনে করিলেন যে, বৃন্দাবনে যে সকল মহন্ত আছেন তাঁহাদিগকে মিলিত করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা শ্রীযুক্ত

* অর্থাৎ "পুরাণা আস্থানে"। এইখানে তিনি তখন সেবাইত মহন্ত ছিলেন, এখনও আছেন।

বিষ্ণুদাসজীকে এই বৎসর পরিক্রমা চালাইতে এবং একেবারে হঠাৎ মহন্তপদ পরিত্যাগ না করিতে অনুরোধ করাইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া একদিন বৃন্দাবনের সমস্ত মহন্তকে নূতন আশ্রমে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। এই সময়ে "শ্রী" সম্প্রদায়ের প্রধান মহন্ত শ্রীমৎ স্বামী ভবতদাসজী মহারাজও ঘটনাক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকেও আহ্বান করিলেন।

ঝুলন পূর্ণিমার পরদিন এই পঙ্গত হইবার কথা ছিল। পূর্ণিমার দিন রাত্রে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের গুরুদেব তাঁহাকে দর্শন দিলেন। অতি প্রসন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া প্রথমতঃ "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" গীতার এই শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারণ করিলেন এবং এই ভাব তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন যে, "যাহা কিছু করিবে তাহা তুমি নিজে করিতেছ ইহা মনে করিও না ; তোমার সকল কার্য্যের ভারই আমার উপর জানিবে।" অনন্তর কিয়ৎক্ষণ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই ঘটনাকে প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি তাঁহার গুরুদেবের সর্ব্বদা সস্নেহ দৃষ্টি, মনোযোগ ও প্রেমেরই পরিচায়ক মনে করিয়া আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ তাঁহার জীবনে কিছু বিরল ঘটনা ছিল না। পরদিন প্রভাতেই আশ্রমে মহন্তগণকে নিমন্ত্রণ করা উপলক্ষে এক অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহার গুরুদেবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল।

সহর হইতে আমাদের নূতন আশ্রমে আসিতে হইলে পুরাতন আশ্রমের দরজার সম্মুখ দিয়াই আসিতে হয়। হয়ত এই কারণেই, অথবা যেজন্যই হউক, পরদিন এখানে আসিবার পথে মহন্তগণ প্রথমে পুরাতন আশ্রমে একত্রিত হইলেন ও নানা আলাপাদি করিতে লাগিলেন।

মহন্তাইয়ের প্রসঙ্গও উঠিল ও তদ্বিষয়েই প্রধানতঃ আলোচনা হইল। এদিকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সমস্ত আয়োজন করিয়া তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে করিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেলে কথঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এই সময় জনৈক সাধু পুরাতন আশ্রম হইতে নূতন আশ্রমে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলেন "মহন্তগণ পুরাতন আশ্রমে আসিয়া বসিয়া আছেন, আপনাকে তথায় যাইতে তাঁহারা আহ্বান করিয়াছেন।" একথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ পুরাতন আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, মহন্তদের প্রায় সকলেই সেইখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অপরিচিত একজন সাধু বলিয়া উঠিলেন "যহ্ তো বহুত আচ্ছা দর্শনী মূর্ত্তি হ্যায়, যহ্ সব্ তরেসে মহন্ত হোনেকী লায়েক হ্যায়।" (ইঁহার ত অতি সুন্দর চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি, মহন্ত হইতে ইনিই ত সব চেয়ে উপযুক্ত।) সকলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে তাঁহাদের সঙ্গে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি যেমন সকলকে দণ্ডবৎ করিয়া বসিলেন, তখনই পূর্ব্বোক্ত সাধুটি বলিলেন যে, তাঁহাকেই মহন্ত করিবেন এইরূপ তাঁহারা সকলে স্থির করিয়াছেন। তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম বদলান হয় নাই ও তিনি যথাবিধি বৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ করেন নাই সত্য; কিন্তু তাহাতে বাধা হইবে না। তাঁহারা সকলে একত্রিতভাবে তাঁহাকে এখনই সাম্প্রদায়িক নিয়মানুসারে সন্ন্যাস দিবেন এবং এখন হইতে তাঁহার নাম "সন্তদাস" হইবে। সকল সন্ত মহন্ত মিলিয়া তাঁহাকে বৈরাগ আশ্রম প্রদানপূর্ব্বক এই নাম দিতেছেন, এই জন্য "সন্তদাস" নাম হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের একজন গুরুভ্রাতা তখনই দ্রুতপদে গিয়া নূতন কৌপীন ও নূতন বস্ত্র লইয়া আসিলেন এবং সমবেত সাধুমণ্ডলীর অনুমতি ও

অভিপ্রায় অনুসারে তিনিও তাহা ধারণ করিলেন। অতঃপর সকলে একমত হইয়া তাঁহারা পরম সমাদরে তাঁহার গলায় মহন্তাইএর মালা ও চাদর পরাইয়া দিলেন।

সমবেত মহন্তগণ ও সাধুমণ্ডলী যখন তাঁহাকে মহন্তপদ দিবার প্রস্তাব করেন, তখন গত রাত্রির ঘটনা ও দর্শকালে পূর্ব্বে "মহন্তাই ভি মিলেগা" বলিয়া তাঁহার গুরুদেব যে তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন এই উভয়ই যুগপৎ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে রোমাঞ্চিত ও অভিভূত করিয়া তুলিল। তিনি বাঙ্গালী,* তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, স্ত্রীও সঙ্গে রহিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় যে বৃন্দাবনের প্রাচীন সাধু মহন্তগণ একমত হইয়া তাঁহাকে ব্রজবিদেহী মহন্তপদ অর্পণের প্রস্তাব করিবেন, ইহা কল্পনাও করা যায় না। বাস্তবিকই ইহা একান্ত অলৌকিক, স্বপ্নাতীত ব্যাপার, এবং সমস্তই অসীম শক্তিমান্ পরমাত্ম-স্বরূপ তাঁহার গুরুদেবেরই লীলা, সমস্তই পরমাত্মরূপী গুরুদেব করিতে-ছেন ও করিবেন, তাঁহার নিজের কিছুই করিবার অথবা ভাবিবার আবশ্যক নাই, এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার এই মহন্তপদ গ্রহণ করাই শ্রীগুরুদেবের অভিপ্রায়, এবং এই জন্যই যে পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি দর্শন দিয়াছিলেন ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া সাধুমণ্ডলীর প্রস্তাবে বা কোন কথায় তিনি দ্বিরুক্তিমাত্র করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সমস্ত সাধু ও মহন্তগণ তাঁহার সহিত নূতন আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সকলে একত্রে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রজপরিক্রমায় তাঁহাকে যাইতে হইল। তজ্জন্য কোন যোগাড়ই তাঁহার ছিল না। পথে কোথাও উপযুক্ত পরিমাণ

* বাঙ্গালী হওয়াতে কি অসুবিধা তাহা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয়াধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মাণ ভেট না পাওয়া গেলে সঙ্গীয় সাধুগণের ভোজনের ব্যবস্থা মহন্তকেই করিতে হয়, তাহাতে অর্থের আবশ্যক। এই অর্থ অথবা অপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিছুই তাঁহার সংগ্রহ ছিল না। কিন্তু সময়মত আপনা হইতেই সমস্ত আসিয়া গেল। পণ্ডিত কিশোরদাসজীর চেলারা তাঁহার মহন্ত-স্বরূপে ভেট পূজা লওয়া বিষয়ে কোন আপত্তি করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজে স্বতন্ত্র ভেট পাইবার অধিকারী বলিয়া দাবী করিতে লাগিলেন এবং এজন্য কোন কোন স্থানে বিরোধও উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু ভগবৎকৃপায় একপ্রকার সুশৃঙ্খলার সহিতই পরিক্রমা সম্পূর্ণ হইল।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর সস্ত্রীক বাস করা সাধুদিগের নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া অতঃপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে কাশীর বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। এই বাড়ী ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার নামে এক দানপত্র সম্পাদন করিয়া তাঁহাকেই দিয়াছিলেন। বাড়ীটি তিনতলা ও বেশ বড়, ইহা দুইটি অংশে বিভক্ত: বড় অংশটি ভাড়া দিবার জন্য ও ছোট অংশ নিজেরা থাকিবার জন্য। ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের কয়েক-জন আত্মীয়া দেশ হইতে আসিয়া শেষ জীবনে কাশীবাস করিতেছিলেন। তাঁহারা এইখানেই থাকিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বৃন্দাবন হইতে আসিয়া ইঁহাদের সহিতই বাস করিতে লাগিলেন *। প্রথমতঃ

* শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এক বৃদ্ধা দিদিমা ছিলেন—তাঁহার বিমাতার মাতা, শ্রীযুক্ত অন্নদাকিশোর, হেমকিশোর ও ৺তরণীকিশোর চৌধুরী মহাশয়গণের মাতামহী। কাশীতে এই ১৬৮নং ডাউজকটরার বাড়ী ক্রয় করিবার পর হইতেই ইনি, তাঁহার আপন মাতুলানী, দূরসম্পর্কীয়া মামাতভগিনী জগতী দেবী ও ঝি শুক্রার মা এই বাড়ীতে থাকিতেন। ঝির ছেলেটিও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত। বাবাজী মহারাজ সংসার ছাড়িয়া যখন বৃন্দাবন যান, সেই সময় তাঁহার মাতুলানীও তাঁহাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলেন। অতঃপর

বাড়ীভাড়ার উপর নির্ভর করিয়াই খরচ চলিত, পরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে শিষ্যেরা কেহ কেহ সাহায্য করিতেন।

অতঃপর ১৩২৭ সালে নাসিক কুম্ভমেলার * সময় উপস্থিত হইল। আষাঢ় সংক্রান্তি হইতে শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়া গোদাবরী তীরে এই মেলা

বাবাজী মহারাজ বৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ করিলে তাঁহার মাতুলানী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কাশীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন ও সকলে একত্রে এইখানে বাস করিতে লাগিলেন।

অতঃপর এইরূপে বহু বৎসর পর্যন্ত মাতাঠাকুরাণী এই বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। বহু পূর্ব্বেই তিনি পিত্তশূল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তদবধি তাঁহার পেটের পীড়া আর ভাল করিয়া সারে নাই ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য অসুখও ছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হইতে দূরে থাকিতে হওয়ায় তিনি মনে কষ্টও পাইয়াছিলেন। এইরূপে রুগ্নদেহ ও ভগ্ন মন লইয়া কয়েক বৎসর এখানে বাস করিবার পর ১৩৩৬ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শরীর বিশেষরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িল। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ভক্তশিষ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বসু মহাশয়দ্বয় তাঁহাকে হাওড়া শিবপুরে নিজেদের বাটীতে আনিয়া বিশেষরূপ চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করেন। এইখানেই ৭ই আষাঢ়, শুক্রবার স্নানযাত্রা পূর্ণিমা তিথিতে ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার দেহান্ত হয়।

* ভারতবর্ষে চারিটি স্থানে পূর্ণকুম্ভমেলা হয়—প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী এবং হরিদ্বার; ইহার সময়ও নির্দ্দিষ্ট আছে। যে বৎসর প্রয়াগরাজে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে চড়ার উপর মাঘমাসে কুম্ভমেলা হয়, তাহার তিন বৎসর পরে শ্রাবণ মাসে নাসিকে গোদাবরীতীরে, তৎপর বৎসরই উজ্জয়িনীনগরে সিপ্রাতীরে বৈশাখ মাসে এই মেলা হয়। ইহার পাঁচবৎসর পরে মাঘমাসের শেষভাগ হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে বৈষ্ণবসম্প্রদায়স্থ সমস্ত সাধুমণ্ডলী একত্রিত হন, চৈত্রের প্রথমে এখান হইতে উঠিয়া হরিদ্বারে যান এবং তথায় গঙ্গাতীরে চৈত্রের শেষ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত পূর্ণকুম্ভমেলা হয়। ইহার তিন বৎসর পরে পুনরায় প্রয়াগে মেলা হয়। প্রত্যেক পূর্ণ কুম্ভমেলায় সাধু, সন্ন্যাসী, উদাসী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই একত্রিত হন।

অনুষ্ঠিত হয়। এই কুম্ভমেলায় যাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা ও সাধুসেবার বন্দোবস্ত করিয়া কয়েকজন সাধু সমভিব্যাহারে ২২শে আষাঢ় (ইং ১৯২০, ৭ই জুলাই) তিনি নাসিক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে স্থাপন করিয়া এবং নিজের আসন লাগাইয়া ঠিক আশ্রমের মতই ঠাকুরজীর সেবা চালাইতে থাকিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মহন্তই আসিয়া নিজ নিজ ঠাকুরজীকে স্থাপন করিলেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সাধুগণই এই সময় কুম্ভমেলায় উপস্থিত হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহাদের কর্তব্যাকর্তব্য নির্দ্ধারণ করেন।

ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী চারিসম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে ১। নিম্বার্ক, ২। শ্রী, [ইহার দুই শাখা, (ক) রামানুজী ও (খ) রামানন্দী], ৩। বিষ্ণুস্বামী, ৪। মাধ্বি। চারি সম্প্রদায়ের চারি জন প্রধান মহন্ত আছেন। এই চারিজনের দ্বারাই সমস্ত বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইয়া থাকে। কোথায় কি নিয়ম-বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয়েরও বিচার ইঁহারাই করেন। এই চারিসম্প্রদায়ের চারিজন প্রধান আচার্য্য মহন্তের মধ্যে ব্রজবিদেহী মহন্ত অন্যতম।

আবার এই চারিজন মহন্তের মধ্যেও একজন নেতৃস্বরূপে বৃত হইয়া থাকেন। অনুপযুক্ত না হইলে চিরাচরিত প্রথানুসারে ব্রজবিদেহী মহন্তই এই অতিশয় সম্মানের পদ প্রাপ্ত হন। এবারে ব্রজবিদেহী মহন্ত স্বরূপে উপস্থিত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে এই নাসিক কুম্ভ-মেলায় ভারতবর্ষের চারিসম্প্রদায়ের ছোট বড় সমস্ত মহন্ত ও সাধুগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একত্রিতভাবে উচ্চ আসনে বসাইয়া, চাদর উড়াইয়া ও মালা গলায় দিয়া চারিসম্প্রদায়ের প্রধান মহন্তপদে অভিষিক্ত করিলেন।

কোন কুম্ভমেলায় একত্রিত সাধুসকল যখন এই মহন্তপদ অর্পণ করেন, তখন কুম্ভমেলাস্থ সমস্ত সাধুকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিতে হয়, মহন্তদিগকে যথাযোগ্য ভেটও দিতে হয়। তদনুসারে বাবাজী মহারাজও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া সমস্ত সাধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং মহন্তগণকে যথাযোগ্য টাকা ভেটও দিলেন। সকলে খুব পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করিলেন এবং তাঁহার জয়জয়কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্থসংগ্রহ ছিল না, কিন্তু এই বিরাট ব্যাপারের ব্যয়সংকুলানের উপযুক্ত অর্থ শ্রীশ্রীঠাকুরজীর কৃপায় সময়মত অভাবনীয়ভাবে আসিয়া গেল।

মেলা অন্তে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

অনন্তর জন্মাষ্টমীর দুই দিন পরে দশমীর দিন বৈকালে যথানিয়মে ব্রজপরিক্রমায় যাত্রা করিলেন। পরিক্রমা খুব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। পরিক্রমা সম্পূর্ণ করিয়া আশ্রমে ফিরিবার সময় তাঁহার সঙ্গে অনেক সাধুও আশ্রমে আসিলেন। তিনিও প্রীতির সহিত তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। তদবধি অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে সাধুগণ আশ্রমে রহিয়া গেলেন, কেহ কেহ কয়েকদিন থাকিয়া স্থানান্তরে গেলেন আবার অপর কয়েক 'মূর্ত্তি' * অতিথিরূপে আসিয়া তাঁহাদের স্থান পূরণ করিলেন এইরূপ ঘটিতে লাগিল। সাধুরা সাধারণতঃ একস্থানে দীর্ঘকাল থাকেন না। সুতরাং ক্রমশঃ এই সাধুদের প্রমুখাৎ শুনিতে শুনিতে সর্ব্বত্র সাধুদের মধ্যে আশ্রমের সাধুসেবার সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল ও ইহার ফলে আশ্রমে সাধুসমাগম হইতে লাগিল। কেবল আশ্রম-

* সাধুদিগের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত। "পাঁচ মূর্ত্তি আসিয়াছেন", "তিন মূর্ত্তি সাধু চলিয়া গেলেন" এইরূপ ভাষা ব্যবহার হয়। পাঁচজন, দশজন এরূপ বলে না।



বাসীবাই আছেন, অভ্যাগত সাধু কেহ নাই, এরূপ আর হইল না। এই সময় আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ও সাধুদিগের সেবার কার্য্য করিবার লোকের অত্যন্ত অভাব ছিল। সুতরাং বাবাজী মহারাজ নিজেই শ্রীশ্রীঠাকুরজীর পূজা আরাত্রিকাদি করিতেন, দূর হইতে জল বহন করিয়া লইয়া আসিতেন, ভোগ রন্ধন করিতেন, ভোগ নিবেদন করিতেন, সাধুদের ভোজন করাইতেন, তৎপর প্রয়োজন মত ডেগ কড়াই ইত্যাদি মাজিতেন, নিজ হস্তে গো-সেবা করিতেন ও গোয়াল পরিষ্কার করিতেন, রোগীদের সেবা ও প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদের মল-মূত্রাদিও পরিষ্কার করিতেন ও ঘর ধুইতেন। তিনি বাসন মাজিতেছেন দেখিয়া ক্রমশঃ কোন কোন সাধু আসিয়া তখন তাঁহার এই কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন, ভাল রসুইয়া সাধুও কখনও কখনও অতিথিস্বরূপে আসিতে লাগিলেন। এইরূপ কেহ আশ্রমে উপস্থিত থাকিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে স্বয়ং রন্ধন করিতে দেখিয়া তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাক করিবার জন্য আসিতেন। এইরূপে সাধুসেবা উত্তমরূপে চলিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন "বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব এবং ভিক্ষান্নের দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিব, এইরূপ মনে করিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন বাস করিতে আসি। পরন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরজীর এমনই কৃপা যে, আমাকে একদিনও ভিক্ষার জন্য বাহির হইতে দিলেন না। আমি বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে থাকিলে কেহ পাঁচ টাকা, কেহ দশ টাকা ইত্যাদি প্রকারে অর্থ পাঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে সাধুসেবার ব্যয় একপ্রকার চলিয়া যাইতে লাগিল এবং সাধু-সমাগম যেমন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, অর্থাগমও সেই পরিমাণ অধিক হইতে লাগিল।

আশ্রমে সাধুসমাগম এক এক সময় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ

ঝুলন যাত্রার সময় শ্রীবৃন্দাবনে ঝুলন উৎসব দর্শনার্থ প্রতি বৎসর বহু সাধু মহাত্মা আগমন করেন ও আমাদের আশ্রমে অবারিত সাধুসেবা প্রবর্তিত থাকায় তাঁহাদের অধিকাংশই এখানে আসিয়া অবস্থান করেন। এই সময়ে দুই তিন শতেরও অধিক মূর্ত্তি আশ্রমে থাকেন। এইরূপ সময়ে সাধুসেবা চালান বহু ব্যয়সাধ্য এবং শারীরিক পরিশ্রমের দিক্ দিয়াও অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। অধিকন্তু আশ্রমটি কোলাহলপূর্ণ হইয়া যায়।

দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রমে যখন শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন আমাদিগের ন্যায় সাধারণ লোকের (বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শরীর অপটু বলিয়া) সেবার কর্ম্মে প্রীতি ও উৎসাহ তিরোহিত হয়, কেবল গুরুবাক্য পালনার্থ বাধ্য হইয়া করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় সহজেই মনে হয় এই সাধুসেবা না থাকিলেই বেশ হইত। অনেক সময় দেখা যায়, আমরা যাহা চাই, তদনুকূল যুক্তি সকলও মনে আপনা হইতে উপস্থিত হয়। অনেকটা এইরূপেই আমাদের একবার মনে হইল "আমরা গুরুকৃপা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া তপস্যা করিব মনে করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, অথচ আশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রতিকূল। সাধুসেবার জন্যই আমাদের ভজনের বিঘ্ন হইতেছে, সর্ব্বদা নানা কাজ, তদুপরি কলরব, ধ্যান জপের সময়ও নাই, সুযোগও নাই। এইরূপভাবে জীবন কাটাইবার জন্যই কি পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া আসিয়াছি ?" শ্রীভগবানের কি আশ্চর্য্য কৃপা (কৃপা কেন বলিলাম, তাহা কিছু পরেই পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিবেন), এইরূপ চিন্তা একই সময়ে কয়েকজন সাধু গুরুভ্রাতার মনে উদিত হইয়াছিল, পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে তাহা প্রকাশ পাইল। তখন আমরা পরামর্শ করিয়া একত্রে কোন নির্জ্জন সময়ে

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলাম, "বাবা, এই সাধুসেবায় আমাদের ভজন সাধনের বিষয়ে অত্যন্ত বিঘ্ন হইতেছে। অধিকাংশ সময় তাঁহাদের সেবার কাজেই আমাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। ভজনের সময়ই পাই না। আর যখন একটু ভজনের সময় পাই, তখনও বহু সাধু সমাবেশের জন্য যে একটা গোলমাল সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে তজ্জন্য ভজনে মন বসে না। আপনার এই বিষয়ে একটু দৃষ্টি দিতে হইবে।" তখন তিনি বলিলেন "বাবা, আমি কোন সাধুকে ত ডাকিয়া আনি নাই। তাঁহারা নিজেরাই আসিতেছেন, এবং তাঁহাদের ভাগ্যে তাঁহাদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থও আপনিই আসিয়া পড়িতেছে। তোমরা ইচ্ছা করিলে জমা খরচের খাতা আনিয়া দেখিতে পার।" তখন আমরা খাতা আনিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই যে মাসে যত খরচ হইয়াছে সে মাসে সেই পরিমাণ টাকাও অযাচিত ভাবে বাহির হইতে লোকে পাঠাইয়াছেন। যে মাসে কম সাধু আসিয়াছেন, সেই মাসে টাকাও কম আসিয়াছে, যে মাসে বেশী সাধু আসিয়াছেন, সেই মাসে অর্থ বেশী আসিয়াছে। কোন মাসে কিছু বেশীও আসিয়াছে, কোন মাসে কিছু কমও আসিয়াছে দেখা গেল বটে; কিন্তু এই বেশী কম মিলিয়া ঠিক সাধু সেবার ব্যয় নিয়মিতরূপে চলিয়া যাইতেছে। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "এখন বুঝিতেছ ত এই সব অর্থ সাধুদেরই ভাগ্যে আসিতেছে। আমরা তাঁহাদের সেবা করি ইহাই ভগবদিচ্ছা, নচেৎ ঠিক্ তাঁহাদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ আপনা হইতে আসিত না। কেবল আমাদের উপযোগী ব্যবস্থাই ভগবান্ করিতেন। এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা তোমাদের বলিতেছি, শুন। ধীরমদাসজী নামে এক মহাত্মা ছিলেন। তিনি একজন বড় মহন্তও ছিলেন— ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বৃহৎ সাধু জমাত লইয়া পর্য্যটন করিতেন।

সাধুদের মধ্যে তাঁহার খুব নাম ছিল। তিনি যেখানে যাইতেন, প্রায় সর্ব্বত্রই শেঠগণ অথবা গ্রামবাসিগণ সাধুদের ভোজনের নিমিত্ত ভাল ভাল জিনিষ দিত। লাড্ডু, কচুরী, পুরী, ক্ষীর (পায়স) ইত্যাদি প্রায় প্রত্যহই হইত। যেদিন তাহা না হইত, সেইদিন অন্ততঃ রুটির নিমিত্ত আটা, ডাল, ঘি, তরকারী ইত্যাদি দ্রব্য পাইতেনই, কোন দিনই সাধুগণের ভোজনের অভাব হইত না। ইহা দেখিয়া প্রায় সকলেই বলিতেন "ইনি এত সাধুকে প্রত্যহ সর্ব্বত্রই খুব উত্তমরূপে ভোজন দিতেছেন, অতএব ইঁহাকে খুব ভাগ্যবান বলিতে হইবে। এই মহন্তজীর ভাগ্যেই এই সব উত্তম উত্তম আহার্য্য বস্তু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।" এই সমস্ত কথা অধিকাংশ লোকের মুখে শুনিতে শুনিতে মহন্তজীর একদিন মনে হইল, আচ্ছা, প্রায় সকলেই যে বলিতেছেন, আমারই ভাগ্যে এই সমস্ত জিনিষ আসিতেছে, ইহা সত্য কিনা একবার পরীক্ষা করিতে হইবে। একদিন পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন স্থির করিয়া সাধু জমাত একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময় জমাতের সমস্ত সাধুকে বলিয়া দিলেন, 'আপনারা অমুক গ্রামে পৌছিয়া যথাস্থানে আপন আপন আসন লাগাইবেন এবং ভোজনের জিনিষ পত্র কোন ভক্ত আনিয়া দিলে তাহার দ্বারা রসুই করিয়া আপনারা যথাসময়ে ভোজন করিবেন, আমার আজ অন্যত্র কিছুসময় থাকিতে হইবে, সুতরাং জমাতে পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইবে, এমন কি সন্ধ্যাও হইয়া যাইতে পারে। আমার জন্য আপনারা অপেক্ষা করিবেন না'। তিনি এইরূপ বলিলে সমস্ত সাধুগণ যাত্রা করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট গ্রামে পৌছিয়া গ্রামের বাহিরে যথাস্থানে আপন আপন আসন স্থাপন করিলেন। মহন্ত শ্রীযুক্ত ধীরম্-দাসজীও তাহার পরে যাত্রা করিয়া সেই গ্রামের নিকট গিয়া গ্রামের যে দিকে জমাত পড়িয়াছে, তাহার বিপরীত দিকে এক বৃক্ষতলে রাস্তার

কিনারে যাহাতে রাস্তার লোকে দেখিতে পায়, এমন জায়গায় আপন আসন লাগাইলেন। তিনি প্রায় সমস্ত দিন বসিয়া রহিলেন, পথচারী লোক সকল তাঁহাকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, কেহই কোন দ্রব্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল না। অবশেষে যখন দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে, তখন একটি লোক তাঁহার ভোজনের জন্য আধসের তিন পোয়া আটা, কিছু ডাল, কিছু লবণ, এবং সামান্য ঘৃত ইত্যাদি আনিয়া দিল। তখন তিনি তাহা লইয়া জমাতে গেলেন। ওদিকে জমাতের সাধুদের ভোজনের জন্য বড় বড় শেঠ প্রচুর পরিমাণে আটা, ঘি, ডাল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি লইয়া আসিয়া মহন্তজীব ছাতার নিকট রাখিয়াছেন, এবং মহন্তজীর জন্য অনেকক্ষণ বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় মহন্তজী তাঁহার ভাগ্যলব্ধ সেই জিনিসগুলি লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে শেঠগণ বলিয়া উঠিলেন 'আপনার জন্যই আমরা এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, আপনি এখন এই সমস্ত জিনিষ লইয়া সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিন'। তখন তিনি তত্রত্য সমস্ত সাধুদিগকে ও অন্যান্য সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দেখুন আপনারা বলিতেন যে, মহন্তজী খুব ভাগ্যবান্, তাঁহার ভাগ্যেই উত্তম উত্তম আহার্য্যবস্তু প্রচুর পরিমাণে প্রতিদিন আসিতেছে, পরন্তু আমার ভাগ্যেই তাহা আসিতেছে কিনা অদ্য আমি তাহা পরীক্ষা করিয়াছি। এই দেখুন আমার ভাগ্যে আধসের তিন পোয়া আটা, এই ডাল, এই লবণ, এবং এই ঘৃতটুকু আসিয়াছে ; আর সমস্ত সাধু মহাত্মাদের ভাগ্যে এই সব উপাদেয় আহার্য্যবস্তু আসিয়াছে'। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া থাকিলেন। তৎপর মহন্তজী সমস্ত সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন এবং সাধুগণও খুব তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন।

এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিলেন—অতএব বাবা, সাধুগণ যেমন কৃপা করিয়া আমাদের আশ্রমে আগমন করিতেছেন, তেমনই তাঁহাদেরই ভাগ্যে তাঁহাদের সেবার জন্য অর্থ আসিয়া যাইতেছে, সাধু সেবা বন্ধ করিয়া দিলে এই অর্থ আসাও একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব ইহা নিশ্চিতরূপে জানিবে যে, আমরা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেছি না, তাঁহাদের ভাগ্যই তাঁহাদিগকে ভোজন দিতেছে।

"আর তোমরা যে বলিয়াছ, সাধুসমাগমের জন্য আশ্রমে অত্যন্ত গোলমাল হয়, ইহার জন্য তোমাদের মন স্থির না হওয়ায় ভজন করিতে পার না, তৎসম্বন্ধে এই বলিতেছি যে, আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছি যে, ভগবানের এবং ভগবৎ ভক্তদিগের সেবা মনুষ্যের পক্ষে পরম কল্যাণকর, সাধক ভক্তি-সহকারে ইহা করিতে থাকিলে সর্ব্বপ্রকার অশুভ দূর হইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারেন। আর তোমরা কোথায় তোমাদের ইচ্ছামত নির্জ্জন স্থান পাইবে? জঙ্গলে গেলেও ঠাকুরজীর ইচ্ছা থাকিলে এইরূপ গোলমাল হইতে পারে। এই সম্বন্ধেও তোমাদিগকে আমাদেরই এক পূর্ব্ব আচার্য্য ও তৎশিষ্যগণ সম্পর্কীয় একটি ঘটনা বলিতেছি, শুন।

"সেই আচার্য্যদেবের অনেকগুলি সাধুশিষ্য ছিলেন। তাঁহার রাজা, মহারাজা প্রভৃতি অনেক গৃহস্থ শিষ্যও হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক সময়ে শ্রীগুরুদেবের আশ্রমকে সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়া গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তিনিও তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া স্বীকৃত হইলেন। তদনুসারে সেই শিষ্যগণ আশ্রমে ইষ্টকাদি দ্বারা খুব ভাল ভাল ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার অনুমতি লইয়া আশ্রমে ঠাকুরজীর ও তদ্ভক্তদের এবং অন্যান্য অতিথিদের সেবারও বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাতে বহু সাধু ও অতিথি আগমন

করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের নিয়মিতরূপে সেবা আরম্ভ হইয়া গেল। তাঁহার সাধু শিষ্যগণকে সেই সেবায় অনেক সময়ই নিযুক্ত থাকিতে হইত। অধিকন্তু আশ্রমে বহু জনসমাগমে সর্ব্বদা গোলমাল থাকিত, এই জন্য শিষ্যগণ ভালরূপ ভজনও করিতে পারিতেন না। একদিন শিষ্যগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন যে, আজ গুরুদেবকে গিয়া আমাদের ভজন বিষয়ে অসুবিধার কথা জানাইয়া যাহাতে নির্জ্জনে গিয়া ভজন করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। অনন্তর তাহারা মিলিত-ভাবে শ্রীগুরুদেবের নিকট গেলেন এবং বলিলেন 'মহারাজজী! হাম সব সংসার ছোড়কে আয়ে হ্যায় যহাঁভি প্রপঞ্চ লাগায় দিয়া, যহাঁ ভজন বিল্‌কুল নহি বন্তা হ্যায়, ভজন জঙ্গলমেহি বন সক্‌তা হ্যায়, অতঃইস্ প্রপঞ্চ কো ছোড়্‌কর্ জঙ্গল মে যানাহি উচিত হ্যায়।' তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন 'মৈঁ তো ইচ্ছা করকে কুছ ভি নহি লে আতা হুঁ, সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ * কো য্যাসী ইচ্ছা হ্যায়্ তো ক্যা করুঁ'। গুরুদেবের এই বাক্যেও শিষ্যগণের মন মানিল না, তখন গুরুদেব তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন 'আচ্ছা বাবা! তুম্ সবকো জঙ্গল মে ভজন করনে কী ইচ্ছা হ্যায়, তো চলো।' এই বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্‌কে লইয়া আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনেক দূরে স্থিত এক নিবিড় দুর্গম পার্ব্বত্য জঙ্গলে গিয়া একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া নিজ নিজ আসন লাগাইলেন এবং

* আমাদের সম্প্রদায়ের (শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের) আদি আচার্য্য কর্ত্তৃক পূজিত অতি ক্ষুদ্রাকার একটি শালগ্রাম। ইনি পরম্পরাক্রমে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে এই শালগ্রামটি কিষণগড় ষ্টেটের অন্তর্গত সালিমাবাদ নামক স্থানের আশ্রমে আছেন। এই আশ্রমেই আমাদের আচার্য্যদের গদী আছে।

সর্ব্বেশ্বর ভগবান্‌কেও নিয়মিতরূপে স্থাপন করিলেন। সেখান হইতে জনপদসমূহ বহুদূরে অবস্থিত।

"শিষ্যগণ মনে করিয়াছিলেন, গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিবেন এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বেশ্বর ভগবানের ভোগ লাগাইয়া নিজেরা তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। এদিকে সেই সময় এক রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া সেই জঙ্গলে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। মৃগয়াকালে একটি হরিণ সেই সাধুদের আসনের দিকে পলায়ন করে এবং রাজাও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়েন। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখেন, কয়েকজন সাধু এই গভীর অরণ্যে নিশ্চিন্ত মনে ভজন করিতেছেন। গুরুদেবের দীর্ঘ জটাজুট ও মনোহর কান্তি বিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজা আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন 'প্রভো! আপনি শিষ্যগণসহ এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ভজনে রত রহিয়াছেন, নিকটে কোন গ্রামও নাই, এই অবস্থায় আপনাদের কেমন করিয়া আহার্য্য বস্তু সংগৃহীত হইতেছে?' তাহাতে তিনি বলিলেন 'আমরা মনে করিয়াছি, দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেই ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সর্ব্বেশ্বর ভগবানের ভোগ লাগাইয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিব।' তখন রাজা বলিলেন, 'আমি আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি যদি কৃপা করিয়া গ্রহণ করেন, তবে কৃতার্থ হইব।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমি এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারিব না। আমার শিষ্যগণের নিকট গিয়া বল, তাহারা যদি স্বীকৃত হয়, তবে আমার কোন আপত্তি নাই।' তখন রাজা শিষ্যদিগের নিকট গিয়া খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার কাতরতা দেখিয়া শিষ্যগণের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল এবং তাঁহারা সেবা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। ইত্যবসরে রাজার পরিচরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজার আদেশে তৎকালে তাহাদের সঙ্গে যে খাদ্যসম্ভার

ছিল, তৎসমস্তই সাধুদিগকে অর্পণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের অনুমতি লইয়া রাজা সর্ব্বেশ্বর ভগবানের জন্য মন্দির এবং কয়েক-খানি ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং সর্ব্বেশ্বর ভগবানের রীতিমত ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতঃপর বহুলোক দর্শন করিতে আসিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বহু সাধু মহাত্মা ও অন্যান্য লোক অতিথি-স্বরূপে আসিতে লাগিলেন, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শিষ্যগণ তাঁহাদের সেবা করিতে বাধ্য হইলেন। * তখন গুরুমহারাজ বলিলেন, 'আব্ ত তুম্ সব ভজনকে লিয়ে জঙ্গলমে আয়া, লেকিন হিঁয়া ভী তো প্রপঞ্চ লাগ গিয়া, আব্ কাঁহা যাওগে বাতাও' (এখনত তোমরা ভজন করিবার নিমিত্ত নিবিড় জঙ্গলে আসিয়াছ, কিন্তু এখানেও ত সেই প্রপঞ্চ আসিয়া গেল। এখন কোথায় যাইবে বল।) তখন শিষ্যগণ বলিলেন, 'মহারাজ! আপনার লীলা কে বুঝিবে? আমরা অজ্ঞান, সেই জন্যই সাধুসেবায় আপত্তি করিয়া আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জঙ্গলে আনিয়া আপনাকে ক্লেশ দিয়াছি। আপনার তপস্যা প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া যে রাজা, মহারাজ এবং জনসমাজ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। মনে করিতাম জনাকীর্ণ স্থানে আশ্রম বলিয়াই এইরূপ লোকজন আসিতেছেন, এখন সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং সাধুসেবা প্রভৃতি আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন।' তখন গুরুদেব বলিলেন, 'বাবা, তোমাদের অপরাধ কিছু হয় নাই, তবে তোমাদের মনে সংশয় ছিল, সেই সংশয় অপনোদন করিবার জন্যই আমি তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তোমাদের ইচ্ছামত জঙ্গলে আসিয়াছি। এখন তোমাদের সংশয় মিটিয়াছে। অতএব অদ্যাবধি সর্ব্বান্তঃকরণে সাধু মহাপুরুষদের সেবা করিতে থাক। ইহা দ্বারা তোমাদের পরমকল্যাণ হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিবে।' "

এই ঘটনা বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বাবা, তোমরা ইহা নিশ্চিতরূপে জানিবে যে, বহু সৌভাগ্যবলে তোমরা এই সাধুসেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছ। ভগবৎসেবা ও সাধুসেবার দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকিলে পরে ভজন সাধনে প্রকৃত অধিকার আপনা হইতে জন্মে। সেবা ছাড়িয়া কেবলমাত্র ভজনে বসিলেই এখন তোমরা চিত্ত স্থির করিতে পারিবে না; সুতরাং যতটুকু সময় পাও উপদেশানুসারে ভজন কর। প্রসন্নচিত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ও সাধুমহাত্মাদিগের সেবা করিয়া যাও, তাহাতেই তোমরা যথার্থ কল্যাণলাভ করিবে। শ্রীগুরুতে যখন আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তখন নিজে কিছু বিচার না করিয়া ও সর্ব্বপ্রকার সাধনাভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া যাওয়াই তোমাদের কর্ত্তব্য।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমাদের সংশয় দূরীভূত হইল এবং প্রসন্নচিত্তে তাঁহার আদেশ পালনে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবার মাহাত্ম্যে তিনি চিরদিনই পরম আস্থাবান ছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই অতিশয় প্রীতি ও নিষ্ঠার সহিত গৃহস্থাশ্রমেও সাধুসেবা করিতেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এখন আশ্রমে সাধু সেবার এইরূপ সুযোগ সংঘটিত হওয়াতে তিনি পরমানন্দিত হইলেন এবং নিরতিশয় প্রীতি ও নিষ্ঠাসহকারে আশ্রমে উপস্থিত সাধুবৃন্দের সর্ব্বপ্রকার সেবা করিতে লাগিলেন। অর্থের কোন প্রকার সংস্থানই তাঁহার ছিল না। তথাপি শ্রীভগবদিচ্ছাবোধে অবারিত সাধুসেবার নিয়ম আশ্রমে প্রবর্ত্তিত করিলেন।

এইরূপে তাঁহার প্রতি তাঁহার গুরুদেবের সকল বর সফল হইল ও সমস্ত ভবিষ্যদুক্তি পূর্ণ হইল।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

তীর্থ ভ্রমণ ও দীক্ষাদান আরম্ভ

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ১৩২৭, ২৮ ও ২৯ সালে ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন। এই তীর্থভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে একটি কথা প্রারম্ভেই বলা আবশ্যক। তাঁহার তীর্থভ্রমণের সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা জানিতে পারি নাই, কারণ ইহা কোথাও লিপিবদ্ধ নাই। অনুসন্ধানফলে তাঁহার তৎকালীন ভ্রমণসঙ্গিগণের প্রমুখাৎ যাহা জানা গিয়াছে, তাহাই প্রধানতঃ এবিষয়ে আমাদের অবলম্বন। পরন্তু ভ্রমণ-কাহিনীতে স্বভাবতঃই বিশেষ বিশেষ স্থানসম্পর্কিত নানা তথ্যের উল্লেখ থাকে বলিয়া ইহা দীর্ঘ হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। যে বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত করিলে গ্রন্থ বহু-বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ এই সকল বর্ণনা সুখপাঠ্য এবং উপকারী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনীর অঙ্গ নহে, ভ্রমণবৃত্তান্তরূপে পৃথক্ গ্রন্থের বিষয় হইবার যোগ্য। অতএব তাঁহার জীবনের এই তিন বৎসরের ঘটনাবলী (যাহা প্রধানতঃ তীর্থ-ভ্রমণকাহিনী) আমরা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে মুরলীদাসজী, দ্বারকাদাসজী প্রভৃতি কয়েকজন সাধু গুরুভ্রাতা সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উত্তরাখণ্ডের তীর্থসমূহ দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। এইবারে হরিদ্বার,

হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত পথই পদব্রজে চলিতে হইত, মটরবাসের প্রচলন তখন হয় নাই। চলিবার সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ খুব উৎসাহের সহিত সকলের আগে আগে হাঁটিয়া যাইতেন। মুরলীদাসজী পিছনে পড়িয়া থাকিতেন, এক একদিন তিনি অবসন্ন হইয়া পথে বসিয়া পড়িতেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়া সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করিতেন, কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে গিয়া পৌছিলেও মুরলীদাসজী উপস্থিত হইতেন না। তখন তাঁহার অনুসন্ধানে বাবাজী মহারাজ ফিরিয়া আসিতেন, অনেকদূর আসিয়া দেখিতেন একেবারে অবসন্ন হইয়া মুরলীদাসজী পথিপার্শ্বে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ইনি বলিতেন, "আমি আর চলিতে পারি না, আমার আর ক্ষমতা নাই, আপনারা যান, আমি এখানেই পড়িয়া থাকি।" কিন্তু বরফের মধ্যে পড়িয়া থাকার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু, সুতরাং নানাপ্রকারে বুঝাইয়া হাত ধরিয়া তিনি ইঁহাকে লইয়া যাইতেন। এইরূপ প্রায়ই ঘটিত, কিন্তু বাবাজী মহারাজ একদিনও ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন না, মায়ের মত স্নেহ যত্নে এই সাথীটিকে লইয়া তিনি সমস্ত পথ চলিয়াছেন।

বদরীনারায়ণের বরফাবৃত পথ অতিক্রম করিবার জন্য একপ্রকার দড়ির জুতা সেখানে কিনিতে পাওয়া যায় এবং যাত্রিগণ সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পথে জুতা ব্যবহার করেন নাই, তিনি খালি পায়েই হাঁটিতেন। একবার মাত্র কাপড়ের জুতা পায়ে দিতে তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি, তাহা পরে প্রসঙ্গান্তরে বলিব। কোন প্রকার পাদুকাই তিনি সাধারণতঃ ব্যবহার করিতেন না।

উত্তরাখণ্ড সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, "এই পথটি (অর্থাৎ বদরীনারায়ণের পথ ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহ) দেবভূমি। শুদ্ধচিত্ত হইলে এখানে দেবদর্শন হয়। মলিনচিত্ত বলিয়া সাধারণের দর্শনলাভ হয় না।"

বাস্তবিক এই স্থানের অধিবাসীদের চরিত্র দেখিলে তাহাদের উপর কলির প্রভাব তেমন বিস্তৃত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিকটও একটি ঘটনা শুনিয়াছি। বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে তিনি একটি গ্রামে মেলার ন্যায় বহু জনসমাগম হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, একটি চোর ধরা পড়িয়াছে এবং কথাটি প্রচারিত হওয়ায় চোর কি রকম, তাহাই দেখিবার জন্য এত লোকের সমাবেশ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এইবারকার তীর্থযাত্রার একটি দুর্ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গে উপযুক্ত অর্থ না থাকায় পথে দুধ খাইতে পাইতেন না। গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে দুধই তাঁহার প্রধান আহার ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বদরীনারায়ণের পথে স্নিগ্ধকর পানীয়াদি ব্যবহার বিষয়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে অনেকেরই আমাশয় রোগ হয়। অর্থাভাবে এই সকল করিতে না পারায়, কঠোর পরিশ্রমে ও দুঃসহ শীতের প্রকোপ বশতঃ পথে তিনি কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই আমাশয়ে ভুগিতে ভুগিতেই পথের সমস্ত তীর্থ নিয়মিতরূপে দর্শন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমে ফিরিবার পর আমাশয় অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অনেক চিকিৎসায় রোগ আপাততঃ প্রশমিত হইল বটে কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল হইল না। অতঃপর কোনদিনই ইহা একেবারে সারে নাই, শেষ পর্য্যন্ত ইহা মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়া শরীরকে ক্লেশ দিয়াছে।

শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইবার অল্পদিন পরেই নাসিক কুম্ভমেলার সময় আসিল। ব্রজবিদেহী মহন্ত স্বরূপে এই মেলায় তাঁহার যাইবার কথা এবং তথায় সর্ব্বদেশীয় বৈষ্ণব সাধুমণ্ডলী কর্তৃক তাঁহার সমগ্র চারি সম্প্রদায়ের প্রধানতম মহন্ত স্বরূপে বৃত হইবার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই নাসিক কুম্ভমেলাস্থলেই তিনি প্রথম দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। একদিন সুচিত্রা দাসী নাম্নী সেই দেশের একটি স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রজবিদেহী মহন্তের নিকট দীক্ষা লওয়াই ইঁহাদের কুলপ্রথা ছিল। অনেক দিন পূর্ব্বেই দীক্ষার জন্য ইঁহার আগ্রহ জন্মিয়াছিল, কিন্তু গরীব বলিয়া এযাবৎ শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া দীক্ষা লইতে পারেন নাই। একান্ত ব্যাকুলভাবে নাসিক কুম্ভমেলার সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সকল কথা বর্ণনা করিয়া কাতরভাবে এই নারী তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন, তিনিও ইঁহার আর্ত্তি ও নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া ইঁহাকে দীক্ষা দেন। অতঃপর নাসিকের কুম্ভমেলা সমাপ্ত হইলে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে বৃন্দাবনবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ঢাকা জিলার শ্রীযুক্ত গুরুচরণ রায় মহাশয়দ্বয় দীক্ষাপ্রার্থী হইলে উভয়কেই সস্ত্রীক দীক্ষা দিলেন। এই সময়ে ব্রজপরিক্রমার কাল উপস্থিত হইল। সুতরাং আশ্রমে পৌছিবার অল্প পরেই পরিক্রমায় যাইতে হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও মহা আনন্দের সহিত পরিক্রমা সম্পন্ন হইয়া গেল। পরিক্রমা সমাপনান্তে আশ্বিন মাসের মধ্যভাগে ফিরিয়া অতঃপর আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মাঘমাসে তাঁহার গুরুদেবের তিরোভাব উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পুনরায় তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। ইহার কয়েকদিন আগে, পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী একটি অতি

সদ্বংশজাত তেজস্বী কিশোর ব্রাহ্মণসন্তান বৈরাগ্যবশতঃ গৃহত্যাগপূর্ব্বক যথার্থ সদ্গুরু সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে সান্তাহার রেলওয়ে ষ্টেশনে কয়েকজন রেলকর্ম্মচারীর নিকটে তাঁহার কথা শুনিয়া কোনক্রমে বৃন্দাবনে তাঁহার চরণপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন আশ্রমে থাকিবার পর উৎসবের ঠিক পূর্ব্বদিনে ইহার দীক্ষা হয়। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইহাকে সন্ন্যাসপ্রদান করেন ও নূতন নাম দেন "অনন্তদাস"। ইনিই তাঁহার প্রথম সাধুশিষ্য। গুজ্জর দেশীয় একটি যুবকও এই সময়ে সাধুশিষ্য হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন (পরে ইহার নিকুঞ্জদাস নাম হইয়াছে) ও আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। উৎসবের কাজ মিটিয়া গেলে আশ্রমের সেবাকার্য্যের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া মাঘমাসের মাঝামাঝি এই দুইজনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তীর্থদর্শনার্থ দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে এই উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরই প্রচুর সমারোহ হয় ও এতদুপলক্ষে স্থানীয় সাধু বৈষ্ণবমণ্ডলী ব্যতীত, দূরস্থিত বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেকে আসিয়া থাকেন। এই বৎসরও এইরূপ অনেকে আসিয়াছিলেন—কাশী হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আসিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গুরুভ্রাতৃবৃন্দ অনেকে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৺জানকীনাথ সামন্ত নামক একজন গুরুভ্রাতা, তাঁহার সঙ্গীয় কয়েকজন স্ত্রীলোক এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এবারকার তীর্থযাত্রায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গী হইলেন। জানকীবাবু ধনীলোক ছিলেন, তিনিই এই তীর্থ যাত্রার সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন।

তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রথমতঃ ভরতপুরে

গেলেন। এই ভরতপুরেই তাঁহার গুরুদেব পরমারাধ্য শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ সয়লানির কুণ্ডা নামক স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন *। এখানে আসিয়া প্রথমেই এই কুণ্ডা দর্শন করিলেন।

এইস্থানে আমাদের সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীযুক্ত নাগাজী মহারাজকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিহারীজীউ নামক বিগ্রহ আছেন। তাঁহারা সকলে এই মূর্ত্তিও দর্শন করিলেন। শ্রীযুক্ত নাগাজীর সম্পূর্ণ নাম শ্রী১০৮ স্বামী চতুরচিন্তামণি নাগাজী মহারাজ। ইনি বর্ত্তমানে আমাদের গুরুপরম্পরাক্রমে চতুর্ব্বিংশতিতম উদ্ধতন পুরুষ। ইহাকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বর্ষাণার নিকটবর্ত্তী কদমখণ্ডীতে দর্শন দিয়া "আধাপুত, আধা দুধে"র বর দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক লিখিত তাঁহার গুরুদেবের জীবন-চরিত গ্রন্থে এই ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। (পৃষ্ঠা ১২০-২৪)

অনন্তর সকলে রাজপুতানার অন্তর্গত করৌলী নামক স্থানে গেলেন। করৌলী রাজ্যের ইহা প্রধান সহর। এখানে পরম মনোহরমূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদনমোহনজীকে দর্শন করিলেন। এই মূর্ত্তি অতি প্রাচীন। কথিত আছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র রাজা এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং ইহার মুখমণ্ডল ও দেহের উর্দ্ধাংশ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ। ইঁহার মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠব এত সুন্দর যে, দেখিলে আপামর সকলেই মুগ্ধ হয়।

* এ সম্বন্ধে কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের স্বরচিত একটি গাথা আছে, তাহা তাঁহার জীবনচরিত গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উল্লেখ করিয়াছেন :—

"রামদাসকো রাম মিলা সয়লানিকি কুণ্ড।
শন্তন্ ত সচ্চিমানে ঝুঁটমানে গুণ্ডা ॥"

(ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ শ্রী১০৮ স্বামী কাঠিয়া বাবাজীর জীবন-চরিত, পৃঃ ৫৪।)

এখান হইতে পথে উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা ক্রমে বোম্বাই আসিয়া পৌছিলেন। বোম্বাই হইতে জাহাজে চড়িয়া দ্বারকায় যাওয়া যায়। তাঁহারাও তাহাই করিলেন। দ্বারকা দুইটি :—গোমতী দ্বারকা ও বেট দ্বারকা। উভয় স্থানেই গিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীদ্বারকানাথকে দর্শন করিলেন। দ্বারকা আমাদের সম্প্রদায়ের মুখ্যধাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পরে এখানে আর একবার আসিয়াছিলেন, তাহা পরে যথাস্থানে উল্লেখ করিব। বেট দ্বারকায় সকলে উভয় বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের ছাপ লইলেন। এখানকার পাণ্ডারা সকল যাত্রীদিগকে এই ছাপ দিয়া দেয়—বাম বাহুমূলে শঙ্খের, দক্ষিণ বাহুমূলে চক্রের, দক্ষিণবাহুর নিম্নভাগে গদার ও বামবাহুর নিম্নাংশে পদ্মের ছাপ দেয়। ছাপ লইবার দুই রকম প্রণালী আছে। লৌহনির্ম্মিত ক্ষুদ্রাকার শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা বাহুতে চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেয়—ইহাকে তপ্তমুদ্রাধারণ বলে, অথবা মাত্র চন্দনের দ্বারা ছাপ দিয়া দেয়। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, এই চিহ্ন যাঁহারা অঙ্গে ধারণ করেন, তাঁহাদের উপর যমদূতের অধিকার থাকে না। তপ্ত মুদ্রাধারণের চিহ্ন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অঙ্গে আমরা অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছি।

দ্বারকা হইতে পোরবন্দর হইয়া জুনাগড়ের পথ দিয়া গিরিনারে গিয়া দত্তাত্রেয়ের পাদপদ্ম দর্শনপূর্ব্বক সকলে প্রভাসে আসিলেন। অনন্তর সিধপুরে কপিলদেবের জন্মস্থান ও আবুপাহাড়ে দত্তাত্রেয়দেবের চরণচিহ্ন দর্শনপূর্ব্বক পুষ্করতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুষ্কর সরোবরে স্নান করিয়া সকলে সাবিত্রী পাহাড়ে চড়িয়া সাবিত্রীদেবী ও ব্রহ্মাজীকে দর্শন করিলেন। এখান হইতে ক্রমশঃ ওঙ্কারনাথ, ত্র্যম্বকেশ্বর ও বেঙ্কট পর্ব্বতস্থিত বালাজীকে দর্শন করিয়া, পথে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী

হইয়া ত্রিচিনাপল্লী রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই রাজ্যে শ্রীরঙ্গম্ প্রধান তীর্থ। এখানে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীকে দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের প্রায় দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত এইবারে পর্য্যটন করিলেন। ইহার পরই বৈশাখ মাসে উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলা; সেখানে ব্রজবিদেহী মহন্তরূপে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হইবে। সুতরাং সেতুবন্ধ হইতে তাড়াতাড়ি চৈত্রমাসের তৃতীয় সপ্তাহে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথে দক্ষিণ মথুরায় (আধুনিক নাম "মাদুরা") মীনাক্ষী দেবীকে দর্শন করেন। এই মীনাক্ষী দেবীর মন্দির অতি বৃহৎ। মন্দিরের ভিতরেই পুষ্করিণী, বাজার প্রভৃতি আছে।

চৈত্র মাসের ২২শে তারিখে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। আশ্রমে আর বিশ্রাম লওয়া সম্ভবপর হইল না। চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ বৈশাখমাস উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা থাকে। এই সংক্রান্তির দিনই কুম্ভযোগের প্রথম স্নানের দিন ছিল। সুতরাং আশ্রমে মাত্র ৪।৫ দিন থাকিয়া উজ্জয়িনী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। প্রত্যেক কুম্ভমেলাস্থলেই ব্রজবিদেহী মহন্তের জন্য বিশেষ চিহ্নিত স্থান থাকে। সেখানে গিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটি বড় ছাতার নীচে নিজের আসন স্থাপন করিলেন এবং বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান মহন্তরূপে একমাস অবস্থান করিলেন। এই ছাতাটি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের ছাতা, প্রতিবার কুম্ভমেলাতে এবং ব্রজপরিক্রমার সময়ে তিনি এই ছাতাটিই ব্যবহার করিতেন। অতিশয় পুরাতন হইয়া গেলেও কোনদিন ইহাকে তিনি পরিত্যাগ করেন নাই—ইহা আমরা দেখিয়াছি, প্রয়োজনানুসারে কখন কখন সারাইয়া লইয়াছেন মাত্র। এই কুম্ভমেলায় সমবেত সাধুগণ এবং গোয়ালিয়রের মহারাজা তাঁহার প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করেন।

কুম্ভমেলা সমাপ্ত হইলে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এখান হইতে আশ্রমে না ফিরিয়া ৺পুরীধামে গেলেন। এখানে প্রায় দুই মাসকাল ছিলেন, ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর প্রতি পূর্ব্বপ্রীতিবশতঃ তাঁহার সমাধি-মন্দিরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। পুরীতে এইস্থান "জটিয়া বাবার সমাধি-মন্দির" নামে প্রসিদ্ধ। এই সময়ে অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করেন। অতঃপর শ্রাবণ মাসে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথে কলিকাতায় পূর্ব্ববন্ধু শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে * কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেখানেও বহুলোককে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। ঝুলন পূর্ণিমার কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে পৌঁছিলেন।

ইহার পর আরও দুইবার তিনি তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই দুইবারে উত্তর ভারতের প্রায় সমুদায় তীর্থ দর্শন করেন। এতদ্ব্যতীতও পূর্ব্বে এবং পরে কখন কখন তিনি তীর্থদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার তীর্থ দর্শনের একটি বিশেষত্ব ছিল, উহা তাঁহার তীর্থসঙ্গীদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা সাধারণতঃ কোনও তীর্থে গেলে, সেখানে যাহা কিছু দ্রষ্টব্য আছে, তৎসমস্তই দেখিবার জন্ম ব্যস্ত হই। পাণ্ডারা যত সব খুঁটিনাটি বিষয়ের কথা বলে, অর্থাভাবে অথবা সময়াভাবে তাহার কোনটা অসম্পন্ন থাকিয়া গেলে মন খুঁৎখুঁৎ করিতে থাকে, কোন প্রধান তীর্থের দিকে ট্রেণে যাইতে থাকিলে লাইনের

* ১৩০৪ সাল হইতে ১৩২২ সালে গৃহাশ্রম ত্যাগ করার দিন পর্য্যন্ত বাগবাজার ৪৭নং বোসপাড়া লেনস্থ বাটীতে শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজ বাস করিয়াছিলেন। তৎপর উক্ত বাটীতে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অবস্থান করিতেন। ১৩২৮ সালে শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজ সংসারত্যাগী সাধু অবস্থায় কলিকাতা আসিয়া শ্রীযুক্ত মোহিনী বাবুর অতিথিরূপে উক্ত বাটীতেই কয়েকদিনের জন্ত বাস করিয়াছিলেন।

পাশে যে সকল ছোটখাট "তীর্থ" থাকে, তাহা দেখা হইল না বলিয়া মন অন্ততঃ সাময়িকভাবেও বিষণ্ণ হয়। তাঁহার এ সকলের কিছুই ছিল না। তীর্থদর্শন করিতে গিয়া তিনি মুখ্যধামগুলিই দর্শন করিতেন, সেই সকল প্রধান স্থানকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে যে সকল তীর্থস্থান কালক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে তৎপ্রতি তত লক্ষ্য করিতেন না। সেগুলিও দর্শন হইলে ভালই, না হইলেও মনস্তাপ নাই, পরিপূর্ণতৃপ্তিতে চিত্ত ভরিয়া আছে, এইরূপই তাঁহার ভাব ছিল। মূলবস্তুর দিকেই চিরদিন তিনি বদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। তীর্থস্থানের পূজা, স্নান, দান প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপই তাঁহার ব্যবহার ছিল, আসল কার্য্যটির জন্য ভক্তি ও আগ্রহের সহিত আয়োজন করিতেন, আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি তত মনোযোগ করিতেন না—হইয়া গেলে ভালই, কিন্তু না হইলেও আপত্তি নাই—খুঁৎখুঁতি তাঁহার একেবারেই ছিল না। যতটুকু হইল তাহাতেই তাঁহার পূর্ণ সন্তোষ হইত। পরবর্ত্তী কালে যখন তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিলেন, তখন শিষ্যদিগকেও তীর্থদর্শন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিতেন, সাধুশিষ্যদিগকে ত নিজেই অর্থ দিয়া তীর্থদর্শনে প্রেরণ করিতেন এবং তাঁহাদিগকেও অনুরূপ উপদেশ দিতেন। আমাদের একজন গুরুভ্রাতা লিখিয়াছেন, "সেবারে কাশীধামে নামিয়া অল্প সময় ছিলাম। সেজন্য চক্রতীর্থ দর্শন করিতে পারিলাম না। এজন্য মনে কষ্ট ছিল, একটু অপরাধ হইয়াছে, এরূপ বোধও ছিল। দেশে আসিয়া এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে লিখিলেন '……তুমি চক্রতীর্থে যাও নাই, তাহাতে কোন দোষই হয় নাই। সকল তীর্থেই ভগবৎ আবির্ভাব আছে, ভক্তিতে সর্ব্বত্রই তিনি পূর্ণ ফল দেন। তুমি কোন চিন্তা করিও না। ভগবান্ নিশ্চিতই অন্তর্যামী; তিনি সব জানিয়া উপযুক্ত বিধান

করিবেন, তুমি কোন প্রকার উদ্বেগ মনে আনিও না।...'..." * আমাকেও তিনি এক সময়ে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ১৩৩৭ সালে আমি কামাখ্যাতীর্থে গিয়াছিলাম, ইহার কিছু পূর্ব্বে পড়িয়া গিয়া আমি ডান পায়ে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলাম এবং এই আঘাতের বেদনা তখনও যায় নাই, তজ্জন্য ভালরূপে হাঁটিতে পারিতাম না। এই অবস্থায় কামাখ্যায় যাইতে উদ্যোগী হইয়াছি দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাকে বলিলেন, "তুমি পাহাড়ে চড়িতে যদি না পার, তবে নীচে থাকিয়াই প্রণাম করিও, তাহাতেই তোমার কাজ হইবে। পাহাড়ের সর্ব্বত্রই দেবীর অধিষ্ঠান আছে জানিবে।" পরে কার্য্যতঃ আমাকে তাহা করিতে হয় নাই, কারণ আমি অনায়াসেই পাহাড়ে চড়িতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

আর একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। অকারণ অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করা তিনি পছন্দ করিতেন না। অনেক আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি আছেন যাঁহারা কিছুতেই কলের জল খান না, কিম্বা রেলগাড়ীতে একসঙ্গে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত থাকিতে হইলেও স্নানাহার কিছুই করেন না—ইত্যাদি। এ সকল ব্যবহারের উদ্দেশ্য ভালই এবং চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে বলিয়া কতক পরিমাণে ইহা শুভফলই উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে এসকলের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং ইহা অপকারী হইয়া পড়ে। বিশেষ বিশেষ দিনে শাস্ত্রে উপবাসের ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু উপবাসের অর্থ কেবল অনশন নহে, উপ (সমীপে) বাস অর্থাৎ ধ্যানজপাদির দ্বারা ঈশ্বরসান্নিধ্য অনুভবের চেষ্টা,

* এই পত্রখানি সম্পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ কর্তৃক প্রকাশিত "ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ কর্তৃক লিখিত পত্রাবলী ১ম খণ্ড" গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

না খাইয়া থাকিলে দেহমনের একটা অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত অবস্থা আসে বলিয়া না খাইয়া অথবা কম খাইয়া থাকা ইহার অনুকূল। কিন্তু এই অনশন আমাদের শারীরিক সামর্থ্যের মাত্রা অতিক্রম করিলে শরীর ক্লিষ্ট ও মস্তিষ্ক অবসন্ন হইয়া পড়ে, ফলে ধ্যানজপাদি করিবার শক্তি আর থাকে না, এইস্থলে উপবাস মূলতঃ ব্যর্থ হয়। এইজন্যই ঋষিগণ শাস্ত্রে অসমর্থপক্ষে অনুকল্পের উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপ কোনও তীর্থে যাইবার পথেই যদি শরীর এরূপ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয় যে তথায় গিয়া তীর্থের প্রভাব চিত্তদ্বারা অনুভব করিবার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তীর্থে আগমনের একটি প্রধান ফল হইতেই বঞ্চিত হইতে হইল! তদুপরি একক্রমে দীর্ঘকাল তীর্থভ্রমণ করিতে হইলে এরূপ কঠোরতার ফলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। তীর্থস্থানে গিয়া অধিকপরিমাণে জপ করিতে তিনি উপদেশ দিতেন। অবসন্নদেহে ক্লান্ত-মস্তিষ্কে যে নিবিষ্টচিত্তে জপ করা যায় না, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন; এইজন্য এরূপস্থলে তিনি গুরুলঘু বিচার করিয়া কার্য্য করিতে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন অর্থাৎ আচারের কঠোরতার কথঞ্চিৎ হ্রাস এবং সাধনের হানি এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি বৃহত্তর অনিষ্ট, ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে বলিতেন। তাঁহার গুরুদেবের জীবনচরিত-গ্রন্থের একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "রেলগাড়ীতে চড়িয়া দূরস্থানে যাতায়াত করিতে শরীর রক্ষার নিমিত্ত আপদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করা দূষণীয় নহে বলিয়া তিনি * পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন, এবং সময়ানুসারে আবশ্যক মত গাড়ীতে বসিয়া ফলমূলাদি তিনি আমাদের সঙ্গে গ্রহণ করিতেন।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিজেরও এই প্রকার অভিমত ছিল। তীর্থের

* অর্থাৎ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গুরুদেব শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ। এই কথা উক্ত জীবনচরিত গ্রন্থের ২০০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

পথে এবং তীর্থে গিয়াও অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন তিনি করিতেন না। মূলবস্তুর দিকেই চিরদিন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। পথে সময়মত স্নানাহারের ব্যবস্থা তিনি সম্ভবস্থলে সর্ব্বদাই করিতেন এবং তাঁহার উপস্থিতবুদ্ধি ও স্বভাবগত অনলস ক্ষিপ্রকারিতার গুণে তাহা অধিকাংশক্ষেত্রেই সম্ভব হইত। গাড়ীতে চলিবার সময় তিনি টাইম-টেবল দেখিয়া এমন ট্রেণ নির্ব্বাচন করিতেন যাহাতে সারারাত্রি (প্রয়োজন হইলে দিবসের শেষভাগ ও সারারাত্রি) চলিয়া পরদিন ভোরে অভীষ্ট স্থানে পৌছান যায়। পথ চলিবার পক্ষে ইহা বড় সুন্দর নিয়ম। ভোরে যথাস্থানে শৌচ স্নান সারিয়া নিশ্চিন্তমনে কিছু সময় ভগবদ্ধ্যান-জপে কাটাইয়া কিছু প্রসাদ পাইয়া লইতে পারিলে তাহার ফলে সারাদিন শরীর স্নিগ্ধ ও চিত্ত প্রফুল্ল থাকে। শরীর ও মনের এই অবস্থাটি তীর্থভ্রমণের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কখন কখন অন্য প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল এই কারণেই তিনি, যেস্থানে ট্রেণ ভোর-বেলায় উপস্থিত হয়, সেই স্থানে নামিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পরে অন্য ট্রেণ বা ষ্টীমার ধরিতেন। পরবর্ত্তীকালে যখন তিনি বঙ্গ, বিহার ও আসামের অনেকস্থলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন আমরা অনেকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম এবং তখনও তাঁহার এই সকল নিয়মই ছিল দেখিয়াছি। পাঠক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহার উদাহরণ পাইবেন।

১৩২৮ সালের পৌষমাসের শেষভাগে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পশুপতিনাথ দর্শনার্থ নেপাল অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার গুরুভ্রাতা রাধেশ্যামদাসজী, শিষ্য অনন্তদাসজী এবং আরও কয়েকজন সাধু এইবারে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। পথে ছাপরায় ও সমস্তিপুরে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং এই দুই স্থানে অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করেন। তাঁহার কলিকাতার জনৈক শিষ্যের এক বন্ধু উষাবাবু এই সময়ে

নেপালের মহারাজার পুত্রদের গৃহশিক্ষক ছিলেন ও তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নেপাল অবস্থানকালে সর্ব্ববিধ সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য এই শিষ্যটি বন্ধুকে পত্র লিখিলেন। ফলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডৌ নগরে পৌঁছিলে উষাবাবু আসিয়া রাজার গেষ্ট হাউসে (Guest-house) তাঁহাকে লইয়া গেলেন ও খুব যত্নপূর্ব্বক সেবা করিলেন। এখান হইতে নিকটবর্ত্তী থাপাথলি আশ্রমের সাধুগণ আসিয়া একদিন তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলেন। এই আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কয়েকদিন রহিলেন। এই সময়ে একদিন মহারাজা তাঁহার সভাপণ্ডিত সহ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে অনেক প্রশ্ন ও তর্কবিতর্ক করেন এবং তাঁহার উত্তর শুনিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার পুরাতন আমাশয় রোগ আবার প্রবলভাবে দেখা দিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি মুক্তিনাথ হইয়া মানস সরোবরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সেখানে অত্যন্ত শীত, তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও রুগ্ন, এজন্য অনন্তদাসজী ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহারাজ প্রথমতঃ সম্মত হন নাই, অবশেষে অনেক অনুরোধ করার পর নিরস্ত হইলেন। তখন আরও দুই একদিন সেখানে থাকিয়া ফিরিবার পথে পুনরায় সমস্তিপুর আসিলে কলিকাতা হইতে এক পত্র পাইলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাস মহাশয়ের কলিকাতা ভবানীপুরস্থ বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য এই সময় শেষ হইয়াছিল। সেই বাটীতে তাঁহাদের গুরুদেব শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজের এবং শ্রীশ্রীঠাকুরজীর চিত্র প্রতিষ্ঠা এবং গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে যাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া ইনি পত্র দিয়াছিলেন।

তদনুসারে সমস্তিপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় ইঁহার বাড়ীতে গেলেন। সেখানে খুব আনন্দের সহিত উৎসব হইল। এইবার এখানে অবস্থানকালে বহুলোকে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করেন। কিছুদিন এখানে থাকিয়া ফিরিবার পথে চিত্রকূট দর্শনপূর্ব্বক ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রার অল্পকালপূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে পৌছিলেন।

ঝুলন পূর্ণিমার পরের অষ্টমীই জন্মাষ্টমী। জন্মাষ্টমীর দুই তিন দিন পরেই ব্রজ পরিক্রমায় যাইতে হইল। পরিক্রমাসমাপনান্তে এইবার কয়েকমাস আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জ্বালামুখী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবার তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সাথী গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সামন্ত মহাশয় সস্ত্রীক, আমাদের গুরুভ্রাতা অনন্তদাসজী এবং কমলদাসজী নামক রামানন্দী সম্প্রদায়ের একজন সাধু ছিলেন। এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম, দেবী খুব জাগ্রত, গুহাভ্যন্তরে প্রস্তরগাত্র হইতে অগ্নিশিখা সর্ব্বদাই বাহির হইতেছে, কিন্তু তাহার তাপ অত্যন্ত কম, হাত দিয়া স্পর্শ করিলেও বিশেষ অনুভূত হয় না। ঘটীর ভিতর দুধ লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অগ্নিশিখার নিকটে দাঁড়াইয়া তাহা নিবেদন করিয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণও এই সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে অগ্নিশিখা ঘটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইল ও কিছুক্ষণ থাকিয়া বাহির হইয়া গেল। এইরূপেই দেবীকে পুনরায় পেঁড়া ভোগ দেওয়া হইল; পেঁড়ার উপরেও অগ্নি আসিয়া কিছুক্ষণ থাকিল, পরে চলিয়া গেল। দেখা গেল পেঁড়া কিছু কৃষ্ণবর্ণের হইয়াছে। অতঃপর সেই দুধ ও পেঁড়া প্রসাদ তাঁহারা সকলে গ্রহণ করিলেন। এখানে তাঁহারা তিন চারি দিন বাস করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন, "স্থানটি বড় সুন্দর। দেবী এখানে জাজ্বল্যমান হইয়া আছেন। এই স্থানের কথাই

আমার গুরুদেব বলিয়াছিলেন। আমাকে এখানে আনিবেন ইহা আমার প্রতি তাঁহার বর ছিল। সেই বর এইবার পূর্ণ হইল।"

অনন্তর তাঁহারা রোয়ালসর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুই দিন পরে চিন্তাপূর্ণী নামক স্থানে পৌছিয়া চিন্তাপূর্ণী দেবীকে দর্শন করিলেন। এই দেবী খুব জাগ্রত এবং ইঁহাকে দর্শন করিলে লোকের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। প্রার্থীর চিন্তা পূর্ণ করেন বলিয়া দেবীর চিন্তাপূর্ণী নাম হইয়াছে। এখানে দুইদিন থাকিয়া সকলে মাণ্ডই অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাস্তায় গরু অথবা ঘোড়ার গাড়ী ভিন্ন অন্য কোন যান ছিল না। দিনের পর দিন টাঙ্গাগাড়ীতে চড়িয়া সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইল। প্রথমে এক গাড়ীতে জানকীবাবু সস্ত্রীক এবং পশ্চাতে আর একখানি গাড়ীতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ, অনন্তদাসজী ও কমল-দাসজী যাইতেছিলেন। পথ সমতল নহে, মধ্যে মধ্যে চড়াই উতরাই আছে। একদিন তাঁহারা এমন একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, টাঙ্গায় চড়িয়াই খুব উচ্চ পাহাড়ে উঠিতে হইল, তারপর নামিবার সময় হঠাৎ ঘোড়ার পা পিছলাইয়া পশ্চাতের টাঙ্গাখানি উল্টাইয়া গেল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রায় পাঁচ হাত দূরে গিয়া পড়িলেন, কিছু আঘাতও পাইলেন। অনন্তদাসজী এবং কমলদাসজীও এইরূপ ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন, দৈবাৎ সকলে বাঁচিয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উঠিয়া আসিয়া ইহাদের উভয়কে তুলিলেন এবং বলিলেন "বাবা! আজ একটা বিশেষ ফাঁড়া ছিল। শ্রীভগবান্ আজ কৃপা করিয়া রক্ষা করিয়াছেন!" ঘোড়াটির পায়ে কিছু চোট লাগিয়াছিল, সেজন্য তিনি বলিলেন "চল আমরা কিছুদূর হাঁটিয়া যাই।" নিজে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্যই করিলেন না। প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ চলিয়া পথিপার্শ্বে একটি উপযুক্ত স্থান দেখিয়া সকলে বিশ্রামার্থ

সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। এই স্থানে রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-জীর ভোগ লাগান হইল ও সকলে প্রসাদ পাইলেন। এইরূপ পথে যে সকল স্থানে বিশ্রাম করা হইত, সর্ব্বত্রই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পৌছিয়া প্রথমেই শুক্‌না কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তারপর চুলা তৈয়ার করিয়া, চাল ধুইয়া রান্নার সমস্ত যোগাড় করিয়া দিতেন। এই সকল শেষ হইলে অনন্তদাসজীকে বলিতেন, "তুমি স্নান করিয়া আসিয়া রসুই চড়াইয়া দাও।" তখন ইনি স্নান করিয়া আসিয়া পাক করিতেন। এক একটি স্থানে পৌছিয়া অন্যান্য সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন এবং প্রায় সকলেই শুইয়া পড়িতেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীর প্রাচীন হইলেও তিনি অক্লান্তভাবে এই সকল বন্দোবস্ত করিতেন। তাঁহার শরীরে আলস্য কেহ কখনও দেখে নাই।

সেদিন রাত্রিতেও এইখানে থাকা হইল, ফলে ঘোড়াটি একটু বিশ্রাম পাইল। পরদিন পুনরায় টাঙ্গায় চড়িয়া সকলে যাত্রা করিলেন। বেলা চারিটায় মাণ্ডই নামক স্থানে পৌছিলেন। এখান হইতে রোয়ালসর দশ মাইল। তাঁহারা মাণ্ডইএ থাকিতেই খুব ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বাধ্য হইয়া দুইদিন এখানে অপেক্ষা করিতে হইল। তৃতীয় দিবসে আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গীয় দ্রব্যাদি বহনের জন্য দুইটি পাহাড়ী লোকের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। জিনিষপত্র তাহাদের সঙ্গে দিয়া সকলে পদব্রজে রোয়ালসর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। খানিকদূর যাইতে না যাইতেই পুনরায় অবিশ্রান্ত বর্ষণ আরম্ভ হইল ও তৎসহ হিমশীতল বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। একে পথ অতি দুর্গম, তাহাতে এই দুর্য্যোগ। সঙ্গের পাহাড়ী লোক দুইটি অনেক পিছনে পড়িয়াছে, সম্মুখের পথ অজ্ঞাত। জনমানবশূন্য বনপথে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া যে

পথ জানিয়া লইবেন, তাহার উপায় নাই। প্রায় সকলেই নিরুৎসাহভাবে আন্দাজে পথ চলিতে লাগিলেন। এইরূপ চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ততক্ষণে অনন্তদাসজী ও কমলদাসজী, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও জানকীবাবু প্রভৃতিকে ছাড়াইয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাত আরম্ভ হইল। অল্প অন্ধকার হইয়াছে এমন সময় এরূপ একটি স্থানে ইঁহারা দুইজন পৌঁছিলেন, যেখানে পথ অল্পপরিসর, অতি সাবধানে কতকদূর পার হইতে হইবে, দুইপাশে গভীর খাদ, কোনক্রমে পদস্খলন হইলে বহুনিম্নে পড়িয়া নিশ্চিত মৃত্যু। অনন্তদাসজীর মনে হইল, "বৃদ্ধ গুরু পশ্চাতে আসিতেছেন, তাঁহার শরীর প্রাচীন, অন্ধকারও হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ দুর্য্যোগ, এখানে আসিয়া যদি কোনরূপে পা একটু রাস্তার বাহিরে পড়ে, তাহা হইলে উপায় ?" এই আশঙ্কায় ও উদ্বেগে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি ফিরিয়া চলিলেন, খানিকদূর গিয়া তাঁহাকে পাইলেন, দেখিলেন প্রশান্ত নির্ভীকভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ চলিয়াছেন। অনন্তদাসজী বলিলেন "বাবা! অন্ধকার হইয়াছে, সামনে কিছুদূরে একটা রাস্তা আছে, সেখানে একটি মাত্র পা ধরে, রাস্তার বাহিরে পা পড়িলে একেবারে বহু নীচে পড়িয়া যাইতে হইবে। এই চিন্তা করিয়া আপনাকে সঙ্গে লইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অতিশয় প্রসন্নভাবে বলিলেন, "চল, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি ঠিক যাইব।" অনন্তর উভয়ে একত্র চলিলেন, সেই স্থানটিতে আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঠিকভাবেই পার হইয়া গেলেন। শ্রীভগবৎকৃপায় অপর সকলেও নির্বিঘ্নে স্থানটি অতিক্রম করিলেন।

রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড অতিক্রান্ত হইলে সকলে রোয়ালসরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহারা আশ্রয় পাইলেন ও

তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আমাদিগকে কিছু কাঠ আনিয়া দিয়া আমাদের জীবনরক্ষা করুন।" শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণটি দ্রুতপদে গিয়া খুব সরু সরু কতকগুলি কাঠ তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তখন আগুন জ্বালাইয়া সকলে ভিজা কাপড়, লেঙ্গুটি প্রভৃতি শুকাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং হাত পা সেঁকিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ সেঁকিতে সেঁকিতে তাঁহাদের শরীর সতেজ হইয়া উঠিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ কিছু পুরী ও শাক আনিয়া দিলে ঠাকুরজীর ভোগ লাগাইয়া সকলে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

রোয়ালসর একটি সরোবর। পরদিবস প্রাতে উঠিয়া এই সরোবরে তাঁহারা স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। দেখিলেন অনতিবৃহৎ সরোবরটি চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত, জলে সাতটি ছোট ছোট পাহাড়খণ্ড ভাসমান, তাহার উপর ছোট ছোট গাছও আছে। ভুটানে এই সময় প্রবল শীত পড়ে বলিয়া ভুটিয়াগণ এইস্থানে নামিয়া আসে। তাহাদের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। চরখী ঘুরাইতে ঘুরাইতে এই সরোবরকে তাহারা প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করে। এইরূপে ভক্তির সহিত পরিক্রমা করিতে করিতে যখন তাহারা তন্ময়চিত্ত হইয়া যায়, তখন সেই ভাসমান পর্ব্বতখণ্ডগুলি তাহাদের নিকটে সরোবরের কিনারে আসিয়া একত্রিত হয়। তাহাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও অন্যান্য সকলে সরোবর পরিক্রমা করিলেন এবং ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন। এই স্থানটি লোমশ ঋষির তপস্যার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এখানে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এই স্থানটি বড় সুন্দর, বাস্তবিকই তপস্যার উপযুক্ত স্থান।" তিনি এখানে তিনদিন থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু সঙ্গীরা সেখানে থাকা ক্লেশকর বলিয়া বোধ করিতেছিলেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ অসুবিধার

কথা জ্ঞাপন করাতে অগত্যা তিনি শীঘ্র ফিরিতে রাজী হইলেন। সেখানে একদিনমাত্র থাকিয়া সকলে পুনরায় মাগুইএ আসিলেন এবং তথা হইতে অন্য রাস্তায় পাহাড় অঞ্চলের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিতে করিতে নীচে নামিয়া অমৃতসহরে আসিলেন।

এখান হইতে জানকীবাবুরা দেশে চলিয়া গেলেন্। এখানে কয়েক দিন বাস করিয়া, অনন্তদাসজী ও কমলদাসজীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অতঃপর নারায়ণসরোবর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রেলগাড়ীতে বিশাল সিন্ধুনদ পার হইয়া রাস্তায় পিণ্ডখর্জ্জুর মাত্র খাইয়া মরুভূমির ন্যায় স্থানের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে সণ্ডাবন্দর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানকার হিন্দু অধিবাসিগণ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। এখান হইতে নারায়ণসরোবর যাইবার দুইটি রাস্তা আছে—একটি স্থলপথ অপরটি জলপথ। স্থলপথে যাইতে হইলে যে রাস্তা ধরিয়া যাইতে হয় তাহাকে 'রণ' বলে; এই রাস্তা অতি দুর্গম এবং পথে জলের অভাব অত্যন্ত অধিক। সুতরাং এই পথে না গিয়া তাঁহারা নৌকার পথেই অগ্রসর হইলেন। এ পথেও খানিকদূর হাঁটিয়া গিয়া তবে নৌকায় উঠিতে হয়। দশ বার মাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সহর পাইলেন। ইহার পর আর জনপদ নাই এবং নৌকাতে কত সময় থাকিতে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। সুতরাং কিছু চিড়া, তেঁতুল ও পানীয় জল সঙ্গে লইলেন এবং উটের পিঠে চড়িয়া সমুদ্রের উপকূলস্থ বহুদূরবিস্তৃত লবণাক্ত পতিত স্থান অতিক্রম করিয়া সারাদিন চলিয়া সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ঘাটে পৌঁছিলেন এবং একখানি নৌকা ঠিক করিলেন। সে রাত্রে আর নৌকা ছাড়িল না, চিড়া খাইয়া বাহিরে আর্দ্র লবণাক্ত ভূমির উপরই শয়ন করিয়া তাঁহারা রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন

বৈকালে নৌকা ছাড়িল, এবং সেই রাত্রিও চিড়া ও জল খাইয়াই থাকিতে হইল। পরদিন বাতাসের বেগ অতিশয় মন্দীভূত হইল, সুতরাং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের অভাবে পালের নৌকা অতি ধীরে ধীরে চলিল। আজ আর জলচিড়াও ছিল না, সুতরাং অনাহারেই থাকিতে হইল। পথিমধ্যে আবার একস্থানে নৌকা চড়ায় আটকাইয়া যাওয়ায় একদিন সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল। এইরূপে নৌকায় সম্পূর্ণ চারিদিন ও তিনরাত্রি অনশনে এমন কি একটু জল পর্য্যন্ত না খাইয়া তাঁহাদের কাটিল। পঞ্চম দিনে রাত্রি প্রায় আটটার সময় লকপত নামক একটি সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরস্থিত ঘাটে গিয়া অবতরণ করিলেন। এই সময় অনাহারে অনন্তদাসজী এবং কমলদাসজী ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই অথবা তাঁহার যে কিছুমাত্র ক্লেশ হইতেছে, ইহা সঙ্গীদ্বয় অনুভব করেন নাই। তিনি ইহাদিগকে বলিয়াছিলেন "বাবা! খুব ভালভাবে সব তীর্থ হইয়া গিয়াছে ; এই শেষ তীর্থ, এখানে ভগবান্ পরীক্ষা করিতেছেন। অবিচলিতভাবে থাকিয়া ভগবন্নাম কর।"

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান ও রাত্রিকাল বলিয়া সহর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতে নৌকার মাঝিকে বিশেষরূপে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। এই সময়ে অনন্তদাসজী ভিতরে একটি বিশেষ শক্তি অনুভব করিলেন এবং সমস্ত জিনিষ কাঁধে করিয়া এক হাতে বাবাজী মহারাজকে ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এই সময়ের সেবায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন। রাস্তায় একটি কূয়া পাইয়া জিনিষপত্র সেখানে নামাইয়া সকলে পেট ভরিয়া জল খাইয়া লইলেন। লকপত পৌঁছিয়া দেখেন, দোকানপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া একজন দোকানদারকে

উঠাইয়া তাহার নিকট হইতে কিছু মিঠাই ক্রয় করিলেন এবং তাহাই খাইয়া বাহিরে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিবস প্রাতে স্নানাদি সমাপনান্তে রামানন্দী সম্প্রদায়ের এক আশ্রমে গিয়া সকলে উঠিলেন। এইখানে দুইদিন বিশ্রাম করিয়া সকলে নারায়ণসরোবর অভিমুখে রওনা হইলেন। নারায়ণসরোবর এখান হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সেখানে গিয়াও তাঁহারা সাধুদের এক আশ্রমে অবস্থান করিলেন।

ভারতবর্ষের চারিটি প্রসিদ্ধ সরোবরের মধ্যে নারায়ণসরোবর একটি। অপর তিনটির নাম মানস সরোবর, পম্পা সরোবর ও বিন্দু সরোবর। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কথা প্রসঙ্গে আমাদের নিকট নারায়ণসরোবরের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। অনেক কষ্টে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া এখানে গিয়া তিনি বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন এইরূপ আমাদের নিকট বলিয়াছেন।

এখান হইতে তাঁহারা বেট-দ্বারকায় গেলেন। দ্বারকাধামে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইতিপূর্ব্বে আর একবার আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীদ্বারকা-নাথকে দর্শন করিয়া দ্বারকাতে তিন দিন বাস করিলেন। অনন্তর সকলে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্রের একটি দিক সর্ব্বদাই তাঁহার তীর্থসঙ্গিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সে কথা তাঁহারা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অবিচলিত ধৈর্য্য এবং সর্ব্বাবস্থায় সমভাব। নেপালাধিপতির গেষ্ট হাউসে অথবা রোয়ালসরের পথের দুর্য্যোগময়ী রজনীতে, সওাবন্দরের নাগরিকগণের সশ্রদ্ধ সেবায় অথবা নারায়ণসরোবর যাইতে নৌকাপথের অনশনে, সঙ্গিগণ তাঁহার একইরূপ অবিচলিত প্রশান্তভাব সর্ব্বদা দেখিয়াছেন।

পরবর্ত্তীকালে তিনি শিষ্যদিগকে তীর্থদর্শনে উৎসাহিত করিতেন এবং সাধু শিষ্যদিগকে নিজেই উদ্যোগী হইয়া খরচ দিয়া তীর্থদর্শনে পাঠাইতেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাঠাইবার সময় যে সকল উপদেশ আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে দিয়াছেন তাহার দুই একটির উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, ভ্রমণকালে সর্ব্বদা ভগবন্নাম স্মরণের উপদেশ। সর্ব্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করিবার উপদেশ আমাদের প্রতি সাধারণ ভাবে আছে, তথাপি তীর্থ-যাত্রাকালে এইটি বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেন। বদরীনারায়ণ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় অতি মর্ম্মস্পর্শীভাবে তাঁহাকে এই কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিতে শুনিয়াছি।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ হয়। ভারতের বহু তীর্থস্থলে স্নানই প্রধান কার্য্য। তীর্থের পাবনীশক্তি—আমাদের দেহমন পবিত্র করিবার উপযোগী যে অদৃশ্য ভগবৎশক্তি যেখানে যুগ যুগ ধরিয়া প্রকটিত আছেন বলিয়া সেই স্থান তীর্থ হইয়াছে—সেই শক্তির নিকট "বহু দূর হইতে অনেক কষ্ট করিয়া বড় আশা লইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, মা আমার অন্তর বাহির শুদ্ধ কর", এইরূপে (অথবা যাঁহার পক্ষে যে ক্ষেত্রে যেরূপ বলিলে প্রার্থনার সহিত প্রাণের যোগ হয়, সেইরূপে) প্রার্থনা করিয়া প্রণামপূর্ব্বক স্নান করিতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ উপদেশ দিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভ্রমণ

১৩৩১ সালের ভাদ্র মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ব্রজপরিক্রমায় বাহির হইয়াই পথে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া জ্বর ও আমাশয় লইয়াই অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই পীড়া এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, সঙ্গীয় সাধুগণ একপ্রকার জোর করিয়াই পরিক্রমার একাদশ দিবসে তাঁহাকে আশ্রমে ফিরাইয়া আনিলেন। আশ্রমে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু পীড়ার উপশম হইল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাশীতে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সেবা-শুশ্রূষা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পুনঃ পুনঃ পত্র দিতে লাগিলেন। অবশেষে আশ্রমস্থ সাধুগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন। ভাদ্র মাসের শেষের দিকে শ্রীমতী গঙ্গাদেবী নাম্নী একটি আত্মীয় কন্যাকে * সঙ্গে লইয়া মাতাঠাকুরাণী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বাগেরহাটের উকিল তদীয় শিষ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় মহাশয় এই সময় কাশীতে

---

* ইনি বালবিধবা ব্রহ্মচারিণী, বাবাজী মহারাজের শিষ্যা; তিনি ইঁহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ জীবিত থাকা কালে দীর্ঘকাল তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনিও বৃন্দাবন যাইতে উদ্যোগী হইলেন এবং তিনি সঙ্গে করিয়া ইঁহাদিগকে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিলেন।

এই সময় ব্রজপরিক্রমার কাল, আশ্রমের সাধুরা অধিকাংশই পরিক্রমায় গিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা চালাইবার নিমিত্ত দুই চারিজন মাত্র আশ্রমে ছিলেন। সুতরাং লোকাভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শুশ্রূষাও উপযুক্তরূপ হইতেছিল না, ইঁহারা আসিয়া পৌঁছিলে সে অসুবিধা দূর হইল। তথাপি পীড়ার শীঘ্র উপশম হইল না; কয়েক মাস ভুগিয়া অবশেষে তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্বল রহিল। আরোগ্যলাভান্তে স্বাস্থ্যের একটু দ্রুত উন্নতি হয় সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার সেরূপ হইল না। তখন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া কিছুকাল বাস করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রজলালবাবুর মধুপুরে একটি বাড়ী ছিল, তাঁহার একান্ত আগ্রহে সেইখানে আসিয়া থাকাই স্থির হইল এবং ১৭ই মাঘ তারিখে যাত্রা করিয়া তৎপর দিবস মাতাঠাকুরাণী, অনন্তদাসজী, গঙ্গাদেবী ও অন্যান্য কয়েকজন সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মধুপুর আসিয়া পৌঁছিলেন।

এখানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রায় তিন মাস ছিলেন। মধুপুরের জলবায়ুর গুণে কিছু স্বাস্থ্যোন্নতি হইল। এখানে কিছুকাল থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইবেন এইরূপই প্রথমতঃ কথা ছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া ঘটনাচক্রের গতি অন্য দিকে আবর্ত্তিত হইল। শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা মধুপুর বঙ্গদেশের অনেক নিকটে। তাঁহার বঙ্গদেশস্থ শিষ্যগণের পক্ষে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়া শ্রীগুরুদেবকে দর্শন অথবা তাঁহার

সঙ্গলাভ করা সহজ ছিল না। এক্ষণে তাঁহারা অনেকেই মধুপুরে আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। অনেকে সপ্তাহান্তে আসিয়া দর্শন করিতেন, অনেকে আবার সুবিধা হইলেই কয়েক দিন থাকিয়া যাইতেন। এখানেও অনেকের দীক্ষা হইল।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যখন যেখানে থাকিতেন, সেখানে দুঃখ দৌর্ম্মনস্যের পরিবর্ত্তে একটি শান্তির হাওয়া সর্ব্বদা বহিত। মধুপুরের একপ্রান্তে জনবিরল উন্মুক্ত একটি স্থানে কুসমা মৌজায়, শ্রীযুক্ত ব্রজলালবাবুর বাড়ীটি অবস্থিত। এখানে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সান্নিধ্যে, তাঁহার অপরিসীম স্নেহাশ্রয়ে, অনাবিল শান্তি ও আনন্দের মধ্যে কিছুকাল বাস করিয়া সংসার-তাপক্লিষ্ট শিষ্যগণ পরিত্রাণের আনন্দ অনুভব করিতেন। এইরূপে কিছুদিন যাইবার পর কি করিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশের মধ্যেই কোথাও আনিয়া রাখা যায়, শিষ্যেরা তাহার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। হাওড়া-শিবপুরস্থ ভড়পাড়া রোডের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বসু মহাশয়দ্বয় কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের বাটীতে পদার্পণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বিশেষরূপ প্রার্থনা করিতেছিলেন। অপর অনেকেই এই প্রার্থনায় যোগ দিলেন। অবশেষে তাহাতে সম্মত হইয়া বৈশাখ মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সকলকে লইয়া ইঁহাদের শিবপুরস্থ বাটীতে আসিলেন ও কয়েকদিন রহিলেন। তখন সেখানে যে অবস্থা হইল, তাহা বলিবার নহে। এই কয়দিন ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন উৎসব চলিল। প্রত্যহই প্রচুর লোক-সমাগম হইত। দ্বিপ্রহরে সাধারণতঃ মেয়েরাই বেশী আসিতেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু ও বিজয়বাবু এবং এবাটীর পরিজনবর্গ তন্ময়ভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের, তাঁহার সঙ্গীয় সাধুবৃন্দের ও সমাগত জনগণের সর্ব্বদা সেবা করিতে লাগিলেন।

ইহাদের উপার্জ্জন অধিক না হইলেও সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকেই তাঁহারা সুচারুরূপে সংকার করিতেন। নিত্যই নানা উত্তম উত্তম বস্তু সহযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ লাগিত এবং অতি সন্তুষ্টচিত্তে ইঁহারা সকলকে প্রসাদদানে পরিতৃপ্ত করিতেন। এখানে বহুলোকের দীক্ষা হইল। শুধু যে কলিকাতা হইতেই লোক আসিতেন, এরূপ নহে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বঙ্গদেশে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া সুদূর মফঃস্বল হইতেও দীক্ষার্থী অথবা তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া অনেকে আসিয়াছিলেন। এত লোকসমাগম হইত, অথচ কোলাহল ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা-পূজায়, আরতি ও ভোগরাগে, প্রসাদপ্রাপ্তি ও বিতরণে, সংসঙ্গে ও সংপ্রসঙ্গে অবিরাম আনন্দস্রোতে সুখস্বপ্নের ন্যায় দিনগুলি অতিবাহিত হইয়া গেল।

এই সময়ে বরিশালে আমাদের কয়েকটি গুরুভাইভগিনী ছিলেন। তাঁহারা, বিশেষতঃ তথাকার তৎকালীন প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কালিপদ রায় মহাশয় অনেকদিন হইতেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে একবার বরিশালে পদার্পণ করার জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। তিনি শিবপুরে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া কালিপদবাবু এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে শিবপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতৎসম্পর্কিত একটি ঘটনা ইঁহার নিকট শুনিয়াছি, তাহা এইস্থলে উল্লেখযোগ্য। ইনি এই সময়ে কয়েকবৎসর যাবৎ ব্যাধিগ্রস্ত থাকায় উপার্জ্জনে অক্ষম ছিলেন। শ্রীগুরুদেবকে একবার বরিশালে আনিবার একান্ত বাসনা অথচ অর্থ নাই; তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন, এরূপ সুযোগ উপেক্ষা করা উচিত নহে, অগত্যা পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, "আমার গুরুদেব বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। তাঁহাকে একবার এখানে আনিতে চাই।" যাদববাবু আমাদের গুরুভ্রাতা ছিলেন না, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং নিজেও মহৎ

প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা এই সময়ে খুব স্বচ্ছল ছিল না। তিনি বলিলেন "হাতে টাকাকড়ি বেশী নাই, কি করিয়া হবে?" তৎপরদিবস আদালত হইতে ফিরিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কালিপদবাবু উপস্থিত হইলে তাঁহার হাতে সাড়ে চারিশত টাকা দিয়া বলিলেন "আজই একটি মোকদ্দমায় অপ্রত্যাশিত-ভাবে এই টাকা পাইয়াছি। এই নাও, ইহা লইয়া সকল আয়োজন কর।" আশ্রিত ভক্তের ঐকান্তিকী প্রার্থনা শ্রীভগবান্ এইরূপেই পূরণ করেন। অনন্তর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীযুক্ত কালিপদবাবু শিবপুরে প্রফুল্লবাবুদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বরিশালে একবার যাইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। কালিপদবাবুর আন্তরিক আর্তিতে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন ও বৈশাখমাসের শেষভাগে বরিশালে গেলেন। শিবপুরের ন্যায় এখানেও নিত্যই বহু লোক-সমাগম হইত, আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় প্রায়ই সন্ধ্যাকালে আসিতেন, সৎপ্রসঙ্গ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। প্রায় সপ্তাহকাল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এখানে ছিলেন। শ্রীগুরুদেবই যে যথার্থ আপন জন ও পরম আশ্রয়, শিষ্যগণের হৃদয়ে তাহার বোধ জাগাইয়া, আরও কতিপয় নরনারীকে অভয় ও স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদান করিয়া, অমৃতময় উপদেশে বহুলোকের সংশয় নিরাস ও জ্ঞানোন্মেষ করিয়া, অনেকের হৃদয়ে ভক্তি ও বিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া, বরিশালে কয়েকদিনের জন্য আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শিবপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার পথে আরও কয়েকটি স্থান হইয়া আসিতে হইল।

ইহার পর শিবপুরে প্রায় এক মাস থাকিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আষাঢ় মাসে বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন।

পর বৎসর ১৩৩৩ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপস্থিত হইল। প্রতি-বার হরিদ্বার কুম্ভমেলার ন্যূনাধিক দুইমাস পূর্ব্বে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধুগণ শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে একত্রিত হইয়া মাসাধিক কাল সেখানে অবস্থান করেন, অনন্তর তথা হইতে হরিদ্বারে গিয়া কুম্ভমেলায় যোগদান করেন। বৃন্দাবনের এই সাধুমেলাকে অর্দ্ধ কুম্ভ বলে। শ্রীপঞ্চমীর দিন ইহা আরম্ভ হয়, এবারেও হইল, যমুনার সুবিস্তৃত চড়ার উপর নানাদিগ্দেশাগত সাধুগণ আসন স্থাপন করিলেন। কেশীঘাট হইতে পানিঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীপঞ্চমীর দিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আশ্রম হইতে গিয়া চড়ায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন স্থাপন করিলেন ও এই মাসাধিক কাল তাঁহাদের সহিত বাস করিলেন। যমুনার সুবিস্তৃত তটভাগের অপূর্ব্ব শোভা হইল। পাপী মানব তীর্থে গিয়া নিজের মলিনতা ক্ষালিত করিয়া আসেন, ভগবদ্ভক্তগণের পুণ্যস্পর্শে এই সঞ্চিত কলুষ হইতে তীর্থগণ আবার মুক্ত হন। যাঁহারা "তীর্থী-কুর্ব্বন্তি তীর্থানি" (তীর্থকেও তীর্থ করেন) এমন সাধু মহাত্মাগণের আগমনে আনন্দধাম শ্রীবৃন্দাবনের স্বাভাবিক আনন্দ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ এই সময়টি হোলির সময়, এই বসন্তোৎসব প্রকৃত পক্ষে শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে আরম্ভ হইয়া দোল পূর্ণিমার দিন শেষ হয়। ব্রজের হোলি উৎসব ভারত বিখ্যাত, এই সময় ব্রজধামের সর্ব্বত্র যে আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠে তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তগণের সম্মেলনে বৃন্দাবন এই মাসাধিককাল এক অপূর্ব্ব অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ হইয়া রহিল।

সমাগত এই সকল সাধুবৃন্দ ব্রজবিদেহী মহন্তের অতিথি বলিয়া গণ্য হন ও তাঁহার প্রত্যহ ইহাদিগকে (চার সম্প্রদায় খালসার সাধুগণকে) ভোজন দিতে হয়। সহস্রাধিক সাধুসেবা, সে এক বিরাট যজ্ঞ—প্রত্যহ

এই যজ্ঞ চলিতে লাগিল। এত সাধুসেবার উপযোগী সমস্ত উপকরণ কোথা হইতে আসিত, সর্বত্যাগী বাবাজী মহারাজ এত অর্থ কোথায় পাইতেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন দিন কোন বস্তু একটুও কম পড়ে নাই। যেন সহস্র অদৃশ্য হস্তে শ্রীভগবান্ সমস্ত বস্তু-সম্ভার বহন করিয়া আনিতেন। প্রতিদিন "হরিহর" "হ-অ-অ-অ রি-ই-ই হ-অ-র্-র্-র্" শব্দে উচ্চধ্বনি করিলেই সাধুগণ স্ব স্ব জলপাত্র হাতে নির্দিষ্ট ভোজন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এইরূপে যত সাধু আসিতেন, সকলকেই বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইত।

একদিন একটি বড় রসুই দেওয়া হইল—অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে পুরী, শাক, মালপোয়া প্রস্তুত করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ লাগান হইল ও প্রসাদ পাইবার নিমিত্ত চার সম্প্রদায় খালসার সমস্ত সাধুগণকে বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রণ করা হইল। ন্যূনাধিক তিন সহস্র সাধু আসিয়া পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য খালসার মহন্তগণের নিকট তাঁহাদের স্ব স্ব জমাতের সংখ্যানুসারে উপযুক্ত পরিমাণে আটা, ঘৃত প্রভৃতি পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

একাদশীর দিন সমস্ত সাধুগণ মিলিয়া পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন পরিক্রমা করিলেন। মহন্তগণ আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে অনুরোধ করিলেন "আপনি আমাদের নেতৃস্বরূপে হাতীতে চড়িয়া আগে আগে চলুন, আমরা আপনার পশ্চাতে মিছিল করিয়া চলিব ও সকলে মহানন্দে এই ধাম পরিক্রমা করিব।" যাঁহারা কুম্ভমেলা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, বিশেষ বিশেষ স্নানের দিনে ঝাণ্ডা উড়াইয়া, বাজনা বাজাইয়া, হাতীর উপর বহুমূল্য বস্ত্রাদিশোভিত হাওদাতে প্রধান প্রধান মহন্ত-দিগকে বসাইয়া, কি বিপুল আড়ম্বর ও সমারোহের সহিত মিছিল করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও সাধুগণ স্নান করিতে যান। শ্রীযুক্ত বাবাজী

মহারাজের আড়ম্বরের সরঞ্জাম ছিল না ইহা তাঁহারা জানিতেন; সুতরাং তাঁহারা নিজ হইতে হাতী ও বহুমূল্য হাওদা উপস্থিত করিলেন। এই সকল মহন্তদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ ধনশালী এবং পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত তাঁহারা এই সকল বিশেষ দিনে বাহির হন। সম্প্রদায়স্থ সাধুগণেরও এইরূপ একটি মর্য্যাদা বোধ থাকাতে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মহন্তদিগকে তাঁহারা এইরূপেই দেখিতে চান। সুতরাং সুসজ্জিত হস্তী উপস্থিত করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না; কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কোন মতেই তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না—যে ধাম তাঁহার গুরুস্থান, যেখানে তাঁহার শ্রীগুরুদেব ও উপাস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই ধাম তিনি হাতীতে চড়িয়া পরিক্রমা করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; অথচ সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান মহন্ত পদব্রজে যাইবেন, অন্য মহন্তগণ পশ্চাতে হাতীতে চড়িয়া আসিবেন ইহাও অসম্ভব। শুধু মহন্তপদের মর্য্যাদাবশতঃ নহে, সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াও সাধুসমাজ তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন। তাঁহার অসাধারণ দৃঢ়তায় অন্যান্য মহন্তগণকেও অবশেষে পদব্রজেই যাইতে হইল—ঝাণ্ডা প্রভৃতি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। অপূর্ব্ব মহিমান্বিত তেজঃপুঞ্জকলেবর সাক্ষাৎ শিবোপম মূর্ত্তি শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ আগে আগে চলিলেন এবং অন্যান্য মহন্ত ও সহস্র সহস্র সাধু পদব্রজেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এইরূপে মহানন্দে সেইদিনের পরিক্রমা শেষ হইল। রাজসিক আড়ম্বরবর্জ্জিত ও ভক্তি-বিনম্রভাবে ভূষিত হইয়া এবারকার পরিক্রমা-শোভাযাত্রা এক অভিনব গৌরব লাভ করিল।

দোলপূর্ণিমার পর হইতে এই আনন্দের হাট অল্পে অল্পে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। সাধুগণ আসন উঠাইয়া কেহ পদব্রজে, কেহ যানে

হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আসন উঠাইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আদেশে হরিদ্বারে গিয়া প্রাথমিক বন্দোবস্তাদি করিবার জন্য অনন্তদাসজী ও দিব্যদাসজী নামক আমাদের গুরুভ্রাতৃদ্বয় সাধুজমাত সঙ্গে লইয়া যথাসময় রওয়ানা হইয়া গেলেন। প্রত্যেক কুম্ভেই ব্রজবিদেহী মহন্তের ও তাঁহার সঙ্গীয় সাধুগণের নিমিত্ত বিশেষ স্থান পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট থাকে। সেখানে পৌছিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমে সংবাদ পাঠাইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হরিদ্বারে গিয়া পৌছিলেন।

পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতটে একমাস ধরিয়া কুম্ভমেলা চলিল। বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের সাধুগণ কনখলের সম্মুখে গঙ্গানদীর চড়ায় তাঁহাদের আসন স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন স্থাপন করিলেন। যে কুম্ভমেলা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "ইঁয়া দেবলোক ভী আয়া হায়। ভগবান্ আপ্‌নে সাথ্ সাথ্ রহতে হৈ" তাহার কথা আর কি বলিব? দেবলোক আসিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্মদেহে আসিয়াছেন বলিয়া চোখে দেখা যায় না; কিন্তু যাঁহারা নরদেহে দেবতা এমন মহাত্মাপুরুষগণ তৎপথযাত্রী শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে তপঃপ্রভায় যে স্থানের আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়া দিক্ আলো করিয়া বসিয়া আছেন, যে ক্ষেত্রে অজ্ঞ মানব কিছুই না বুঝিয়া শুধু দৃশ্য দর্শন করিয়া একবার বেড়াইয়া আসিলেও অলক্ষ্যে তাহার দেহ পবিত্র, মন নির্ম্মল হয়—যে ক্ষেত্রে শুধু একটি প্রণাম করিয়াও সংসার-তাপদগ্ধ মানবচিত্ত অপূর্ব্ব শান্তির আভাস পায়—তৎসম্বন্ধে কি বর্ণনাই বা আমরা করিতে পারি?

একদিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীস্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন তাঁহার



শরীর অসুস্থ, জ্বর রহিয়াছে। এ অবস্থায়ও শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ ইঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি চলিয়া গেলেন। কি গভীর প্রীতি যে এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে ছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। একদিন গিরিমহারাজের আশ্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও সন্ন্যাসিগণের এক সম্মেলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে তথায় যাইবার জন্য গিরিমহারাজের কয়েকজন শিষ্য মোটর গাড়ী লইয়া আমাদের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও আমরা কয়েকজন ঐ মোটরে চড়িয়া গিরিমহারাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। দূর হইতে দেখিলাম, লোকে লোকারণ্য, সাধু, সন্ন্যাসী ও সমাগত জনমণ্ডলীতে আশ্রমটি একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গৈরিক বসন পরিহিত উষ্ণীষ শোভিত গিরিমহারাজ পুষ্পমাল্য হস্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা পৌঁছিবামাত্র গিরিমহারাজ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মোটর হইতে অবতরণ করিলে স্বহস্তে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করিয়া যথাস্থানে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, জনতার মাঝখানে একখানি চৌকি, বহুমূল্য আস্তরণে তাহা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে, তদুপরি দুইখানি আসন, উভয়ে পাশাপাশি সেখানে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইবামাত্র সম্মুখস্থ জনতার মধ্য হইতে "হরিহর কী জয়", "হরিহর কী জয়" ধ্বনি উত্থিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মনোনীত হইলেন। অতঃপর বক্তৃতা আরম্ভ হইল। ভারত সেবাশ্রমসঙ্ঘের একজন সন্ন্যাসী উঠিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহারা যে সেবাকার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে ও তাঁহাদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বর্ণনা দিলেন। হিন্দুমিশনের একজন কর্ম্মী উঠিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায়

তাঁহাদের কার্য্যধারা ও মতামত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ উঠিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ কথা বলিলেন। মাঝে মাঝে ২।১টি সুদীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সভাপতি একটি কথাও বলেন নাই, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিলেন। এইরূপে বক্তৃতাপ্রবাহ যখন নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন সকলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ রাজী হন নাই, অবশেষে সকলের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ধীরে ধীরে অনুচ্চকণ্ঠে কিছু বলিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, এইদিনও বলেন নাই। কিন্তু জনতা এমনই নিস্তব্ধ ছিল যে, অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত তাঁহার বাক্যাবলী সকলের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। তিনি অল্প কথাই বলিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাণীর সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

"যেমন শীতঋতুর শেষে বসন্তাগমের কিছুকাল পূর্ব্বেই আম্রতরু মুকুলিত হইতে আরম্ভ হয় এবং চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির সর্ব্বত্র নানা লক্ষণ দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবের আর বিলম্ব নাই, তেমনি বর্ত্তমানে যে নানা নব নব ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়া লোককল্যাণের জন্য কার্য্য করিতেছেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের শুভদিন অদূরবর্ত্তী। আপনারা সকলে স্ব স্ব প্রণালীতে কল্যাণের জন্য যেমন কাজ করিতেছেন তেমনি করুন, পরন্তু ভগবৎ উপাসনাকেই মুখ্যকর্ম্ম বলিয়া জানিবেন—স্ব স্ব কার্য্যের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে সর্ব্বদা রাখিবেন, অন্ততঃ তৎতৎকর্ম্মের সিদ্ধির জন্যও উহা করিবেন।"

সভা ভঙ্গ হইলে মোটরে করিয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গীয় ব্যক্তিগণকে চার সম্প্রদায় খালসায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

এখানেও বিশেষ স্নানের দিন বৃন্দাবনের অনুরূপ ব্যাপার ঘটিল। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজের পদমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সন্ন্যাসীসম্প্রদায়গণের ও বহু দিগ্‌দেশাগত সাধারণ দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টির সম্মুখে, মহন্তগণ কিছুতেই অনাড়ম্বর ভাবে, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গণের মত মিছিল ব্যতিরেকে গঙ্গাস্নানে যাইতে রাজী হইতে পারিলেন না—বাবাজী মহারাজও হাতীতে চড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। মহন্তেরাও কিছুতেই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মহন্তকে মিছিলের সঙ্গে পদব্রজে যাইতে দিবেন না—তাহাতে তাঁহারা নিজেরা অগৌরব বোধ করেন। এ অবস্থায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অগত্যা এই সময়ে স্নানে গেলেনই না। অবশেষে বৈষ্ণব সাধুসম্প্রদায়ের স্নান হইয়া গেলে পর একখানি মোটর আনাইয়া প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী ব্রহ্মকুণ্ডে তাঁহাকে স্নান করান হইল। *

বৈশাখের শেষে হরিদ্বারের কুম্ভমেলা সমাপ্ত হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আমাশয় রোগ এই সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুকাল থাকিলে তাঁহার শরীরের উন্নতি হইতে পারে, এই আশায় শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় দেরাদুনে তাঁহার জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বৃন্দাবনে না গিয়া হরিদ্বার হইতে দেরাদুন অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী

* ইহার পরবর্ত্তী ১৩৩৬ সালের প্রয়াগের কুম্ভেও একই ব্যাপার ঘটিল। এই ব্যাপার লইয়া অবশেষে সাধুরা অতি দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যান দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার সাধু শিষ্যদের কাহাকেও কাহাকেও হাতীতে চড়িয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে ইঁহারা তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে মহন্তদের মিছিলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাতীতে চড়িয়াই স্নান করিতে গেলেন, পরে বাবাজী মহারাজ লোকসংঘট্টের মধ্যে অতি সাধারণ বেশে গোপনে এক সময়ে পদব্রজে গিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। শীতলদাসজী নামে একজন সাধু এবং আমাদের দুই একজন গৃহস্থ গুরুভ্রাতা মাত্র তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

মহারাজ যাত্রার দিন শ্রীশ্রীগিরিমহারাজের আশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, তিনি আসিয়াছেন সংবাদ পাইবামাত্র গিরিমহারাজ তাঁহার গুফাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। দুইজনে সেই তপস্যাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। অতঃপর সেখানে যে কি হইল, তাহা আমরা কি করিয়া বলিব? অল্পক্ষণপরে যখন তাঁহারা বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহাদের উভয়েরই পরস্পরের প্রতি প্রিয় বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার দেখিলাম। প্রস্থানের সময় নূতন তসরের কাপড় ও চাদর উপঢৌকন দিয়া শ্রীশ্রীগিরিমহারাজ স্বয়ং দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া গেলেন।

দেরাদুনে কিন্তু প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য হইল না। এখানে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা গেল বটে, কিন্তু কয়েকদিন পরেই অনন্তদাসজীর কানে একটি ব্রণ হইয়া তিনি অসহ্য যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। তাহা সহজে উপশমিত না হওয়াতে অগত্যা তাহাকে লইয়া সকলে মিলিয়া বৃন্দাবন আশ্রমে ফিরিয়া আসা হইল।

ইতিমধ্যে একটি নূতন ব্যাপারের সূচনা হইল। প্রথমতঃ বঙ্গদেশের ও পরে বিহারের নানাস্থান হইতে তাঁহাকে একবার তত্তৎস্থানে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া বহুলোকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মধুপুরে অবস্থানের সময় এবং তৎপরবর্ত্তী ভ্রমণের সময় অনেকেই তাঁহার সঙ্গলাভের আনন্দ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রমুখাৎ কথাটা আরও প্রচারিত হইল। এতদ্দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া, সৎসঙ্গের আশায়, তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া, সর্ব্বোপরি সদ্‌গুরুরূপে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষালাভের ব্যগ্রতায় বহুস্থান হইতে লোকে তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জনগণেরই

আগ্রহ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাস্তবিক কিরূপ আর্ত্তি লইয়া যে গুরুলাভের জন্য ত্রাণেচ্ছু লোকে ছটফট্ করেন, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের বুঝা সম্ভব নহে, অথচ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শিষ্যগণের এবং তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থিগণের অধিকাংশই দরিদ্র লোক, শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহার দর্শন অথবা দীক্ষালাভ করিতে অসমর্থ। বোধ করি ইহাদের প্রতি করুণাপরবশ হইয়াই শ্রীভগবান্ এই অবস্থার সৃষ্টি করিলেন। অনেক স্থানেই দীক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ ত তৎস্থানীয় আমাদের গুরুভ্রাতৃগণকে অনুরোধ করিতেন। তাঁহাদের অন্তরে ত এজন্য বাসনা ছিলই, গুরুদেবের সঙ্গলাভের জন্য আগ্রহ শিষ্যের স্বভাবতঃই থাকে, সুতরাং এইরূপ প্রস্তাবে তাহারাও উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিতেন ও সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন। ইহার ফলে অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে অনেকবার বঙ্গদেশাভিমুখে আসিতে এবং বাংলা, বিহার ও আসামের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ শিষ্যগণই প্রার্থনা করিতেন ও তাঁহার আসিবার সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করিতেন, পরে অনেক স্থলে জনসাধারণই উদ্যোগী হইয়া এজন্য প্রার্থনা করিতেন এবং অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত ব্যবস্থা করিতেন *। আন্তরিক আহ্বান শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। শেষের দিকে যখন তাঁহার দেহ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এই বিষয় লইয়া অনেকস্থলে আমাদের সহিত এই সকল দূরদেশীয় ভদ্রলোকগণের রীতিমত তর্ক উপস্থিত হইত। আমরা তাঁহাকে যাইতে দিতে চাহিতাম না—তাঁহারাও শুনিতে চাহিতেন না। আমরা জিদ করিলে, অপরপক্ষ অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন, এরূপস্থলে শেষ পর্য্যন্ত

* শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ফরিদপুর প্রভৃতি অনেক স্থানেই এইরূপ ঘটিয়াছে। বহুলোকে শাকর করিয়া আসিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিতেন।

আমাদিগকেই হার মানিয়া বিশেষ সাবধানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত অধিক সংখ্যায় তাঁহার সহিত যাইতে হইত। বলা বাহুল্য, আহ্বানকারী জনগণ তাহাতে আরও আনন্দিত হইতেন।

কলিকাতাস্থ শিষ্যগণ শীঘ্রই কথা তুলিলেন—শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীর প্রাচীন হইয়াছে, বৃন্দাবনে অসহ্য গরম, অতএব গ্রীষ্মকালে তিনি বঙ্গদেশে আসিয়া অন্ততঃ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় প্রভৃতি দারুণ গরমের মাস কয়টা কাটাইয়া গেলে ভাল হয়, তাঁহার প্রাচীন শরীরের পক্ষে ইহার এক্ষণে আবশ্যকতা হইয়াছে ইত্যাদি। এই মর্ম্মে তাঁহার নিকট পত্রও প্রেরিত হইতে লাগিল। এদিকে শ্রীহট্টে এক ব্যাপার উপস্থিত হইল। তিনি যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন এ সংবাদ সেখানে পৌঁছিয়াছিল। শ্রীহট্টের একটি গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান এবং বাঙ্গালীর, বিশেষ করিয়া শ্রীহট্টবাসীর, তিনি গৌরবস্থল, প্রথম কয়েক বৎসর তিনি শ্রীহট্টেই ওকালতি করিয়াছিলেন এবং সেই স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহার প্রতিভার খ্যাতি এরূপ হইয়াছিল যে তিনি তদ্দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন, তৎপর কলিকাতা চলিয়া আসিলেও সংসারত্যাগের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত দেশের সহিত তাঁহার যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ ছিল এবং চরিত্রগুণে ও অন্যান্য বহু কারণে তিনি শ্রীহট্ট জেলার আপামর সাধারণের ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ত্যাগের ও সন্ন্যাস গ্রহণের কথাও সেখানকার লোকে জানিতেন এবং তৎফলে পূর্ব্বকার ভালবাসা এক্ষণে অপরিসীম শ্রদ্ধা-মণ্ডিত হইয়াছিল। তিনি এক্ষণে খ্যাতনামা মহাপুরুষ ও চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মহন্ত হইয়া সাধুসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছেন, ইহাও অনেকেই

জানিতেন। তিনি যে বঙ্গদেশে আসিয়া কিছুকাল ছিলেন ও কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন, এই সংবাদ যখন শ্রীহট্টে প্রচারিত হইল তখন সেখানকার আপামর জনসাধারণ তাঁহাকে একবার দর্শন করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। ভাদিকাবানিবাসী প্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কর মহাশয় শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে বাল্যাবধি অতিশয় ভালবাসিতেন। প্রথম যৌবনে বাবাজী মহারাজ ব্রাহ্ম হইলে যখন শ্রীহট্ট জেলায় খুব আন্দোলন হইয়াছিল ও তৎফলে তাঁহার পিতা ও সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে স্বসমাজের লোকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন ও বহুবর্ষ যাবৎ নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীযুক্ত কর মহাশয় ইঁহাদের পক্ষে ছিলেন এবং স্বয়ং নানা উপদ্রব অত্যাচার সহ্য করিয়াও সর্ব্বদাই ইঁহাদের সহায়তা করিতেন। ইঁহাকে অগ্রণী করিয়া শ্রীহট্টের জনসাধারণ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে শ্রীহট্টে নেওয়াইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন ও বৃন্দাবনে তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র দিতে লাগিলেন।

শ্রীহট্টবাসীর অন্তরের আহ্বানে ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজীমহারাজ শ্রীহট্ট অভিমুখে যাত্রা করিলেন *। পথে গাড়ী বদলের জন্য নৈহাটী জংশনে প্রায় বার ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে

* সংসারত্যাগী সাধু সন্ন্যাসিগণের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে একবার জন্মস্থান দর্শন করিয়া আসিতে হয়। বার বৎসর পূর্ণ হইলে সাধারণতঃ এ কাজ করা হয়। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ ১৩২২ সালের কার্ত্তিক মাসে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন। বার বৎসর পূর্ণ হইবার পর ১৩৩৩ সালের শেষভাগে তিনি তাঁহার জন্মস্থান বামৈ গ্রামে পূর্ব্বাশ্রমের নিজ বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তৎপর ১৩৩৮ ও ১৩৪১ সালে শ্রীহট্ট জেলায় গিয়াছিলেন। কিন্তু বামৈ পরগণা অথবা বামৈ গ্রাম পর্য্যন্ত আর কখনও যান নাই। পূর্ব্বাশ্রমের স্মৃতির উদ্রেক হয় এরূপ স্থানে না যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় মত ছিল।

হইল। এই সময়টুকু তিনি কৃপাপূর্ব্বক নৈহাটীস্থ আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল তাঁহারাই যে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলেন ও কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন তাহা নহে, স্থানীয় লোকেরাও বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। আর একটি ঘটনা এখানে হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে কলিকাতায় আনিবার জন্য অনেকদিন হইতে কলিকাতাস্থ শিষ্যগণ পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার শ্রীহট্ট যাইবার তারিখ, পথে নৈহাটীতে একদিন থাকিবার কথা প্রভৃতি অনেকেই জানিতেন। এই দিনটি ছুটীর দিন ছিল না, তৎসত্ত্বেও একবার তাঁহার দর্শন পাইবার নিমিত্ত বহুলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূরস্থান হইতেও অনেকে আসিয়াছিলেন। এখানে সারাদিন আনন্দোৎসব চলিল। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের দর্শন, সৎ-প্রসঙ্গে সাংসারিক চিন্তা হইতে পূর্ণ অবসর, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন স্বচ্ছন্দ আচরণ, দীর্ঘকালান্তে অকৃত্রিম বান্ধবগণের সহিত মিলনআনন্দে সারাটা দিন সকলের প্রাণ ভরপুর হইয়া রহিল। রাত্রি প্রায় ১১টায় ঢাকা মেলে সঙ্গিগণসহ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীহট্ট অভিমুখে চলিয়া গেলেন। শ্রীহট্টে যে ব্যাপার ঘটিল, তাহা অতি অদ্ভুত।

শ্রীহট্ট বাজার ষ্টেশনে নামিয়া সুর্ম্মা নদী পার হইলেই দেখা গেল, মোটর লইয়া অনেক ভক্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এক মোটরে বাবাজী মহারাজ, কয়েকজন শিষ্য এবং অপর মোটরে আর সকলে চড়িলেন। মোটরে চড়িবামাত্র বিপুল জনতা আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই বলে 'সন্তদাসজী কোথায়, তাঁহাকে একটু দর্শন করি।' এইরূপ বলিতে বলিতে বহুদূরব্যাপী জনতার মধ্যে ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল। বহুলোক মোটরের দুই পার্শ্বের উপরে (ফুটবোর্ডে) দাঁড়াইয়াই দর্শন

করিতে লাগিল। ড্রাইভার গাড়ীর উপরে দাঁড়াইতে নিষেধ করিলেও কেহ শুনে নাই। কতক্ষণ পরে মোটর চালাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এত লোক যে চালাইবার সুবিধাই হয় না। বহু চীৎকার করিয়া রাস্তা ছাড়িবার জন্য বলিতে বলিতে একটু একটু অগ্রসর হইতে লাগিল। মোটর যখন একটু একটু চলিতে আরম্ভ করিল, তখনও দুই পার্শ্বে মোটরের উপর অনেক লোক দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছিল। নিষেধ করিলেও মানে না। এইরূপে মোটর ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল, জনতাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অনেক পথ অতিক্রান্ত হইলে, জনতা পশ্চাৎ পড়িতে লাগিল, তখন চালক মোটরে একটু বেগ দিতে লাগিল। তথাপি জনতা পশ্চাৎপদ হয় নাই। তখন মোটরের পিছনে ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়া গেল। দুই চারিজন প্রাণপণে দৌড়িয়া লাফ দিয়া মোটরের পাশে উঠিয়া বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে লাগিল। ইহাঁদের ধর্ম্মভাবের তুলনা হয় না, ধর্ম্মের জন্য ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত! কতক্ষণ পরে মোটর গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শ্রীহট্ট ভ্রমণের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও দুই একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখমাত্র এই প্রসঙ্গে করিব। শ্রীমঙ্গল, বামৈ, হবিগঞ্জ, শিলচর প্রভৃতি অনেকগুলি স্থানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ভ্রমণ করেন। সর্ব্বত্রই এরূপ বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল যে তাহা না দেখিলে ধারণা করা যায় না। সমাগত সহস্র সহস্র নরনারীর যে ব্যাকুলতা ও ভক্তি দেখা গিয়াছিল তাহাও অবর্ণনীয়। বামৈ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের জন্মস্থান, এখানে যে কয়দিন তিনি ছিলেন সে কয়দিন ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে মেলা বসিয়া গিয়াছিল। একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল; তদুপরি আসীন হইয়া বাবাজী মহারাজ সকলকে দর্শন

দিতেন, নিস্তব্ধ জনসমুদ্র মুগ্ধনেত্রে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিত। জনস্রোত রোধ করিবার নিমিত্ত কয়েক হাত দূরে বাঁশের বেড়া দেওয়া হইয়াছিল—এক এক সময় লোকের চাপে তাহা ভাঙ্গিবার মত হইত। অন্যত্র দূরের লোক আসিলে যাঁহার বাড়ীতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ থাকিতেন, তিনি অথবা কয়েকজনে মিলিয়া সমাগত জনগণের সৎকার করিতেন—বাবাজী মহারাজের ভ্রমণকালে ইহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে এবং শ্রীহট্টের আরও কয়েকটি স্থানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। প্রসাদ বিতরণে কার্পণ্য ছিল না, তথাপি অজস্র বিতরণ সত্ত্বেও তাহা অসম্ভব হইয়াছিল। দশ বার ক্রোশ দূর হইতে হাঁটা পথে তীর্থযাত্রীর ন্যায় চাল চিঁড়া বাঁধিয়া লইয়া বন্যার স্রোতের ন্যায় অগণিত নরনারী আসিয়াছেন, অনাবৃত স্থলে উন্মুক্ত আকাশতলে রাত্রিযাপন করিয়াছেন, "কই, মহারাজ কই ?" সবারই এই এক প্রশ্ন, মুখে চোখে ব্যাকুল আগ্রহ, অনেকের নয়নে অশ্রু। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। নবাগত লোকেরা তাঁহার দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করিতেন। দর্শন পাইলে তবে আশ্বস্ত হইতেন। নানা স্থানে বহু নরনারী তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের দত্তরালী গ্রামের শ্রীবঙ্কবিহারী রাহা নামক একজন ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষালাভ করেন। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর দীক্ষালাভের বিবরণ এইস্থলে প্রাসঙ্গিক হইবে মনে করিয়া তাঁহার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "* * * * * আমি সদ্‌গুরুর কৃপালাভের জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলাম। * * * * অবশেষে দীর্ঘকাল এইরূপে প্রতীক্ষা করিবার পর আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। ১৩৩৫ সালের

২৮। বৈশাখ, সোমবার আমাদের পরমারাধ্য ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীহট্টে পদার্পণ করিয়া জিন্দাবাজার শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ দত্ত উকিল মহাশয়ের বাসায় আসন স্থাপন করেন। আমি এই সময় শ্রীহট্ট হইতে পাঁচ মাইল দূরে খাদিমনগর চা বাগানের কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। মঙ্গলবার সকালে তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াই আমার প্রাণে এমন একটি আকর্ষণের সঞ্চার হয় যে, আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে ঐদিন বিকালেই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায় বাগানের মোটরযোগে শ্রীহট্ট আসিয়া সোজা জিন্দাবাজার যাই। সেখানে গিয়া দেখিলাম, বাবাজী মহারাজকে দর্শনের জন্য লোকে লোকারণ্য, ঘরের সকল দ্বার বন্ধ, পশ্চাতের একটি দ্বার মাত্র খোলা; খিড়কীর ফাঁক দিয়া অতিকষ্টে দেখিলাম, বাবাজী মহারাজ একখানি পালঙ্কের উপর বসিয়া তিলক-স্বরূপ করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শনের বাসনা আমার প্রাণে এত প্রবল হইয়াছিল যে, আমি অতি বেগে কাহারও বাধার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ঐ পশ্চাতের খোলা দ্বার দিয়া অতি কষ্টে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাবার সাক্ষাতে সাষ্টাঙ্গে লম্বা হইয়া পড়ি ও বাবার সৌম্য মূর্ত্তি ও চোখের তেজঃপুর্ণ দৃষ্টি দেখিয়াই তাঁহার শ্রীচরণে আমার মনঃপ্রাণ সমর্পণ করি। আমার প্রাণের ঐকান্তিকতা ও অবস্থা দেখিয়াই বোধ করি বাবা সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও আমাকে বাধা দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমি উঠিয়া করজোড়ে দাঁড়াইলে আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন; আমিও অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম। কি উদ্দেশ্যে গিয়াছি জিজ্ঞাসা করায় আমি অতি কাতরকণ্ঠে বলিলাম "বাবা! এ অধম আপনার কৃপালাভের জন্য শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত, আমাকে দয়া করিয়া দীক্ষা দিয়া আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করুন।" একটু চিন্তা করিয়া আমাকে বাবা বলিলেন "তুমি তো দীক্ষিত, তবে আবার দীক্ষা

গ্রহণ করিতে চাও কেন ?" উত্তরে আমি আমার পূর্ব্বদীক্ষা সম্বন্ধীয় বিবরণটি অতি সংক্ষেপে বাবার কাছে বলিলাম। তখন একটু সময় আমার মুখপানে চাহিয়া বাবা বলিলেন "যদি তোমার পূর্ব্বগুরুর নিকট হইতে কোন উপদেশ না পাওয়া যায় এবং তোমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে তাহা হইলে পুনরায় দীক্ষাগ্রহণ করিতে পার।" পরক্ষণেই আদেশ করিলেন, তুমি পরশ্ব (৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার) সকালে ৮টার মধ্যে একখানা আয়না, একছড়া জপের মালা ও একখানা নূতন কাপড় লইয়া মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক স্নান করিয়া এখানে আসিবে। তিলকের জন্য গোপীচন্দন ও গলার জন্য তুলসীর মালা (কণ্ঠী) এখানে পাইবে। বাবার আদেশ পাইয়াই আমি এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমার স্ত্রীর কান্নাকাটি নিজে দেখিয়া আসা সত্ত্বেও তাহার দীক্ষা সম্বন্ধে একটি কথাও বাবাকে জিজ্ঞাসা করিতে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসি ও বাগানের মোটরে সোজা বাসায় চলিয়া আসি। বাসায় গিয়া সকল কথা বলার পর, বাবার কাছে আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই শুনিয়া সে অতি ব্যাকুলা হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আমি কিন্তু সেদিকে একটুও মনোযোগ না দিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে বাবার শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হই ও যথাসময়ে বাবার কৃপালাভ করি। দীক্ষান্তে বাবা আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন—"তুমি আসার সময় মাইকে কেন আনিলে না ?" আমি বলিয়াছিলাম "বাবা! তাহার সম্বন্ধে আমি আপনার অনুমতি গ্রহণ করি নাই বলিয়াই আপনি পাছে অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে তাহাকে আনি নাই।" বাবা বলিলেন, "সে বড়ই আর্ত্তনাদ করিতেছে ও অশান্তি ভোগ করিতেছে ; তুমি কল্য সকালে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে। তাহাকে কিছুই বলিতে হইবে না। এখানে আসিলে আমি সব ঠিক

করিয়া লইব।" আমি তখন বুঝিলাম, তাহার কান্না বুঝি বাবার কাছে পৌঁছিয়াছে। দীক্ষার পর প্রসাদ পাইবার আদেশ পাইয়া আমি আমার ছেলের বাসায় যাই। সেখানে গিয়া দেখি আমার স্ত্রীও বাগান হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি বাসা হইতে আসিবার সময় এমন উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতেছিল যে, তাহার কান্না শুনিয়া পাশের বাসার সকল লোক আমার বাসায় জড় হইয়া গিয়াছিল। আমি আসার পর সে কোনমতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া এবং বাগানে মোটর পাইবার অন্য কোন উপায় না থাকায় আফিসের অন্য একটি বাবুকে দিয়া ম্যানেজার সাহেবের কাছে মোটর চাহিয়া পাঠায়। সাহেবও সকল অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহার নিজের মোটর দিয়া তাহাকে শ্রীহট্টে পাঠাইয়া দেন। আমি ছেলের বাসায় গিয়া দেখিলাম, সে বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে। আমাকে দেখিয়াই অন্য কিছু না বলিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কাজ তো হইয়াছে দেখিতেছি; বাবা কি আমার কথা কিছু বলিয়াছেন?" আমি বলিলাম "হাঁ! কল্য সকালে তোমাকে দীক্ষা দিবেন বলিয়া আদেশ করিয়াছেন।" তাহার মুখে সকল কথা শুনিয়া বুঝিলাম, যত কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনার সংঘটন হইয়াছে, সমস্তই বাবার লীলাখেলা মাত্র। আমার মুখে তাহার দীক্ষা পাইবার কথা শুনিয়া কত যে আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহা বলিবার নহে। আমি তাহাকে কোনদিন এরূপ শান্তিলাভ করিতে দেখি নাই, যেন মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হইল। তাহার দীক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আমি রাত্রে বাগানে চলিয়া আসি। পরদিন সকালে বাবা কথামত তাহাকে দীক্ষাদান করিলেন।"

দ্বিতীয় বারে যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীহট্টে আসেন তখন নবিগঞ্জে অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্নে তিনি একটি ঘরের ভিতর

আছেন, সেখানে অসম্ভব ভিড। আর বেশী লোক ঘরের ভিতর না যাইতে পারে, অনেকটা ইহার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে আমি দ্বারদেশে ছিলাম, এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটি মহিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার পায়ে একহাঁটু কাদা, ক্রোড়ে একটি শিশু। আসিয়াই ব্যগ্রভাবে আমাকে বলিলেন, "বাবাজী মহারাজ কই? একটু বলিয়া দিন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছি।" আমি বলিলাম, "তিনি এখন ঘরের ভিতর আছেন, আপনি অপেক্ষা করুন, কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন।" শুনিয়া মহিলাটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন 'দেখুন, আমি এই ছেলে কোলে লইয়া জল-কাদা ভাঙ্গিয়া আসিয়াছি। পথে এক এক স্থানে এত জল যে দেখুন, আমি কাপড় বাঁচাইতে পারি নাই। আপনি আমাকে আর বারণ করিবেন না। আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে।" তখন ইহার অবস্থা দেখিয়া এবং কাকুতি-মিনতি শুনিয়া আমি কোন প্রকারে পথ করিয়া ইহাকে লইয়া বাবাজী মহারাজের দর্শন করাইয়া দিলাম তখন মহিলাটি শান্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এক একটি স্থানে গেলে সেখানে কিরূপ অবস্থা হইত সে সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল বর্ণনা করিয়াছি, তৎসমস্ত আমাদেরই কথা। অপরে কিরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাও নিম্নে দিলাম। ১৩৩১ সালে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গিয়াছিলেন। ১৩৪৫ সালের মাঘ সংখ্যা 'শ্রীসুদর্শন' পত্রিকায় তথাকার উকিল শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দত্ত মহাশয়* এক প্রবন্ধে এ বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—"১৩৩১ সালের

* ইনি আমাদের গুরুভ্রাতা নহেন।

৫ই ভাদ্র একটি স্মরণীয় দিন, ঐ দিন তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসিয়াছিলেন এবং চার পাঁচ দিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সূর্য্যোদয় হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত দলে দলে লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেও নৌকায় নৌকায় অগণিত লোক আসিয়া সহরে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সকলেরই মুখে এক কথা "সাধুদর্শনে চলিয়াছি।" ঘাটে, মাঠে, পথে, আদালতে, স্কুলে, বাজারে সর্ব্বত্রই শুধু সাধুর কথা; কে কি দেখিল, কে কি শুনিয়াছে, তাঁহার সঙ্গে কাহার কি আলাপ হইয়াছে ইত্যাদি কথা লইয়া সহর মুখর হইয়া গিয়াছে। পর্ব্ব উপলক্ষে তীর্থস্থানে বা গঙ্গার ঘাটে লোকের যেমন ভিড় হয় ইহাও সেইরূপ ভিড়—যেন একটা মেলা বা মহোৎসব বসিয়াছে।

"**সদ্য বিধবা চোখের জল মুছিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিল। পুত্রশোকে কাতরা জননী গৃহ ছাড়িয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইল। কেহ তাঁহার নিকট পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল, কেহ বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদেশ মত জীবন গঠন করিতে ব্রতী হইল। এইভাবে তাঁহার অবস্থিতির স্থান যেন পুণ্যতীর্থ হইয়া উঠিল,—সর্ব্বক্ষণ সে স্থানে লোকে লোকারণ্য হইয়া রহিল—দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তজনের কলকণ্ঠে সে স্থান কিরূপ মুখর হইয়াছিল, মনে হইলে স্বপ্নের মত মনে হয়। বলিতে কি, সমস্ত সহর যেন তাঁহার পুণ্যপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। শুনিয়াছি তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন সেখানেই এরূপ অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহার মহত্ব ও মহিমা প্রচার করিয়াছে। তাঁহার আকর্ষণ-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।"

১৩৩৮ সালে বঙ্গদেশ ও আসাম ভ্রমণকালে তিন জায়গায় তাঁহার পূজা উপলক্ষে বহু লোকের ভিড় ও অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। তত্ত্ৎ-

স্থানীয় গুরু ভ্রাতাভগিনীগণের একান্ত ইচ্ছায় এইবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষরূপে তাঁহার পূজা (গুরু পূজা) করা হয়,—শ্রীহট্টে দশহরার দিন (তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে), হবিগঞ্জে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রার দিন, ও শিবপুরের ১২নং ভড়পাড়া রোডের বাড়ীতে আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন (গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে)। সকলের ইচ্ছানুসারে এই তিন স্থানেই পূজা করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। এই পূজা ও স্তুতিপাঠকালীন তাঁহার স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ও করুণামাখা মূর্ত্তি, আমাদের প্রতি কৃপাবর্ষণ ও উপস্থিত জনগণের আনন্দজনিত সাশ্রুনয়ন নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে স্থিতি প্রভৃতির চিত্রটি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। এখন পর্য্যন্তও দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকের মুখে শুনিতেছি যে, সেই চিত্রটি তাহাদের চিত্তে চিরমুদ্রিত হইয়া আছে।

এই ভ্রমণের সময়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ব্যবহারের একটি দিক্ আমাদের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিত। সেটি তাঁহার নিয়মনিষ্ঠা। আশ্রমে থাকিতে যে নিয়মে থাকিতেন, ভ্রমণকালের দ্রুতপরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যেও ঠিক সেই প্রণালীতেই দিনের পর দিন আমাদের অতিবাহিত হইত। প্রত্যূষে উত্থান, শৌচ, প্রভৃতি নিয়মিত-রূপেই নিজে করিতেন, আমরাও যাহাতে নিয়মিতরূপে করি, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, শ্রীশ্রীশালগ্রামদেব, গোমতীচক্র, একটি গোপালমূর্ত্তি এবং তাঁহার শ্রীগুরুদেবের একখানি ফটো সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ইহাদের সেবা যাহাতে যথাসময়ে নিয়মিতরূপে হয় সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিত, আমরা সে বিষয়ে কোনরূপ শৈথিল্য করিলে বিশেষরূপে শাসন করিতেন, সময়ে সময়ে সেবার কার্য্য স্বহস্তে করিতেন। আমাদের মধ্যে যাহার উপর যখন সেবা পূজার ভার থাকিত আলস্য, নিদ্রা অথবা অপর কোনরূপ

শৈথিল্যে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর কার্য্যে যাইতে বিলম্ব হইলে আমরা অতিশয় ভীত হইতাম, তাড়াতাড়ি স্নানাদি সারিয়া গিয়া আশঙ্কানুরূপই দেখিতে পাইতাম, বাবাজী মহারাজ স্বয়ংই আসিয়া সেবার কাজে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে সাধারণতঃ বিশেষরূপে শাসন করিতেন ও পূজাস্থানে যাইতে দিতেন না, অনুতপ্ত হইয়া অনেক অনুনয় করিলে পরে দিতেন। ট্রেণে অথবা ষ্টীমারে দীর্ঘপথ চলিতে হইলে, তত্তৎ-যান মধ্যেই ব্যবস্থা করিয়া লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরজীর আরতি, কখন কখন সেবা-পূজাও করিতে হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ স্থলে সর্ব্বদাই প্রয়োজনানুরূপ সুযোগ এবং অনুকূল অবস্থা সংঘটিত হইত। একক্রমে একাধিক দিন ট্রেণে চলিতে হইলে অনেক সময় পথে কোন ষ্টেশনে নামিয়া যথাসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা-পূজা করিয়া ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইয়া পুনরায় ট্রেণে উঠিতেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গেও এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ একটি ঘটনার বিবরণ এইস্থলে দিতেছি। ১৩৩৮ সালে যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দ্বিতীয়বার শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন, তখন গৌহাটী হইতে শ্রীহট্টে যাওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে আনিবার জন্য শ্রীহট্টবাসিগণ আমাদের তত্রত্য দুইজন গুরুভাইকে গৌহাটী পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে চলিলেন। সন্ধ্যার সময় গাড়ীতে উঠিলাম—সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ পার হইয়া পাহাড়ের পথে আসাম-বেঙ্গল রেলের গাড়ী চলিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে সবগুলি লক্ষ্য করা গেল না। সকালে মৈবং নামক পথিপার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে অবাক হইয়া দেখি সেই নির্জ্জন ক্ষুদ্র ষ্টেশনে ব্যস্তভাবে সকলে অবতরণ করিতেছেন। স্থানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। চারিদিকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং পার্ব্বত্য ঝরণার নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া

বেশ আনন্দ হইল, ততোধিক বিস্ময় হইল সেখানে পাকাদির সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিয়া। শ্রীহট্ট হইতে আমাদের সঙ্গী সেই দুইজন গুরুভ্রাতার নিকট জানিলাম শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অনুমত্যনুসারে তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। স্নানের পর একদিকে কয়েকজন রন্ধনে ব্যাপৃত হইলেন, অপরদিকে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা পূজায় নিযুক্ত হইলাম। ইতিমধ্যে বহু স্থানীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন, আরতির সময় সকলে সানন্দে দর্শন করিতে লাগিলেন। আরতির পর স্তুতিপাঠ হইল। অতঃপর সকলে আসিয়া ভক্তিপূর্ণনেত্রে বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রণাম করিয়া একদল চলিয়া গেলে আবার একদল আসিয়া উপস্থিত হইলেন—এইরূপে যতক্ষণ আমরা সেখানে ছিলাম, স্থানীয় অধিবাসীদের ভিড় কোন সময়ই কমে নাই। শীঘ্রই পাক শেষ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ লাগাইয়া জয়ধ্বনি দিয়া সকলে প্রসাদ পাইলাম। সমবেত লোকেরাও বিশেষ ভক্তি ও আগ্রহের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই নিস্তব্ধ প্রাকৃতিক সুষমামণ্ডিত উন্মুক্ত স্থলে সেদিন যে আনন্দ হইল, তাহা কি করিয়া বুঝাইব? পুনরায় ট্রেণে উঠিবার সময় স্থানীয় লোকগণ সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফর্ম্ম পর্য্যন্ত আসিলেন এবং সকলে বাবাজী মহারাজের জয় দিতে লাগিলেন। সেই সুরে সুর মিলাইয়া মহানন্দে আমরাও মাঝে মাঝে জয় দিতেছিলাম। অবশেষে তাহাদের সমবেত কণ্ঠের মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনির মধ্যে আবার আমরা ট্রেণে আরোহণ করিলাম। আর একটি বিষয় আছে যাহা এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহা তাঁহার উৎসাহ। যখন তাঁহার সহিত এইরূপে আমরা বঙ্গ, বিহার ও আসামের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তখন তাঁহার শরীর প্রাচীন হইয়াছে, কখন কখন রুগ্নও থাকিত।

তথাপি রোগ ও শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সর্ব্বদাই তাঁহাকে যুবকের ন্যায় উৎসাহশীল দেখিয়াছি। আমাদিগের মধ্যে যাহারা এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে সেবাশুশ্রূষার্থ থাকিতাম, সকলেই তরুণ যুবক ছিলাম, কিন্তু উদ্যমশীলতা বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠিতাম না। এক স্থান হইতে অপর এক স্থানে যাইবার সময়ে তিনি সর্ব্বদাই ঘড়ী দেখিয়া ট্রেণ বা ষ্টীমারের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রস্তুত হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সময়ানুসারে সেবা, জিনিষপত্র গুছান, আমাদিগকে প্রয়োজন স্থলে কিছু খাওয়াইয়া লওয়া, স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া শুধু যে এইগুলিই সম্পন্ন করাইতেন তাহা নহে, আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। যে স্থানে ছিলাম, তথাকার লোকেদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে তিনি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিতেন। অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী নানাস্থান হইতে যে সকল লোক সেই বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সময়মত আহারাদি করিয়া প্রস্থানের বন্দোবস্ত, সংগৃহীত দ্রব্যাদির যাহাতে অপচয় না ঘটে তাহার ব্যবস্থা, সেই বাটীর লোকদের সর্ব্ববিষয়ের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্তই যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেন। একটি ঘটনার কথা স্মরণ হইতেছে। ১৩৩৮ সালে পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণকালে কোনও একটি সহরে একজন দরিদ্র গুরুভ্রাতার গৃহে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই গুরুভ্রাতাটি অল্প বেতনের একজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁহার মাসিক আয় পঞ্চাশ কি ষাট টাকার অধিক ছিল না। তাঁহার বাটীতে নিকটস্থ ও দূরবর্ত্তী অনেক স্থান হইতে বহু গুরুভাইভগিনী এবং অন্যান্য লোকও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, অনেকে দীক্ষা-প্রার্থীও ছিলেন। পাশের একটি বৃহৎ ত্রিতল বাটী ব্যবহারার্থ পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহা সমাগত জনগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

গুরুভ্রাতাটি সাধ্যাতীত ব্যয়ে প্রাণপণ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ও সমাগত লোকগণের সেবা করিয়াছিলেন। এইখানে আমরা চারিদিন ছিলাম। অনন্তর প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইলে অভ্যাগতদিগের অধিকাংশ স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন, কেহ কেহ আমাদিগের সঙ্গে চলিলেন, কয়েকজন আরও দুই এক দিন থাকিয়া যাইবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারা গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইহাদের ইচ্ছা ছিল আর কয়েকদিন থাকিয়া সহর দেখিয়া যাইবেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহা লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে বুঝাইয়া সেই দিনই বাড়ীতে ফেরত পাঠাইলেন। ইহারা আরও কয়েকদিন সেখানে থাকিলে শিক্ষক গুরুভ্রাতাটি অবশ্য আপত্তি করিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে আর্থিক ক্লেশে বিব্রত হইতে হইত। এরূপ অবস্থায় তাঁহার উপর আরও চাপ দেওয়া ইহাদের পক্ষে সঙ্গত হইত না, এই ভাবিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই দরিদ্র গুরুভ্রাতাটির কিছু ঋণ ছিল, তাহার পরিশোধেরও একপ্রকার ব্যবস্থা বাবাজী মহারাজ এইবারেই করিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাপারেও তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। এক-স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময় এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেন। ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল এবং ইহার কয়েকটি আনুষঙ্গিক শুভ ফলও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ১৩৩২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৪২ সাল পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক দশবর্ষকাল মধ্যে অন্ততঃ ছয় সাতবার আমরা বঙ্গদেশে আসিয়াছি, শত শত স্থান এবং হাজার হাজার মাইল আমাদিগকে ট্রেণে এই সময় পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সাধারণতঃ ফাল্গুন, চৈত্র অথবা

বৈশাখ মাসে বৃন্দাবন হইতে রওয়ানা হইতেন এবং শ্রাবণ কিম্বা ভাদ্র-মাসে ঝুলন পূর্ণিমার পূর্ব্বেই আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেন। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনকালে ব্যস্ততা বশতঃ কোন জিনিষ ফেলিয়া যাওয়া অথবা তদ্রূপ অন্য কোন ঘটনা খুব কমই ঘটিয়াছে। কখনও দেরীর জন্য ট্রেণ অথবা ষ্টীমারে উঠিতে পারি নাই বলিয়া স্মরণ হয় না। ইহার আর একটি ফল হইত, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যখন কোন স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইতেন, তখন সেখানে কান্নাকাটি পড়িয়া যাইত। মেয়েদের ত কথাই নাই, বিশেষ ধৈর্য্যশালী পুরুষেরাও অনেক সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থায় যদি সময়াভাবে পরস্পরের সহিত বিদায়ের ক্ষণে একটু আলাপ করিতেও না পারা যায়, যথোপযুক্ত প্রণামসম্ভাষণাদিরও সময় না থাকে, তাহা হইলে এই সকল সন্তপ্ত নরনারীর প্রাণে আর একটি অনাবশ্যক, অথচ অতি রূঢ় আঘাত দেওয়া হয়। এরূপ আমাদিগকে কখনই করিতে হয় নাই। বরঞ্চ শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সকলের মধ্যে একটা কর্ম্মব্যস্ততা সঞ্চারিত করিয়াছেন, এরূপও স্থানে স্থানে অনুভব করিয়াছি।

১৩৩৮ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যশোহর জিলার কোন কোন স্থান ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা যাইবার পথে দৌলতপুর কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছিলেন। ঐ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুকুন্দদেব চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহাদের বাটীর সকলে এই উপলক্ষে সেখানে আসিয়াছিলেন। রন্ধনাদির সমুদায় ব্যবস্থা করা ও অন্যান্য বহু কার্য্যের ভার ইঁহাদিগের উপর পড়িয়াছিল। কলিকাতা

যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অভ্যাস মত বেশ একটু আগে থাকিতেই প্রস্তুত হইয়া বাহিরে একখানি চেয়ারে বসিয়াছেন, তাঁহার আসন উঠাইয়া বাঁধা হইয়া গিয়াছে, সকলে আসিয়া তাঁহাকে প্রায় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহার মধ্যে মুকুন্দবাবুর পিসীমা এবং ভগ্নীও ছিলেন। সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিতে ইহাদের বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, তখনও খাওয়া হয় নাই, এদিকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া ইহারা অন্য তখন খাইতে না বসিয়া, তাঁহার নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহাদিগকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন "কি মাই! তোমরা প্রসাদ পাইয়াছ?" তখন তাহারা বলিলেন "না বাবা, আমরা প্রসাদ পরে পাইব, এখন একটু আপনার কাছে আসিয়াছি।" তাহাতে বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "না মাই, তোমরা এখনই গিয়া প্রসাদ পাও, আমার এখনও অনেক সময় আছে, তোমরা অভুক্ত রহিয়াছ দেখিয়া যাত্রা করিলে আমি পথে স্বস্তি পাইব না। যাও, প্রসাদ পাইয়া আবার আমার কাছে এস।" এমন মধুময়, স্নেহপূর্ণ স্বরে তিনি কথাগুলি বলিলেন যে, তাঁহারা আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না, অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রসাদ পাইতে গেলেন। সত্যই তখনও ট্রেণের অনেক সময় বাকি ছিল এবং তাঁহারা প্রসাদ পাইয়া আসিয়াও সেই পরমস্নেহময় পিতার পদপ্রান্তে বসিবার সময় পাইলেন।

সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই সকালে এবং সন্ধ্যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরজীর আরতির পর, কোন উন্মুক্ত স্থানে অথবা বড় হল ঘরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বসিতেন। এই সময়ে জনসাধারণ তাঁহার দর্শন পাইতেন। কেহ বা ভক্তিপূর্ণনেত্রে নীরবে শুধু তাঁহাকে দর্শনই করিতেন, কেহ কেহ আবার নানা বিষয়ে সংশয় অপনোদনের নিমিত্ত তাঁহাকে নানাবিধ

প্রশ্নও করিতেন। এই উপলক্ষ করিয়া কত যে অমৃতময় উপদেশ তিনি শান্তিকামী মানবকে দিয়াছেন, আর তাহার ফলে কত সংশয়াত্মা নাস্তিক ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইয়াছেন, কত যে ভ্রমান্ধ লোকের সন্দেহ দূর হইয়া যথার্থ শান্তির পথ লাভ হইয়াছে, কত যে শুষ্ক তার্কিকের চিত্ত স্নিগ্ধ সরস হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শুনিয়াছি অনেক সাধুপুরুষই বলিয়াছেন ও বলিতেছেন যে, ভারতের পুনরভ্যুত্থান নিকটবর্ত্তী। ভারতীয় জনসমাজের প্রতি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এই অজস্র কৃপাবর্ষণের কথা যখন চিন্তা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথ বাবাজী, শ্রীযুক্ত গিরি মহারাজ প্রভৃতি মহাপুরুষগণেরও অনুরূপ কৃপা বিতরণের কথা স্মরণ করি, তখন এই মহাপুরুষোক্তির যাথার্থ্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করি। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এই সকল অমৃতময় উপদেশাবলীর দুই একটি মাত্র এইস্থলে বিবৃত করিতেছি।

সর্ব্বশ্রেণীর লোকই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট উপদেশলাভার্থ আসিতেন। স্ব স্ব সংশয় অপনোদনের নিমিত্ত তাহারা যে সকল প্রশ্ন করিতেন, তাহারও বৈচিত্র্য অসাধারণ, সব রকমের কথাই তাহাতে থাকিত। ধুবড়ীতে ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের বাড়ীতে একবার আমরা কয়েকদিন ছিলাম। এইখানে অবস্থানকালে একদিন একটি মুসলমান যুবক ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি তখন বাটীর ভিতর ছিলেন, এই সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যাইতেছি।" তিনি বাহিরে আসিলে একখানি চেয়ার আনিয়া দেওয়া হইল। তাহাতে তিনি উপবেশন করিলেন, মুসলমান ভদ্রলোকটিও উপবিষ্ট হইয়া বিনীতভাবে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। একটি প্রশ্নের কথা

আমাদের বেশ স্মরণ আছে। তিনি বলিলেন, "আপনাদের তো মুক্তি সম্বন্ধে নানারূপ পন্থার নির্দ্দেশ আছে। আমরা মুসলমান, আমরা কি করিলে যথার্থ কল্যাণ লাভ করিতে পারিব?" উত্তরে বাবাজী মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের কতবার নমাজ পড়িবার ব্যবস্থা আছে?" মুসলমান ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"পাঁচবার।" তখন তিনি বলিলেন, "আপনি নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন পাঁচবার করিয়া নমাজ পড়িয়া যাইবেন, তাহাতেই আপনার পরম কল্যাণ হইবে।" যিনি যে অবস্থায় আছেন নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভগবৎসেবা-বুদ্ধিতে তত্তদবস্থা-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া গেলেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন, এই মর্ম্মে কিছু উপদেশ দিলেন। সাধনাদি বিষয়ক আরও নানা কথা হইল। আমরা কেহ কেহ এই সময় একদৃষ্টে উভয়ের দিকে চাহিয়াছিলাম। দেখিলাম কথা শুনিতে শুনিতে ভদ্রলোকটির মুখশ্রী অতিশয় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কথা শেষ হইলে আমাদের একজনকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "ইহাকে কিছু প্রসাদ আনিয়া দাও।" প্রসাদ আনা হইলে ইনি খুব ভক্তি-সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন। এই সময় স্বগতভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আস্তে আস্তে বলিলেন, "পরে আনন্দ লাভ হইবে।" আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা এই মুসলমান ভদ্রলোকটির বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনিও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। যাইবার সময় ইনি তাহাকে বলিয়া গেলেন, "আজ বড় আনন্দ পাইয়াছি। বাবাজী মহারাজের কথায় আমার সকল সংশয় মিটিয়া গিয়াছে। তিনি যেন আমার অন্তরের সকল কথা জানিয়া সর্ব্ববিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া দিলেন।"

একদিন শ্রীশ্রী স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "সদ্‌গুরুলাভের পর আর কি পতন সম্ভব?"

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিলেন, "সদ্গুরু আশ্রিত শিষ্যকে কোন্ পথ দিয়া কিরূপভাবে গন্তব্যপথে লইয়া যান, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। যাঁহাদের দিব্য দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা অধোগতির লক্ষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও সাধককে তাঁহার গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী করে। বদরিকাশ্রমে যাইবার সময় একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পথে অনেক পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়। কখনও পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হয় এবং পরক্ষণেই হয়ত ক্রমে ক্রমে অনেক নীচে নামিয়া যাইতে হয়, সেখানে সূর্য্যালোকও অনেক কম পাওয়া যায়। উচ্চশিখরে উঠিয়া পরে নীচে নামিয়া গেলে যাত্রীর হয়ত মনে হয়, পূর্ব্বে উচ্চে ছিলাম, এখন নিম্নে পতিত হইয়াছি। পরন্তু পশ্চাৎভাগের উপরিস্থানে থাকা অপেক্ষা এই প্রকার নিম্নে পতিত হওয়া গন্তব্য স্থানের পক্ষে অগ্রসর হওয়াই বলিতে হয়।"

বরিশালের শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বরিশালে গেলে সৌম্যমূর্ত্তি বর্ষীয়ান্ আচার্য্য জগদীশ প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসিতেন, নানা সুন্দর প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন —প্রায়শঃ গীতার কথা, যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সমস্তার মীমাংসা করিতেন, তখন শ্রদ্ধার সহিত তন্ময়ভাবে শ্রবণ করিতেন, মাঝে মাঝে পরিপ্রশ্ন তুলিতেন। মীমাংসান্তে তাঁহার মুখ আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩,৩৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ যে বলিয়াছেন :—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥

ইহার সামঞ্জস্য কি ? প্রথমে বলিলেন, "নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ?" পরশ্লোকেই বলিতেছেন, "তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ ?" ইহাতে একটু খট্‌কা লাগে।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইবে মনে করিয়া তাঁহার উত্তরের মর্ম্ম এই স্থলে উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন "বাস্তবিক এই উভয় উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। প্রকৃতিকে রোধ করিবার চেষ্টা যে নিষ্ফল, তাহা শ্রীভগবান্ গীতাতে অন্যত্রও বলিয়াছেন,

"মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥

ইত্যাদি

বরঞ্চ স্ব স্ব প্রকৃতির অনুযায়ী স্বাভাবিক কর্ম্ম করিতেই বলিয়াছেন, যথা—

স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।

ইত্যাদি—

কোন্‌টি নিষেধ করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে দেখিতে হইবে। "তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ" এই বাক্যে "তয়োঃ" পদ দ্বিবচন, ইহা প্রকৃতির সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই, রাগ এবং দ্বেষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বভাবনিয়ত কর্ম্মই করিতে হইবে। কিন্তু সেই কর্ম্ম নিজের সুখের

জন্য নহে, রাগ ও দ্বেষ-রহিত হইয়া নিষ্কাম ভাবে ভগবৎ-সেবার্থ করিতে হইবে, করিলে তদ্দ্বারাই শ্রেয়োলাভ হইবে। "রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু-বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্। আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি" "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" ইত্যাদি বাক্যে ইহাই বলিয়াছেন। কি প্রণালীতে স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম করিয়া গেলে তদ্দ্বারাই শ্রেয়োলাভ হইতে পারে তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন—

স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য" ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। সর্ব্বপ্রাণীর সমস্ত কর্ম্মের প্রেরক একমাত্র তিনিই—যে প্রকৃতির বশে ভূতগ্রাম এক এক বিশেষ বিশেষ ভাবে চালিত হইতে বাধ্য হয়, সেই প্রকৃতি তাঁহারই প্রকৃতি। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য", প্রতি কর্ম্মের দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করিতেছি, এইরূপ বোধে, ভগবৎসেবা বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া চলিলে তদ্দ্বারাই চিত্ত নির্ম্মল হয় ও সিদ্ধিলাভ করা যায়।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ১৩৩৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রথমবার ময়মনসিংহ গেলে তথাকার জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দে মহাশয় তাঁহার কতকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহার সংগ্রহ হইতে কয়েকটি উপদেশ নিম্নে দিলাম :—

প্রশ্ন :—গৃহস্থলোকের পক্ষে ভগবানের দর্শনলাভের উপায় কি? ইহা অসম্ভব বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

উত্তর :—সন্ন্যাসিগণও সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারেন, গৃহস্থরাও পারেন। তবে দুইটিতে প্রভেদ আছে। আমার বাবাজী মহারাজ একটি গল্প বলতেন। এক রাজা তাঁহার মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে এই প্রচার

করেছিলেন যে এক কড়াই তেল ফুটতে থাকবে, যিনি এই ফুটন্ত তেলে ডুব দিতে পারবেন তিনি এই কন্তা পাবেন। এক রাজার ছেলে তার প্রতি আসক্ত ছিল, কিন্তু তাকে পাওয়ার কোন পথ পায় না। শেষে সে বনে গেল প্রাণত্যাগ করতে। সেখানে এক সন্ন্যাসীকে পেয়ে তাঁকে মনের কথা বল্‌লে, তিনি ঐ ফুটন্ত তেলে ডুব দিয়ে রাজকন্তাকে গ্রহণ করলেন ও পরে রাজার ছেলেকে দান করলেন। সন্ন্যাসীদের এইরূপ অসাধারণ ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, কিন্তু সংসারীদের তাহা হয় না। এই পর্য্যন্ত প্রভেদ। উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সেবা করতে হয়। গীতায় ভগবান্ এবিষয়ে বলেছেন "অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং" (অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে যত্ন কর)—এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা ক'রে বসে অভ্যাস করুন। কিন্তু তাও ত পারা যায় না, মন ত বিষয়ে মগ্ন,—তখন বলছেন—"অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম-পরমো ভব।" অভ্যাসে অসমর্থ হইলে সেবার ভাবে, সর্ব্বঘটে আমি আছি এই জেনে, সকলের সেবা কর। "তোমার সেবা করা আমার কর্ত্তব্য" এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম কর। প্রভুকে যেমন দাস সেবা করে তেমনি যার সঙ্গে যেভাবের সেবা করা কর্ত্তব্য সেই ভাবেই তাকে সেবা করবে, তবেই তিনি প্রকট হবেন।

প্রশ্ন :—বিধবার কি নিয়মে চলা উচিত?

উত্তর :—ভগবান্ যাহাতে প্রসন্ন হন সেই ভাবেই চলা উচিত। কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা করলেই যে ভগবান্ প্রসন্ন হন তা নয়, যাকে যে অবস্থায় তিনি রেখেছেন সেই অবস্থাতেই সেবিকাভাবে সকলের সাথে ব্যবহার কর, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। স্ত্রী, শূদ্র সহজে তাঁকে পান, কারণ সেবার দ্বারা সহজে তাঁকে পাওয়া যায়, এই সেবাবৃত্তি তাদের স্বাভাবিক। সর্ব্বঘটে তিনি আছেন এই বুদ্ধিতে সকলের প্রীতি সম্পাদন

ক'বে চলবে। এইভাবে সকলের প্রীতিভাজন হ'তে পাবলে ভগবান্ প্রসন্ন হন। তখন তোমাদের সংসারও সুখের হবে, শান্তিময় হবে। ঋষিরাও সকলে এই কথাই বলেছেন।

প্রশ্ন :—প্রকৃত শান্তি কিরূপে লাভ করা যায় ?

উত্তর :—'শান্তি কোথা আছে আব অমৃত সাগব বিনা'। তাকে প্রাপ্ত হলে তুমি আনন্দময় হতে পাববে। আমাদের শাস্ত্র বলছেন কেউ স্থায়ী নয়—দুমিনিটের জন্য স্থায়ী নয়। শিশু বালক হয়, বালক যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়। এখন আপনার দেহে যে অণু পবমাণু আছে বাব বৎসর পরে তার কিছুই থাকবে না। নিজেব যাব স্থিবতা নাই, ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে, তার আশা পবিত্যাগ কবে তার ভিতবে একটি স্থায়ী জিনিব যা আছে তা যদি ধরতে পারেন তবেই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ। গোলাপের দৃষ্টান্ত ধরুন,—কলিটি কাছে রাখলেন, ক্রমশঃ পরিস্ফুট হল ও শুকাইয়া গেল। কিন্তু তবুও আপনি তাকে গোলাপ বলছেন। শব্দ স্পর্শ রূপ বস গন্ধ ছাড়া জগতের আব কোন জ্ঞান আমাদের নাই। গোলাপের গুণ সব বদলে গেছে, কিন্তু উহাকে তখনও সেই গোলাপ বলছেন, এই জন্য যে উহার অভ্যন্তরের আসল বস্তুটি বদলায় নি। সেই যে জিনিষ উহা আশ্রয় বস্তু। উহা আছে—এই পর্য্যন্তই আমাদেব ধারণা, কিন্তু তাব কোন জ্ঞান আমাদের নাই। ইন্দ্রিয় তাকে প্রকাশ করতে পারে না। সেই যে বস্তুটি তা অচল,—পরিবর্ত্তন তাব হয় না—সে ঠিক আছে। আপনার ভিতরে কত পরিবর্ত্তন হচ্ছে, তবু আপনি বলছেন আপনি ঠিক আছেন, সেই জিনিষটি বাস্তবিক স্থায়ী। শাস্ত্র বলছেন—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং"

যিনি ফুলে আছেন, তিনি আপনাতেও আছেন। তাকে যদি আয়ত্ত

করতে পারেন তবে শান্তি, নচেৎ নয়। কিন্তু মানুষের ভুল—সে মনে করে লাখ টাকা হ'লে, দোতলা বাড়া হ'লে শান্তি সুখ হবে ; স্ত্রী বলুন, পুত্র কন্যা বলুন, ধনদৌলত বলুন, সংসারে এমন কোন জিনিষ নাই যা আপনাকে শান্তি দিতে পারে। অনিত্য বস্তু কি কখনও মানুষকে শান্তি দিতে পারে ?

আমাদের গুরুভ্রাতা অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় তাঁহার বহু উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি নিয়ে দেওয়া হইল :—

প্রশ্ন :—সাংসারিক বিপদ আপদের সময়ে চিত্ত স্থির থাকে না কেন ?

উত্তর :—নিজে সব করছ এই মনে কর বলে। যদি স্থির ভাবে মনে করতে পার যে ভগবানই সব করছেন, আমি তাঁর দাসমাত্র,—তিনি যা আমাকে দিয়ে করাবেন তাই হবে, তিনি যেভাবে রাখেন সেই-ভাবেই থাকতে হবে, তাহা হইলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হবে না, সর্ব্বদা শান্তির অবস্থা থাকবে। তোমরা কি নল রাজার উপাখ্যান পড় নাই ? তাহা প'ড়ে দেখবে যে তিনি কত ক্লেশ পেয়েছেন। ভগবান্ সব করাচ্ছেন এই ভাব থাকায় কখনও তাঁর চিত্তের বিক্ষেপ ঘটে নাই, সর্ব্বদাই মনে শান্তি বিরাজ করত। অবশ্য তিনি সমস্তই পুনরায় লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন :—সংসারে কেহ কি সুখী ?

উত্তর :—কেহই সুখী নয়। কোটীপতি হতে রাস্তার ভিখারীকে জিজ্ঞাসা কর, সবাই এক কথা বলবে—আমি নিতান্ত দুঃখে আছি। তোমরা যাকে সুখ বল, তাতে মোটেই সুখ নাই। থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখায় যে আনন্দ পাওয়া যায়, তা ত নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। ......অর্থ পেয়েও সুখ হয় না। টাকা থাকলেও তা যে চিরজীবন থাকবে তাও নয়। গ্রীসদেশের Solon the Wise (বিজ্ঞ সলোন) এর একটি

গল্প আছে। Croesus (ক্রীসাস) নামে একজন অত্যধিক ঐশ্বর্য্যশালী রাজা সলোনকে তাঁর বাড়ী নিয়ে যান। বাড়ীতে নিয়ে তাঁর ঐশ্বর্য্যাদি দেখান। পরে জিজ্ঞাসা করেন যে সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী আপনি কাহাকে বিবেচনা করেন? সলোন একটু চিন্তা করে একটি কৃষকের নাম করেন। পুনরায় 'দ্বিতীয় সুখী কে' জিজ্ঞাসা করলে, সলোন অপর একজনের নাম করেন। রাজা মনে করেছিলেন, সলোন দ্বিতীয়বারে অন্ততঃ তাঁর নামই করবেন। তা না করায়, রাজা ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন "আমার কথা আপনি কি মনে করেন?" তাতে সলোন বলেন "I have not seen your last" (আপনার শেষ দশা ত আমি দেখি নাই)। কিছুদিন পরে অন্য রাজা এই রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তি কেড়ে নেন এবং তাঁকে ফাঁসীর হুকুম দেওয়া হয়। বধ্য-ভূমিতে যখন তাঁকে নিয়া যায়, তখন সলোনের কথা স্মরণ ক'রে রাজা ব'লে উঠেন "Oh Solon, Solon, how truly wise thou art!" (হে সলোন, তুমি বাস্তবিকই কি জ্ঞানী!) তাঁর এই কথা শুনে প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করে, 'একথার অর্থ কি?' তখন তিনি কথাটার অর্থ ভাঙ্গিয়া বলেন। বিপক্ষ রাজা এই কথা শুনে দয়ার্দ্র হয়ে তাঁকে ছেড়ে দেন।

বাস্তবিক সংসারে কোন স্থায়ী সুখ নাই। যদি সংসারে স্থায়ী সুখ থাকত তা'হলে এত মহাত্মা সংসার ত্যাগ করতেন না, তাঁরা পাগল বা নির্ব্বোধ নন। অস্থায়ী জিনিষ কি করে স্থায়ী সুখ দিবে?

[কোনও শিষ্যের প্রতি উপদেশের মর্ম]

সেবাবুদ্ধিটাকে খুব ক'রে ধ'রে রাখবে। নিজে সেবক হয়ে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করবে। * * *

সর্ব্বদা বেশ যত্নে করে ধারণা করবার চেষ্টা করবে যে, তোমার সন্তান, স্ত্রী, ঘর, অর্থ যা কিছু তোমার কাছে এসেছে, তা সব ভগবানের

জিনিষ,—তোমার কাছে এ সব এসেছে, তুমি তাদের সেবা করবে বলে। তুমি সে সব জিনিষ নিজের বলে দাবী করতে পার কি?—বেশ করে বিচার করে দেখ।

তোমার মেয়েকে সেবা করে তুমি যে তৃপ্তি পাবে সে রকম তৃপ্তি অন্তভাবে ভালবাসায় পাবে না। এই ভাবে সেবা করে গেলে, কোন রকম মোহ আসবে না। যে কদিন তোমার কাছে রইল,—তার সেবা করে যাবে। তাতে বিচ্ছেদের ক্লেশ নাই। সে ছেড়ে গেলে তোমার কষ্ট হবার কারণ নাই। * * * যতটুকু পার, সেবা করে আনন্দ লাভ করবে, এতে তোমার মধ্যে কোনও মোহ জন্মাবে না—সংসারে কোনও আঁট থাকবে না। আর সংসারে কোনও জিনিষের জন্য তোমার আকর্ষণ না থাকলে তোমার দেহান্তে তোমায় টেনে আনবে কিসে? সংসারে কোনও জিনিষে তোমার আকর্ষণ না থাকলে তুমি মোক্ষধামে একেবারে চলে যাবে।

এইরূপ সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণকালে প্রায় প্রত্যহই হইত।

এক এক দিন ভগবদ্বিষয়ক গান হইত। যখন শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সংসঙ্গে সকলের চিত্ত অল্প-বিস্তর সত্ত্বভাবাবিষ্ট, তখন এক একটি বিশেষ অবস্থায় অন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত সেই গান সকলের চিত্ত স্পর্শ করিত। এইরূপ দুই একটি ঘটনা বলিব। উত্তর বিহারের দলসিংসরাইয়ে তত্রত্য ডাক্তার আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র দত্ত চৌধুরীর গৃহে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ কয়েকবারই গিয়াছেন। ইহার বড় মেয়েটি বেশ ভক্তিমতী, সে মাঝে মাঝে তাঁহাকে গান শুনাইত। একদিন প্রভাতে আরতির পর শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ নিজের আসনে উপবিষ্ট আছেন, স্থানীয় গুরুভ্রাতৃগণ ও আমরা সঙ্গীয় সাধুগণ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছি, এমন সময়ে তাঁহার অনুমতিক্রমে মেয়েটি মধুরকণ্ঠে ভক্তিভাবে গাহিল:—

ওহে জীবন-বল্লভ, সাধন-দুর্লভ,
আমি মরমের কথা অন্তরের ব্যথা কিছুই নাহি কব।
শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লও সব,
আমি কি আর তোমায় কব।
সংসার-পথ অতি সঙ্কট কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেম মূরতি তব,
আমি কি আর তোমায় কব।
সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে আমার মাথায় তুলিয়া লব।
সুখ দুঃখ তব পদধূলি বলে মাথায় তুলিয়া লব,
আমি কি আর তোমায় কব।
অপরাধ যদি করে থাকি পদে না কর যদি ক্ষমা
তবে পরাণ প্রিয় দিওহে দিও বেদনা নব নব,
আমি কি আর তোমায় কব।
তবু ফেল না হে দূরে দিবসের শেষে ডেকে নিও চরণে,
ওগো তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার মৃত্যু-সঙ্কটে তব,
আমি কি আর তোমায় কব॥

শুনিতে শুনিতে আমরাও তন্ময় হইয়া গেলাম—সকলেই নীরব, নিস্পন্দ। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মুদিত নেত্রে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন, নয়ন সজল হইয়া উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে শুধু বলিতেছেন "জয়", "জয়"। গান শেষ হইলে দেখি অনেকের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

এই মেয়েটির ডাকনাম প্রসাদী, ইহারই মুখে "আজি যামিনীর শেষে ঘুমের আবেশে কি হেরিছ আমি স্বপনে" গানটি বিভিন্ন সময়ে শুনিবার কথা, পুরুলিয়ায় আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অনন্ত বাবুর পুত্র শ্রীমান্

সুশীলকুমারের ভগবৎ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কাঁদিয়া ফেলিবার কথা, ফরিদপুরে শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রবাবুর গৃহে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের স্বয়ং "গাওহে তাঁহারি নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম" গানটি গাহিবার কথা, অনেকেরই মনে আছে—চিরদিন মনে থাকিবে। একটি ঘটনার কথা আমার মনে আছে। সেদিন এ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ আমরা পাইয়াছিলাম। ১৩৩৭ সালে পাটনা প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে পুরুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন। আমাদের গুরুভ্রাতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার রায় মহাশয় একটি পৃথক্ ভাল বাড়ী বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বাড়ীতেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আসন স্থাপন করিলেন। এই সময়ে স্থানীয় জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে অতি সাধারণ লোক পর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন ও স্ব স্ব সংশয়ভঞ্জনের নিমিত্ত নানা প্রশ্ন করিতেন। প্রত্যহই সকাল সন্ধ্যা নানা সদালাপে আনন্দে কাটিত। এখানকার জনৈক বাঙ্গালী উকিল একদিন সন্ধ্যার পর আসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ইহার এরূপ ভাবাবেগ উপস্থিত হইল যে উচ্চৈঃস্বরে রাম নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাদের একটি সাধু গুরুভ্রাতাকে বলিলেন, "প্রসাদ থাকে ত কিছু নিয়ে এস।" তাহা আনীত হইলে ভদ্রলোকটির মুখে কিছু দিতে বলিলেন। সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই জোর করিয়া তাঁহার মুখে কিছু প্রসাদ দেওয়া হইলে, তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বাবা, ভাব অন্তরে চাপিয়া রাখিতে হয়, বাহিরে প্রকাশ হইয়া গেলে ভিতর শূন্য হইয়া পড়ে।" উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, ভগবৎপ্রসাদের কি মাহাত্ম্য! ইনি অজ্ঞান

হইয়া গিয়াছিলেন, প্রসাদ দেওয়া মাত্রই মূর্চ্ছা দূর হইল।” অনন্তর এইরূপ আর একটি ঘটনার কথা বাবাজী মহারাজ বর্ণনা করিলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতৃস্থানীয় প্রেমদাসজী নামক একজন সাধু ছিলেন, ইনি বহুকালাবধি তাঁহার গুরুদেব শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ইনি এক সময়ে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হন ও পরে কেবল ভগবৎপ্রসাদেরই গুণে ইহার রোগমুক্তি হয়। এই ঘটনাটি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রণীত তাঁহার গুরুদেবের জীবন চরিত গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীভগবৎ প্রসাদের মাহাত্ম্য ও প্রভাব স্বচক্ষে দর্শন করিবার এবং তদুপলক্ষে প্রসাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখাৎ উপদেশ লাভ করিবার সুযোগ আমরা আরও পাইয়াছি। তন্মধ্যে একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি।

শ্রীমান্ কানাইয়াদাস নামক আমাদের একটি সাধু গুরুভ্রাতার প্রথমে ভগবৎপ্রসাদের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস ছিল না। সে যখন প্রথম শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে আসে, তাহার অল্প পরেই সে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হইল। অনেক দিন ভুগিয়া ক্রমে তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, প্লীহা এবং যকৃৎও বেশ বড় হইল। ১৩৪০ সালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুরে আসিয়া কিছুকাল ছিলেন। সে সময় তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মধুপুরে আসিয়াও তাহার ২।৩ বার জ্বর হইল। একবার কয়েকদিন জ্বর ভোগের পর অন্নপথ্য করিবার দিন পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজের তিরোভাব উৎসব পড়িল। বাবাজী মহারাজ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি আজ কি প্রসাদ পাইবে?” অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল “বাবা! আপনি যাহা পাইতে বলেন, তাহাই

পাইব।" তদুত্তরে মায়ের মত স্নেহসহকারে তিনি বলিলেন—"বাবা! বহুদিন তো ভুগিলে, আজ আমার বাবার উৎসব, তাঁহার প্রসাদই পাও, যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে তোমার রোগ ভাল হইয়াও যাইতে পারে।" তাঁহার কথা শুনিয়া তাহার মনে অতিশয় আনন্দ হইল, কারণ সেদিন নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ও অন্যান্য উপাদেয় বস্তু বাবা শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ লাগিয়াছিল, সেই সকল প্রসাদ পাইতে তাহার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল। প্রসাদ পাইবার সময় আমরা সাধু গুরুভ্রাতৃগণ প্রায়শঃ বাবার নিকট বসিয়াই প্রসাদ পাইতাম। সেইদিন তাঁহার নিকট অন্যান্য সাধু গুরুভ্রাতৃগণসহ সেও প্রসাদ পাইতে বসিয়াছিল। লুচি, তরকারী, মৃতান্ন এবং পানতোয়া, রসগোল্লা, নানাপ্রকার সন্দেশ প্রভৃতি সমস্ত প্রসাদই তাহাকে দেওয়া হইল। পরে দধি প্রসাদ লইয়া আসিলে সে তাহাও লইল। বাবা তাহা দেখিয়া বলিলেন—"কি? দধিও নিয়াছ?" সে বলিল "আপনি নিষেধ করিলে দধি খাইব না।" তিনি বলিলেন "যখন লইয়াছ, তখন পাও।" সে খুব আনন্দের সহিত পেট ভরিয়া প্রসাদ পাইল। জরান্তে অন্নপথ্যের দিন দিবানিদ্রা বিশেষ অনিষ্টকর, কিন্তু দুর্ব্বল শরীরে পেট ভরিয়া খাওয়াতে তাহার তন্দ্রার ভাব আসিতে লাগিল। তখন সে মনে করিল—"আজ তো জর আসিবেই এবং বোধ হয় বহুদিন ভুগিতে হইবে। সাবধান হইয়া আর লাভ কি? বরঞ্চ একটু ঘুমাইয়া লই।" এই ভাবিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে শরীরে কোন গ্লানি নাই, বরঞ্চ বেশ সুস্থই বোধ হইতেছে। অতঃপর তাহার আর জর হয় নাই। এতদিনের পুরাতন জর, এমন কি প্লীহা যকৃৎ পর্য্যন্ত বিনা ঔষধে সারিয়া গেল। উৎসবের কয়েক দিবস পরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একদিন কয়েকজন ভদ্র-লোকের সম্মুখে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বাবা! তোমাদের

ভগবৎপ্রসাদের উপর বিশ্বাস নাই, ইহা তো ভাল নয়! ভগবৎপ্রসাদ যদি বিশ্বাস করিয়া কেহ পায়, তবে তাহার সমস্ত ব্যাধি সারিয়া যায়, এমন কি প্রসাদের গুণে জন্মজন্মান্তরের সংস্কারও ক্ষীণ হইয়া চিত্ত ভগবদভিমুখী হইতে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি কিছুদিন একটু বিশ্বাসের সহিত ভগবৎপ্রসাদ পায়, তবে প্রসাদের গুণে তাহার শরীর প্রসাদময় হইয়া যায়, প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছু তাঁহার নিকট আনিয়া দিলে তিনি স্পর্শ করিয়াই তাহা বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ, উৎসবের দিন বহু দেবদেবী ও মুনিঋষিগণ অলক্ষিতে উপস্থিত হইয়া ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করেন।" একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমাদের পুরাতন আশ্রমে যখন শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে একটি তরমুজ ভোগ লাগাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কোন কারণবশতঃ উৎসবের দিন ভোগ দিতে পারেন নাই, উৎসবের পরদিন তিনি ভোগ লাগাইবার জন্য আমাকে বলিলেন। তখন আমি আমার বাবাজী মহারাজকে সে কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, 'কাল ভোগ লাগাইলে ভাল হইত, কাল কত দেবদেবী ও মুনিঋষিগণ আসিয়াছিলেন।' অনেক দেবদেবী ও মুনিঋষি আসিয়া উৎসবে নিবেদিত সামগ্রী (ভগবৎপ্রসাদ) গ্রহণ করেন। ভগবৎ প্রসাদ যাহাই হউক না কেন, খুব ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিবে, তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে।"

ভ্রমণকালেও এইরূপ কোন পর্বাহ অথবা উৎসবতিথি উপস্থিত হইলে, যখন যেখানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ থাকিতেন, তখন সেইখানেই উৎসব হইত। বাস্তবিক তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থানই ছিল এক নিরবচ্ছিন্ন উৎসব, তাহার মধ্যে এই সকল বিশেষ বিশেষ

দিনে মনে হইত, "আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।" সাধারণ উৎসবে যে আনন্দ আমরা পাই, তাহা যেন লঘু ও অগভীর, অন্তরের সর্ব্বাংশকে তাহা স্পর্শ করে না, হৃদয়ের গভীরতম স্তর পর্য্যন্ত তাহা পৌঁছে না। পক্ষান্তরে, মহাপুরুষের সঙ্গফলে, তাঁহাদের সান্নিধ্যের প্রভাবে এই বস্তুই রূপান্তরিত হইয়া অননুভূত-পূর্ব্ব গভীরতা লাভ করে—"যে কিছু আনন্দ আছে বর্ণে গন্ধে গানে, তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে" এই আকাঙ্ক্ষাটি অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও পূর্ণ হয়। এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা নাই, সৌভাগ্য এবং সুযোগ হইলে ইহা অনুভূতির বিষয় হয়; বর্ণনা করিয়া ইহা বুঝান যায় না!

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের এই সময়ের একটি প্রধান কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। ১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসে তিনি কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরে আসিয়া আসন স্থাপন করেন এবং মাসাধিক কাল তত্রত্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ১৩৩৮ সালে পুনরায় যখন বঙ্গদেশে আসিলেন, সেবারেও প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ভ্রমণান্তে কলিকাতায় আসিয়া এই স্থানেই রহিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার এইখানে কিছুদিন থাকার সংবাদ পাইয়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতেও অনেকে আসিতে লাগিলেন। ইহাদিগকে স্থান দিবার জন্য প্রফুল্লবাবু ও বিজয়বাবু এবার পূর্ব্ব হইতেই একটি আলাদা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথাপি এক এক সময় স্থান সংকুলান হওয়া দুর্ঘট হইত। তদুপরি ইহাদের আর্থিক ক্লেশের আশঙ্কায় বেশী সময় থাকিতে অনেকে কুণ্ঠিত হইতেন। এইরূপ নানাপ্রকারে শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে

মনে করিতে লাগিলেন যে অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যখন এদেশে আসিবেন, তখন তাঁহার অবস্থিতির জন্ত একটি নিজস্ব স্থান থাকিলে ভাল হয়। ইহা হইতে ক্রমে একটি শাখা আশ্রম স্থাপনের কথা উঠিল।

তৎপর এ সম্বন্ধে ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ কতিপয় গুরুভ্রাতাভগিনীগণের স্বাক্ষরিত একখানা পত্র বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের নিকট প্রেরিত হয়। তদুত্তরে ১৪ই আশ্বিন তারিখে তিনি আমাদের গুরুভগিনী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ঘোষ মহাশয়ার নিকট এক পত্র দ্বারা জানান যে "আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা স্থাপন করিতে হয়, সেই ঠাকুরের সেবা চালাইতে লোক ও অর্থ উভয়ের প্রয়োজন হয়। আশ্রম প্রস্তুত করিতেও বহু সহস্র টাকার প্রয়োজন হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া যদি তোমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হও তবে ভাল। চাঁদা করিয়া যে অধিক অর্থ বাহির হইতে সংগৃহীত হইবে এরূপ আশা করিও না।

"তোমরা যাহারা প্রথমে উদ্যোগী হইবে তাহাদিগকেই ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে এইরূপ মনে করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। নতুবা পরের আশা করিলে তাহা অধিকাংশ স্থলেই পূর্ণ হয় না। এই সকল মনে করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে। তোমাদের সঙ্কল্প শুভ সুতরাং আমি বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।"

কয়েকটি কথা বিবেচনা করিয়া গুরুভ্রাতৃবর্গ এবিষয়ে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। অনেকেই ভাবিলেন "আশ্রম স্থাপিত হইলে তিনি প্রতি বৎসরই এদেশে আসিবেন, তখন সবাই তাঁহার দর্শন পাইব। শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইয়া দর্শন করিতে কয়জন বাঙ্গালী শিষ্য সমর্থ? আর সংসারে

নানারূপে আমরা ক্লিষ্ট থাকি; এখানে আশ্রম হইলে অতি নিকটেই একটি শান্তির স্থান থাকিবে, যখন তখন আসিয়া জুড়াইয়া যাইতে পারিব।" এইরূপে তাহাদের আগ্রহ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহারা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে আশ্রম স্থাপনের উপযোগী স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ ৬।১২।৩১ (২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ সাল) তারিখে আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নৃসিংহদাস বসু মহাশয়কে এক পত্রে জানান যে "নূতন আশ্রম গঙ্গার পশ্চিম পারে হইতে পারিলে ভাল হয়। স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বস্তি হইতে কিছু পৃথক্ ও পরিমাণে কিছু অধিক হইলে ভাল হয়। কারণ আশ্রমে বাগবাগিচা থাকিলে অধিক মানায় এবং প্রশস্ত জায়গা হইলে কালক্রমে বিদ্যার্থিগণ থাকিয়া শাস্ত্রপাঠাদি করিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে। সুতরাং জায়গা একটু বেশী হইলে সকল প্রকারেই ভাল হয়। তুমি আশ্রমসম্বন্ধে যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছ তদ্রূপ আশ্রম হইলে ইহা বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্বরূপ হইবে, সুতরাং একটু প্রশস্ত স্থান হওয়াই আবশ্যক।" তৎপর বাবাজী মহারাজের অভিপ্রায় অনুযায়ী গঙ্গার পশ্চিম পারে শিবপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রমের উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করা হয় এবং ১৩৩৮ সালের শেষভাগে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ ফরিদপুর যাইবার উদ্দেশ্যে শিবপুর আগমন করিলে, দেখাইবার জন্য তাঁহাকেও কয়েকটি জায়গায় লইয়া যাওয়া হইল। আশ্রম স্থাপনের জন্য তাঁহারও আগ্রহের উদ্রেক হইয়াছে বলিয়া এই সময়ে আমরা বোধ করিলাম এবং তখনই আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম এবং বুঝিলাম যে, আশ্রম স্থাপিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পুনরায় শিবপুরে আসিয়া অনেকগুলি স্থান দেখিবার পর অবশেষে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নিকটে একটি

স্থান মনোনীত করিলেন। দেখা গেল যে আটহাজার টাকা হইলে স্থানটি ক্রয় করা যায়। টাকার জোগাড় নাই, কি করা যায়? তিনি বলিলেন, "তোমরা সব ঠিক্ কর, সদিচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে না।" সুতরাং উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল, এবং দলিল রেজেষ্ট্রী হইবার নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বেই উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইল। অনন্তর বৃন্দাবন ফিরিয়া যাইবার পর মন্দির, নাটমন্দির প্রশস্ত চত্বর সমন্বিত সুবৃহৎ আশ্রম বাটীর নক্সা তিনি স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ দিয়া প্রস্তুত করাইলেন। কিন্তু তদ্রূপ আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, অথচ তৎপরিমাণ অর্থ তখনও সংগৃহীত হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সকলকে আশ্বাস দিলেন, "যাঁহার মন্দির হইবে, তিনিই এই কাজ সম্পন্ন করাইয়া লইবেন, বাবা, তোমরা কোন চিন্তা করিও না।" অতঃপর ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক মাসে একটি অভাবনীয় ঘটনায় আশ্রমের নির্ম্মাণকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের অনেক শিষ্যের বন্ধু একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাক্টার দুই বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবন আশ্রমে গিয়া কয়েকদিন ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার (কান্তিবাবু)। সেই সময় শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ তাঁহার সহৃদয়তা ও সততার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ শিবপুর আশ্রম নির্ম্মাণের ভার উক্ত ইঞ্জিনিয়ার বাবুর উপর দিতে মনস্থ করিয়া তাঁহাকে পূজার পর বৃন্দাবন যাইতে আহ্বান করেন। তথায় তাঁহার সহিত শিবপুর আশ্রমের প্ল্যান ইত্যাদি সমস্ত ঠিক করিলে পর তিনি শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে বলিলেন, "আমি বিনা পারিশ্রমিকে, জিনিষপত্রের দামও নগদ না লইয়া, আমার নিজ দায়িত্বে ইট, কাঠ প্রভৃতি আনিয়া আপনার আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিব। মজুরীর টাকা ও অন্যান্য খরচ কিছু কিছু

আপাততঃ আমাকে দিলেই হইবে, জিনিষপত্রের দাম আপনি পরে ধীরে ধীরে শোধ করিয়া দিবেন।" তিনি আরও বলিলেন যে তিনমাস মধ্যে এই আশ্রম নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া দিতে পারিবেন। তখন শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ স্থির করিলেন যে তিনি স্বহস্তে ১৪ই কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন আশ্রমের ভিত্তিস্থাপনের কার্য্য সম্পন্ন করিবেন এবং মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন.; এবং এই সময় পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মধুপুর অবস্থান করিবেন। এইরূপ ব্যবস্থাই হইল। ১৩৩৯ সালের ১৪ই কার্ত্তিক শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ স্বহস্তে ভিত্তিস্থাপন করিলেন এবং দুইমাস মধুপুরে গিয়া রহিলেন। দিবারাত্রি অবিরাম আশ্রম নির্ম্মাণের কাজ চলিতে লাগিল। তাঁহার আদেশানুসারে কান্তিবাবু প্রতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া কাজ কতদূর অগ্রসর হইল, তাহার বিবরণ মধুপুরে তাঁহার নিকট পাঠাইতেন। তথা হইতে তিনি আবশ্যকমত উপদেশ দিতেন। আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুপ্ত দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীউর যুগলমূর্ত্তি এবং সাধুগুরুভ্রাতা দিবোদাসজী দ্বারা গরুড়জীর মূর্ত্তি, মহাবীরজীর মূর্ত্তি এবং অন্যান্য মূর্ত্তি জয়পুর হইতে আনান হয়।

মাঘ মাসের প্রথমভাগে শ্রীপঞ্চমীর কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ মধুপুর হইতে শিবপুরে ফিরিয়া আসিলেন। কান্তিবাবুর কর্ম্মঠতাও আশ্চর্য্য! আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্পের মতই সুদৃঢ় মন্দির ও বিশাল আশ্রমবাটিকা নির্ম্মিত হইয়া উঠিল। আমি তখন কেবল অধ্যয়ন শেষ করিয়া বাবার নিকট আসিয়াছি। তিনি আমাকেই তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কিত যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইতে আদেশ দিলেন। সে কি বিপুল উৎসাহ, কি উন্মাদনা! একদিকে ঠুক্‌ঠাক্ ঠকাঠক্ মিস্ত্রিদের কার্য্য অবিশ্রান্ত চলিয়াছে, আর যেখানে



[illegible]

[illegible]

যে অসম্পূর্ণতাটুকু ছিল, তাহা অবিরাম দ্রুতগতিতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। অপরদিকে প্রতিষ্ঠা দিনের উৎসবের আয়োজন পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হইতেছে; আশ্রম সাজান, বহু সহস্র লোক খাওয়াইবার যোগ্য দ্রব্যসম্ভার আনয়ন, যজ্ঞের জন্ত বেদী নির্ম্মাণ, পূজার আয়োজন প্রভৃতি কার্য্যে দুই তিন দিন আগে হইতেই বহু গুরুভ্রাতাভগিনী একান্ত-ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে দুইজন শাস্ত্রজ্ঞ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অবশেষে ১৭ই মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিন মহাসমারোহে, সমাগত সহস্র সহস্র জনগণের বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে শিবপুরে বঙ্গীয় নিম্বার্কাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীউ, শ্রীশ্রীহংসভগবান্, শ্রীসনৎকুমার ভগবান্, শ্রীনারদভগবান্, শ্রীনিম্বার্ক-ভগবান্, শ্রীগরুড়জী, শ্রীমহাবীরজী ও শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজ তথায় সমাসীন হইলেন। এইদিনে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের যে করুণার্দ্রমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম তাহা আমাদের হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকিবে। তাঁহার সম্বন্ধীয় একটি বিস্ময়কর ঘটনাও আমার বিশেষরূপ মনে আছে, তাহা পরে বর্ণনা করিব। বারটার মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজ হইয়া গেলে তৎপর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন আরম্ভ হইল, সমাগত সমস্ত লোককেই প্রসাদদানে পরিতৃপ্ত করা হইল। অন্যূন ছয় সহস্র নরনারী সেদিন প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ, "দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত" নামক একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়া বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাসঙ্গিক বোধে তাহা হইতে দুইটি অংশ এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। গ্রন্থারম্ভে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিতেছেন, "শ্রীভগবৎকৃপায় অদ্য ১৭ই মাঘ সম্বৎ ১৯৮৯ (বঙ্গাব্দ ১৩৩৯) সনে বঙ্গভূমিতে শ্রীনিম্বার্কাশ্রম স্থাপিত হইল। জনসাধারণের অবগতির জন্ত ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ

বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীনিম্বার্ক ঋষির প্রচারিত পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীহংসাবতার এবং ভগবান্ সনৎকুমারাদির উপদিষ্ট সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম এতদ্দেশে এই আশ্রম হইতে প্রচারিত হইয়া যাহাতে এতদ্দেশবাসীর ধর্ম্মপিপাসার নিবৃত্তি হয়, এবং সকলে পরমশান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, ইহাই এই আশ্রম এবং মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য।" অতঃপর প্রবন্ধ মধ্যে শ্রীনিম্বার্ক ঋষির উপদিষ্ট এই ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া পুনশ্চ গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন, "শ্রীনিম্বার্ক ঋষির উপদিষ্ট সার্ব্বজনীন সর্ব্বপ্রকার বিরোধরহিত সর্ব্বত্র প্রীতিপ্রবর্ত্তক ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে এতদ্দেশীয় লোকের এবং পৃথিবীর সকল জাতীয় মনুষ্যের মধ্যে বিরোধ ও অশান্তি দূরীকৃত হইয়া সর্ব্বত্র সুখশান্তি স্থাপিত হইবার পথ বিমুক্ত হইবে এবং সকলে অচ্যুত আনন্দ লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন, ইহাই আমাদের ধারণা এবং এই ধারণা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই এই আশ্রম ও মন্দির স্থাপিত করা হইল *।"

তাঁহার এই উদ্দেশ্য ইতিপূর্ব্বেই আংশিকভাবে সফল হইয়াছে, তাহা আজ আমরা দেখিতেছি। ইহা একটি অনুপম শান্তির স্থান হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ ফলবতী হইবে, তাহারও লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর আশ্রমনির্ম্মাণের বাকী কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গেলে হিসাব করিয়া দেখা গেল, কান্তিবাবুর নিকট প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ রহিয়াছে। সর্ব্বস্থানের গুরুভাইভগিনীগণের

* এই পুস্তিকাখানি এখনও পাওয়া যায়। শ্রীনিম্বার্কমতের সংক্ষিপ্তসার ইহাতে সরল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠ করিলে অনায়াসে তৎসম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানলাভ হয়। কলিকাতা ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেডের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।



শ্রীনিম্বার্কাশ্রম—শিবপুর পৃ ৩৭২

নিকট হইতে এককালীন দান যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কিন্তু সকলকে অভয় দিয়া বলিতেন, "কেহ চিন্তা করিও না। স্বার্থের জন্য ত তোমরা এই ঋণ কর নাই, শ্রীশ্রীঠাকুরজীর কার্য্যে এই খরচ হইয়াছে, তিনিই ইহা শোধ করিবার উপায় করিয়া দিবেন।"

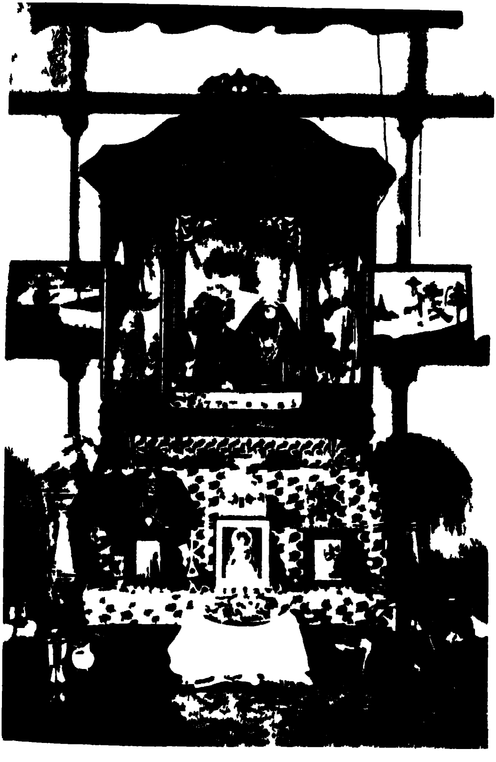
প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরে বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবন হইতে শিবপুর আশ্রমে আসিয়া অবস্থান করার সময় একদিন শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু করিয়া দিয়া ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থা কর।" এই ব্যবস্থাই করা হইল এবং আমাদের গুরুভ্রাতৃবৃন্দ অনেকেই মাসে মাসে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। ফলে একবৎসর মধ্যেই কান্তিবাবুর সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধিত হইয়া গেল *।

আরও একটি আশ্রম শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহট্টের নিম্বার্কাশ্রম স্থাপনের ইতিহাসও অনেকটা শিবপুরেরই অনুরূপ। ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি যখন দ্বিতীয়বার শ্রীহট্টে যান তখন তত্রত্য রামানন্দী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি

* বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন পূর্বে বাবাজী মহারাজ আদেশ করেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সম্মুখে নাটমন্দিরে একটি মার্কেল পাথরে কান্তিবাবুর নাম নিম্নলিখিত প্রকারে খোদিত করিয়া রাখিতে হইবে—"শিল্পী শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বসন্তপঞ্চমী সম্বৎ ১৯৮৯"। বাবাজী মহারাজ তখন বলিয়াছিলেন "কান্তিবাবু যেরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়া এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি ইচ্ছা করি যে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর দর্শনার্থী ভক্তগণের পদধূলি কান্তিবাবুর উপর পড়ে।" প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন বাবাজী মহারাজের এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল। তিনি সদা সর্বদাই কান্তিবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং আশীর্বাদ করিতেন "শ্রীশ্রীঠাকুরজী তাহার মঙ্গল করুন।" বাস্তবিক কান্তিবাবুর নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

আশ্রমে আসন স্থাপন করেন। এখানকার মহন্তজী তাঁহাকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া অতি আদর ও মর্য্যাদার সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। তথাপি আমরা দেখিয়াছি, আমাদের গুরুভ্রাতা-ভগ্নিনীগণের কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা হইত। এজন্য এখানকার বিশিষ্ট গুরুভ্রাতাদের মনে হইল যে, এখানে আমাদের একটি আশ্রম হইলে ভাল হয়। এই ভাবনা ক্রমে বলবতী ইচ্ছায় পরিণত হইল এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অনুমতি লইয়া স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। এক খণ্ড জমিও পাওয়া গেল। ইহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির, আটচালা টিনের নাটমন্দির ও আশ্রমবাসিগণের থাকিবার উপযোগী কয়েকখানি ছোট ঘর নির্ম্মিত হইয়া উঠিল। ১৩১১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শিবপুর আশ্রমে ছিলেন সেই সময় একদিন শ্রীহট্ট হইতে পত্র আসিল। তিনি সেখানে গিয়া একটি শুভদিন স্থির করিয়া স্বয়ং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন এই প্রার্থনা শ্রীহট্টস্থ গুরুভ্রাতৃগণ তাহাতে জানাইয়াছিলেন। তিনি পত্রোত্তরে ইহাতে সম্মতি-জ্ঞাপন পূর্ব্বক ২৮শে আষাঢ় রথযাত্রার দিবস প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করিয়া দিলেন এবং রথযাত্রার কয়েক দিন পূর্ব্বে স্বয়ং শ্রীহট্টে উপস্থিত হইলেন। মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইল। এই উৎসবে প্রায় সাত হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন স্থানীয় গুরুভ্রাতৃবর্গ করিয়াছিলেন। বারোটা বাজিতে বাজিতেই বাবাজী মহারাজ প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া এবং সন্ধ্যার পরেও প্রসাদ বিতরণ চলিল, এবং ঘন ঘন আনন্দধ্বনিতে স্থান মুখরিত করিয়া অগণিত লোক তৃপ্তিপূর্ব্বক প্রসাদ পাইলেন। অবশেষে রাত্রি এগারটার সময় প্রসাদ বিতরণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য শেষ হইল।





শ্রীশ্রীবাণীনিত্যাবাসা

শ্রীহট্টবাসী গুরুভ্রাতৃগণের চেষ্টায় এই আশ্রমের কার্য্য এযাবৎ ভাল ভাবেই চলিতেছে। ভবিষ্যতে আরও উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই অধ্যায়ের আলোচ্যকাল মধ্যে, এই সকল আশ্রম স্থাপন তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য। অতঃপর উড়িষ্যা প্রদেশান্তর্গত ভুবনেশ্বরধামে আর একটি নিম্বার্কাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সূচনা তিনি দেহাবসানের অল্পকাল পূর্ব্বে করিয়াছিলেন। সেকথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্য্য গত ১৩৪৬ সালের ১০ই বৈশাখ তারিখে সম্পন্ন হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধুসমাজে বাবাজী মহারাজ

জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বাঙালী আজ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেছেন ও তজ্জন্য ধর্ম্মে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, এমন কি ব্যবসায়ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত বঙ্গসন্তানগণের গৌরবের আসন আজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গজননীর যে কয়েকটি কৃতী সুসন্তান জীবনে এক এক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়া মাতৃভূমিকে নূতন গৌরব দান করিয়াছেন, শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ তাঁহাদিগের অন্যতম। ধর্ম্মই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

যাঁহারা কুম্ভমেলা কখনও দর্শন করিয়াছেন অথবা ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে লোকলোচনের অন্তরালে ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী এবং সাধুদিগের এক সুবৃহৎ সমাজ আছে। এই সমাজের আয়তন সত্যই বিপুল, ইহা সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং এই ধর্ম্মের গ্লানির যুগেও ভারতীয় জনগণের উপর ইহার প্রভাব অসামান্য। কিন্তু এই ধর্ম্মজগতে অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙালীর স্থান ছিল না—বাঙালী এই সমাজে একান্তই হেয় ও অপাংক্তেয় ছিলেন।

এই অগৌরব, এই অমর্য্যাদা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রায় নিঃশেষে বিদূরিত করিয়াছেন। এদেশের সাধুসমাজে বাঙালীর অবস্থার উন্নতি করিয়াছেন, চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের এবং সমগ্র ভারতের বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায় খালসার প্রথম বাঙালী মহন্ত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ। সাধুদিগের প্রতি তাঁহার এবং তাঁহার প্রতি সাধুদিগের ব্যবহারের বিষয়,

যাহার ফলে সাধারণভাবে বাঙ্গালীর প্রতি সাধুসমাজের মনোভাব ও আচরণের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা এই স্থলে করিব।

১৩২৮ সাল হইতে প্রথমতঃ এক বৎসর অন্তর এবং পরে প্রতি বৎসরই কয়েক মাসের জন্ত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বাঙ্গালায় আসিতেন। বৎসরের অবশিষ্ট সময় তিনি বৃন্দাবনের আশ্রমেই যাপন করিতেন; শরীর সুস্থ থাকিলে ব্রজ পরিক্রমায় যাইতেন এবং যে বৎসর কুম্ভমেলা থাকিত সে বৎসর তিনি তথায় উপস্থিত থাকিতেন। দুই একবার মাত্র যান নাই, তাহারও উল্লেখ যথাস্থানে করিব।

তিনি যখন বঙ্গদেশে থাকিতেন, তখন প্রায়শঃ সাধুদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত না, শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে অবস্থানকালেই তাহা হইত। তথায় এবং কুম্ভমেলাস্থলে তাঁহার ও সাধুগণের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের বিষয় যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, তাহাই বর্ণনা করিতেছি। অল্পকালমাত্র সাধারণভাবে সাধুমার্গে প্রবিষ্ট বালকসাধু হইতে সাধনজগতে অতিশয় উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত প্রাচীন সাধুগণ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। আমাদের আশ্রমে অবারিত সাধুসেবা প্রবর্ত্তিত থাকায় পঞ্চাশ ষাট মূর্ত্তি সাধু প্রায় প্রতিনিয়তই আশ্রমে অবস্থান করেন। সাধুরা একস্থানে বেশী দিন থাকেন না বলিয়া এই সংখ্যা কখনও কমে, কখনও বাড়ে, কিন্তু পঞ্চাশের নিম্নে প্রায়ই হয় না। দুইবেলা আরতির অন্তে শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে প্রণাম করিয়া যখন আমরা শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিতে যাইতাম, তখন দেখিয়াছি, বালকবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে অভ্যাগত সাধুগণও আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। এ যে কেবল শিষ্টাচারানুসারে মহত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্ত করিতেন তাহা নয়, যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির

সহিত করিতেন, ইহা নিয়তই দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও সমান আদরে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

শ্রীবৃন্দাবনে প্রায় সারা বৎসর ধরিয়াই নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রী-সমাগম হয়। এই সকল যাত্রিগণের অধিকাংশই নানাস্থানে ঠাকুর-দর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকেও দর্শন করিতে আসিতেন এবং মুগ্ধভাবে তাঁহার মহিমোজ্জ্বল সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিতেন। নানাস্থান হইতে সাধুমহন্তগণও শ্রীবৃন্দাবনে অনেক সময় আগমন করিয়া থাকেন। তীর্থযাত্রীদিগের ন্যায় তাঁহারাও আকৃষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিতেন। তাঁহার সেই শান্ত শিবোপম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, তাঁহার মধুর বাক্যে ও ব্যবহারে সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতেন। অনেকে নিজেদের সংশয় অপনোদনের নিমিত্ত সাধনাদি-বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন এবং তাঁহার উত্তর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতেন। সাধুদিগের মধ্যে একটু উগ্রপ্রকৃতির লোকের অভাব নাই, এরূপ লোককেও বাবাজী মহারাজের উপদেশে বিগলিত হইতে দেখিয়াছি। ডুমরপুরে এই শ্রেণীর একজন অতি তেজস্বী নাগা সাধু ছিলেন। ইনি একবার শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তখন বৈকালে আশ্রমসন্নিহিত শ্রীশ্রীঠাকুরজীর বাগিচায় বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার একজন সাধুশিষ্যের কটিবিদ্ধ কাঠের আড়বন্ধ ও কৌপীনের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, তৎক্ষণাৎ ইনি বলিলেন, "একে একটা মোটা কাঠ পরাইয়া দিয়াছেন কেন? এ আমার একেবারেই ভাল লাগে না। এরকম ঢং করিয়া 'আমি খুব তপস্যা করি' ইহা লোককে দেখাইয়া লাভ কি?" একটু উত্তেজিতভাবেই এরূপ কথা বলিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কোনও উত্তর করিলেন না, নীরবে শুনিয়া গেলেন মাত্র। অতঃপর

তাঁহারা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি ইঁহাকে বলিলেন, "আমার বাবাকে দর্শন করিবেন চলুন।" এই কথায় শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজের মন্দিরের বারান্দায় তাঁহারা গেলেন এবং সেই সময় তিনি বলিলেন, "আমার গুরুদেব এই কাঠের কৌপীন ধারণ করিয়াছিলেন।" এবারে নাগা সাধুটি আর কিছু বলিলেন না। অনন্তর আশ্রমের পশ্চাদ্‌ভাগে একটি বারান্দায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের বসিবার স্থানে তাঁহারা গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "বাবা! এই কাঠের কৌপীন হইতে সাধকের বহু কল্যাণ হয়। ইহা ধারণ করিলে ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে। স্ত্রীলোকে ইহা দেখিলে কাছে আসিতে সাহসী হয় না। সাধকেরও কোমরে এই মোটা কাঠের আড়বন্ধ এবং কাঠের কৌপীন থাকায় কুপ্রবৃত্তি আসিতে পারে না। তাহা ছাড়া নিদ্রা ও আলস্য কম হয়, খুব বেশী আহার করিতে পারে না এবং স্বতঃই ভজনের দিকে মনকে চালিত করে। আপনি স্বচক্ষে দেখিলেন, আমার বাবাজী মহারাজ ইহা ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বহুপুরুষ হইতে আমাদের ধারায় এই কাঠের কৌপীন ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে; সাধন ভজনের বিশেষ সহায়ক বোধেই ইহা তাঁহারা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কিরূপ অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন!" বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। আর বলিতে পারিলেন না, নীরব হইয়া রহিলেন। সাধুটির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহারও চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। এবারে তিনি বলিলেন—"মহারাজ! এই সব কথা বলিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি। আমি যথার্থই ইহার তত্ত্ব জানিতাম না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" একটু পরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সাধুটিকে পুনরায় বলিলেন—"বাবা! আপনি

জানিতেন না বলিয়াই এরূপ বলিয়াছেন, অতএব ইহাতে অন্যায় হইয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইবেন না। তবে আজ আপনাকে বলিতেছি মহাপুরুষদের নিন্দা করিবেন না।" বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই সাধুটি বলিলেন— "আশীর্বাদ করুন, যেন এই স্বভাব আমার দূর হইয়া যায়।"

উচ্চসাধনসম্পন্ন মহাত্মারা তাঁহাকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন, তেমনি ভালবাসিতেন। ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। আমাদের আশ্রমে একবার একটি রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রাচীন ত্রিহুতী সাধু আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিজে বলিয়াছিলেন, "ইনি খুব উন্নত পুরুষ।" তাঁহার সহিত আলাপ ব্যবহার করিলেই বুঝা যাইত তিনি ভগবদনুভূতিতে মাতোয়ারা থাকিতেন। তাঁহার নাম ছিল স্বামী রামদাসজী। এই সাধুটি প্রায় প্রত্যহ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন এবং তাঁহাকে পাখা করিতে করিতে প্রেমভাবে বিভোর হইয়া করুণস্বরে গান করিয়া তাঁহার নিকট কি যেন প্রার্থনা করিতেন।

জয়পুরে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একজন খুব প্রাচীন সাধু ছিলেন। অল্পকাল পূর্ব্বে ইহার দেহান্ত হইয়াছে। জয়পুরের মহারাজা মাধবসিংহজী ইহাকে খুব সম্মান করিতেন এবং গোবিন্দজীর মন্দিরের সন্নিকটেই থাকিবার ও আহারাদির সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার নাম ছিল "কৃষ্ণদাসজী"; কিন্তু লোকে তাঁহাকে "সিদ্ধবাবা" বলিত। কত ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে কত অর্থ দান করিতেন, কিন্তু তিনি একটি পয়সাও স্পর্শ করিতেন না। ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত অর্থ সাধুসেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইত।

ইহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এক সময় বলিয়াছিলেন—



শা স্ব া দানন্দ

চ পুরের সিদ্ধর ন

"ইনি সূর্য্যের উপাসনা করায় ইহার গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধীয় দৃষ্টি অনেক খুলিয়া গিয়াছে" (ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ—পাতঞ্জল সূত্র)।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি ইহার অগাধ শ্রদ্ধা ও অনির্ব্বচনীয় প্রীতি ছিল। মধ্যে মধ্যে শুধু তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্যই জয়পুর হইতে ব্যাকুলভাবে আসিতেন। যখনই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন, দূর হইতেই "জয় হো মহারাজ। জয় হো মহারাজ!" বলিতে বলিতে আসিতেন এবং নিকটে পঁহুছিয়া দণ্ডবৎ করিয়া বসিতেন এবং অনেক আলাপ করিতেন। তাঁহাদের আলাপের মাধুর্য্য যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দেহান্তের পর ভাণ্ডারায় আসিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়াই বৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। ভাণ্ডারার দুইদিন পূর্ব্বে একাদশীর দিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের তৈলচিত্রাদির প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেই চিত্র লইয়া মহাসমারোহে সমস্ত বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করা হইয়াছিল। ভ্রমণ করিয়া যখন আমরা ফিরিতেছিলাম, তখন কেহ সিদ্ধবাবাকে গিয়া বলেন—"শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের মূর্ত্তি লইয়া সাধুরা শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেছেন, আপনার দর্শন করিবার ইচ্ছা হয় ত করুন।" তিনি অতিশয় আবেগের সহিত বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"কাঁহা হৈ! কাঁহা হৈ!!" আমি বলিলাম, "ঐ দেখুন।" বলিবামাত্র তাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, গদগদস্বরে বলিলেন, "বলিহারি মহারাজ! বড়া দর্শন দিয়া। জয় হো! জয় হো!!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবাজী মহারাজ-কা দর্শন মিল গিয়া?" প্রসন্ন হাসিতে তাঁহার সৌম্যকান্তি আবার উজ্জ্বল হইল, তিনি বলিলেন, "খুব দর্শন মিল গয়া। বাবাজী সাক্ষাৎ খাড়া হৈঁ।"

বাবাজী মহারাজের প্রতি বিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের কিরূপ গভীর সৌহার্দ্দ ও প্রীতি ছিল, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কি মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, সে কথা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য তিন সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান মহন্তগণও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা যখনই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিতেন, তখনই নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করিতেন। তাহা যে আন্তরিক, বাহ্যিক শিষ্টাচারমাত্র নহে, তাহা বেশ বুঝা যাইত। তাঁহাদের কথায় বার্ত্তায় আচরণে একটি অনাবিল প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইত। এইরূপ উচ্চ সাধক অথবা মহাপুরুষ দুই চারিজনের কথা নহে, সমগ্র সাধু সমাজই তাঁহাকে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপ্রত্যাশিতরূপে ইহার প্রথম পরিচয় পাই ১৩৪০ সালে উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলায়। অসুস্থতার জন্য তিনি স্বয়ং এই মেলায় উপস্থিত ছিলেন না। শ্রীযুক্ত অনন্তদাসজীকে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে পাঠাইয়াছিলেন। আমাকেও বলিলেন, "তোমারও কুম্ভমেলায় যাওয়ার প্রয়োজন আছে, তুমিও যাও।" যাত্রাকালে আমাকে বলিয়া দিলেন, "কুম্ভমেলায় সমবেত মহন্তগণকে আমার দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিবে।" তদনুসারে মেলাক্ষেত্রে পৌঁছিয়া আমি মহন্তগণকে তাঁহার দণ্ডবৎ জানাইলে তাঁহারা সাদরে ও বিনীতভাবে বলিলেন, "তিনি আমাদের গুরুতুল্য, তিনি আবার আমাদিগকে কি দণ্ডবৎ জানাইয়াছেন? আপনি আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে আমাদের সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইবেন।"

সাধুসমাজ শুধু যে তাঁহাকেই সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার জন্য আমরাও সাধুদিগের নিকট সর্ব্বত্র অতিশয় সদ্ব্যবহারই লাভ করিয়া থাকি। আমাদের সাধু গুরুভাইদের অধিকাংশই তীর্থযাত্রা-

ব্যপদেশে উত্তরে হিমাচল হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারী এবং পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ হইতে পশ্চিমে দ্বারকাধাম পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র সাধুদিগের আশ্রম আছে। ভ্রমণকালে এই সকল স্থানেই আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। সর্ব্বত্রই আমরা দেখিয়াছি, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নাম উল্লেখমাত্রে তাঁহারা চিনিয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্য বলিয়া আমাদিগকে বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, বিকানীরী, মাড়োয়ারী নির্ব্বিশেষে আদরের সহিত সৎকার করিয়াছেন। আজকাল সাধুর বেশ ধারণ করিয়া অপর লোকে অনেক সময় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং এরূপ লোককে আশ্রয় দেওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রে চৌর্য্যাদিও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা শুনা যায়। এজন্য সাধুদিগের আশ্রমের মহন্তেরা কোন নূতন সাধু উপস্থিত হইলে প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার সম্প্রদায়, গুরুদ্বারা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে পরিচয় লইয়া যথার্থ সাধু বলিয়া বুঝিলে তারপর আশ্রয় দেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এমনই ভারতজোড়া নাম যে মাত্র তাঁহার শিষ্য বলিলে অধিকাংশক্ষেত্রেই অন্য পরিচয়ের আবশ্যক হয় না, এমন কি তাঁহার শিষ্য ব্যতীত অপর লোকেও তাঁহার নাম করিয়া কোথাও উপস্থিত হইলে সাদর অভ্যর্থনা পাইয়া থাকেন।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সাধুশিষ্যবর্গের মধ্যে আমরা প্রায় অর্দ্ধেক বাঙ্গালী। প্রথমতঃ আমাদের পংক্তি গ্রহণ করিতে, এমন কি পংক্তির মধ্য দিয়া আমরা চলিলেও সাধুরা বেশ আপত্তি করিতেন। সাধুরা অধিকাংশই অবাঙ্গালী, এবং "বাঙ্গালী মছলী খাতা হৈ" বলিয়া ও "অনাচারী ম্লেচ্ছ" বলিয়া সাধারণভাবে বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহাদের একটু হেয় জ্ঞান থাকে। সাধুদের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে যে, যে কোন দেশীয় সাধুই হউন না কেন, সাধু হওয়ার পর যে পর্য্যন্ত দ্বারকাধামে গিয়া শঙ্খ-চক্রাদির চিহ্ন (তপ্তমুদ্রা) ধারণ

করিয়া না আসেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার স্পৃষ্টান্ন সাধুরা গ্রহণ করেন না। কিন্তু বাঙ্গালী সাধুরা দ্বারকাধামে গিয়া উক্ত চিহ্ন ধারণ করিয়া আসিলেও তাঁহাদের স্পৃষ্টান্ন গ্রহণ করিতে দ্বিধা ভাব অনেক সময় দেখা যাইত। অনেকদিন পূর্ব্বের কথা, বৃন্দাবনে আমাদেরই আশ্রমে একটি বাঙ্গালী সাধু পাকঘরে প্রবেশ করিতে গেলে রসুইয়া সাধুগণ আপত্তি করেন। ব্যাপারটি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট নিবেদন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিলেন এবং রন্ধনশালায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রসুইয়া সাধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া মধুর অথচ দৃঢ়ভাবে বলিলেন,—"দেখ বাবা! এই বালকটি ব্রাহ্মণ সন্তান, পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজন আদি সমস্তকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছে—দীক্ষা লইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। তোমাদের সর্ব্বপ্রকার আচার পালন করিতেছে। দ্বারকাধামে গিয়া "তপ্তমুদ্রা"ও ধারণ করিয়া আসিয়াছে; তথাপি কি তাহার শরীরে বাঙ্গালীত্ব লাগিয়া আছে? ইহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা তোমাদের উচিত হয় নাই। এইরূপ আর কখনও করিবে না।" রসুইয়া সাধুরা তখন আর কোন উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়াই থাকিলেন। পঙ্গতে পরিবেশন করা প্রভৃতি ব্যাপারেও এরূপ ঘটনা হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদাই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিকার করিয়াছেন। তিনি আচার্য্য ও মহন্ত ছিলেন এবং স্বয়ং সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া সাধুগণ তাঁহার শাসন সর্ব্বদাই মান্য করিতেন। ফলে, আমাদের আশ্রমে উৎসবাদি উপলক্ষে বড় বড় নিমন্ত্রণে, অথবা কুম্ভমেলায় যখন তিনি প্রত্যহ সহস্র সহস্র সাধুর ভোজন দিয়াছেন, তখন সর্ব্বদাই বাঙ্গালী সাধুগণ পাক, পরিবেশন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন এবং এখনও করেন, তাহাতে আর কোনও আপত্তি হয় না।

এইরূপে সাধু-সমাজে বাঙ্গালীর অপাংক্তেয়ত্ব ঘুচিয়াছে এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে *।

---

* এই অধ্যায়ের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ শেষভাগে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা বৈষ্ণব সাধুদিগের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধে নহে। সাধু এবং সন্ন্যাসী এই দুইটি শব্দ সাধারণতঃ পৃথক্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধু বলিতে চারি সম্প্রদায়ের সংসারত্যাগী বৈষ্ণবদিগকে বুঝায় এবং সন্ন্যাসী বলিতে শঙ্করপন্থী দশনামী, সাংখ্যমার্গী প্রভৃতি সন্ন্যাসীদিগকে বুঝাইয়া থাকে। সাধুদিগের মধ্যে নেতৃস্থানীয়গণকে মহন্ত এবং সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে নেতৃস্থানীয়গণকে মণ্ডলেশ্বর বলা হয়। (মঠাধীশরূপে ইঁহাদেরও মধ্যে মহন্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দেখা যায়)। সন্ন্যাসীদের মধ্যে বাঙ্গালী কোনদিনই একান্ত অপাংক্তেয় ছিলেন না, তবে সেখানেও গিরিমহারাজের শিষ্যদের মধ্যে প্রধান শ্রীযুক্ত স্বামী মহাদেবানন্দ-গিরি মহারাজ মণ্ডলেশ্বর হওয়ায় এবং বিগত ১৩৩২ সালের মাঘ মাসের প্রয়াগ[illegible] অর্দ্ধকুম্ভে মণ্ডলেশ্বরগণ শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসীদিগকে দশনামী সন্ন্যাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ায়, বাঙ্গালীর মর্য্যাদা সম্প্রতি বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীসদ্গুরুরূপে লীলা

শ্রীশ্রীভক্তমালবর্ণিত বর্দ্ধমাননিবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট হইতে স্পর্শমণি পাইয়াও তাহা নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন, চাহিলেন কি?—"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি"—সেই অদ্ভুত বস্তুর কিঞ্চিৎ। যখন কোন গৃহস্থাশ্রমী পুরুষ—যাঁহার ধন, জন, মান, সুখ, ঐশ্বর্য্য কিছুরই অভাব ছিল না—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পূর্ণানন্দময় হইয়া অবস্থান করেন, তখন ইহ সুখ-সর্ব্বস্ব মানুষ দেখিয়া অবাক হয়—পক্ষান্তরে কেহ কেহ তাঁহার নিকট গিয়া ঐ আনন্দের অংশ পাইতে ইচ্ছা করে।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ গৃহী থাকা কালে দেশবাসী তাঁহার নিকট অনেক উপকার পাইয়াছেন। আত্মীয় স্বজন সর্ব্বদা সাহায্য পাইয়াছেন, বিদ্যার্থী আশ্রয় পাইয়াছেন, বিপন্ন দরিদ্র লোক তাঁহার সাহায্যে মোকদ্দমা হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, নূতন উকিল তাঁহার সহায়তায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন—দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁহার অকাতর দানে অনেক লোকের ক্ষুধা মিটিয়াছে, প্রাণ বাঁচিয়াছে। এসকলই আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করিয়াছি। তারপর যখন তিনি পার্থিব বৈভব ত্যাগ করিয়া, বাহ্য দৃষ্টিতে রিক্ত, নিঃস্ব হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বসিলেন, তখনও স্বার্থীর দল আমরা তাঁহাকে ছাড়ি নাই—আবার তাঁহার কাছে গিয়া হাত পাতিয়াছি, তাঁহার সাধনৈশ্বর্য্যের ভাগ চাহিয়াছি। তিনি "যে ধনে ধনী হইয়া" পার্থিব বৈভবকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহারি খানিক

লাভের জন্য। এদেশ গুরুবাদের দেশ—সমর্থ গুরুর আশ্রিত হইতে পারিলে তিনি শিষ্যকে সর্ব্বপাপ হইতে উদ্ধার করিবেন, এ বিশ্বাস এদেশের লোকের মজ্জাগত। তাই যে সময় তাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগের কথা, কঠোর তপস্যার কথা লোকে শুনিল—সেই সময় হইতেই সর্ব্বসন্তাপ মুক্ত হইবার আশায়, সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট লোক তাঁহার নিকট অপার্থিব বস্তুর প্রার্থী হইয়া আসিতে লাগিল। এই সকল প্রার্থিগণকে প্রথমতঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া অথবা অপেক্ষা করিতে বলিয়া পরে ১৩২৭ সালের নাসিক কুম্ভ মেলায় তিনি প্রথম দীক্ষা দান করেন। তথা হইতে আশ্রমে ফিরিয়াও কয়েকজনকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, এসকল কথা ইতিপূর্ব্বেই যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রীসদ্‌গুরুরূপেই তিনি লীলা বিস্তার পূর্ব্বক এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছেন, আজিও করিতেছেন।

সদ্‌গুরু বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি একজন শক্তিমান মানুষ, যিনি তপঃশক্তি প্রভাবে শিষ্যের জীবনে অঘটন ঘটাইতে পারেন এবং তাহার সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধন করেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে ভগবৎশক্তিবিশেষই গুরুশক্তি, গুরুদেহ এই শক্তির আধার, শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর লীলাপরম্পরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানেরই কাজ।

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন, "গুরু কেবল এক বিশেষ দেহেই আবদ্ধ নহেন, তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহা জানিবে। যে দেহকে অবলম্বন করিয়া ভগবান্ তোমাকে উপদেশ করিয়াছেন, সেই দেহ কখনও চিরস্থায়ী নহে, তাহাতে মাত্র গুরুবুদ্ধি করিলে গুরুতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই জানিবে। * * * অবশ্য এই দেহও বিশেষ আদরণীয়, কারণ ইহা অবলম্বনে গুরু তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, কিন্তু এই দেহমাত্রই তিনি নহেন, তিনি আত্মস্বরূপ সেই এক সর্ব্বব্যাপী পদার্থ।" (সদ্বাণী, ১ম ভাগ, পৃঃ ৬৮)।

বিশ্বব্যাপী গুরুশক্তি নরজগতে, মানুষের জীবনে কিরূপে কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধে বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন, "জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিৎগুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন এবং ঐ উপদেশ সকল উপযুক্ত শিষ্যে স্ফুরণ করিবার শক্তি গুরুতে সঞ্চারিত করিয়াছেন, এই শক্তি পরম্পরাক্রমে আগত হইয়াছে। পরম্পরারূপে আগত এই শক্তি যিনি লাভ না করিয়াছেন, তিনি যতই শক্তিশালী এবং যতই জ্ঞানী হউন না কেন, শিষ্যকে মোক্ষমার্গপ্রাপ্তি করাইতে পারিবেন না।"

মোক্ষার্থী মানবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ এইরূপে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া এই নরজগতে গুরুশক্তির ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সেই ধারাক্রমে আগত হইয়া শ্রীভগবানের এই শক্তি আজিও কার্য্য করিতেছেন এবং মানবজাতি যতদিন ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন করিবেন। এইরূপ ধারা অবশ্য একটি নহে, বহু। ইহারই একটি ধারা শ্রীভগবানের হংসাবতার কর্ত্তৃক জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়া হংস সম্প্রদায়, সনক সম্প্রদায় অথবা নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীহংসভগবান্ কিরূপে আবির্ভূত হইয়া এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আবার এই সম্প্রদায়ের এক ধারার পরম্পরাক্রমে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীহংসভগবান্ হইতে পঞ্চ পঞ্চাশত্তম (৫৫) পুরুষ।

১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যখন শ্রীহট্ট জিলায় হবিগঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন সদ্গুরু-বিষয়ক প্রসঙ্গ হইয়াছিল। একটি ভদ্রলোক তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "এই পরম্পরাক্রমে আগত গুরুশক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন,

তিনি স্বয়ং যদি সিদ্ধিলাভ না করিয়া থাকেন, তবেও কি তাঁহার দ্বারা শিষ্য মুক্তিলাভ করিতে পারিবে?" তিনি বলিলেন, "এইরূপ গুরু নিজে সিদ্ধ না হইলেও তাঁহার শিষ্যে গুরুশক্তি সঞ্চারিত হইয়া যায়। যিনি গুরুধারা হইতে বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন গুরুর মধ্যে যদি পরম্পরাগত শক্তি তেমন প্রস্ফুটিত নাও হইয়া থাকে, তথাপি শিষ্যে সেই শক্তি সঞ্চারিত হয়। পিতামহের কুষ্ঠাদিরোগ পিতাতে প্রকাশিত না হইয়াও পুত্রে সঞ্চারিত হইয়াছে, এমন অনেক দেখা যায়। হয় ত মধ্যে দুইপুরুষে বংশগত রোগ প্রকাশিত হয় নাই, তৃতীয় পুরুষে হইয়াছে, এমনও দেখা যায়। সেইরূপ সদ্‌গুরুর পরম্পরায় যদি কোন পুরুষে শক্তি প্রস্ফুটিত নাও হয়, তথাপি তাঁহার শিষ্যে শক্তি সঞ্চারিত হইবে এবং সেই শক্তির কার্য্য যে মুক্তিলাভ, তাহাও হইবে। আমরা মহাপুরুষ তাঁহাকেই ধরি, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ-ঋষিপরম্পরানুগত, তাহা না হইলে তাঁহার পার করিবার সামর্থ্য থাকে না, তিনি যতই শক্তিশালী হউন না কেন!" এই সময়ে আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিবার পর কাহার মধ্যে এই শক্তির শীঘ্র প্রকাশ হয়?"

তিনি বলিলেন, "যে অধীনভাবে পড়িয়া থাকে, তাহার মধ্যেই খুব শীঘ্র শক্তি খুলিয়া যায়। তুমি যে পরিমাণে অহংকে খাড়া করিয়া রাখিবে, সেই পরিমাণে শক্তি খুলিতে বিলম্ব হইবে। সম্পূর্ণরূপে যিনি নিজেকে গুরুর অধীন করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাতে গুরুশক্তি অতি শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়।"

ইহাই তাঁহার উক্তি ছিল। কিরূপ সমগ্রভাবে শ্রীগুরুর নিকট তিনি নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়)। ইহার ফলে গুরুশক্তি তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে

আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি শ্রীসদ্গুরুর সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোনও শিষ্যকে তিনি একবার পত্রে লিখিয়াছিলেন "বাবা, তোমাকে নিশ্চয়ই বলিতেছি যে আমার নিজের কোন শক্তি নাই। তবে আমাকে সদ্গুরু * গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছেন; তিনি এই (আমার) ঘটে থাকিয়া তোমাদের গুরু হইয়াছেন এবং তোমাদের সমস্ত কল্যাণ বিধান করিবেন। এই বিষয়ে তুমি সংশয় করিও না।" (পত্রাবলী ২য় খণ্ড, শ্রীগুরুমাহাত্ম্য, ২৮০ পৃষ্ঠা)।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বঙ্গদেশে আসিলেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এইরূপ সাক্ষাতের জন্য একবার তিনি উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত অভয়বাবু পরম সমাদরে তাঁহাকে ভিতরে নিয়া বসাইলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইল। অতঃপর প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত অভয়বাবু তাঁহাকে ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন। জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা বলিয়া বাবাজী মহারাজ ইঁহাকে সর্ব্বদাই বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং ইহাতে তিনি "করেন কি? করেন কি?" বলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাহাতে অভয়বাবু বলিলেন "আমি ঠিকই করিতেছি। আপনি শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আমি অন্তরে অনুভব করি। আপনার বাহিরের চেহারা পর্য্যন্ত বাবার মত হইয়া গিয়াছে!"

বিশ্বব্যাপী শ্রীসদ্গুরুর এক প্রকটিত মূর্ত্তি বলিয়া তাঁহাকে আজ শত শত সাধক নিজ নিজ জীবনে অনুভব করিতেছেন।

---

* অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী গুরুশক্তি; দেহধারী ব্যক্তিবিশেষ নহেন।

তাঁহারই কৃপায় আজ আভাসে বুঝিতেছি যে তিনি গুরুরূপে সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থলে, সকল অবস্থায় সর্ব্বব্যাপী এই যে মহান্, ইঁহারই অঙ্গীভূত হইয়া আমরা আছি। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন "এই দেহের পতন অবশ্য হইবে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের পক্ষে কোন ব্যতিক্রম হইবে না।" *

ইনি কাহার জীবনে কি ভাবে লীলা অতীতে করিয়াছেন অথবা বর্ত্তমানে করিতেছেন, তাহার পরিচায়করূপে বিভিন্ন দেশকালে সংঘটিত বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনের কয়েকটি ঘটনা আমরা এই অধ্যায়ে যথাসম্ভব তত্তৎ ব্যক্তির নিজের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমাদের গুরুভ্রাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত—লিখিয়াছেন, "ইংরাজী ১৯২৫ সালে মধুপুরে আমার দীক্ষা হয়। ভগবদিচ্ছায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে, সদ্‌গুরু-কৃপা লাভ করিতে না পারিলে জীবন বৃথা—এই দুঃখপূর্ণ সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নাই। অথচ আমার দোষগুণের উপর নির্ভর না করিয়া সম্পূর্ণ নিজ শক্তিতে যিনি আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন, ঈদৃশ সদ্‌গুরু যে নিজে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া চিনিয়া লইব এমন চোখ আমার নাই। এরূপ অবস্থায় মনের কষ্টে কালযাপন করিতেছিলাম। অনেক সাধুস্থানে গিয়াছি, সে সকল স্থান যথার্থ সৎস্থান সন্দেহ নাই, কিন্তু সবদিক্ দিয়া আমার মন তৃপ্তিলাভ করে নাই। সুতরাং দীক্ষার প্রার্থনা করিতে মতি হয় নাই। অবশেষে একরূপ হতাশ হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম এবং ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিতাম, দোহাই প্রভু, গুরুরূপে দেখা দিয়া আমায় উদ্ধার কর। এদিকে দেখিতে লাগিলাম, দিনের পর দিন যতই যাইতেছে ততই অধঃপতিত হইতেছি। ইহাতে মনের কষ্ট এত বাড়িয়া গেল

* পত্রাবলী ৪র্থ খণ্ড, ৫৭৩ পৃষ্ঠা।

যে দিনে দিনে পলে পলে যেন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতাম। এই সময়ে একদিন স্বপ্নাতীত আশ্চর্য্যভাবে শ্রীগুরুদেব প্রকটিত হইয়া অপরিসীম করুণা সহকারে আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

"ইহার কয়েকমাস পরে মধুপুরে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে দীক্ষা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। পরে আমার অতীত জীবনের কথা নিজে নিজে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই শ্রীগুরু অদৃশ্যরূপে আমাকে পরিচালিত করিয়াছেন।

"দীক্ষার পরেই আমার গুরুতর পীড়া হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করি। এই সময় আমার হাতে অর্থ নাই, ঔষধ পথ্যের যোগাড় নাই—একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা। অপরিসীম স্নেহ ও করুণা, এই সময়ে ও পরে শ্রীগুরুদেব আমাকে প্রকাশ্য ভাবেও করিয়া প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সাহায্য পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

"ইংরাজী ১৯২৫ সালের জুলাই কি আগষ্ট মাস। আমার পীড়া তখনও ভালরূপে সারে নাই। অসুস্থ দেহ লইয়া যশোহর জিলার শ্রীধরপুর গ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত একটি হাই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের অপ্রত্যাশিত আহ্বানে হেড মাষ্টাররূপে সেখানে গিয়াছি। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে পত্রে সকল কথা জানাইয়াছি এবং উপদেশ ও আশীর্ব্বাদপূর্ণ তাঁহার একখানি পত্রও তদুত্তরে কয়েকদিন হইল পাইয়াছি। সেই উপদেশ যথাযথ পালিত হইতেছে না, এইরূপ বোধ করিয়া এক ছুটির দিন দ্বিপ্রহরে তৎসম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছি, সম্পূর্ণ জাগ্রতাবস্থা, এমন সময়ে দেখি অদূরে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ একটু কঠোর ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ক্ষণকাল পরেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমি উঠিয়া দণ্ডবৎ করিতেও পারিলাম না।

"ইহার পর বৎসর (ইংরাজী ১৯২৬ সালে) আমি হাওড়া জিলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত কোলিয়া গ্রামে তত্রত্য আমীরালি হাই স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলাম। সেখানে বোর্ডিং হাউসেই থাকিতাম বটে, কিন্তু স্বপাক খাইতাম। স্কুলের কাজ ত ছিলই, তদুপরি একটি টিউশন ছিল। সুতরাং পরিশ্রম যথেষ্ট ছিল। রাত্রে ক্লান্ত শরীরে ঘুমাইয়া পড়িয়া চেষ্টা সত্ত্বেও সব দিন ভোরে উঠিতে পারিতাম না। এদিকে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ, অতি প্রত্যুষে রাত্রি থাকিতে উঠিয়া শৌচস্নান সারিয়া ভজন করিতে হইবে। এজন্য মনে অশান্তি থাকিত। একদিন শেষ রাত্রে নিদ্রাগত আছি, এমন সময়ে কেহ আমার নাম ধরিয়া সুস্পষ্ট-স্বরে ডাকিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলাম, কারণ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না এবং আমার নাম ধরিয়া ডাকিবার মত লোক কেহ কোলিয়া গ্রামে ছিলেন না। তখন শীঘ্র শীঘ্র শৌচস্নান সারিয়া আসিয়া নাম করিতে বসিলাম। এইরূপ ঘটনা আরও কয়েকদিন সেখানে থাকিতে আমার হইয়াছিল।

"আমি বুঝিতে পারি আমার চিত্ত অতিশয় মলিন, তাই আমার সম্বন্ধে শ্রীগুরুদেবের যত্নেরও অন্ত নাই। এইরূপ বহুবিধ ঘটনা শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। একটি ঘটনা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। একদিন সকালবেলা আমাদের বাটীর বৈঠকখানায় একখানি খাটের উপর বসিয়া লেখাপড়াসংক্রান্ত কোন কাজ করিতে-ছিলাম—কাজের মধ্যে অন্তমনস্ক হইয়া কখন যে তন্ময়ভাবে কুৎসিত চিন্তা আরম্ভ করিয়াছি, তাহা টের পাই নাই। কামভাবে ভাবিত হইয়া মন বেশ খানিকদূর অগ্রসর হইয়াছে, কল্পনায় একটি অপ্সরা চিত্রিত করিয়া ভাবিতেছি এইরকম যদি ভোগের ইচ্ছা মাত্রই ভোগের উপকরণাদি উপস্থিত হয়, তবে কি চমৎকারই হয়! এমনই সময়

মনের মধ্য হইতে কে বলিলেন, তোমার সুখের আদর্শটা ওই পর্য্যন্তই ত! কথা কয়টি আমি স্পষ্টই শুনিতে পাইলাম। একেবারে চমকিয়া উঠিলাম, বাবা আমাদিগকে ধমক্ দিবার সময় মাঝে মাঝে যে স্বরে কথা বলিতেন, এ ঠিক্ সেই স্বর, কথাটির প্রত্যেকটি বর্ণ আমি স্পষ্টরূপে স্বকর্ণে শুনিয়াছি, অথচ স্বরটি বাহির হইতে আসে নাই ইহা একেবারে নিশ্চিত। আমার ভিতরে উঠিয়াছে, ঠিক কোন্‌খানে তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, বুকের কাছে বলিয়া বোধ হইল। বলা বাহুল্য কামচিন্তা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল; শুধু সেই দিন নয়, তদবধি পরমানন্দের দিকে শ্রীগুরুদেব লইয়া চলিয়াছেন তত্তুলনায় কামক্রীড়াজনিত সুখ যে নিতান্ত তুচ্ছ, এই চিন্তা দ্বারা বহুবার কামচিন্তাকে পরাভূত করিতে পারিয়াছি।

"আর একটি বড় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বহির্জগতে বাবার প্রভাবের পরিচয় অনেকবার পাইয়াছি, কিন্তু নিজ হইতে যেন পৃথক্ বলিয়া একটা বোধ ছিল। মনের মধ্যেও যে তিনি আছেন, একথা জানিতাম না। তদবধি নিজের ভিতরেও যে তিনি আছেন, এই স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে।"

"ত্রিপুরা জিলান্তর্গত গঙ্গামণ্ডল রাজ ইন্‌ষ্টিটিউশনের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"......আমার দীক্ষা লাভের মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে জানিলাম, শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বঙ্গদেশ পরিভ্রমণে আসিয়াছেন। কুড়িচর গ্রামে তাঁহার জনৈক শিষ্যের বাটীতে কিছুদিন তিনি অবস্থান করিতে পারেন। হঠাৎ একদিন ভোরে আমার স্ত্রীকে ঘুম হইতে উঠিয়াই ব্যাকুলস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া বহু জিজ্ঞাসার পর জানিলাম জটাজুট-সমন্বিত জ্যোতির্ম্ময় এক সাধু মহাপুরুষ স্বপ্নে তাহাকে অভয়মূর্ত্তি দর্শনদানে

এত আনন্দ দিয়াছেন যে, তাঁহার অদর্শনে তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইতেছে ও কেবলই কান্না আসিতেছে। আমি প্রবোধ দিয়া বলিলাম, ইহাতে খুবই মঙ্গল হইবে। দীক্ষালাভের কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। পরে বুড়িচঙ্গে দীক্ষাপ্রার্থী হইতে গিয়া স্ত্রীর নিকট জানিয়া বিস্মিত হইলাম যে ইনিই তাহার স্বপ্ন-দৃষ্ট সেই মহাপুরুষ। মাতাপিতা বা গুরুজনের অনুমতি ভিন্ন হয়ত তিনি দীক্ষা দেন না, এই আশঙ্কা আমার মনে ছিল। আমি দীক্ষাপ্রার্থী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিলেন, 'বাবা! তোমার মাতাপিতা ত রয়েছেন, বিরোধী হবেন যে।' জানিনা কে প্রেরণা দিলেন, আমি উত্তর করিলাম—'বাবা, যদি আমার আত্মমঙ্গল হয়, তবে সকলে বিরোধী হইলেই বা দোষ কি? আর আপনার কৃপায় ত সবই সম্ভব। আপনি নিজেই সব ঠিক করিয়া দিতে পারেন।' তিনি অর্দ্ধস্তিমিতনয়নে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, হবে।' অতঃপর, সন্তানের স্বেচ্ছ আচরণেও বর্ত্তমানে অধিকাংশ স্থলে মাতাপিতার তেমন আপত্তির ভাব দেখা যায় না, যেমন সদ্গুরুলাভ বা ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করা বিষয়ে তাহাদের অনিচ্ছার ভাব দৃষ্ট হয়—এই সম্বন্ধে নানা আলাপ হইল। তিনি সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থার অনেক কথাই বলিলেন। কি আশ্চর্য্য! তৎপরে আমার আত্মীয়বর্গের বিরুদ্ধভাব দূরীভূত হইয়া গেল ও হঠাৎ তাঁহাদের মনোভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। যাহা হউক, তিনি আমাকে সস্ত্রীক দীক্ষা দিবেন বলিয়া সম্মতি দিলেন। আমরা উভয়ে দীক্ষার সময় উপস্থিত হইলাম। আমি ভক্তিহীন ও বিশ্বাসহীন বলিয়াই বোধ হয় দীক্ষাদানকালেও তিনি নিজ মহিমার কিঞ্চিৎ আভাস দিলেন। একটী নূতন পৈতায় গ্রন্থি ও শোধনাদি কার্য্য করিয়া রাখিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল দীক্ষাকালে উহা ব্যবহার করিব, কিন্তু ভুলক্রমে উহা বাড়ীতে

ফেলিয়া যাই। দীক্ষাকালে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ সস্নেহে আমাকে বলিলেন, 'নূতন পৈতা প'রে দীক্ষা নিতে হয়।' এত লোকের দীক্ষা হইল, অথচ অন্য কাহাকেও তিনি কিছুই বলেন নাই। তৎপর শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর চরণে সমর্পণের জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। আমিও আনন্দভরে ভাববিহ্বলাবস্থায় বলিতে যাইতেছিলাম যে, এই জন্যই গত কিছুকাল যাবৎ আমিও কিভাবে শ্রীভগবান্‌কে ডাকিয়াছি! তখনই বাবাজী মহারাজ আমাকে ধমক দিয়া বারণ করিয়া বলিলেন, 'আমি সব জানি, বলতে হবে না।' তৎপরে কৃপা করিয়া তিনি আমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। দীক্ষার পর শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইবার দিনে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক সমস্যায় পতিত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে অস্থিরচিত্তে বাবার নিকট যাইয়া পাষণ্ডের ন্যায় মনে মনে কহিতে লাগিলাম, 'গুরুদেব! তুমি যদি প্রকৃতই সদ্‌গুরু হইয়া থাক, তবে আমার মনের কথা এখনই টের পাইবে ও তাহার সমাধানকল্পে উপদেশ প্রদান করিবে। অথচ উপস্থিত সকলে তাহা যেন জানিতে না পারে।' চতুর্দিকেই তখন লোক, কেহ বসা, কেহ বা দাঁড়ান ছিলেন। মনে মনে আমার নিবেদন জানাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার দিকে (আমি তখন তাঁহার অতি নিকটে দণ্ডায়মান ছিলাম) হাসিতে হাসিতে চাহিয়া উক্ত বিষয়ের যথার্থ উপদেশ দিলেন এবং পরে সেইভাবে কার্য্য করিয়া আমি আশাতীত ফললাভ করিলাম। তিনি যে সকল উপদেশ স্পষ্টস্বরে সকলের সামনে আমাকে করিলেন, তাহা সেখানের কেহই শুনিতে পারেন নাই। ইহা আমি পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। * * * * আমি ঘোর সংশয়বাদী, বোধ হয় আমার মোহকালিমা ঘুচাইবার জন্যই তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে অহেতুক কৃপা অনেকবার করিয়াছেন।..."

হাইলাকান্দির উকিল শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"........দীক্ষার সময় আমার ইচ্ছা ছিল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিজ হাতে আমার গলায় উপবীত পরাইয়া দেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা প্রকাশ করি নাই। তিনি আসনে বসিয়াই আমার জন্য একগাছি উপবীত গ্রন্থি দিয়া আনিতে শ্রীযুক্ত অনন্তদাসজীকে বলেন এবং সেই উপবীত আমার গলায় নিজ হাতে পরাইয়া দেন। যখন তিনি আমার গলায় কণ্ঠী পরাইয়া দিলেন, তখন আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল যে যাহাদের আমি সর্ব্বদা ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি, আমাকে শেষে সেই 'বৈরাগী' হইতে হইল। যাহা হউক, মনে মনে স্থির করিলাম, বৃন্দাবনে কণ্ঠী ধারণ নিন্দনীয় নয় সুতরাং বৃন্দাবনে যে কয়দিন আছি কণ্ঠী ধারণ করিব, পরে গাড়ীতে উঠিয়াই কণ্ঠীছড়া বন্ধ করিয়া রাখিব এবং বৃন্দাবন ত্যাগ করার পর তিলক ধারণ করিব না। মনে মনে এই সব চিন্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাসিতে হাসিতে আরও একছড়া কণ্ঠী আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখ, আমি প্রত্যেককে একছড়া কণ্ঠী দিয়া থাকি, তোমাকে দুই ছড়া দিতেছি, একছড়া ছিঁড়িলে তৎক্ষণাৎ অপর ছড়া গলায় দিবে। তোমার পৈতা যেমন সর্ব্বদা ধারণ কর, সেইরূপ সর্ব্বদাই কণ্ঠী ধারণ করিতে হইবে।' এই কথার পর আমি নিরুপায় হইলাম, মনে মনে স্থির করিলাম গুরুদেব সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার আদেশ যথাশক্তি পালন করিব, তিনিই আমার সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূর করিবেন। তাঁহার নিকট কিছুই গোপন নাই, তাঁহার সঙ্গে কোনও প্রকার চাতুরী করিব না। পরে তাঁহার কৃপায় মালা তিলক ধারণ করিয়া জনসমাজে বাহির হইতে কখনও সঙ্কোচ হয় নাই।"

শ্রীমতী *** লিখিয়াছেন—"একদিন বাবা আমায় কয়েকটি উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিলেন 'ত্যাখ্! রোগীর সেবা খুব যত্নের সঙ্গে করতে চেষ্টা করবি। ভগবান্ পীড়িতরূপে বিশেষ ক'রে তোর সেবা নিয়ে তোকে ধন্য করছেন, সর্ব্বদা এই ধ্যান মনে রাখবার চেষ্টা ক'রে, যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে রোগীর সেবা করবি। রোগীর সেবায় ভগবান্ বড় প্রসন্ন হ'ন। ঘৃণা বা সঙ্কোচ মনে রাখবি না। যদি রাস্তার ম্যাথরকেও পীড়িত-অসহায় দেখিস্, দরকার হ'লে তার সেবাও যেন প্রসন্ন মনে করতে পারিস, এমন ভাবে মনকে প্রস্তুত রাখা চাই। কেমন পারবি ?' আমি বলিলাম 'হ্যাঁ, চেষ্টা ক'রব।'

"আমি অলস প্রকৃতির লোক, তাহা ছাড়া মল, মূত্র, পুঁজ, রক্ত প্রভৃতিতে আমার বড় ঘৃণা। তবে তখন ভগবানের প্রসন্নতালাভের ইচ্ছা কিছু বলবতী ছিল। ভাবিলাম ঐ উপায় তবুও অপেক্ষাকৃত সহজ। একটি রোগী পাইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। মনের এইরূপ অবস্থা লইয়া তিনচারি মাস পর কাশীতে গেলাম। আমি যাওয়ার অল্পকাল পরই আমাদের এক পিসীমা ক্যানসার রোগাক্রান্ত হইয়া কাশীপ্রাপ্তির আশায় কাশী আসিলেন। আমি মনে মনে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে অশেষ ধন্যবাদ সহকারে প্রণাম করিয়া সাগ্রহে পিসীমার সেবার ভার নিলাম এবং গুরুবাক্য স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য যত্ন সহকারে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলাম। তাঁহার রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইয়াছিল, ক্রমশঃ বাড়িতেই লাগিল, অল্পকাল মধ্যেই তিনি উত্থান-শক্তিশূন্য হইয়া অন্তিমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একদিন এক নূতন উপসর্গ দেখা দিল, পিসীমা প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার চারিধারে নানারূপ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন ও দণ্ড দেওয়া সূচক নানা কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনি ভীতি-বিহ্বল চিত্তে আমার

দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আমায় সেই সব দেখাইতে ও শুনাইতে লাগিলেন, আমি কিছুই দেখি না বা শুনি না, অথচ তাঁহার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বাস্তবিক তিনি কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন। পিসীমার চেহারা তৎকালে যেমন দুর্ব্বল তেমন ভীষণও হইয়াছিল। ইদানীং মাংস পচিতেছে, দুর্গন্ধ। তিনি চীৎকার কবিয়া আমায় বুকে চাপিয়া ধরিলেন। আমার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল, কাতর প্রাণে গুরুদেবকে বলিলাম, 'বাবা! কি ভীষণ ব্যাপার! তুমি পিসীমার প্রাণ-বিয়োগকালে তাঁর কাছে আমায় রাখিও না।' চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলাম, ঘন ঘন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ মাথার উপর হইতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের মন্দ্রমধুরস্বরে 'ভয় কি মাই, আমি আছি' এই বাণী কর্ণপথে গিয়া মর্ম্মস্পর্শ করিল। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রাণে অসীম সাহস ও বল পাইলাম। তখন ১৩২৯ সাল, ফাল্গুনের মধ্যভাগ। শ্রীশ্রীগুরুদেব জ্বালামুখী তীর্থে অবস্থান করিতেছেন। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলাম! এত করুণা! আমার সকল অবস্থাই তিনি জানিতেছেন !! এতদূর হইতেও তাঁর দৃষ্টি অব্যাহত !!! যথার্থতঃ জানিলাম তিনি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে রহিয়াছেন। স্মরণ হইল শ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'গুরু সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে রহিয়াছেন এবং সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করিতেছেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিয়া সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিবে। তোমার ভয় ও চিন্তার কারণ কিছু নাই। আর ইহাও স্মরণ রাখিবে যে তোমার অন্তর ও বাহ্য কার্য্য-কলাপ সবই তিনি দেখিতেছেন, তাঁহার নিকট কিছুই গুপ্ত থাকিবে না।' জানিলাম গুরুদেব সর্ব্বজ্ঞ যোগীশ্বর ভগবান্। তাঁহার দুইটি ভাব চিত্তে ফুটিয়া উঠিল, এক দেহধারী রূপ, অপর সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বময়। আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া বাবার অমৃতময়ী বাণী ভুলিয়াছিলাম। তিনি যে সর্ব্বক্ষণ কাছে রহিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিলেন। রোগীসেবার জন্য

সঙ্গে সঙ্গে মিলিল। তারপর আরও কতরূপে কত করুণার পরিচয় দিয়াছেন এবং দিতেছেন, কিন্তু মনে হয় সকল করুণার ঐ এক মূলমন্ত্র 'ভয় কি মাই! আমি আছি।'

"পরে উক্ত ঘটনা শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করিলে তিনি এক অপূর্ব ভাবে বিভোর হইয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, 'হাঁ, এখন বুঝিলে ত যে গুরু সর্ব্বদাই সঙ্গে রহিয়াছেন।' গুরুদেব আমার প্রার্থনাও পূর্ণ করিয়াছিলেন, পিসীমার দেহান্তের কিছুকাল পূর্ব্বে কোন অনিবার্য কারণে বাধ্য হইয়া তাঁহার সান্নিধ্য আমায় ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।"

তাঁহার কৃপায় মাতাল, লম্পট, অবিশ্বাসী, ভ্রষ্টাচার ব্যক্তি অতি সদাচারী, সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের অবস্থা লাভ করিয়াছেন। এ সকল স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। পরন্তু অজ্ঞান হইতে উদ্ধার করা, শুদ্ধ করা, যথার্থ আস্তিক্যবুদ্ধি প্রদান করা, অহংবুদ্ধি বিনষ্ট করা প্রভৃতিই প্রধানতঃ গুরুশক্তির কাজ হইলেও গুরু যখন শিষ্যকে গ্রহণ করেন, তখন সর্ব্বতোভাবেই করেন, শিষ্যের সম্বন্ধে তিনিই চরম আশ্রয়স্থল হয়েন—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু সকলই তিনি। সর্ব্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে শিষ্যের তিনিই রক্ষক। তাই গুরুশক্তির ক্রিয়া শিষ্যের জীবনে নানাভাবে প্রকাশ পায়।

ই. আই. রেলওয়ের আসানশোল ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ আফিসের শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা :—

"হাওড়া শিবপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিনে আশ্রমের পশ্চিম দিকের বারান্দায় অর্থাৎ রাস্তার ধারের ফটকের ডান দিকে বাবা এবং বাবার বামপার্শ্বে কাকাজী মহারাজ (শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসজী মহারাজ) একাসনে বসিয়া আছেন, যেন হরিহর বসিয়া আছেন, অনেক লোকে কেহ গীতা, কেহ ফল, ফুল, মাল্য, টাকা ইত্যাদি দিয়া উভয়কে পূজা করিতেছেন।

ঐ বারান্দা লোকে ভরা। লোক সব বসিয়া বাবাকে দর্শন করিতেছেন, তিলার্দ্ধ স্থান নাই, লোকের দর্শনে ব্যাঘাত না করিয়া আমরাও যাহাতে বাবাকে দেখিতে পাই, সেজন্য আমি ঐ বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছি এবং মনে মনে বাবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, 'বাবা! আজ এই আনন্দের দিনে সবাই তোমাকে কতভাবে পূজা করিতেছে, আর আমি কিছু ফুল চন্দনাদি তোমার চরণে দিতে আনিয়াছিলাম, তাহা পকেটেই রহিয়া গেল। চেষ্টা করিয়াও তোমার নিকটে যাইতে পারিলাম না, যাহা হউক তোমার কৃপা সর্ব্বদাই গরীবের প্রতি আছে, ইহা কল্পনা নহে, তাহা বহুবার দেখিয়াছি। তুমি মনের সব দুঃখ বুঝ, ইত্যাদি।' এমন সময়ে বাবা দূরস্থিত স্বীয় আসন হইতে দুইটি হস্তাঙ্গুলির দ্বারা সঙ্কেত করিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমরা মনে করিলাম যে, বোধ হয় আমার পার্শ্বস্থ গুরুভ্রাতাকে ডাকিতেছেন। ঐ গুরুভ্রাতা যাইতে উদ্যত হইলে বাবা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'বিজয় আসবে।' তাহাতে আমি ধন্য জ্ঞান করিয়া এবং আমার মনের চিন্তা তিনি বুঝিয়াছেন জানিয়া তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি যে আমার মনের চিন্তা বুঝিয়াছেন ও সকলের খোঁজই যে তিনি রাখেন, তাহা দেখাইবার জন্যই বাবার এই কৃপা।"

বি. এন্. রেলওয়ের খড়াপুরের মেসিনসপ ফোরম্যান্ আফিসের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কথা :—

"শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ৺ভুবনেশ্বরে থাকিবার কালীন আমি, বিজয় দা, বিনোদ দা প্রভৃতি কয়েকজন গুরুভ্রাতা তাঁহাকে দর্শন করিতে সেখানে যাই। পথের পার্শ্বে ৺ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকট কয়েকজন সাধু বসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের কেবলমাত্র হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইলাম। আমরা শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের নিকট পৌঁছিবামাত্র

আমাদের সকলকে মৃদু ভৎ‌র্সনা করিয়া বলিলেন—'এ তোমাদের কিরূপ রীতি? তোমরা সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর না।' ভবিষ্যতে যাহাতে আমরা ওরূপ না করি সেজন্য সাবধান করিয়া দিলেন। আমরা তাঁহার অন্তর্যামিত্ব ও সর্ব্বদা আমাদিগকে সংশোধন করিবার দিকে লক্ষ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একস্থানে থাকিতে অন্যত্র তাঁহার সাক্ষাদর্শন পাইবার বিষয়ে এক সময়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন 'বাবা, আকুলিত প্রাণে প্রার্থনা করিলে সময় সময় কেহ এইরূপ দর্শন পায়'। আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। গত ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসে উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যান নাই, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে আমাদের জ্যেষ্ঠ সাধুগুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অনন্তদাসজী গিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজের আদেশে আমিও গিয়াছিলাম এ কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বাধ্যায়েই বলিয়াছি। এই কুম্ভমেলায় আমাদের এক গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু (ই. বি. রেল লাইনের হিলি ষ্টেশনের তৎকালীন ষ্টেশন মাষ্টার) সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। বাবা যে ছাতার নীচে বসিতেন, তাহাতে শ্রীযুক্ত অনন্তদাসজী ও আমি থাকিতাম। শ্রীযুক্ত অনন্তদাসজী মহন্তের আসনে বসিতেন না, প্রায়ই নীচে বসিয়া থাকিতেন। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সন্ধ্যা আরতি করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি, এমন সময় শ্রীযুক্ত অনন্তদাসজী আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'দেখত সুরেন বাবুর স্ত্রী ছাতার নীচে বসিয়া কাঁদিতেছেন কেন?' আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি খুব ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমতঃ তিনি উত্তর করিতেই পারিলেন না; কয়েকবার জিজ্ঞাসা করার পর একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,

"বাবার আসনটি খালি দেখিয়া আমার মনে বড়ই দুঃখ হইল এবং অত্যন্ত আবেগের সহিত মনে মনে বাবাকে বলিলাম,—'বাবা! তুমি আসনে বসিয়া থাকিলে কতই শোভা হইত এবং আমরা কতই আনন্দ পাইতাম। তুমি এই আসনে উপবিষ্ট থাকিলে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে। শূন্য আসন আমি আর দেখিতে পারিতেছি না, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।' এই বলিতে বলিতে আমার চক্ষুতে জল আসিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আসনে বসিয়া আছেন। তাহা দেখিয়া আমিও প্রণাম করিলাম। তিনি আমার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহাতে আমি যে কি আনন্দ পাইলাম, তাহা মুখে বলিতে পারি না, তৎপরই তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।"

মেদিনীপুরস্থ বাঁশদা পলাসীর নন্দী এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী জানাইয়াছেন :—

"......আমার দীক্ষা লওয়ার দুই বৎসর পরে একবার আমার বড় মেয়ের খুব অসুখ হয় এবং তার জীবনের কোন আশাই ছিল না। ঐ সময় একদিন রাত্রি খুব বেশী হইয়াছে, আমার মেয়েটি রোগে ছট্‌ফট্ করিতেছে, আমি বসিয়া এই কথাটা বারংবার মনে করিয়া কাঁদিতেছি যে, শুনিয়াছি, সন্তানের মৃত্যু নাকি পিতামাতার পাপে হয়। তবে আমি যদি এত পাপী যে, আমার এই প্রথম সন্তানটি মরিবে, তা হ'লে শ্রীগুরুদেবের মত মহাপুরুষ তাঁহার চরণে আমায় আশ্রয় কেন দিবেন? যখন পর্য্যন্ত চাক্ষুষ তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, সেই অনেক আগে স্বপ্নে এই মহাপুরুষ আমার হাতে মালা দিয়াছিলেন। পরে অভাবনীয়রূপে আমার কৃপা করিয়া দীক্ষা দিলেন, আর এই দুবছর পূর্ণ না হইতেই যদি আমার এই দশা হয়, তবে কেমন হইবে? এই সকল চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ দেখি যে, শ্রীগুরুদেব আমার বিছানার উপর দাঁড়াইয়া

আছেন। বাবার সেই অলৌকিক রূপ দর্শন করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ আমি বাবাকে দর্শন করিলাম, আন্দাজ করিতে পারিব না। তাহার পরে আমার কন্যার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া অমৃত মাখান অভয় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া ক্রমেই যেন ঘরের দেওয়ালের সাথে মিলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই দৃষ্টি, সেই রূপ আমার অন্তরে গাঁথা হইয়া আছে। মনে করিলেই আমার সমস্ত শরীর আনন্দে শিহরিয়া উঠে। আমার কন্যাটি ক্রমে রোগমুক্ত হয়।

"শিবপুর আশ্রমে একদিন আমি যাই; বাবাকে দণ্ডবৎ করিতে কাছে যাওয়া মাত্র ডান পা খানি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। মুখে মৃদু হাসি। আমি অবাক্ হইয়া আনন্দে বাবার পদধূলি মাথায় দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। তারপরই বাবা অতি মৃদুভাবে আমাকে বলিলেন,— 'বাহিরের দিকে বেশী তাকাবি না, অন্তরের দিকে তাকাইলেই সব পাবি। মন খারাপ করিস্ না, আমি সব সময় তোদের কাছে আছি।'

"গত ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বাবার তিরোভাবের সংবাদ পাইয়া প্রাণে অসহ্য যাতনা পাইতেছিলাম; সংবাদ পাইবার তিন দিন পরে একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় বিছানায় বসিয়া একা ঘরে শুধু বাবার জন্য কাঁদিতেছি। একটু দূরে আর একখানা তক্তপোষ আছে, সেখানে কেহ শোয় নাই—খালি। কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ তাকাইয়া দেখি, বাবা সেই তক্তপোষের এক কোণে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন এবং আমায় ডাকিতেছেন। অতি অপরূপ জ্যোতির্ময় চেহারা, আমি উঠিয়া গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাকে স্পর্শ না করিয়া মাটিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। কিন্তু বাবা দুই হাত দিয়া আমার পিঠের উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন,—'এত ব্যাকুল হইয়াছিস্ কেন? আমি ত তোদের কাছেই আছি, আর কাঁদিস্ না।' এই বলিয়া আমার শরীরের উপর

হইতে হাত সরাইয়া লইলেন। পরে বাবা অন্তর্হিত হইলেন। এই প্রত্যক্ষ ঘটনার পর হইতে প্রাণের বেদনা অনেক কমিয়া গেল এবং সেই হইতে প্রায় সময়ই বাবার সেই মধুর মূর্ত্তি আমার অন্তরে অনুভব করি।"

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক, দৌলতপুর কলেজ) লিখিয়াছেন :—"আমার বিবাহের অব্যবহিত পরেই আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কৃপালাভ করেন। ইহার পর আর দুইটি বৎসর মাত্র তিনি জীবিতা ছিলেন; এই অল্পকাল মধ্যে তাঁহার যে সাধনোন্নতি হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতাম। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, শ্রীগুরুদেবের প্রতি আত্মীয়বোধ জন্মিয়াছিল, পার্থিব কোন বস্তুর প্রতিই তাঁহার স্পৃহা ছিল না। ঠিক দুই বৎসরের শেষে করুণাময় শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়াছেন।

"মাত্র সাতটি দিন তিনি রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলা হইতে অল্প জ্বরবোধ করিতেছিলেন। মধ্যরাত্রে সহসা জ্বরের প্রাবল্য দেখা দিল। উত্তেজিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের কথা বলিতে লাগিলেন। মাথায় বরফ দিতে দিতে একটু স্থির হইলেন। ভোরের দিকে মধুর স্বরে বলিলেন, 'বাবা এসেছেন!' সমস্ত সকাল ধরিয়া এক কথাই বলিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন, 'বাবা এসেছেন, বাবা, বাবা, বাবাইত! দিদি, (আমার ভগিনীকে তিনি দিদি বলিতেন) শীঘ্র আসন করিয়া দিন, দেখ্‌ছেন না দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বাবার শরীর কত কাহিল হয়ে গিয়েছে *। বড় কষ্ট হচ্ছে, দিদি শীঘ্র জায়গা পরিষ্কার করে আসন করে দিন।'

"এই রকম কয়েকদিন ধরিয়াই চলিল। একদিন আমাকে বলিলেন,

---

* এই সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবনে অসুস্থ ছিলেন এবং খুব [illegible] গিয়া-ছিলেন; এই সময় তাঁহার জানিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

'আমি বাবার সঙ্গে যাব। যাব? বল, যাব?' কাতরভাবে আমার সম্মতি চাহিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'বাবা কি বলেন?' খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, 'বাবা রাজী হয়েছেন, তিনি নিয়ে যাবেন। এইবার বল, যাব?' অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া আমি বলিলাম, 'বাবা যদি নিতে চান, আমার আপত্তি নাই।' রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রায় সর্ব্বদাই বাবার কথা বলিতেন। ক্রমাগত অবিচ্ছেদী প্রবল জ্বরের ফলে পঞ্চম দিনে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এক সময় বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছেন দেখিয়া আমার পিসীমা নীচু হইয়া তাঁহার মুখের কাছে কাণ নিয়া গিয়া শুনিলেন, 'জয় বাবাজী মহারাজের জয়!'

"ষষ্ঠদিনে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে কান্দিয়া বলিলাম, 'বাবা, যদি নিবেই, ত শীঘ্র নাও। এ কষ্ট আর দেখিতে পারি না।' আর দেরী হইল না, অস্থিরতা বন্ধ হইয়া গেল। পরদিন ছিল শিবরাত্রি। সকালে একটু ঔষধ মাত্র খাইয়াছিলেন, রাত্রি প্রায় দুইটার সময় অবস্থা খুব খারাপ বুঝিয়া ডাক্তারকে খবর দিলাম। সংবাদ পাইয়াই তিনি চলিয়া আসিলেন। একটি ইনজেকশন করিয়া একটু পরে বলিলেন, 'আর বেশী সময় নাই, তোমরা ভগবানের নাম কর।' আমার ভগিনী তাড়াতাড়ি গা মুছাইয়া বিছানা পরিষ্কার করিয়া গঙ্গাজল দিয়া দিলেন। আমি শিয়রের বালিশ সরাইয়া বাবার ব্যাখ্যাত গীতা একখানি দিয়া দিলাম ও তিলকস্বরূপ করিয়া দিলাম। আমরা মনে মনে জপ্যনাম করিতে লাগিলাম। যতই সময় শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, ততই রোগিণীর মুখশ্রী লাবণ্যযুক্ত হইতে লাগিল, মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হইল। ডাক্তারবাবুটি ব্রাহ্মণ, সজ্জন ও ভক্ত লোক। তিনি চলিয়া যান নাই, শ্রীভগবদিচ্ছায় অপেক্ষা

করিয়াছ ছিলেন। আমরা নীরবে জপ করিতেছি দেখিয়া তিনি অতি সুমিষ্টস্বরে উচ্চকণ্ঠে ভগবন্নাম করিতে লাগিলেন। এইরূপ সুস্বরে কাহারও দেহত্যাগের সময় নাম শুনাইতে ইহার পূর্ব্বে অথবা পরে কখনও আমি আর শুনি নাই। তাঁহার স্বরলহরী উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া প্রকোষ্ঠকে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেখানে শোকের ব্যথা একান্ত লঘু হইয়া গেল—দেহত্যাগের সময়টি উৎসবময় হইল। সেই সময়ে ও পরে রোগিণীর মুখ এমন একটি অপূর্ব্ব উজ্জ্বল প্রসন্ন শ্রী ফুটিয়া রহিল যে তেমন আর কখনও দেখি নাই। বাটীর লোকে এবং প্রতিবেশীরাও তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

তাঁহার মরণ সময়ের সেই দৃশ্য যখনই স্মরণ করি, তখনই ভরসায় বুক ভরিয়া উঠে। বাবাকে মনে মনে বলি, 'তোমার এই অধম পতিত সন্তানের সকল ত্রুটি, সকল পাপ উপেক্ষা করিয়া কবে অমনি করিয়া নিজে আসিয়া আমাকেও নিয়া যাইবে, সেই ভরসাতেই আজ বুক বান্ধিয়া আছি।"

বামনরাও কৃষ্ণরাও আজিংক্য নামে আমাদের এক মারাঠী গুরুভ্রাতা আছেন, কলিকাতায় থাকিয়া কাজ করেন। ইনি বিবাহ করেন নাই, সংসারে তাঁহারা কয়েকটি ভাইবোন মাত্র, আর কেহ নাই। সকলেই শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের আশ্রিত, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া সেবায় পূজায় ভজনে এক মাধুর্য্যময় একটানা স্রোতে ইঁহাদের জীবন বহিয়া চলে। চঞ্চলকুমারী নামে ইহার এক ভগিনী ছিলেন। তাঁহার দেহাবসানের বিবরণ (ইহার আর এক ভগিনী শশিকলা কৃষ্ণরাও আজিংক্য লিখিত) দিয়ে দিলাম:—

"শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাদের ছোট বোন [illegible] জীবনও কত অল্প সময়ের মধ্যে ধর্ম্ম জগতে কত উচ্চস্থান

লাভ করিতে পারে, চঞ্চলের জীবন তাহার একটি দৃষ্টান্ত। দীক্ষা গ্রহণের পর আমার ভগিনী কখনও সমস্ত দিবারাত্রে ৩।৪ ঘণ্টার অধিক সময় বসিয়া ভজন করিবার সময় পায় নাই। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে দীক্ষা দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, জীবের সেবাই তোমার ধর্ম, একান্তমনে সকলের সেবা করিবে। শ্রীগুরুদেবের এই 'বাক্য' তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ও সাধনাস্বরূপ হইয়াছিল। মৃত্যুর আধঘণ্টা পূর্ব্বেও সকলের আহার হইয়াছে কি না, খবর লইতে ভুলে নাই। 'মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং' ইহা তাহার জীবনে সফল হইয়াছিল।

"দীক্ষাদান কালে বাবা আরও বলিয়া দিয়াছিলেন,—'পিতা যেমন বিবাহের সময় কন্যা সম্প্রদান করেন আমি সেইভাবে তোমায় শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম। তুমি কি ইহা বুঝিয়াছ? সকলের সেবা যত্নের সহিত করিবে'।

"শিবপুর আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ৮।১০ দিনের মধ্যে চঞ্চলের সর্দ্দি ও জ্বর হয় এবং মস্তকে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। তিন চারি দিন যাবৎ ডাক্তারেরা ঐ যন্ত্রণার লাঘব করিতে পারেন না। পঞ্চম দিন প্রাতে বেলা ৮।টা ৯টার সময় শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজের পায়ে যে ফুল আটকাইয়া নিবেদন করা হইয়াছিল (আমাদের বাটীতে ছবির ফ্রেমে পিন লাগান আছে, ঐ পিনে ফুল লাগাইয়া দেওয়া হয়) উহা তাহার মস্তকে আসিয়া পড়িল। ঠিক যেন কেহ ঐ ফুল হাতে করিয়া ছুঁড়িয়া তাহার মস্তকে ফেলিয়া দিল। এই ঘটনার সময় আমরা সকলেই রোগিণীর নিকট বসিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজের ছোট বাঁধান ছবি চঞ্চলের মাথা হইতে চারি হাত দূরে দেওয়ালের একটি খাটালের মধ্যে ঘরের মেঝে হইতে এক হাত উচ্চে ঝুলান ছিল। এমন অবস্থায় ছিল যে, যদি কোনও কারণবশতঃ ঐ ফুল পিন হইতে

খুলিয়া যায়, কোনও রকমেই অতদূরে গিয়া পড়িতে পারে না ; জোর বাতাস বহিলেও ফুল সম্মুখদিকে চারি হস্ত দূরে পড়িবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ঐ ফুল মস্তক স্পর্শ করিবার দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তাহার মস্তকের যন্ত্রণা একেবারে অন্তর্হিত হয়।

"বিছানায় গঙ্গাজল দিতে বলিত। প্রত্যহ দুইবার বিছানা বদলাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। কারণ সমস্ত দিনই বলে, দাদাগুরুজী মহারাজ ও বাবাজী মহারাজ আমার বিছানায় এসে বসেছেন, কেহ বিছানা ছুঁইও না, গুরুপরম্পরার সাধুরা এসেছেন, আরও অনেক সাধু সঙ্গে রয়েছেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে বলে কোনও কষ্ট নাই, বেশ ভাল রহিয়াছি। কিন্তু জ্বর খুব থাকিত এবং কোনও শারীরিক কষ্টের কথা আর একদিনও বলে নাই। কেবল বলিল—'আমি শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজকে বলিলাম, বুধবার যাব, কিন্তু তিনি বলেছেন, বৃহস্পতিবার দ্বাদশী তিথি, ঐদিন সন্ধ্যার পর আমি তোমায় নিয়ে যাব।'

"প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বরূপ করিয়া উত্তম পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া চুল বাঁধিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় প্রত্যহ ঐরূপ করা হইত। সুস্থ অবস্থায় কিন্তু সাজ পোষাকের দিকে তাহার কখনও লক্ষ্য ছিল না। একটু সাজ পোষাকের জন্য পীড়াপীড়ি করা হইলে কাঁদিত ও বলিত আমার ওসব একেবারে ভাল লাগে না।

"কাকা বলিলেন, 'তুমি সুস্থ হও, বিবাহ হইবে ও তোমার বাটীতে যাইবে।' ইহাতে সে বলিল, 'আপনি মনে করেছেন আমায় ধরে রাখবেন, আমি চলে যাবই। দাদাগুরুজী মহারাজ বলেছেন যাবার সময় আমায় কত তীর্থ দেখাবেন, সে সব তীর্থ আপনি দেখেন নি, কাকা।' সমস্ত রাত্রি দিন সাধুদর্শন ও স্তুতিপাঠ, একবারও ক্লান্তি নাই। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে বলে 'বেশ ভাল আছি, কোনও অসুখ নাই।'

"ডাক্তার অতি বিচক্ষণ ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন সাধনশীল ব্রাহ্মণ। তিনি সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। একথাও বলিলেন—'উহার দিন স্থির হইয়াছে, উহাকে আর রাখা যাবে না। সর্ব্বদা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির, গুরুদর্শন ও গুরুপ্রসঙ্গ, এত ব্যাধিযুক্ত শরীরেও কোনও যন্ত্রণা বোধ নাই। রোগী শরীর হইতে তাহার পৃথক্ সত্ত্বার অনুভব করিতেছে, এ শরীর আর থাকবে না। তিন চারি দিন পরেই দেহত্যাগ হইবে'। শরীর এত লাবণ্যযুক্ত হইয়াছিল যে তাহাকে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত মনে করা দূরের কথা, যেন তাহার শরীর ভাল ও উন্নত হইয়াছে। গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ক্রমশঃ চতুর্গুণ ফুটিয়া উঠিল।

"ইহার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যা ৮ টার সময় সকলের নিকট বিদায় লইয়া শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিতে করিতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পূর্ণজ্ঞানে শরীর ত্যাগ করিল। মুখে কোনও যন্ত্রণার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই ব শরীরের কোনও যন্ত্রণা একবারও ব্যক্ত করে নাই।"

সদ্গুরুরূপে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের বিভূতির এইরূপ পরিচয় কেবল যে তাঁহার শিষ্যদিগের জীবনে ঘটিয়াছিল এমন নহে। তাঁহার শিষ্য নহেন এরূপ ব্যক্তিও সময় সময় ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

বীরভূম জিলান্তর্গত আহমদপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেশন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমি গত চারি বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন বন্ধুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনধামে দোলযাত্রা উপলক্ষে গিয়াছিলাম। সেখানে আমরা শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাই। তাঁহার সহিত আমরা ৭৮ দিন সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছিলাম। আমরা যেদিন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিব, তাহার পূর্ব্বদিন আমি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কোন জিনিষের প্রার্থনা করি। তাহাতে তিনি বলিলেন—'তোমাকে

আর আমি কি দিব ?' তারপর তিনি আমাকে তাঁহার ফটো দেন এবং বলিয়া দেন যে, কখনও কোন বিপদে পড়িলে এই ফটোর দিকে চাহিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলেই সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব। আমি এখনও সেই ফটো অতি যত্নসহকারে নিজের নিকট রাখি। আমি একবার পরীক্ষার সময় বিশেষরূপ প্রস্তুত হইতে পারি নাই ; কিন্তু যেদিন পরীক্ষা দিতে যাইব, সেই দিন এই মহাপুরুষের ফটোখানা আমার মাথার নিকট লইয়া তাঁহাকে আমার কাতর প্রার্থনা জানাই এবং তাঁহার কৃপায় পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাই। চাকুরী করিতে করিতে একবার আমার নিজের ভুল বশতঃ এমন বিপদে পড়িয়াছিলাম যাহাতে আমাকে নিশ্চয়ই চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইতে হইবে এরূপ মনে হইয়াছিল। সেইবারও আমি পূর্ব্ববৎ স্মরণ করি এবং সেইবারও নিরাপদে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া যাই। এইরূপ আমি যে কত ছোট বড় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, তাহা বর্ণনা করার নহে। আমি তাঁহার নিকট হইতে যে এইরূপ উপকার পাইব, তাহা আশা করি নাই। তাঁহার দয়া পাইবার যোগ্য হইতে পারি নাই। তিনি নিজগুণে দয়া করিয়া আমার জীবনের শান্তিময় পথ দেখাইয়া দিয়াছেন এবং তিনিই আমার জীবনের আশ্রয়-স্বরূপ। আমি তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য নহি।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, হেল্‌থ্‌ অফিসার, শিলং হইতে জানাইয়াছেন :—

"শিলংএ তাঁহাকে নিয়া আমি সকাল বিকাল দুইবেলাই আমার গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইতাম। সাধারণতঃ আমার যাবার সময় হইলেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমার সঙ্গে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। বহু জনসমাগম হইত। তাহাদের ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে শুধু আমার সঙ্গে চলিয়া আসা সমাগত জনগণের মনোমত হইত না।

কিন্তু বাবাজী এমন ব্যবহার করিতেন যে তিনি যেন কোন দুর্দান্ত সন্তানের আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। আমি স্বভাবতঃই কিছু উগ্রপ্রকৃতির লোক। তাঁহার সহিতও সাধারণতঃ উগ্রভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতাম। তিনিও তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন। লোকের সমাগম ও তাহাদের বাজে কথাবার্ত্তা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, অবান্তর প্রশ্ন আমাকে ক্ষেপাইয়া তুলিত। একদিন বাবাজীর উপরেই ক্ষেপিয়া গেলাম। খুব তেজের সহিত তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনার গুরুমহারাজের জীবনীতে তাঁহার অনেক অলৌকিক কাজের কথা লিখিয়াছেন। আপনি যদি তেমন কিছু দেখাতে পারেন তবে দেখ্‌বেন সবাই ভগবানের নামে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে! যদি পারেন তো দেখান না কেন?' তিনি শান্তভাবে উত্তর করিলেন, 'তা' হলে বাবা লোকে আমার মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো করে খেয়ে ফেল্‌বে।'

"আমার মনে অবিশ্বাসের ছায়াপাত হইল। আমি মনে করিলাম, 'উকিল ছিলেন, ওকালতি চাল চালিলেন।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পারেন তো?' বাবাজী উত্তর দিলেন, 'হাঁ বাবা, তুমি জান্‌তে পার্‌বে।' বাবাজীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল শুধু বেড়ানের ও তাঁহাকে বেড়াইয়া আনিবার। তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আমি চলিয়া যাইতাম। কখনও লোকের ভিড়ে আসিতাম না। শুধু প্রসাদের অপেক্ষায় যদি কখনও আসিতে হইত, তখন বাহিরে বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতাম। প্রসাদের সম্বন্ধে বাবাজী বলিতেন—'বাবা, প্রসাদের বড় গুণ।' তিনিও আমার জন্ত প্রসাদ রাখিতেন এবং যতদিন তিনি শিলং ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নানা কাজকর্ম্মে দিন কাটাইয়া রাত্রে রিল্লাসামখিরার আমার গৃহে (তখন ভাড়াটে) একদিন শয়ন করিয়া আছি। শেষরাত্রের দিকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিবার পরে আমার তখনকার অভ্যাস ছিল

সিগারেট খাওয়া। বাক্স হইতে সিগারেট বাহির করিয়া দেশলাইয়ের বাক্সের উপরে ঠুকিতেছিলাম। হঠাৎ দেখি বাবাজী আমার বিছানায় বসিয়া। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি এখানে?' ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি একটি সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিলেন। আমি সংস্কৃত জানি না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এর অর্থ?' উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন তাহারও অর্থ ঠিক বুঝিলাম না, কিন্তু কথাগুলি মনে গাঁথিয়া গেল। তাঁহার সস্মিত উজ্জ্বল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তাঁহার বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে মনে মনে তোলপাড় করিতেছি, সহসা তিনি মিলাইয়া গেলেন। পরদিন সকালবেলা সর্ট রাউণ্ড রোডে (Short Round Roadএ) গাড়ী রাখিয়া যখন তিনি পাদচারণ করিতেছিলেন, তখন প্রশ্ন করিতে যাইতেছি, সহসা আমার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, 'বাবা, সব সময় সব কথা বলতে নাই।' আমি আমার স্বভাবানুযায়ী ঝাঁজের সঙ্গে বলিলাম, 'বুঝলাম না শুনলাম না, কে আমায় বুঝাইয়া দিবে?' তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা বাবা, আমি বুঝাইয়া দিব।' পরে তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—পরোক্ষভাবে।

"শ্রীযুক্ত——এখানকার—শিলং স্কুলের—মাষ্টার ছিলেন। আমার বাসার নিকটে রাস্তার অপর পারে তাঁহার ভাড়াটে বাসা ছিল। বিপুলায়তন তাঁর দেহ, যেমন লম্বা, তেমনি মোটা! চেহারার অনুযায়ী একখানা বাঁশের চেয়ার তাহার বারান্দায় ছিল, তাহাতে অনেক সময় তিনি বসিয়া থাকিতেন। লোকটির সঙ্গে আমার খুব ভালবাসা ছিল। উভয় পরিবারের সম্প্রীতিও খুব আন্তরিক। কোন ঘটনায় ধারণা হইল তিনি বাঙ্গালীবিদ্বেষী। তখন হইতে তাঁহার প্রতি আমারও প্রবল বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমার গাড়ীতে সকাল বিকাল দুই বেলাই বেড়াইতেন

ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যখনই আমার ইচ্ছা হইত তখনই তাঁহাকে আমার বাসায় আনিতাম। সহর শুদ্ধ লোক আমার মোটরে বাবাজীকে দেখিবার জন্য প্রত্যাশা করিতেন। আমার গাড়ীতে বাবাজী আছেন একথা জানিয়াও——বাবু তাঁহার সেই বারান্দার চেয়ারে বসিয়া বিরাট পদদ্বয় পথের দিকে তুলিয়া দিয়া বসিয়া থাকিতেন! পথের মাঝেও অনেক সময় তাঁহাকে পাইতাম। তিনি আমার গাড়ীর দিকে পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইত। পক্ষান্তরে——বাবুকে দেখিলেই বাবাজী মহারাজ বলিতেন, 'দেখেছ বাবা? কি সুন্দর চেহারা। বা! বা! ভারি সুন্দর তো!' আমি বলিতাম, 'ওর সুন্দর চেহারা দিয়া আপনার দরকার কি? ভারি তো লোক!' মনে মনে ভাবিতাম, * * * সাধু বাঙ্গালী বলিয়া তুমি তাঁহাকে একটু সম্মানও দেখাইতে পার না?' এক একদিন এসেম্বিলীর সামনে——বাবুকে আমার গাড়ীর দিকে পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতাম, বাবাজী মহারাজেরও উচ্ছ্বাস আরম্ভ হইত!

"বাবাজী শিলং হইতে চলিয়া গেলেন।——বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল না, এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি আমার মনে বদ্ধমূল হইল। ইহার কিছুদিন পরে ইনি বদলী হইলেন। তাঁহার যাইবার সময়ও আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারি নাই। তাঁহার যাইবার দিনে তিনি সকলকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার দেরী হইল। তাঁহার সময় ছিল না। তবুও অপেক্ষায় ছিলেন। ফিরিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার মন গলিয়া গেল। অন্যান্য কথাবার্ত্তার মধ্যে বলিলাম

যে, 'শ্রীযুক্ত সন্তদাস বাবাজী আপনাকে বহু বহু আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।' তিনি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, 'তাহা হইলে আমার প্রণাম বাবার চরণে পৌঁছিয়াছিল!' আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'আপনি প্রণাম করিলেন কখন? আপনি হয়ত নিজের বারান্দায় রাস্তার দিকে পা তুলিয়া বসিয়া থাকিতেন অথবা আমার গাড়ীতে তিনি থাকিলে সেদিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এই কি আপনার প্রণাম?' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'ডাক্তারবাবু, আমাদের নীরব সাধনা। আমরা যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি তখন সকলে দেখিবে আমরা পিছন ফিরিয়া সটানে দাঁড়াইয়া আছি।' চোখের জলে ভাসিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।"

পক্ষান্তরে তাঁহার শিষ্যেরা অপরাপর মহাপুরুষগণেরও কৃপা বহুস্থলে বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার কোনও শিষ্যকে পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"......তোমার পত্র পাইয়াছি। ভোলাগিরি মহারাজ যে—বাবুকে দর্শন দিয়াছেন, তাহাতে ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবে যে যথার্থ মহাজনদিগের মধ্যে ভেদবুদ্ধি নাই। বস্তুতঃ যাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক গুরুভ্রাতা-সদৃশ এবং সকল মহাজনদের কৃপাই তাঁহারা লাভ করেন। সকলেরই নজর তাঁহাদের উপর থাকে।......"
(পত্রাবলী প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২২)

গ্রন্থবিস্তারের আশঙ্কায় এই বিষয়ে এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

বাস্তবিক শ্রীসদ্‌গুরু এক। বিভিন্ন দেহাবলম্বনে কার্য্য করিলেও এবং সেই সকল দেহে গুরুশক্তির স্ফুরণের বিভিন্নতা থাকিলেও তত্ত্বতঃ তিনি

এক ও সর্ব্বব্যাপী। "তিনি আত্মস্বরূপ সেই এক সর্ব্বব্যাপী পদার্থ।" (পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮)

এই অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাবলীতে যাহা সম্পূর্ণরূপে ফলিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের এমন একটি অমৃতময়ী বাণী স্মরণ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

"শ্রীশ্রীভগবান্ সদ্‌গুরুই যথার্থ আপন জন; তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, সকল স্থান হইতে কৃপা করিতে পারেন ও করিতেছেন। তাঁহাতে আপন বুদ্ধি করিয়া তিনি সর্ব্বদা নিকটে আছেন এই ধারণার অভ্যাস করিতে পারিলে শীঘ্রই সমস্ত তাপ দূর হইয়া যাইবে।....." (পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৪)

পঞ্চম অধ্যায়

চরিত্র

শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রতটে দূরপ্রসারী বেলাভূমির উপর দাঁড়াইয়া সূর্যোদয়ের দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সে কি কখনও আর তাহা ভুলিয়াছে? সমুদ্র আর আকাশের সে নিবিড় আলিঙ্গন, তার মধ্যে প্রসন্ন জ্যোতির বিকাশ, চিত্তপটে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। পরে সংসারের কর্মকোলাহল-মুখরিত ক্লান্তদিনের মাঝে কখনও এক নিস্তব্ধ শুভ মুহূর্ত্তে সেই ছবি সহসা উদিত হইয়া চিত্তে একটু মধুময় স্পর্শ দিয়া যায়!

এমন কতবার হয়! তাই বলিয়া কখনও কি মনে করিতে পারি যে আকাশ কিম্বা সমুদ্রকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি?

সেইরূপ এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি মনে করিতে পারি যে আমাদের গুরুদেব শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের মহিমা বহুবার বহুপ্রকারে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি? তথাপি তাঁহার নিবিড় মধুময় স্পর্শ সর্ব্বদা আমাদের জীবনকে ঘিরিয়া আছে—এই আত্মবিস্মৃত কলুষ-পঙ্কিল জীবনে আমরা প্রত্যেকেই তাহা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি।

এই বিরাট পুরুষের বাহ্য ব্যবহারের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা যেকেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত তাহারই চিত্তকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিত। তাঁহার শিষ্য অথবা শিষ্য নহেন এমন বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি আজও জীবিত আছেন। তাঁহার সঙ্গে কিছুকাল কাটাইবার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছে, তাহাদের কে না বলিবেন যে সেই সব দিনের এক একটি শুভ মুহূর্ত্ত আজও অম্লানভাবে স্মৃতির

ভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে? শ্রীভগবানের করুণার কথা বলিতে বলিতে একটি বাষ্পগদ্গদ বাক্য, সুচিরসঞ্চিতসংশয়চ্ছেদী স্বগতপ্র একটু মৃদুবাণী, অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রকমের একটি কর্ম্মপ্রণালী, দীপ্ত মূর্ত্তি ও অসাধারণ প্রতিভায় দর্শনশাস্ত্রের কঠিন প্রশ্ন সমাধান করিতে করিতে একটু ভক্তির কথা উঠিতেই অমনি সজল চক্ষু—এই প্রকার আরও কত স্মৃতি এক এক সময় হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া সেই অসাধারণ পুরুষের জটাজূটমণ্ডিত তেজঃপুঞ্জ শিবোপম মূর্ত্তিকে অশ্রুসিক্ত চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে।

আজ তাঁহার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মনে আসে সংসারী জীবের প্রতি তাঁহার অপার করুণার কথা। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও পুনরায় লোক সমাজে আবার ফিরিয়া আসিলেন কেন? সংসারের সমস্ত মায়া কাটাইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, এবং গুরুকৃপায় তিনি সবই পাইয়াছিলেন, তাঁহার চিরবাঞ্ছিত বস্তুকে পূর্ণভাবেই লাভ করিয়াছিলেন। তদুপরি শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার গুরুস্থান——'গুরুদ্বারা', তিনি নিজেও সেইখানে সিদ্ধমনোরথ হন, আর সেইখানে গিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়াই সংসার ছাড়িয়াছিলেন, সেই শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া শেষ জীবনে এই শোকতাপজর্জ্জরিত কলিকলুষিত জনসমাজে অল্পকালের জন্যও ফিরিয়া আসিতে তাঁহার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি আসিয়াছিলেন।

মনে হয়, যেসকল মহাপুরুষ নিজেরা সংসারে থাকিয়া, অথবা সংসারী অবস্থায় কিছুকাল থাকিবার পর সন্ন্যাস লইয়া, জীবন্মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা যেন পাপকলুষিত তাপক্লিষ্ট জীবের ব্যথায় অত্যধিক ব্যথী ও দরদী হয়েন। যে ক্লেশে যে সংসারী জীব অবিরত দগ্ধ হইতেছে, কত

দুঃখী এবং কত দুর্ব্বল যে তাঁহারা, ইহা সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই যেন তাঁহাদের ক্ষমা হয় অনন্ত, করুণা হয় অপরিসীম। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের কৃপা ধনী দরিদ্র সদসৎউচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে যেমন করিয়া আপামর সকলের উপর বর্ষিত হইয়াছে, দুঃখের কাহিনী শুনিয়া কিরূপে তাঁহার চক্ষে জল ঝরিয়াছে, পুনঃ পুনঃ কি অপূর্ব্ব ক্ষমা সহজ স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আজ স্মরণ করিতেছি।

শেষ বয়সে তাঁহার প্রাচীন শরীর দীক্ষা দিবার পর অসুস্থ হইয়া পড়িত। দীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হইলে এক একদিন দীক্ষাদানের পর একেবারে অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িতেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর উঠিতে পারিতেন না। শেষের দিকে যখন শরীর রুগ্ন হইয়া পড়িত, বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য শরীর খুব দুর্ব্বল থাকিত, তখন আমরা এ বিষয়ে প্রকাশ্যভাবেই আপত্তি করিলাম। কয়েকজন গুরুভ্রাতা মিলিত হইয়া একত্রে একদিন নিবেদন করিলাম, "বাবা! আজকাল আপনার দেহ নিয়তই দুর্ব্বল থাকে, মধ্যে মধ্যে রোগভোগও হইতেছে, দীক্ষা দিতে গেলেই আপনি অবসন্ন হইয়া পড়েন, এক একদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরে অবসাদ, ক্লেশ ও তাপ থাকে, এ অবস্থায় দীক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেই ভাল হয়!" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের তখন যে করুণাবিগলিত মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের স্মৃতিপটে চিরাঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি বলিলেন, "বাবা! তাহা হইলে এই শরীরটা আছে কি জন্য?" তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম, জীবগণের প্রতি তাঁহার সেই অসীম করুণার ভাব উপলব্ধি করিয়া একথার আর উত্তর করিতে পারিলাম না! করতলগত সর্ব্বসম্পদ তুচ্ছ করিয়া সংসারের নিকট চিরবিদায় লইয়া

গিয়া পুনরায় সেই পাপ-কলুষিত জনসমাজে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার গোপন রহস্য এইখানে, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পূর্ব্বোক্ত কথার মধ্যে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও ভারতের অন্যান্য স্থানের কি সহস্রাধিক নরনারী ১৩২৭ সাল হইতে ১৩৩২ সাল পর্য্যন্ত ষোল বৎসর কালের মধ্যে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর কৃপা ইহাদের জীবনে কিরূপ অজস্রভাবে বর্ষিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে কিছু বর্ণিত হইয়াছে। বহু লোককেই আশ্রয় দিয়াছেন, আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে যেন কিছু বাছবিচার না করিয়াই দিয়াছেন; যাহারা আসিয়া প্রার্থী হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশকেই দীক্ষা দিয়াছেন, আর ইহাদের মধ্যে দরিদ্র, অসহায়, অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশী; নমঃশূদ্র, ধোপা প্রভৃতি জাতীয় লোক আছেন, আমাদের দৃষ্টিতে চরিত্রহীন লোকও ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা-সম্পন্ন শিক্ষিত লোকদিগের নিকট হইতে সমালোচনা শোনা গিয়াছে। প্রথম প্রথম শিষ্যদের মনেও আপত্তির ভাব উঠিত, সন্দেহ আসিত এবং সেজন্য কোন কোন লোকের তাঁহার নিকটে দীক্ষাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অযোগ্যতার কথাও আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া এসম্বন্ধে আমাদের সংশয় চিরতরে নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। বুঝিয়াছি যে, আমরা সাধারণতঃ যে প্রণালীতে এ বিষয়ের বিচার করি, তাহাতেই ভুল আছে। বাস্তবিক যেমন দাতার অন্নে ক্ষুধিত নিরন্ন ব্যক্তিরই যথার্থ অধিকার, তেমনি দুর্ব্বল পাপী মানবের যখন শুদ্ধ জীবন লাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা আসে, তখন তাহারই মহাপুরুষের কৃপালাভের প্রয়োজন ও যোগ্যতা সব চেয়ে বেশী। একবার

কোনও দীক্ষাপ্রার্থী সম্বন্ধে এইরূপ একটি আপত্তি ও সংশয় তাঁহাকে জানান হইল। একটু নীরব থাকিয়া, তাঁহার গুরুদেবের প্রসঙ্গে সম্ভবতঃ তিনি যেরূপ সজলনেত্র হইতেন তদ্রূপ হইয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, আমার বাবা * অযোগ্যবোধে আমাকে ত প্রত্যাখ্যান করেন নাই, একথা স্মরণ করিয়া আমি এদের ফিরাইতে পারি না।" ইহার উপর দ্বিরুক্তি চলে না—বাধ্য হইয়া আমাদের চুপ করিতে হইল।

আর একবার যে উত্তরটি দিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহার সম্বন্ধে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। আমরা সাধারণতঃ লোকের দোষটাই আগে দেখি, তাঁহার ছিল ঠিক বিপরীত, সব লোকেরই চরিত্রের গুণের দিকটা তাঁহার নজরে সর্ব্বাগ্রে পড়িত। এটি তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। লোকের বড় বড় গুণগুলি আমাদেরও নজরে পড়ে সত্য, কিন্তু এমন অনেক স্থল আছে যেখানে আমরা কেবল অনেকগুলি দোষেরই সমাহার দেখি, গুণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না—যদিও বুঝি যে, কোন লোকেরই চরিত্রে শুধু দোষ অথবা শুধু গুণ থাকিতে পারে না, মানুষমাত্রেই দোষ এবং গুণ আছে। এরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহার দৃষ্টি গুণের দিকেই আগে পড়িত। যাহার শত দোষ এবং একটি গুণ আছে, তাহারও সেই গুণটিই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতেন, তাহার মর্য্যাদা দিতেন এবং আমাদিগকে তাহা বলিতেন, আবার সাবধান করিয়া দিতেন, "দেখ, একথা তাহাকে যেন বলিও না!" †

একবার একজন নূতন শিষ্য সম্বন্ধে কয়েকজন নানা আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন, "দেখ, তোমরা তাহার যে সকল দোষের কথা,

* অর্থাৎ তাঁহার শ্রীগুরুদেব।

† অর্থাৎ তাহা হইলে তাহার অহঙ্কার হইতে পারে।

বলিলে তাহা ঠিক", তৎপর তাহার দুই একটি গুণের (যাহা তাহাদের নজরে পড়ে নাই) উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"তাহার এই এই গুণও ত আছে। শিষ্য হইবার যোগ্য এই একটি লক্ষণও ত তাহার আছে—তাহাই ধরিয়া (ভগবন্নাম) দিয়াছি।" এই উত্তর শুনিয়া তাহাদের নিরস্ত হইতে হইল।

আর একটি দিনের কথা বলিব। এই তৃতীয় বারের তাঁহার উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য, আর তাঁহার অপরিসীম দয়ার পরিচায়ক। হইল পূর্ব্ববৎ, কি দেখিয়া অমুককে শিষ্য করিলেন ইহাই ছিল আমাদের সন্দেহ ও প্রশ্ন। করুণার্দ্র মূর্ত্তিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই দিন বলিয়াছিলেন, "বাবা, তোরা কি চাস্ না যে জীব শান্তিলাভ করুক। অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও ত ইহার চিত্ত ভগবানের প্রতি উন্মুখ হইয়াছিল। তখনই সে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তটুকু অবলম্বন করিয়া আমি ইহাকে ভগবানের নাম দিয়াছি। নামের শক্তি অমোঘ, তাহা কখনও ব্যর্থ হইবে না, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি উদ্ধার হইয়া যাইবে!" এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "এই কালে তাঁহার নাম অতি অল্প লোকেই করে; কোন সূত্রে 'ভগবানের নাম করিব' এই ইচ্ছা লইয়া আসিয়াছে, আমিও তাহার মধ্যে কোনও একটি শিষ্য লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া দিয়াছি। এখন তাঁহার বস্তু, তিনিই শুদ্ধ করিয়া লইবেন।"

দীক্ষাদানপূর্ব্বক আত্মসাৎ করা বিষয়ে তিনি যে জাতি-কুল, শীল, বয়স, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুরই অপেক্ষা করিতেন না, শুধু প্রার্থীর অন্তর দেখিয়াই দিতেন তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিব।

বরিশালে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মহিত্তা নামক আমাদের একজন শ্রদ্ধাস্পদ বর্ষীয়ান্ গুরুভ্রাতা আছেন, তিনি এক পত্রে লিখিয়াছেন, "এখান হইতে

আসন উঠাইয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ খুলনা হইয়া বাগেরহাট যাওয়ার জন্য ষ্টীমারে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক ষ্টীমারে উঠিয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। বাবা ইহাকে বলিলেন যে, তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইবেন, কিন্তু কিছু বিলম্ব আছে। ইনি পরের বৎসর তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ইনি বাবাজী মহারাজের নিকট পত্র লিখিলেন, 'নীচ প্রবৃত্তি হয় কেন ?' বাবা শ্রীবৃন্দাবন হইতে উত্তর লিখিলেন, প্রাক্তন কর্ম্মফলে এইরূপ হয়, আরও লিখিলেন যে, 'তোমার সকল অবস্থা জানিয়াই আমি দীক্ষা দিয়াছি।' বাবা পুনরায় এখানে আসিলেন। এই গুরুভ্রাতাটি একদিন অপর কতিপয় গুরুভ্রাতার সম্মুখেই শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে নিজের দুশ্চরিত্রতার কথা বর্ণনা করিয়া সেই স্বভাব কোনমতে ছাড়িতে পারিতেছেন না জানাইলেন। এই কুচরিত্রের বিষয় বলাতেও মহারাজজীর কোন ভাবান্তর দেখিলাম না। তিনি বলিলেন, 'নাম কর, নাম কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।' বর্ত্তমানে এই গুরুভাইটির অবস্থা এইরূপ যে, তাহাকে টানিয়াও খারাপ দিকে নেওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে ইহার অপেক্ষা অধিক সচ্চরিত্র ও গুরুভক্ত কতজন আছেন, তাহা জানি না।"

একবার তিনি যখন শ্রীহট্টের অন্তর্গত হবিগঞ্জে গিয়াছিলেন, তখন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রী— একদিন একটি অস্পৃশ্যজাতীয়া স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন। এই মেয়েটি তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু নিজে সাহস করিয়া আসিতে পারে নাই। আমাদের গুরুভ্রাতাটি যখন লোকের ভিড়ের মধ্যে একটু সুযোগ পাইয়া মেয়েটির প্রার্থনা জানাইলেন, তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার অভ্যাস মত, বাড়ী কোথায়, কি জাতি, কে কে আছে, প্রভৃতি নানা কথা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং দীক্ষা দিতে

সম্মত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার ঘরের ভিতরে নিয়া আসার জন্য আমাদের গুরুভ্রাতাটিকে একটু ধমক দিলেন। বাহ্য ব্যবহারে সাধারণতঃ প্রচলিত আচার রক্ষা করাই তাঁহার অভিমত ছিল। পরে দীক্ষার সময় তিনি ইহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অতি প্রসন্নভাবে আমাদিগকে বলিলেন, "বাবা, নিম্নজাতি হইলে কি হইবে, ইহার কপাল কত প্রশস্ত এবং কপালে ঋষিদের চিহ্ন রহিয়াছে।" আমরা দেখিলাম তাহার উন্নত প্রশস্ত ললাটে তিলকের চিহ্ন রহিয়াছে।

এ রকম আমরা অনেকবার দেখিয়াছি। এ সম্বন্ধে কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, "সকলেই শ্রীভগবানের নিজ জন, তাঁহার আরাধনায় সকলেরই অধিকার আছে। নীচ জাতীয় হইয়াও যদি কেহ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতে পারে তবে সেও অবশ্যই পরমা-গতি লাভ করিবে।" এইরূপে তাঁহার দয়া সর্ব্বশ্রেণী মানবের উপর বর্ষিত হইয়াছে। শুধু যে দীক্ষা দিতেন, তাহা নহে, দীক্ষার্থী অতিশয় দরিদ্র হইলে তাহাকে মস্তক মুণ্ডনের পয়সা, দীক্ষার সময়ে আচ্ছাদন বস্ত্র, বাড়ী ফিরিবার পাথেয় পর্য্যন্ত নিজে দিয়াছেন।

১৩৪৪ সালের "শ্রীসুদর্শন" পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় আমাদের গুরুভ্রাতা কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"একদিন একটি সুপুরুষ, উচ্চ শিক্ষিত যুবা তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে আসেন। ইনি যেমন পাদস্পর্শ করিলেন, অমনি বাবাজী মহারাজ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোমার মন্ত্রগ্রহণ হইবে না।" আমি গিয়া ঐ কথা শুনিলাম। আমি মহারাজজীর নিকট তাহাকে পুনরায় লইয়া যাই। আগন্তুক ভদ্রলোকটি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন। বাবাজী মহারাজ আমায় বলিলেন "এখন হবে না, পরে হতে পারে'।"

১৩৩৬ সালের বর্ষাকালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবন আশ্রমে অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুদিন রোগভোগের পর অসুখ সারিয়া যায়, কিন্তু আশ্বিন মাসেও শরীর খুব দুর্ব্বল ছিল। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বাঙ্গালা দেশে পূজার ছুটি থাকে, প্রতি বৎসরই এই সময়ে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার কাছে থাকিয়া ছুটির দিন কয়টি কাটাইবার আশায় অনেকে শ্রীবৃন্দাবন আসিতেন ও ছুটির মাসটা আশ্রমে থাকিতেন। বাঙ্গালা অথবা বিহার হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাওয়া-আসা ব্যয়সাধ্য এবং যাঁহারা এইরূপে পূজার বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন আসিতেন, তাঁহাদের অনেকেই স্বচ্ছল অবস্থার লোক ছিলেন না। তাঁহার শিষ্য নহেন, এরূপ লোকও এক একবার আসিতেন। এইবার বন্ধের প্রথমেই যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত আনিয়া কিছুকাল রাখিবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট এই প্রস্তাব করা হইলে তিনি রাজী হইলেন না, বলিলেন, "আমার যাইবার ইচ্ছা নাই। অনেকে বহুদিন হইতে আশা করিয়া আছে, এই সময়ে দুই চারি দিনের মধ্যে তাহারা আসিয়া পড়িবে। এখন আমি চলিয়া গেলে, বহুদূর হইতে এতকষ্ট, এত আশা করিয়া আসিয়া আমাকে না দেখিয়া তাহারা অতিশয় দুঃখ পাইবে। এখনই এমন কেহ কেহ আসিয়াছে, যাহারা মধুপুরে গিয়া থাকিতে পারিবে না। ইহাদের সকলকে ফেলিয়া শরীরের জন্য আমি কি করিয়া যাই?" এই কথা হইতে বুঝা যায় শিষ্যগণের প্রতি তাঁহার কি অপরিসীম বাৎসল্য ছিল।

আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সাধু গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অনন্তদাসজী, একবার নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী বনভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই

সময় শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ শিবপুর আশ্রমে অতিশয় পীড়িতাবস্থায় ছিলেন। অনন্তদাসজী তথায় একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, বাবার শরীর বড় রুগ্ন, তাঁহাকে ডাকিতেছেন। পর পর আরও দুই দিন এই একই প্রকার স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং অতিশয় ব্যাকুলভাবে তিনি বৃন্দাবনের দিকে রওনা হইলেন। বৃন্দাবন-আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দর্শন না পাইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং একদিন দ্বিপ্রহরের পরে শিবপুর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবা যেন তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন, এইভাবে বিছানায় প্রায় উঠিয়া বসিলেন এবং শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ডাক্তার বাবুকে বলিলেন, "আর ঔষধের দরকার হইবে না। এইবার আমি সারিয়া উঠিব। আমার বড় ছেলে আসিয়াছে!" তাঁহার ইচ্ছানুসারে তখনই প্রসাদ আনিয়া তাঁহার ঘরের মেঝেতে জায়গা করিয়া অনন্তদাসজীকে দেওয়া হইল। নিজের রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া, "এটা খাও, ওটা খাও", করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন—যেন দূরপ্রবাসী পুত্রকে বিরহক্লিষ্টা জননী বহুদিন পরে কাছে পাইয়াছেন! এইরূপ ভাব আমাদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ছিল।

শ্রীযুক্ত কানাইয়াদাস নামে আমাদের একজন সাধু গুরুভ্রাতা আছেন। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের দেহান্ত পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ইনি অসীম ধৈর্য্য ও প্রেমের সহিত তাঁহার সেবা করিয়াছেন। বাস্তবিক ইঁহার ন্যায় বাবাজী মহারাজের সেবা করিতে আমরা আর কাহাকেও দেখি নাই। এই কথা বলিবার একটি বিশেষ কারণ আছে,—ইঁহার প্রতি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ব্যবহার কিছু অতিরিক্ত কঠোর বলিয়া আমাদের বোধ হইত। এ সম্বন্ধে পরে কানাইয়াদাসজীকে একদিন প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী

মহারাজের চরিত্রের এই দিক্‌টি সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কোন কোন দিন খুব কঠোর পরিশ্রম করিবার পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকটে যাইবার সময় ভাবিয়াছি—বাবা আজ খুব প্রসন্ন হইবেন এবং আমাকে খুব আদর করিবেন; কিন্তু তাঁহার নিকটে পৌঁছিলেই আশার বিপরীত ফলই আমার ভাগ্যে ঘটিত। যে কোন কথা বা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বাবা আমাকে তিরস্কার করিতেন। মর্ম্মাহত হইয়া আমিও অভিমান করিয়া তাঁহার কাছে আর যাইতে চাহিতাম না। কিন্তু তখন দেখিতাম, বাবা আমাকে কোন না কোন কার্য্য উপলক্ষে সস্নেহে আহ্বান করিতেন এবং এরূপ মধুর ব্যবহার করিতেন যে, আমি তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অভিমান-শূন্য হইতাম এবং ভাবিতাম, শ্রীশ্রীগুরুদেব অতিশয় দয়াল, তাঁহার বাহিরের আচরণ বজ্রের অপেক্ষাও কঠিন, অথচ তিনি ভিতরে কুসুম অপেক্ষাও কোমল। এই দুই ভাব দেখিয়া আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর আকৃষ্ট হইতাম এবং ভাবিতাম, বাবা আমাকে আরও শুদ্ধ ও শান্ত করিবার জন্য এইরূপ আচরণ করিতেছেন। সময় সময় তাঁহার ব্যবহারে মনে করিতাম যে, তিনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন আছেন, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিয়াছি—তিনি সর্ব্বদাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও আমার প্রতি প্রসন্নই ছিলেন। কেবল আমার অন্তর শুদ্ধির জন্য সময় সময় ঐরূপ শাসন করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার অন্তরে স্নেহের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইত, যখন যাহা আব্দার করিতাম, বাবা স্নেহশীলা জননীর ন্যায় সেই আব্দার পূরণ করিতেন। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন আমাদের স্নেহময়ী মাতা, ভরণপোষণকারী পিতা ও শাসনকারী গুরু। কেহ যদি তাঁহার নিকট অপ্রয়োজনীয় জিনিস চাহিতেন, অমনি

তাহাকে কঠোর শাসন করিতেন, আবার প্রয়োজনীয় কোন জিনিস চাহিলে আশার অতিরিক্তও প্রদান করিতেন। তাঁহার এমনি সরল ব্যবহার ছিল যে, আমরা নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট হৃদয়ের সকল ভাব ব্যক্ত করিতাম, তিনি সকল কথা শুনিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন।"

সংসারী শিষ্য-শিষ্যাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ এবং বাৎসল্য যে বিন্দুমাত্র কম ছিল, তাহা আমরা তাঁহার ব্যবহারে কখনও অনুভব করি নাই। তিনি একাধারে আমাদের সকলের পিতামাতা উভয়ই ছিলেন। পূজার ছুটির শেষে বৃন্দাবন আশ্রম হইতে দূরাগত শিষ্যেরা যখন বিদায় লইয়া আসিতেন, তিনি তখন আসন হইতে উঠিয়া আশ্রমের দরজা পর্য্যন্ত আসিতেন, তাঁহারা প্রণাম করিয়া যাত্রা করিবার সময় এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চক্ষু ছল ছল করিত।

বাস্তবিক একাধারে জনক ও জননীর স্নেহ আমরা তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। সে স্নেহ, যত্ন, কল্যাণেচ্ছা একেবারে পরিপূর্ণ, কোথাও একটু কার্পণ্য ছিল না। সাধুশিষ্যগণের সর্ব্ববিষয়ের ভার ত নিয়াছিলেনই, * সংসারী শিষ্যদিগেরও সকল অভাব-অভিযোগের খবর লইতেন; বেকার অবস্থা, কন্যাদায়, সাংসারিক সমস্যা, আকস্মিক বিপদ, সবদিকেই তাঁহার সস্নেহদৃষ্টি দেখিয়াছি। বহুস্থলেই স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দৌলতপুরে থাকিয়া যখন আমি টোলে পড়িতাম, তখন একবার ছুটিতে বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে নিবেদন করিলাম,

* প্রাচীন অবস্থায় দুর্ব্বল শরীর লইয়াও সাধুশিষ্যদিগকে নিয়মিতভাবে নিজে পড়াইতেন। বর্ত্তমান সাধুসমাজে জ্ঞানচর্চ্চার অভাব তাঁহাকে ব্যথিত করিত, আমাদের গুরুভ্রাতৃগণ শাস্ত্রচর্চ্চাবিমুখ ও ভোগলিপ্সু না হন, সেদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

"বাবা, ওখানে সময় সময় নানা দুঃখ কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়, আপনার কাছে আসিয়া এখন আর কোন দুঃখই নাই। এক এক সময় মনে হয় আপনার নিকট চলিয়া আসি। দৌলতপুরে আর থাকিতে ইচ্ছা হয় না।" বাবা কিছুই বলিলেন না, একটু পরে বাউলের সুরে এই গানটি গাহিয়া আমার কথার উত্তর দিলেন :—

"বিনা দুঃখে হয় না সাধন
সেই যোগীজনার বাঞ্ছিত চরণ রে।
সহজে কি হয় কখন পাষণ্ড দমন রে ?
সুখশয্যায় শুয়ে কেবা পেয়েছে কখন,
সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে ?
অশ্রুপাত করে বীজ করবে বপন,
যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।
প্রভুর কার্য্যে হয় যদি এ দেহ পতন
(তবে) পরিণামে দিব্যধামে করিবে গমন রে॥'

আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া সুরটি শিখিয়া লইতে বলিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম এবং আমার আপত্তির মীমাংসা হইয়া গেল।

বাবাজী মহারাজ দেহত্যাগের অল্পকাল পূর্ব্বে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কিছুদিন এটোয়ায় অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রত্যহই সকালে বেড়াইতে যাওয়া হইত, অনন্তদাসজী ও আমি সঙ্গে থাকিতাম। কয়েকদিন পরে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার সেন * আসিলেন, তখন হইতে তিনিও

* অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার সেন। ইনি এবং ইহার স্ত্রী শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের বিশেষ ভক্ত এবং বহুপ্রয়াসে কয়েকবার তাঁহাকে নিজ বাসস্থানে লইয়া গিয়া আপ্রাণ গুরুসেবা করিয়াছেন।

সঙ্গে যাইতেন। পৌষ মাস, এটোয়ায় বিষম শীত পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ব্যবহারের জন্য কাপড়ের জুতা তৈয়ার করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহাই পায়ে দিয়া সকালে বেড়াইতে বাহির হইতেন। একদিন প্রাতে সকলে বেড়াইতে চলিয়াছি, শচীনবাবুর পায়ে জুতা, এবং বাবাজী মহারাজের পায়ে সেই কাপড়ের জুতা, আর আমরা নগ্নপদ। চলিতে চলিতে শচীনবাবু বলিলেন, "বাবা, অনন্তদাসজী ও ধনঞ্জয়দাসজীব এই বিষম ঠাণ্ডায় খালি পায় চলিতে বড় কষ্ট হয়, আপনি অনুমতি করিলে ইঁহাদিগকেও দুজোড়া কাপড়ের জুতা কিনিয়া দিই।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন, "না বাবা, ইহা ঠিক নয়। আমার শরীর বৃদ্ধ ও অচল হইয়াছে বলিয়াই এই জুতা পায়ে দিতে আমি এখন বাধ্য হইয়াছি, নতুবা আমি সাধু হওয়ার পর কোন প্রকার জুতাই এযাবৎ ব্যবহার করি নাই। সাধুর পক্ষে জুতা ব্যবহার করা সঙ্গত নহে।"

১৩৩০ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে বালিগঞ্জে তাহার এক ভ্রাতার বাসায় গিয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে একদিন কয়েকজনে আমাকে আসিয়া ধরিলেন, "দেখুন, আজ একটা শুক্ত ও একটা ঘণ্ট করিতে হইবে, আমরা বড় আগ্রহ করিয়া জোগাড় করিয়াছি! আপনি ইহার ব্যবস্থা করুন।" আমি বাবাকে গিয়া বলিলাম, "বাবা! ইহারা বড় আগ্রহ করিয়া তরকারী আনিয়াছেন, আজ এই তরকারীগুলি রান্না করিতে হইবে।" এইকথা যেমন বলিয়াছি, অমনি বাবা যেন অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন, আমার দিকে তাকাইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "আভি হঠ্ হিয়াঁসে, তুম বন্দোবস্ত করনে কা কোন্ হৈ, ওর কুছ ভী নেহী বনেগা।" প্রাণে বড় আঘাত লাগিল,

সকলের সম্মুখে এইরূপ অপদস্থ হইয়া বাবার উপর অভিমানও হইল। প্রসাদ পাইবার সময় নিজের আসনে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী নিজে আসিয়া আমাকে প্রসাদ পাইবার স্থানে নিয়া গেলেন। বাবা বলিলেন, "আমার পাশেই উহাকে বসাও।" প্রসাদ পাইতে বসিয়াও খাইতে পারিতেছিলাম না। মাঝে মাঝে বাবা নিজের পাত হইতে প্রসাদ আমার পাতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন এবং মিষ্ট করিয়া বলিলেন, 'খাও বাবা! খুব প্রসন্ন মনে খাও।' আচমনান্তে নিজের ঘরে যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'আচাইয়া একবার আমার নিকট আসিবে।' আমি বলিলাম, 'আমি এখনি আসিতেছি।' তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি তিনি শয়ন করিয়াছেন, আমাকে বলিলেন 'পা টিপিয়া দে'. আমি পদসেবা করিতে লাগিলাম। তখন বড় মধুর, শান্তস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'দেখ বাবা! তোমরা আমাকে গুরু করিয়াছ কি জন্য? ক্রমে ক্রমে চিত্ত নির্ম্মল করিয়া ভগবৎ প্রত্যক্ষের দ্বারা সংসার যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কি না?' আমি উত্তর করিলাম, 'সেই জন্যই ত।' তখন বাবা বলিলেন, 'যাহাতে তোমার অভিমানবৃত্তি দূর হইয়া যথার্থ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পার, সেইজন্যই তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি। যখন ফট্‌কার * খাইবে, তখনই এই উদ্দেশ্য আছে জানিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিবে, তাহা হইলে খুব শীঘ্র চিত্ত নির্ম্মল হইয়া ভগবদ্দর্শনের অধিকারী হইতে পারিবে। যিনি আশ্রিতজনের অভিমান বাড়াইয়া দেন, তিনি গুরু নহেন।'

বিগত ১৩৩৩ সালের হরিদ্বার কুম্ভের প্রায় আড়াই মাস পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনের অর্দ্ধকুম্ভে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যমুনার চড়ায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন স্থাপন করিয়া মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী হইতে দোলপূর্ণিমা

* ধমক্, গালাগালি।

পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাধু গুরুভ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। শিবপুর নিম্বার্কাশ্রমের বর্ত্তমান মহন্ত রামকৃষ্ণদাসজীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবাকার্য্যের ভার ছিল। একদিন প্রাতঃকালে যমুনাস্নান করিয়া আসিতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইয়া আসিয়া দেখেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ স্বয়ং ঠাকুরজীর সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি ভীত হইয়া শীঘ্র তিলক স্বরূপ করিয়া গিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলেন, "বাবা, আপনি যান, আমি পূজা করিতেছি।" তিনি তখন কিছু উত্তর দিলেন না, সেবার কার্য্য করিতে থাকিলেন। রামকৃষ্ণদাসজীও পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার গালে খুব জোরে এক চড় লাগাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "এত বেলা হইয়া গিয়াছে, এখনও শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে উত্থাপন কর নাই, তোমার যদি পূজা করিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে আমাকে আগে জানাও নাই কেন? ঠাকুরজী এখনও ত আমাকে অসমর্থ করেন নাই, আমি নিজেই তাঁহার সেবা করিতে পারি।" তখন রামকৃষ্ণদাসজী কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদাসজী খুবই মর্ম্মাহত হইলেন এবং অভিমান করিয়া তাঁহার সঙ্গে আর কথা বলিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবাপূজা সমাপন পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পর বাবাজী মহারাজ তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে, বাবা? তোমার শরীর ভাল আছে ত?" তিনি তাহাতে কোন উত্তর করিলেন না বটে, কিন্তু এই কথাগুলি বাবাজী মহারাজ এমন স্নেহকণ্ঠে ও মধুরভাবে বলিলেন যে, তাহার মনের পূর্ব্বভাব একেবারে

পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তখন বলিলেন, "বাবা! কাকাজীর কাছে গিয়াছিলাম।" বাবা "এই নাও, তোমার জন্য প্রসাদ রাখিয়াছি" বলিয়া তাহাকে আমলকীর মোরব্বা প্রসাদ দিলেন।

বাবাজী মহারাজ সাধুশিষ্যদিগকে ইহা অপেক্ষাও কঠিন শাসন সময় সময় করিয়াছেন, লাঠি, চেলাকাঠ, পাখা প্রভৃতি দ্বারা প্রহার করিয়াছেন, আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই সকল কঠোর শাসন সাধুশিষ্যদিগের প্রতিই করিয়াছেন, গৃহস্থ চেলাদিগকে এরূপ করেন নাই। শেষের দিকে দেখিয়াছি, তাঁহার শাসনের কঠোরতা অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, প্রয়োজনানুসারে তিরস্কার অথবা অল্পবিধ মৃদু দণ্ডই দিতেন।

শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেই যে তাঁহার দয়া অসহায় মানবের উপর বর্ষিত হইত, তাহা নহে, ব্যবহারিক ও সাংসারিক ব্যাপারেও তাঁহার দয়ার অন্ত ছিল না। গৃহী থাকিতে বাবাজী মহারাজ বহু দরিদ্র ছাত্রকে গৃহে রাখিয়া অন্ন দিতেন, দেশের বহু লোককে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি সাধু হইবার পর তাঁহার কোন আয় ছিল না যাহা হইতে তিনি পূর্ব্বের মত অপরকে সাহায্য করিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবার্থ বহুলোক অর্থ প্রেরণ করিতেন, কিন্তু তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবাতেই ব্যয়িত হইত, তাহা হইতে তিনি কখনও দান করিতেন না। তাঁহাকে প্রণামী বলিয়া লোকে যাহা দিত, তাহাই তাঁহার নিজের তহবিলরূপে কোন শিষ্যের নিকট থাকিত, এই অর্থ যথেচ্ছ দান করিতেন। আমাদের একটি গুরুভ্রাতা লিখিয়াছেন, "বি. এ. পরীক্ষা দিবার পর আমার খুব অসুখ হয়, শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, কাজকর্ম কিছুই করিতে পারিতাম না। পূর্ব্বে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিয়া-

ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সামান্য পরিশ্রম করিলেই জ্বর হইত। তখন আমি কপর্দ্দকশূন্য, আর্থিক দূরবস্থা হেতু ঔষধ পথ্য যোগাড়ের উপায় ছিল না। আমার অবস্থা জানিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীগুরুদেব আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। আমি চাহি নাই, কারণ ইহা আমি কল্পনাই করিতে পারি নাই। প্রচলিত ধারণা অনুসারে আমি জানিতাম গুরুকে দিতে হয়, কিছুই দিবার সাধ্য আমার ছিল না, ইহাতেই নিজেকে ধিক্কার দিতাম; তিনিই যে আমাকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন এ সম্ভাবনা আমার মনে উদিত হয় নাই। শ্রীগুরুই যে পিতামাতা, ভ্রাতা, বন্ধু সকলই এবং জীবনের সমস্ত ভারই যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তখন জানিতাম না। যাহা হউক, সেই অর্থ শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল—কিছু নিজে ব্যয় করিলাম, কিছু আমার কয়েকটি আত্মীয়া সেই সময় অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দিলাম। ইহার পর আবার নিঃস্ব হইয়া অতি কষ্টে পড়িলাম। এই সময়ে শ্রীযুক্ত···দাদা আমাকে কয়েক মাস পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে অর্থ সাহায্য করিতেন। এক সঙ্গে অধিক দিতেন না, ঠিক যে পরিমাণ প্রয়োজন, সেই পরিমাণই দিতেন। ইহার পর আমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলাম ও একটি নূতন স্কুলে হেড মাষ্টারী কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া সেখানে চলিয়া গেলাম। এইরূপে আমার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবার পর শ্রীযুক্ত···দাদা প্রকাশ করিলেন যে সেই টাকা তিনি নিজে দেন নাই, শ্রীগুরুদেবই দিয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব তাহাকে গোপনে ডাকিয়া কতকগুলি টাকা একসঙ্গে দিয়া দেন, এবং বলেন "'......'র বড় কষ্টে দিন যাইতেছে, কিন্তু ওকে একসঙ্গে এতগুলি টাকা দিলে অবিবেচনাপূর্ব্বক খরচ করিয়া দুরবস্থায় পড়িবে, সুতরাং তুমি অল্পে অল্পে উহাকে প্রয়োজনমত দিও।" এই কথা শুনিয়া তখন আমার মনের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। আজিও সেদিনের কথা

স্মরণ হইলে অশ্রুরোধ করিতে পারি না। ইহার পর চাকুরী হইতে ছুটি লইয়া যেবার এম্. এ. পরীক্ষা দিই, তখন টিউশনি করিয়া বাড়ীতে টাকা পাঠাইতাম, পরীক্ষার ফি (আশী টাকা) দিবার সঙ্গতি ছিল না, সেই টাকাও বাবাজী মহারাজ দিয়াছিলেন।"

"তোতী" নামক একজন বৃন্দাবনবাসী চামারজাতীয় রাজমিস্ত্রী আমাদের আশ্রমের মেরামতাদি কার্য্য অনেক সময় করিত। একদিন সিমেণ্ট চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট লইয়া গেলাম। তিনি সকল কথা শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অতিশয় ক্রোধের ভাব দেখাইয়া তাহাকে খুব ফটকার দিলেন। একটু পরে দেখি মৃদুভাবে পরদিনের কাজ সম্বন্ধে তাহার সহিত পরামর্শ করিতেছেন। সে চলিয়া যাইবার পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "দেখ বাবা, ইহারা বড় গরিব, এদের দয়া করিতে হয়।"

শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে পাইখানা, জলনালী প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত মেথর নিযুক্ত আছে। তাহাকে প্রতিদিন আহার দিতে হয়। একদিন দ্বিপ্রহরে অসময়ে বহু অতিথি উপস্থিত হইলে অবশেষে প্রসাদ কম পড়িয়া গেল, এদিন মেথরকে প্রসাদ দেওয়া হইল না। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কোন প্রকারে তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের ডাকাইলেন। যাহাদের উপর প্রসাদবণ্টনের ভার ছিল, তাহাদিগকে বলিলেন, "কেন আজ মেথরকে প্রসাদ দেওয়া হয় নাই?" তাহারা সভয়ে বলিলেন, "আজ পঙ্গতের সময় বহু সাধু আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে প্রসাদ কম পড়িয়া গিয়াছিল, তাই ভাঙ্গির জন্য আর ছিল না।" ইহাতে কঠোরভাবে তিনি বলিলেন, "এ কথা আমি শুনিব না। সকলে খাইবে, আর তাহাদের বেলাতেই কম পড়িবে, এ কোন্ কথা?

খবরদার, আর যেন কখনও এরূপ না হয়। মেথরকে তাহার রোজের প্রসাদ দিতেই হইবে। তাহার জন্য প্রসাদ আগে হইতে রাখিয়া দিবে।" ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া তখনই মেথরের জন্য আটা, ডাল প্রভৃতি বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। তাহা দেওয়া হইলে বাবাজী মহারাজ আবার মিষ্ট বাক্যে আমাদের বলিলেন, "দেখ, মা যেমন শিশু সন্তানের বিষ্ঠা মূত্র পরিষ্কার করেন, কখনও ঘৃণা করেন না, ইহারা তেমনি করিয়া আমাদের সেবা করে, ইহাদিগকে দুটি খাইতে না দেওয়া কি উচিত?" ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া বুঝাইলেন।

নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে অবজ্ঞা অথবা নিজের সুবিধার জন্য তাহাদের অস্বাচ্ছন্দ্য উৎপাদন করা তিনি সহিতে পারিতেন না। কাহাকেও এরূপ করিতে দেখিলে তিনি সর্ব্বদা শাসন করিতেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা বহুবার পাইয়াছি।

শুধু যে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের জন্যই তাঁহার দরদ ছিল তাহা নয়, পশু, পক্ষী এমন কি উদ্ভিদের প্রতিও তাঁহার এই দয়া সর্ব্বদা দর্শন করিয়া আমরা অবাক্ হইতাম। একবার কলিকাতা ভবানীপুরে (প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতাধ্যাপক) শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাস মহাশয়ের বাটীতে অবস্থানকালে একদিন প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ গঙ্গাস্নানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে তথায় আসিয়াছিলেন। ব্রজবাবু প্রস্তাব করেন যে, তিনি তাহার বালিগঞ্জের বাটী হইতে তাহার ঘোড়ার গাড়ী পাঠাইয়া দিবেন, গাড়ী বাবাজী মহারাজকে হাইকোর্টের ঘাট হইতে স্নান করাইয়া আনিয়া ভবানীপুরে পৌছাইয়া দিয়া পুনরায় তাহাকে লইয়া হাইকোর্টে যাইবে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আপত্তি করিয়া বলিলেন, "ভাই, ঘোড়াটির এতটা পথ যাওয়া আসা করিতে বড়ই ক্লেশ

হইবে। এ ব্যবস্থা ভাল হইবে না। ঘোড়া হইলেও জীব ত বটে!" কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যে, উপস্থিত কেহ আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। অতঃপর তাঁহার গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত অন্য ব্যবস্থা করা হইল।

ব্রজের মধ্যে এক গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর কিছু জমি আছে, কয়েকটি বলদ রাখিয়া তাহা ভাগে চাষ করা হয়, স্থানটির নাম এগরারা, জলবায়ু বেশ ভাল ও স্বাস্থ্যকর। দেহরক্ষার কয়েকমাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এখানে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। যতদিন ছিলেন প্রত্যহই বলদগুলিকে একবার করিয়া দেখিতে যাইতেন। তাহাদের কোন প্রকার ক্লেশ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতেন এবং বলিতেন, "বাবা! ইহারা কথা বলিয়া নিজেদের অসুবিধা জানাইতে পারে না, এজন্য বিশেষ অবহিত হইয়া তোমাদের দেখা উচিত, ইহাদের ঠিক মত সেবা হইতেছে কিনা। ইহাদের ক্লেশ দূর করিবার জন্য তোমরা চেষ্টার ত্রুটি করিও না।"

শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে গ্রীষ্মকালে দারুণ উত্তাপের সময় পশুপক্ষী অনেক সময় জলাভাবে কষ্ট পায়, কারণ গভীর কূপ ও ইন্দারা ব্যতীত অন্য কোথাও প্রায় জল থাকে না। আমাদের আশ্রমের পশ্চাৎদিকে একটি বারান্দায় যেখানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সর্ব্বদা বসিতেন, এবং রৌদ্র নিবারণের জন্য তাঁহার সামনে একখানি খড়ের চালা ছিল, সেইস্থানে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের আদেশ অনুযায়ী তাঁহার আসনের ঠিক সম্মুখে একটি বড় মাটির পাত্রে জল ভরা থাকিত; কুকুর, বিড়াল, বাঁদর প্রভৃতি তাহা হইতে যথেষ্ট জল পান করিতে পারিত, আর উপরে একটি শিকায় জলপূর্ণ মাটির হাঁড়ি ঝুলান থাকিত—তাহা হইতে পাখীরা জল খাইত।

তরুলতার প্রতিও তাঁহার এই প্রকার করুণার পরিচয় আমরা মধ্যে মধ্যে পাইয়াছি। একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটি পুষ্করিণীর চারিধারে ভ্রমণ ও সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতেছিলেন। স্থানটি বঙ্গদেশের একটি পল্লীগ্রাম, পুষ্করিণীর পাড়ে নানা আগাছা জন্মিয়াছিল, আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা আগে আগে চলিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার চলিবার পথে দু-চারিটি ছোট গাছ তুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। একটু অপ্রসন্নতার ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলে গুরুভ্রাতাটি নিবৃত্ত হইলেন। ইনি লিখিয়াছেন, "তাঁহার চলিবার সুবিধার জন্যই আমি ঐরূপ করিতেছিলাম জানিলেও তিনি যে কেন আমাকে নিবারণ করিলেন, তাহা আমি তৎকালে বুঝিতে পারি নাই, বরঞ্চ তাঁহার অপ্রসন্নতা দৃষ্টে মনে মনে বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছিলাম। তাঁহারই কৃপায় পরে বুঝিয়াছি যে তাঁহার অপার দয়াই ইহার কারণ, তাঁহার সুবিধার জন্য গাছগুলিকে আমি উন্মূলিত করি, ইহাতে তাঁহার অনুমোদন ছিল না। এইরূপ বুঝিবার পর হইতে দৃষ্টতঃ সামান্য এই ঘটনাটি অপূর্ব্ব মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া আমার জীবনে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যখনই ইহা স্মরণ করি ও এই বিষয়ে চিন্তা করি, তখনই উপকৃত হই।"

শিবপুর আশ্রমের পশ্চাদ্দিকে সীমানার মধ্যে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের ঘরের অনতিদূরে একটি তেঁতুল গাছ আছে। তেঁতুল গাছের হাওয়া ভাল নয়, এটি আমাদের দেশের একটি প্রচলিত সংস্কার। এই গাছটিকে কাটিয়া ফেলিতে এক সময়ে আমাদের অনেকেরই আগ্রহ হইয়াছিল এবং এ প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি মত দেন নাই; মধুর বাক্যে সকলকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ বাবা! ও ত তোমাদের কোন অনিষ্ট করে নাই, আশ্রমের বেশী

ভূমিও নেয় নাই, কোন মতে একটি প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে, কেন উহাকে মারিবে ?”

এইবার তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমার কথা কিছু বলিব ; তাঁহার ক্ষমার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৩৩৫ সালের প্রথম ভাগে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ শ্রীহট্টের নানাস্থানে ভ্রমণ করার সময় আমাদের সাধুগুরুভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণদাসজী ও অন্য এক সম্প্রদায়ের একটি অল্পবয়স্ক সাধু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সেই সাধুটি লোভবশতঃ শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের প্রণামীর টাকা হইতে কয়েকটি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং একদিন একাদশী উপলক্ষে বাবাজী মহারাজের নিমিত্ত যে সমস্ত ফলাহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা হইতে কিছু অংশ গোপনে খাইয়া ফেলিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছিলেন। এ সমস্ত বিষয় শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের গোচরে আনিলে তিনি একবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

অবশেষে সেই সাধুটি যখন অতিশয় কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিলেন, “লিখ্ দে কি আউর কভী কুছ্ অপরাধ করেঙ্গে তো হামকো লাজা করকে নিকাল দীজিয়েগা” (যদি আমি আর কখনও কোন অপরাধ করি, তবে আমার সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দিবেন, এই কথা লিখিয়া দে)। তখন তিনি তাহাই করিলেন। অনন্তর, এই কাগজখানি অতি প্রয়োজনীয় একখানি দলিল, এই ভাব দেখাইয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিলেন, “রামকৃষ্ণদাস! এই কাগজ নিয়া আমার ঝুলির মধ্যে রাখিয়া দাও।” সেই সাধুটিকে বলিলেন, “যাও, প্রসাদ পাও।” তারপর শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি শয়ন করিলে যখন রামকৃষ্ণদাসজী তাঁহার পা-

হাত পা টিপিয়া দিতেছিলেন, তখন তিনি এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "বাবা, ইহাকে আপনি খরচ দিয়া বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিন্। এ যদি পুনরায় চুরি করিয়া ধরা পড়ে, তবে আমাদের দুর্ণাম হইবে।" শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ অতি স্নেহপূর্ণকণ্ঠে, মধুর ভাবে বলিলেন, "বাবা রে! তাহা হইলে ওর ত আর কোন আশাই থাকিবে না। তার চেয়ে তোমাদের পাঁচজনের সংসঙ্গে থাকিলে ওর যদি স্বভাবের সংশোধন হয়, সেটা কি ভাল নয়?" কথাগুলি আর্দ্রস্বরে, এমন করিয়া বলিলেন যে রামকৃষ্ণদাসজী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

যাহাকে আমরা অন্যায়, অপকর্ম্ম মনে করি তন্মধ্যে এমন গর্হিত কাজ নাই, যাহা তাঁহার নিকট অকপটে প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলে ক্ষমা পাওয়া যাইত না। এরূপ কোন একটি ঘটনা উপলক্ষ করিয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা যদি শুধু দোষই দেখিতে চাও, তবে আমার সহস্র দোষ আছে।"

আর একদিন তাঁহার গুরুদেবের একটি কথার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ স্মরণীয়। কোন কারণে আমাদের একটি গুরুভ্রাতা অনেকের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাহার নানাপ্রকার দোষ দেখাইয়া, তাহাকে কোন প্রকার শাস্তি দিবার জন্য, অনেকে মিলিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে একদিন বিশেষ-রূপে অনুরোধ করিলেন। সমস্ত কথা নীরবে ধৈর্য্যসহকারে শুনিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, তাহাকে শিষ্য করিয়া লইয়াছি, এখন ছাড়ি কিরূপে? তোমরা তাহাকে ছাড়িলেও আমি ত পারি না। আমার বাবা * বলিতেন, 'একগুণ রয়নেসে দো দোষ সাথ্ সাথ্ সদাই লাগা রয়তা হায়!' দেখ বাবা, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সর্ব্বদাই সকলের মধ্যে

* অর্থাৎ শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ।

রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সত্ত্বগুণের কার্য্যকে 'গুণ' এবং রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াকে 'দোষ' বলা হয়। সুতরাং যে কোনও লোকের মধ্যে একটি গুণ থাকিলে, দুইটি দোষ অবশ্য থাকিবে। আমার মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়া থাকায় আমারও যথেষ্ট দোষ আছে। শুধু দোষের দিক দেখিয়া যে শাস্তি দেওয়ার কথা বলিতেছ তাহা হইলে আমাকেও ত তোমাদের তাড়াইয়া দিতে হয়।" এ কথা শুনিয়া সকলের চিত্ত ক্রমশঃ শান্ত হইল।

শ্রীযুক্ত পতিতপাবনদাসজী নামে আমাদের একজন প্রবীণবয়স্ক সাধু গুরুভ্রাতা আছেন। তিনি বলেন, "শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে সাক্ষাৎ মহাদেবরূপেই চিরদিন দেখিলাম। কেহ দোষ করিয়া এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই, তখনই অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিবেন, কিন্তু যত বড় অপরাধীই হউক, যত দোষই করিয়া থাকুক, অকপটে সকল কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেই অমনি জল। তাহার অপরাধ তখনই ক্ষমা করিবেন।" একদিন আমাদের এক গুরুভ্রাতা অনুতপ্তভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সমীপে তাঁহার অতীত জীবনের ইতিহাস অকপটে ব্যক্ত করেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি গুরুতর পাপকার্য্যের কথা ছিল; শ্রবণান্তে তিনি বলিলেন, "বাবা! তোর অপরাধ গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু অনুতপ্ত হইয়া যখন সকল কথা গুরুর নিকট অকপটে প্রকাশ করিয়াছিস্, তখন আর ভয় নাই; শ্রীভগবান্ তোর সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সকলের প্রতি সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অন্তরালে একটি ভাব লুক্কায়িত থাকিত, তাহা সর্ব্বজীবের প্রতি অনাবিল সুগভীর কল্যাণেচ্ছা।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরা সহর ৬। মাইল দূর। কার্ত্তোপলক্ষে

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে কখন কখন সেখানে যাইতে হইত। তিনি যখনই কোন কারণে সহরে যাইতেন, আসিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরজীর জন্য কোন বস্তু লইয়া আসিতেন। অনেক দিন পূর্ব্বের কথা, একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি মথুরায় গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পরই ফিরিবার কথা, কিন্তু অনেক দেরী হইতে লাগিল। যখন রাত্রি ন'টা কিম্বা সাড়ে ন'টা বাজিয়াছে, এমন সময় দেখা গেল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটি বড় চালকুমড়া বহিয়া লইয়া তাঁহার স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে আশ্রমের দিকে আসিতেছেন। অনন্তদাসজী কুমড়াটি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া বলিলেন, "বাবা, এত দেরী হইল কেন? আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির হইয়াছি।" তিনি উত্তর করিলেন, "বাবা, সন্ধ্যার সময় (মথুরাস্থিত) বৃন্দাবন দরজায় আসিয়া এক্কা দর করিলে রাত্রি হইয়াছে বলিয়া এক্কাওয়ালা এক টাকা চাহিল। ঠাকুরজীর পয়সা এইভাবে ব্যয় করিতে ইচ্ছা হইল না। তাই হাঁটিয়া আসিয়াছি ইহাতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর পয়সা অপব্যয় করা উচিত নয়।" অপর এক সময়ে আশ্রমের কোন ব্যাপারে আমাদের কেহ কেহ কিছু অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রস্তাব করিলে, তিনি তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "সংসারী লোকেরা কত কষ্টে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সেই টাকা তোমাদিগকে দেয়, তাহা তোমরা বুঝ না!"

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিকেই শুধু লক্ষ্য রাখিতেন এরূপ নহে। ব্যবহারিক শিক্ষাও অনেক আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। সব রকম কাজেই তাঁহার অপূর্ব্ব দক্ষতা ছিল। বাস্তবিক এরূপ সর্ব্বকর্ম্মনিপুণ লোক দুর্লভ। যাহা করিতেন, সুন্দর করিয়া করিতেন; দেখিলে মনে হইত, ইহার উপর আর কিছু করিবার নাই। একস্থান হইতে আর একস্থানে যাইবার সময়

বিছানা বাঁধিতে হইবে, আমরা কেহ কাজটি করিতে গিয়াছি, ঠিক্ হইতেছে না দেখিলেই বলিয়া দিলেন, "এইরূপ করিয়া কর"। কখনও নিপুণশিল্পীর ন্যায় দ্রুতহস্তে নিজেই কাজটি সারিয়া ফেলিলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠ সাধু গুরুভ্রাতা অনন্তদাসজী বালককালেই যখন তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, সে সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আশ্রমের সেবাকার্য্যের অধিকাংশই স্বহস্তে করিতেন, একথা পূর্ব্বেই যথাস্থানে বলিযাছি। ইঁহাকে তিনি হাতে ধরিয়া ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা হইতে নানা-প্রকার রান্না পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ শিখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের হাতের রান্না খাইয়াছেন, এরূপ লোক আজিও জীবিত আছেন; ইঁহাদের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহার রান্না ব্যঞ্জনের স্বাদ অতি অপূর্ব্ব হইত, আর অতি দ্রুত ও পরিষ্কারভাবে সমস্ত কাজ করিতেন। তাঁহার রান্নার দু'একটি বিশেষত্বের কথা আমরা জানি। নানা রকম নূতন রান্না তিনি জানিতেন; এগুলি প্রায়ই যে সকল জিনিষ অব্যবহার্য্যবোধে আমরা ফেলিয়া দিই, তাহা দিয়া তৈয়ারী এবং তাহার স্বাদও বড় সুন্দর মুখরোচক হইত—কচুপাতার বড়া, মানকচুর খোসা পিষিয়া তাহা দিয়া বড়া, ইত্যাদি। আর একটি জিনিষ তিনি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন—কতকগুলি রান্নার উপকরণ ও পরিমাণ সম্বন্ধে বাঁধাধরা নিয়ম। দু'একটি এরূপ নিয়ম দৃষ্টান্তস্বরূপে দিতেছি:—পায়স রান্নার এক সের দুধে এক ছটাক চাউল ও আধপোয়া মিশ্রী; খিচুড়ীতে চাউল আধসের, ডাইল আধসের, সৈন্ধব আড়াই তোলা, ঘৃত সাধারণতঃ একছটাক, বিশেষ ক্ষেত্রে (উৎসবাদিতে) আধপোয়া; হালুয়ায় যতটুকু সুজি, ততটুকু ঘৃত ও তাহার দ্বিগুণ চিনি, ইত্যাদি।

তাঁহার তীর্থযাত্রার সঙ্গীদের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে

থাকিয়া নিজেরাও দেখিয়াছি, তিনি প্রয়োজনস্থলে সব রকম কাজই নিজ হাতে করিয়া লইতেন, কাহারও অপেক্ষা করিতেন না। তাঁহার এই অনপেক্ষ, অনলস স্বভাবের ও দৃঢ় নিয়মনিষ্ঠার পরিচয় পাঠক ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। তাঁহার প্রাচীন বয়সে, রোগজীর্ণ দুর্ব্বল শরীরেও এই স্বভাব তাঁহার ছিল। কোন কাজকে ছোট মনে না করা, এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্মই ভগবৎসেবাবুদ্ধিতে যত্নপূর্ব্বক করা, এই উপদেশ তিনি সকলকে দিতেন। তিনি বলিতেন, "সেবার জন্য কাজ মাথায় করিয়া করিবে।"

একদিন শ্রীবৃন্দাবনআশ্রমে রাত্রের প্রসাদ পাইবার পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শয়ন করিয়াছেন, রামকৃষ্ণদাসজী তাঁহার পা টিপিয়া দিতেছেন, এমন সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কাজকর্ম্ম সব মিটিয়া গিয়াছে ত?" সেইদিন বৈকালে বহুসংখ্যক সাধু অতিথি উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেজন্য বেশী পরিমাণে রান্না করিতে রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, সকলের প্রসাদ পাইতে অন্যান্য দিন অপেক্ষা বিলম্ব হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ-দাসজী বলিলেন, "কাজকর্ম্ম বেশী থাকায় অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আজ একটু শীতও বেশী, তাই রান্নাঘরটা আর পরিষ্কার করা হয় নাই, এই কাজটি আমরা কাল করিব বলিয়া রাখিয়া দিয়াছি।" শুনিয়াই তিনি বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন, বাল্‌তি ও ঝাঁটা লইয়া নিজেই ঘর ধুইতে চলিলেন, বলিলেন, "বাবা, তোরা ক্লান্ত হইয়াছিস্, আজ তোদের এ কাজটা আমিই করিয়া দি। ঠাকুরজীর কাজের অনিয়ম করা উচিত নয়।" বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহার নিজের করিতে হইল না, অপর সকলে আসিয়া পড়িলেন, অল্পসময় মধ্যেই ঘর ধোওয়া হইয়া গেল।

তাঁহার আলস্য অথবা কর্ম্মকুণ্ঠতা কখনও দেখা যায় নাই। আমরা

অনেক সময় অনিচ্ছাবশতঃ অনেক কাজ 'এখন থাক্, পরে করিব' বলিয়া রাখিয়া দিই। বহু বৎসর তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াও এরূপ কথা আমরা কেহই তাঁহার মুখে কদাপি শুনি নাই। বরঞ্চ এক এক সময়ে প্রয়োজন হইলে তাঁহার যে অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি প্রকাশিত হইত সেরূপ কর্ম্মশক্তি সচরাচর দেখা যায় না। তিনি অক্লান্তভাবে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারিতেন, আর একটি বিশেষত্ব তাঁহার ছিল, তিনি একসঙ্গে অনেক রকমের কাজ করিতে পারিতেন, বহু বিষয়ে যুগপৎ মনোযোগ দিবার একটি অনন্যসুলভ শক্তি তাঁহার ছিল। এক একটি উৎসবের সময়ে ইহা বিশেষরূপে দেখা যাইত। এক এক সময়ে—পূজার ছুটিতে শ্রীবৃন্দাবনে অথবা তিনি স্বয়ং কোথাও আসিলে সেখানে বহু গুরুভ্রাতা ভগিনীগণ তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতেন। দেখিয়াছি এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, প্রত্যেকেই তাঁহার পূর্ণ মনোযোগ লাভ করিতেন।

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের চরিত্রের বিশেষত্বগুলি তাঁহার জীবদ্দশায় আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর এ বিষয় যতই চিন্তা করা যায় ততই সেই সমস্ত গুণাবলী আমাদের মানসচক্ষে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সদাচার ও আভ্যন্তরিক প্রকৃতি

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আচারব্যবহার সকলই শাস্ত্রানুগত ছিল। শাস্ত্রোপদিষ্ট অথবা সাধুগণের আদৃত সদাচার লঙ্ঘন করিয়া আমাদের কাহাকেও চলিতে দেখিলে তিনি কঠোর শাসন করিতেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে দিলাম।

১৩৩৮ সালে বৈশাখ মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আসাম প্রদেশান্তর্গত কোন সহরে গিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় আটটার সময় ট্রেণ পৌছিল। তত্রত্য——মহাশয়ের বাসায় উঠিবার কথা। দুইখানি মোটর লইয়া তিনি, স্থানীয় গুরুভ্রাতৃবর্গ ও সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেকে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ স্থানীয় দুই একজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া একখানি মোটরে উঠিয়া বাজারের দিকে গেলেন, অপর খানিতে চড়িয়া শ্রীশ্রীঠাকুরজীকে লইয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট বাসায় আসিলাম। এই সময় বাবার শরীর ভাল ছিল না বলিয়া রাত্রি অধিক হইলে তিনি খাইতে চাহিতেন না। এজন্য আমি তাড়াতাড়ি পাকের আয়োজন করিতে উদ্যোগী হইলাম। বাটীর মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখনও মাছ মাংস রান্না করা হয় নাই, এরূপ পাকপাত্র আপনাদের আছে কি?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ আছে" এবং কতকগুলি বাসন দিলেন। তাহা লইয়া আমি রন্ধনে ব্যাপৃত হইলাম। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আসিয়া পৌছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই রন্ধন শেষ করিয়া আমি সোৎসাহে বলিলাম, "বাবা! রসুই হইয়া গিয়াছে, এখন কি ভোগ

লাগাইব ?" বলামাত্র তিনি খুব ধমক্ দিয়া আমাকে বলিলেন, "কে তোমাকে রাঁধিতে বলিয়াছে ? কেন তুমি ইহাদের বাসনপত্র ব্যবহার করিয়াছ ? তুমি জানিতে আমি বাজার হইয়া আসিতেছি, আমি ত বাসন আনিবার জন্যই গিয়াছিলাম।" তখন আমি বলিলাম, "আপনি বাসন আনিতে গিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতাম না। দেরী করিলে আপনার খাইতে অধিক রাত্রি হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াই নিরামিষ বাসন লইয়া আমি রাঁধিয়াছি।" ইহাতে তেজের সহিত তিনি বলিলেন, "মূর্খ! তুমি জান না, যাহারা মাছ খায় তাহাদের বাটীতে কি মাছের সংস্রবশূন্য বাসন থাকিতে পারে ? যাহা রন্ধন করিয়াছ, সব ফেলিয়া দিতে হইবে, ইহা ভোগে লাগিবে না। পুনরায় রন্ধন না করিলে ঠাকুরজীর ভোগ লাগান যাইবে না এবং আমিও খাইব না।" তখন আমি বলিলাম, "বাবা! আমার অপরাধ হইয়াছে, আপনি ক্ষমা করুন। আমি আবার রাঁধিতেছি।" অতঃপর তিনি শান্ত হইয়া উপবেশন করিলেন। নূতন বাসন লইয়া আমি পুনরায় রন্ধন করিলাম। পাক শেষ হইতে বারটা বাজিয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইতে পাইতে রাত্রি প্রায় একটা হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এত রাত্রেও খুব প্রসন্নভাবেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

পক্ষান্তরে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রচলিত সদাচার সম্বন্ধীয় দৃঢ়তা তিনি কথঞ্চিৎ শিথিল করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ অসঙ্কোচেই তাহা করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। দেখিয়া প্রথম প্রথম বিস্ময় জন্মিত, পরে বুঝিয়াছি তত্তৎস্থলে তাঁহার প্রদর্শিত আচরণই যথার্থ, শাস্ত্রোপদিষ্ট আপদ্ধর্ম। অবস্থাসঙ্কটে পতিত হইলে শাস্ত্রানুকূল যুক্তিতে গুরুলঘু বিচার পূর্ব্বক উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়াই তাঁহার

উপদেশ ছিল। এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থ ভ্রমণ অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া তাহার পুনরুক্তি করিলাম না। পরন্তু তাঁহার এই সকল আচরণ অপেক্ষাও লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে শাস্ত্রোপদেষ্টা ঋষিগণের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। তাঁহার শ্রীগুরুদেবকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া তিনি সর্ব্বদা খ্যাপন করিয়াছেন। গুরুদেবের প্রতি যেমন, প্রাচীন ঋষিদের প্রতিও তাঁহার তেমনই প্রেম ছিল। এই প্রেম যে কতদূর গভীর ছিল, মধ্যে মধ্যে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। এইরূপ একটি ঘটনা এইস্থলে বর্ণনা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একবার গৌহাটিতে গেলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সহরের কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি একদিন তাঁহাকে স্থানীয় হরিসভায় লইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমে কীর্ত্তন ও অনন্তর নানা সংপ্রসঙ্গ হইল। অনেকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ও তিনি তৎসমুদয়ের উত্তর দিলেন। সকলে বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন। অবশেষে কয়েকজনে বলিলেন, "আপনি সর্ব্বদ্রষ্টা ঋষিগণের মহিমা কিছু কীর্ত্তন করুন। আপনার মুখে তাঁহাদের গুণানুবাদ আমরা শুনিতে চাই।" এইদিন সভায় সংস্কৃতজ্ঞ, প্রাচীন আদর্শের অনুরাগী অনেকে উপস্থিত ছিলেন, আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তিও অনেকে আসিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধারণতঃ হরিসভায় আসেন না, তাঁহারাও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আগমন সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছিলেন। সকলেই আগ্রহের সহিত এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন, সভায় বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইল। কিন্তু বাবাজী মহারাজ সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। সেইস্থানে কিয়ৎকালের জন্য এক অপূর্ব্ব মহিমান্বিত দৃশ্যের উদ্ভব হইল। সমাধিমান্ ধূর্জ্জটির ন্যায় তিনি মুদ্রিতনেত্রে স্থিরভাবে স্বীয় আসনে সমাসীন, আজানুলম্বিত জটাভার

শিরোপরি সন্নদ্ধ, আয়তোন্নত ললাট হইতে তপঃপ্রভা ও জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত, নয়নপ্রান্তে উদ্গতাশ্রু সেই তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিকে অপরূপ কমনীয়তা প্রদান করিয়াছে, আর সেইদিকে চাহিয়া শত শত নরনারী ব্যাকুল আগ্রহে নিস্তব্ধ, উৎকর্ণ হইয়া আছেন। মিনিট দুই পরে কথা কহিতে গিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কাঁদিয়া ফেলিলেন। কথা কহিতে পারিলেন না, একেবারে বালকের মত ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ প্রয়াস করিয়াও কোন মতেই বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না! অবশেষে সকলে বলিলেন, 'আর আপনার বলিতে হইবে না, আমাদের কথার উত্তর মিলিয়াছে। আমরা ইহা এত সুন্দররূপে বুঝিয়াছি যে অনেক কথাতেও তাহা হইত না!'

শ্রীগুরুদেবের স্মরণে তাঁহার দেহ পুলকিত, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইত, শ্রীভগবানের কথা বলিতে গেলে তাঁহার চোখে জল আসিত। কিন্তু এই দিনের মত তাঁহার বিহ্বলভাব কখনও দেখা যায় নাই। "ভাব অন্তরে চাপিয়া রাখিতে হয়, বাহিরে প্রকাশ হইতে দিতে নাই" এই উপদেশ তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন, তাঁহার নিজের জীবনেও ইহা সুপালিত হইয়াছে। ভাব সংবরণ করাই তাঁহার স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু এই দিন তাহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল।

স্থিরভাবে আসনে বসিয়া আছেন, আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন বটে, কিন্তু তথাপি দৃষ্টি এ জগতের দিকে নহে, অন্য কোথায় যেন নিবদ্ধ। যখন কথা কহিতেছেন তখনও, কথাবার্ত্তার মধ্যেও, এই একই ভাব; আবার কথা শেষ হইলে তখনই নীরব, স্থির, আত্মসমাহিত *।

* সন ১৩৪২ সালের মাঘ সংখ্যা "দেবায়তন" পত্রে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"......অনেক দিন দেখিয়াছি—তাঁহার বিজ্ঞান-বৈরাগ্য বিমণ্ডিত শুভ্র শ্মশ্রুগহন ব্রহ্মচর্য্যোদ্দীপ্ত মুখখানি ষড়্দর্শনের ব্যাখ্যা করিতে করিতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে, আবার ভক্তির

জিজ্ঞাসিত না হইয়া কোন উপদেশ কাহাকেও তিনি দিতেন না, আবার কাজের কথা, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, এমন কি সাধারণ সাংসারিক আলাপও করিতেছেন, এরূপ দেখা যাইত।

প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিতেন, শৌচ স্নান সমাপনান্তে নিজের আসনে আসিয়া কিয়ৎকাল একান্তে থাকিতেন। এই সময়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করিতেন, কাহাকে যেন প্রণাম করিতেছেন এইরূপ অনেক সময় দেখা যাইত। তাহার পর বাহিরে আসিয়া বসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর শৃঙ্গার আরতির সময় প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন *। আরতির পর শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। আরতির পর প্রণাম করিয়া উঠিয়া সকলের দিকে ফিরিয়া বড় মধুর হাসিয়া জোড় হাতে বলিতেন, "দণ্ডবৎ মহারাজ।" শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে অবস্থান কালে এই সময়ে স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরজীর চরণামৃত ও প্রসাদ সকলকে বিতরণ করিতেন।

ইহার পর পুনরায় নিজ আসনে আসিয়া বসিতেন, এই সময়ে প্রয়োজনানুসারে দীক্ষাদান, উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত সদালাপ প্রভৃতি নানা কাজ করিতেন। প্রত্যহই অনেক চিঠি আসিত, তাহারও উত্তর এই

প্রসঙ্গ উঠিবামাত্র তাঁহার বিশাল লোচনযুগল অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে……"। ১৩৪৫ সালের মাঘ সংখ্যা "শ্রীসুদর্শন" পত্রিকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উকিল শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রথম দর্শনেই মনে হইয়াছিল সন্তদাস শান্তির মূর্ত্তি……সমাগত বহু দর্শকমণ্ডলীর দিকে চক্ষু মেলিয়া রাখিয়াছেন, অথচ মনে হইয়াছে তাঁহার দৃষ্টি যেন কোন দূর দূরান্তে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে—মুখে আলাপ আলোচনা করিতেছেন কিন্তু তাঁহার মনঃপ্রাণ যেন অন্তর দেবতার চরণতলে প্রণত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিলেই প্রাণ জুড়াইত, হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিত।……কি সৌম্য সুন্দর শান্ত মূর্ত্তি।"

এই উভয় লেখকের কেহই আমাদের গুরুভ্রাতা নহেন।

* যাহারা অনুপস্থিত অথবা বিলম্বে আসিত তাহাদিগকে পরে কটুকার দিতেন।

সময় দিতেন। আশ্রম সংক্রান্ত যে সকল বিষয়ে তাঁহার নির্দেশ আবশ্যক, তৎসমুদায়ও তাঁহার নিকট এই সময়ে উপস্থিত হইত, তিনিও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন। বেলা প্রায় এগারটায় স্নান করিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ দিবার পর অন্যান্য সকলকে প্রসাদ পাইতে বসাইয়া স্বয়ং প্রসাদ পাইতে যাইতেন। অনেক দিন আচমনান্তে আবার আসিয়া সকলের খাওয়া দেখিতেন—কে খাইল, কে না খাইল খবর লইতেন, আদর করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন। অনন্তর এই সময়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেন, কোন কোন দিন আহারান্তে বাহিরে আবার কিছুক্ষণ বসিয়া সকলের সঙ্গে সদালাপ করিতেন, তারপর বিশ্রাম করিতেন।

তাঁহার বিশ্রামান্তে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ হইত—গীতা, ভাগবত, পুরাণ, ভক্তমাল, Imitation of Christ প্রভৃতি; নিয়মিতভাবে পড়িয়া এক একখানি গ্রন্থ কিছুদিনে শেষ করা হইত। কখন কখন সকালে এবং সন্ধ্যার পরেও পড়া হইত। এইরূপে এক একখানি গ্রন্থ অনেকবার পড়া হইয়াছে। শেষের দিকে এই সময় তরুণবয়স্ক সাধু-শিষ্যদিগকে তিনি নিজে সংস্কৃত ব্যাকরণ, গীতা প্রভৃতি পড়াইতেন।

বৈকালে মুক্ত বায়ুতে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান কালে পদব্রজেই যাইতেন, বঙ্গদেশে আসিলে শিষ্যেরা মোটরে করিয়া লইয়া যাইতেন। সন্ধ্যা আরতির পূর্ব্বেই তিনি ফিরিয়া আসিতেন ও প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সন্ধ্যা আরতিতে উপস্থিত হইতেন। ইহার পর আবার নিজ আসনে আসিয়া বসিতেন। এই সময়ে নানা সৎপ্রসঙ্গ হইত। রাত্রে প্রসাদ পাইবার পর কিছুক্ষণ পায়চারি করিতেন, তারপর শয়ন করিতেন।

আশ্রম সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারে আমাদিগকে ডাকাইয়া আমাদের

সকলের মত লইতেন, আমরা অকুণ্ঠভাবেই স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিতাম, তিনিও কতক মত লইয়া, কতক বদলাইয়া একটি নির্দ্দেশ দিয়া দিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যখন প্রেসে দিবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হইতেছিল, তখন তাঁহার লিখিত ব্যাখ্যার কোন কোন স্থল আমাদের কাহারো অভিপ্রায় অনুসারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন, ইহাও দেখিয়াছি। এরূপ গুরুতর ব্যাপারেও আমাদের অভিমতকে উপেক্ষা করেন নাই। অসুস্থ অবস্থায় ঔষধ পথ্য বলিয়া আমরা যাহা যখন দিতাম, তাহাই তখন সুবোধ শিশুর ন্যায় গ্রহণ করিতেন এবং আমাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন যেন তিনি আমাদের বালগোপাল, আমরা তাঁহার অভিভাবক।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মত তিনি বহুস্থলে সমালোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন, অথচ তাঁহার নাম উল্লেখ যখনই করিতেন, বিশেষ শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদার সহিত "শঙ্কর ভগবান্" বলিতেন। বাস্তবিক আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়াই তাঁহার স্বভাব ছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। সাধু ও সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে গৃহস্থদের প্রতি, এমন কি গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতিও, অনাদর ও অবজ্ঞার ভাব দেখা যায়। ইহা শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের একেবারেই ছিল না এবং সাধু শিষ্যদিগের মধ্যেও যাহাতে সেই ভাব না আসে, তাহাদিগকে তদ্রূপ উপদেশ করিতেন। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও উপযুক্ত সাধন ভজন করিলে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায়, ইহা তাঁহার অভিমত ছিল। তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সাধনজগতে বিশেষ উন্নত, নবীন সাধুশিষ্যদিগকে তাঁহাদের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, এমন কি সঙ্গ করিয়াও, উপকৃত হইতে তিনি কখন কখন উপদেশ দিয়াছেন! অপর পক্ষে গৃহস্থ শিষ্যদিগকে সর্ব্বদা সাধুদের

উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন। সাধুদিগের পঙ্গতের সময় সেখানে কোন গৃহস্থ শিষ্য উপস্থিত হইলে তজ্জন্য তাহাকে অনেক সময় বিশেষরূপ শাসন করিতে দেখিয়াছি।

সাধারণতঃ নৈষ্কর্ম্য—সর্ব্ববিধ অভিসন্ধিরহিত নির্লিপ্তভাব ও সেই সঙ্গে ভগবৎসেবার্থ সর্ব্ববিধ কর্ম্মের জন্য অনুক্ষণ প্রস্তুত থাকা—তাঁহার এইরূপ ভাবই আমরা সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়াছি। নিজে হইতে কোন কর্ম্মে লিপ্ত হইতেন না; লোকের প্রার্থনায়, শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর সেবার প্রয়োজনে, সাধুদিগের চিরাচরিত নিয়মানুরোধে, অথবা অন্যবিধ কারণে কোন কর্ম্মের প্রেরণা আসিলে উৎসাহসহকারে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা সম্পন্ন করিতেন। এই সময়ে তাঁহার যে উৎসাহ ও অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি প্রকাশিত হইত, তাহা দেখিয়া সকলকেই বিস্মিত হইতে হইত। সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিয়া যুবক আমরা প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের সহিত পারিয়া উঠিতাম না। তাঁহার ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় এই গ্রন্থের একটি উপসংহার যোগ করিয়া দিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অধিক সময় ছিল না, মূল গ্রন্থের তখন মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে। উপসংহার লিখিবার কাজ আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়া যাইতেন, আমাদের জনৈক উচ্চশিক্ষিত গুরুভ্রাতা—ইনি একটি কলেজের অধ্যাপক—তাহা লিখিয়া লইতে লাগিলেন। প্রত্যূষে শৌচ স্নানাদি সারিয়া উভয়ে কাজে বসিতেন, মাঝখানে পূজার আরতির সময়টুকু বাদ দিয়া বেলা এগারটা সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত কাজ করিতেন, আবার প্রসাদ পাইয়া আসিয়া বসিতেন ও অবিচ্ছেদে বৈকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত কাজ চলিত। সপ্তাহাধিককাল এইরূপভাবে কাজ করিয়া গুরুভ্রাতাটি ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, মাথায় যন্ত্রণা সহ বমনোদ্বেগ হইতে লাগিল। লিখিবার কাজ অন্যের লইতে হইল, এই

সময় হইতে লিখিবার কাজ আমরা কয়েকজনে মিলিয়া শেষ পর্যন্ত চালাইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কিন্তু কোনপ্রকার ক্লান্তি আমরা একদিনও লক্ষ্য করিতে পারি নাই। উপসংহার লেখা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপেই কাজ চলিল। কার্য্য সমাপ্ত হইলে আবার সেই আত্মসমাহিত নৈষ্কর্ম্য!

সকল কার্য্যে তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভগবৎসেবা, অপর কোন উদ্দেশ্য থাকিত না, তাঁহার আচরণে ইহা সর্ব্বদাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইত; কখন কখন তাঁহার নিজের কথাতেও প্রকাশিত হইত। গত ১৩৩৬ সালের প্রয়াগ কুম্ভে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একরাত্রে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীর সহসা বিশেষরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িল। স্থির হইয়া শয়ন করিতে পারিতেছেন না—শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন, কখন উঠিয়া বসিতেছেন, কখন বালিশের উপর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া উপুড় হইয়া থাকিতেছেন, এক একবার বলিতেছেন, "হে মহারাজ!" যন্ত্রণা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমাদের সাধু গুরুভ্রাতা বনমালীদাসজী জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "মেরুদণ্ডের নিম্নদিক হইতে একটা বেদনা হৃদয়কে আঘাত করিয়া উর্দ্ধদিকে উঠিতেছে, তাহা এত তীব্র যে মাঝে মাঝে শ্বাসরোধ হইয়া যাইতেছে।" রাত্রি প্রায় চারিটার সময় এই অস্থিরভাব কমিয়া গেল ও অত্যন্ত অবসন্নভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। ভোরবেলায় দেখা গেল নিজে উঠিতে পারিতেছেন না, শরীর একেবারে ফ্যাকাশে—রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে। উঠাইয়া দিলে অতি কষ্টে দেওয়াল ধরিয়া শৌচে গেলেন। শৌচের পর যখন হস্তপদ শুদ্ধি করিতেছিলেন তখন ধীরে ধীরে স্বগতভাবেই বলিলেন, 'কাল ত শরীর ছুটিয়াই গিয়াছিল, ঠাকুরজী আবার রাখিয়া দিলেন!' শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর পূজার আরতির সময় এই শরীর লইয়াই চলিলেন।

শরীর কাঁপিতেছে, পা টলিতেছে, এক একবার পড়িয়া যাইতে যাইতে দেওয়াল ধরিয়া সামলাইয়া লইতেছেন, তথাপি ব্যাকুল আবেগ লইয়া চলিয়াছেন। মন্দিরদ্বারে গিয়া যখন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরজীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত, পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ভাব—"হে প্রভো! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, এই শরীর, প্রাণ, মন সকলই তোমার, যেভাবে রাখিতে চাও তাহাই হউক"—যাহা তাঁহার কথাবার্ত্তা ও আচরণে সর্ব্বদা বুঝা যাইত তাহা আজ যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীকে প্রণাম করিয়া যখন তিনি শ্রীগুরুদেবের মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত, যেন কিছু বলিতেছেন, দরদরিত অশ্রুধারা বুক ভাসাইয়া আসিয়া বসনকে সিক্ত করিয়াছে।

পরদিন প্রয়াগ যাত্রা করিবার কথা। বেলা প্রায় আটটার সময় রামকৃষ্ণমিশনের ডাক্তার আসিলেন ও যন্ত্রাদির দ্বারা তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে আগামী কল্য আপনার যাওয়া হইবে না, কয়েকদিন পরে শরীর সুস্থ হইলে যাইবেন।" কিন্তু বাবাজী মহারাজ একথা শুনিয়া অতিশয় দীনভাবে ও গদগদভাবে বলিলেন,—"বাবা! ঠাকুরজী যখন এবার শরীর রাখিয়াছেন তখন যাইবার যে দিন স্থির করা হইয়াছে, তাঁহার কাজে সেই দিনই যাইতে হইবে।" যে ভাবে তিনি কথাগুলি বলিলেন তাহাতে ডাক্তারবাবুও আর পুনরায় নিষেধ করিতে পারিলেন না। পরদিন যথাসময়ে একপ্রকার চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থাতেই তাঁহাকে লইয়া প্রয়াগ-রাজে কুম্ভের উদ্দেশে আমরা যাত্রা করিলাম।

তিনি যে দীক্ষা দিতেন, তাহারও ভাব ছিল অবিদ্যাগ্রস্ত জীবরূপী

ভগবানের সেবা। যদ্দ্বারা জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখতাপের মূলোচ্ছেদ ও পরমানন্দলাভের উপায় হয়, সেই দীক্ষাদান হইতে আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাত্যহিক সাধারণ ক্রিয়া পর্যান্ত জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপার সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা বোধে কিরূপে কার্য্যতঃ করিতে হয়, তাহার প্রণালী তিনি তাঁহার শিষ্যশিষ্যাগণকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার কর্ম্মসম্বন্ধে আর একটি বিষয় আমরা মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কাজের সময় তাঁহার অসুখ থাকিত না। হাওড়া শিবপুরস্থ বঙ্গীয় নিম্বার্ক আশ্রম যেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পূর্ব্বদিন অনেকবার পাতলা দাস্ত হওয়ায় তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। চিকিৎসাতেও শেষরাত্রি পর্যান্ত বিশেষ কিছু উপশম হইল না। পরদিন শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, আশ্রম প্রতিষ্ঠা, তৎসংক্রান্ত বৈদিক যজ্ঞ প্রভৃতি হইল ও ন্যূনাধিক ছয় হাজার লোক প্রসাদ পাইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই বৃহৎ ব্যাপারের তত্ত্বাবধান—যাহা কিছু করা প্রয়োজন সবই করিলেন, সেদিন আর তাঁহার দেহে কোন অসুখ আমরা দেখিলাম না। পরদিন আবার পূর্ব্ববৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন—যেন পীড়া তাঁহার দেহকে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি ঘণ্টার জন্য ছুটি দিয়া গিয়াছিল, নির্দ্দিষ্টকাল অতিবাহিত হইলে যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিল, আবার সেই অবস্থায় আসিয়া ধরিল। এরূপ ঘটনা আরও অনেকবার ঘটিয়াছে। দেহান্তের কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে মুমূর্ষু অবস্থায় যখন তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে, এমন কি পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়, তখন এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১৩৪২ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় আমাদের গুরুভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ সাহা মহাশয় লিখিয়াছেন—"ইদানীং শরীরের অসুস্থতার জন্য তিনি কথা কহিতে ক্লান্তি বোধ করিতেন।

কিন্তু দেহত্যাগের পাঁচদিন পূর্ব্বে যেদিন বিখ্যাত অদ্বৈতবৈদান্তিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, সেদিন এত নিপুণতাব সহিত দুই ঘণ্টাকাল শ্রীনিম্বার্ক মতের ভেদাভেদ-বাদ সমর্থন করিয়াছিলেন যে সমবেত শিষ্য ও জনমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই সময়টুকুর জন্য সকলে মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি নিরাময় হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়াছেন। এই বিষয় আলোচনার অব্যবহিত পরে তিনি এত অবসন্ন হইয়া পড়েন যে, দুই এক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ উত্থানশক্তিরহিত হইয়াছিলেন।" অসুস্থ অবস্থাতেও তাঁহার গুরুদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেন, ঈশ্বরীয় কথা কহিতে কহিতে উৎসাহভরে উঠিয়া বসিতেন। একবার তাঁহাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তাঁহার কাজের জন্য ঠাকুরজী শক্তির অভাব দেন না, বাবা!"

সময় সময় বালকবৎ আচরণও তাঁহার ছিল। বৃন্দাবনে বৈকালে বেড়াইতে চলিয়াছেন, সান্ধ্যসমীরে ধীরে ধীরে আনন্দে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছি, সহসা এক জায়গায় থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত কত পথ আসিয়াছি?" বলা বাহুল্য, কেহই তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না, দুই তিনটা আন্দাজী কথা দুই তিন জনে বলিলাম, তিনি বলিলেন, "কেউ পার্‌লে না!" হাতের লাঠিটি মাটিতে ঠুকিয়া দিয়া বলিলেন, "এই জায়গায় আশ্রমের দরজা থেকে ঠিক চার ফার্লঙ্ হয়েছে!" "কি করে জান্‌লেন?" "পা গুনিয়া আসিয়াছি যে!"—এমন বালকের মত করিয়া কথাগুলি বলিলেন যে অতি কষ্টে বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে আমাদের হাস্য সংবরণ করিতে হইল। ১৩৪১ সালের কার্ত্তিক মাসে বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন। চিকিৎসার অসুখ কমিয়া গেলে স্থান পরিবর্ত্তনে উপকার হইবে মনে করিয়া তাঁহাকে

লইয়া এটোয়ায় আসা হইল। এখানে আমরা মাসাধিককাল ছিলাম। বৃন্দাবনে অসুখের সময় বাবা জটা দাড়ি ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত শ্রী আর নাই, দেখিতে পূর্ব্বাপেক্ষা যেন ছোট, কৃশ, অনেকটা বালকের মত হইয়াছেন। এখানে আসার কয়েকদিন পর একদিন মধ্যাহ্নে দুইটি সাধু গুরুভ্রাতা বৃন্দাবন হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ইহাদিগকে প্রসাদ দেওয়া হইল। বাবা কাছে বসিয়া আদর করিয়া খাওয়াইতেছেন। গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক, বয়স অনুমান ষোল সতর হইবে. ইহার সহিত তাঁহার যেন সখ্যভাব, সে বলিল "বাবা, আপনি এই কয়দিনেই যে মোটা হয়েছেন, দেখ্‌চি!" সোৎসাহে দুই হাত প্রসারিত করিয়া তিনি বলিলেন, "এখানে কদিন থাক্‌লে তুইও এত মোটা হয়ে যাবি।" তাঁহার ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া আমরা হাসিতে লাগিলাম। আর একদিন এই ছেলেটিকে বলিলেন, "তুই উটের নাচ দেখ্‌তে পাল্লি না, সেদিন হয়েছিল। এখানকার লোকে বেশ দেখায়। দেখেছিস্ কখনও উটের নাচ?" সে বলিল, "না বাবা, উটের নাচ কোনদিন দেখিনি।" "এই ছ্যাখ্, এই রকম করিয়া নাচে!" বলিয়া মাথার উপর এক হাত তুলিয়া অনুকরণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া আনন্দে আমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলাম।

শ্রীমান্ মনোহরদাস নামে আমাদের একটি ব্রজবাসী গুরুভ্রাতা আছেন। ব্রজে ইহার জন্ম, শৈশবেই ঘটনাক্রমে আমাদের আশ্রমে আসেন; কিছুকাল আশ্রমে বাস করিবার পর শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের প্রতি ইহার সাতিশয় শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ জন্মে, তিনিও কৃপা পূর্ব্বক ইহাকে সাধুচেলা করিয়া লন। তদবধি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বিশেষ নিষ্ঠা ও প্রীতির সহিত তাঁহার সেবাকার্য্য করিয়াছেন। ইহার

সহিতও তাঁহার যেন সখ্যভাব, ইহার সহিত ব্যবহার কালে তিনিও বালকবৎ হইয়া সমবয়স্কের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। ইহার প্রতি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতেন, আমাদের সকলের নিকট ইহার নানা সদ্‌গুণের সুখ্যাতি করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার অতি-মাত্র বাৎসল্য আমাদের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। একদিন এই প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট উত্থাপিত হইয়াছিল। ধীরভাবে সকল কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "দেখ বাবা, কাহার কিসে কল্যাণ হয় তাহা তোমরা বুঝ না। ছেলেটি পিতামাতার আদরের সন্তান ছিল, অতি বালক অবস্থায় গৃহ ছাড়িয়া আমার নিকট আসিয়াছিল। একটু আদর না পাইলে এ বয়সে আশ্রমের কঠোর জীবন-যাত্রায় টিকিয়া থাকিতে পারিত না। এই জন্যই তাহার প্রতি তখন ওরূপ ব্যবহার করিয়াছি। যোগী কাবো বশ নয়, বাবা!"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে তিনি এই গ্রন্থের একটি উপসংহার লিখাইয়া দিয়াছিলেন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কিছুদিন পর্য্যন্ত কি বিপুল পরি-শ্রম তিনি এজন্য করিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এই সময়ে একদিন সকালে কার্য্য চলিতেছে, তিনি বলিয়া দিতেছেন, আমরা লিখিয়া লইতেছি, এমন সময়ে একটি অভিযোগ উপস্থিত হইল। আশ্রম হইতে অনতিদূরে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর একটি বাগিচা আছে, সেখানে ফুল, তুলসী এবং কিছু কিছু শাকসব্জীও উৎপন্ন হয়। ভজনলাল নামে ব্রজ-বাসী চাকর বহুবর্ষ পর্য্যন্ত এই বাগিচার কার্য্যে ও আশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সে বাগিচা হইতে কিছু গোয়ার * চুরি করিয়াছে বলিয়া কয়েক

* "গোয়ার" নামে ব্রজে একপ্রকার ফসল হয়; ইহার গাছ কাটিয়া গরুকে খাইতে দেওয়া হয়।

জনে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। বাবাজী মহারাজ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "বোলাও উস্কো।" ভজনলাল আসিয়া অপরাধ অস্বীকার করিল। তখন তিনি তাহাকে জেরা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জেরার ফলে সে নিজের প্রথম কথা ঠিক রাখিতে পারিল না—তাহার অপরাধ প্রমাণিত হইল। তখন "চোরি ভৌ কিয়া, ফির্ হমারে সাম্নে ঝুটভী কহনে লাগ গয়া" বলিতে বলিতে তিনি যেন অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে আসন হইতে উঠিয়া তাহার নিকট গেলেন ও এক থাপ্পড় লাগাইলেন এবং "ফের এসা কাম করোগে ত হিঁয়াসে নিকাল দেঙ্গে" বলিতে বলিতে নিজ আসনে ফিরিয়া আসিলেন। বসিবামাত্র তাঁহার ক্রোধের কোন চিহ্ন আর আমরা দেখিলাম না। "আহা, তোমরা বসিয়া আছ! আচ্ছা! বাবা, লেখ" বলিয়া অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যের যে পর্য্যন্ত বলিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক তাহার পর হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, স্মরণ করাইয়া দিতে হইল না যে কোন্ পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন। সেই সৌম্য জ্ঞানপ্রভাদীপ্ত মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ ফুটিয়া উঠিল!

আর একদিন মধ্যাহ্নে আমাদিগকে গীতা পড়াইতেছেন, এমন সময় এগরারা হইতে লোক আসিল। তাহারা অবিলম্বে ফিরিয়া যাইবে, সুতরাং তাহাদের সহিত তখনই কথা কহিতে হইল। দেখিলাম দেনা পাওনার হিসাব লইয়া সমানভাবে তাহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতেছেন। অবশেষে ব্যাপারের সমাধান হইলে তাহারা প্রণাম করিয়া বিদায় হইবামাত্র আমাদের দিকে ফিরিলেন। "বাবা! তোমরা অনেকক্ষণ বসে আছ" বলিয়া যথাস্থানে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ গদ্‌গদচিত্ত হইলেন। সে কি তন্ময়ভাব! বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সম্পূর্ণ ভাবটি যেন তাঁহাতে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিল, যেমন ভগবৎ-প্রসঙ্গে তাঁহার সর্ব্বদা হইত। তাঁহার এই ভাবান্তর ঘটিতে এক মুহূর্ত্তও লাগিল না!

বস্তুতঃ এবম্বিধ মহাপুরুষের সম্বন্ধে সাধারণ বিচারবুদ্ধি ব্যর্থ ও নিষ্ফল। দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গলাভ ও তাঁহার আচরণপরম্পরা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এই ধারণাই আমাদের ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়াছে যে, তাঁহার বাহ্যরূপের অন্তরালে অবস্থিত পূর্ণ স্ব-রূপ আমাদের বোধাতীত। পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে যখন যে গুণের, যে শক্তির ক্রিয়া হইবার কথা, তাহাই প্রকাশিত হয়। সেই জন্যই এই সকলের কোন একটিকে বা কতকগুলির সমষ্টিকে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া বলা অসম্ভব। শেষ কথা এই যে আমরা তাঁহার কথা বলিতে গিয়া নিজেদের অক্ষমতার কথা যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি, তেমন অনুভব করিতেছি যে—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তথাপি তব গুণানামীশ! পারং ন যাতি * ॥

বাস্তবিক যিনি অনন্তের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার অন্ত পাইবে কে?

---

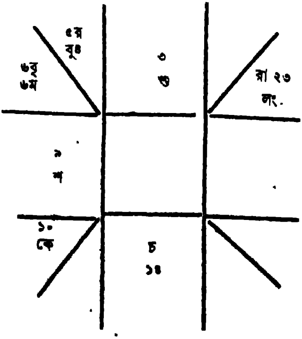
* বঙ্গানুবাদ:—যদি কালির পর্ব্বত সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া যায় (অর্থাৎ সাগর-ভরা কালি হয়), আর (তাহা হইতে কালি লইয়া) পারিজাতের শাখার লেখনী দিয়া সমগ্র পৃথিবীতলরূপ কাগজে স্বয়ং সরস্বতী দেবী চিরকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তথাপি তোমার গুণসমূহ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবেন না।

সপ্তম অধ্যায়

অন্তর্দ্ধান

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কোষ্ঠী ছিল, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার জন্মকুণ্ডলীটি নিম্নে প্রদত্ত হইল *। কাশীধামে যাহাদের নিকট ভৃগুসংহিতার মূল গ্রন্থ আছে, তাহাদের দ্বারাও নিজের কোষ্ঠীবিচার তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে, সংসার ত্যাগের বহু পূর্ব্বে করাইয়াছিলেন এবং ইহারা যে সকল ভবিষ্যদুক্তি করিয়াছিলেন তাহার দুইটির মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, "সহস্রাধিক শিষ্য সহ বৈকুণ্ঠে বাস।" দ্বিতীয়টি ছিল আয়ু সম্বন্ধে; ভৃগুসংহিতার

শকাব্দা ১৭৮১।১।২৭।৪৮।৫৭।২৪ তুলারাশি, চিত্রা নক্ষত্র।



ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, পরমায়ু ৬৯ বৎসর কয়েকমাস, তবে এ কথাও ছিল যে ইহা সাধন ফলে বর্দ্ধিত হইতে পারে।

১৩৩৬ সালের প্রয়াগ কুম্ভমেলায় যাত্রার প্রাক্কালে এক রাত্রে যেরূপে সহসা অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার ভৃগুসংহিতোক্ত আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া কিছু অধিক হইয়াছিল। যে প্রণালীতে সাধারণতঃ দেহত্যাগ হয়, তদ্রূপ অবস্থাই সে রাত্রে তাঁহার শরীরের হইয়াছিল। বাস্তবিক দেহত্যাগ যে হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরজী বিশেষ লীলা প্রকাশ করিয়া যে তাঁহাকে আবার রাখিয়া দিলেন, একথা পরে তিনি কোন কোন শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সংসারে লোককল্যাণের নিমিত্ত আরও কাজ তাঁহার বাকী ছিল, 'জগদ্ধিতায়' আরও অনেক কাজ তাঁহার দেহ অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবান্ করিবেন বলিয়া তাঁহার দেহ রহিয়া গেল। ইহার পরে তাঁহার শরীর যতদিন ছিল, এক প্রকার অসুস্থ অবস্থাতেই ছিল, পূর্ণ স্বাস্থ্য আর লাভ করেন নাই। তাঁহার পুরাতন আমাশয় রোগ মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। এই কিঞ্চিদূন ছয় বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চারি পাঁচ বার কঠিন রোগ ভোগ করিয়াছিলেন। ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসে অত্যন্ত গরমের সময় পাটনা হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে গাড়ীতে "লু" লাগিয়া গুরুতর পীড়িত হইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। ইহার ফলে অনেকদিন শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। পর বৎসর শ্রাবণ মাসে শিবপুরে অবস্থান কালে পুনরায় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। এইরূপে প্রাচীন ও জীর্ণ শরীর লইয়াই হৃষ্ট, সুন্দর, সম্পূর্ণভাবে "তাঁহার কাজ করিয়া" কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

১৩৪১ সালের হেমন্তকালে বৃন্দাবনআশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবাজী

মহারাজের যে কঠিন পীড়া হইয়াছিল তাহার পর তাঁহার শরীর আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। এটোয়ায় মাসাধিক কাল অবস্থানের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইল বটে, কিন্তু পৌষ মাসের শেষ ভাগে পুনরায় শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজের উৎসবের জন্য বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে হইল। বৃন্দাবনে আসিয়াই তাঁহার শরীর আবার খারাপ হইল, এবং জ্বর দেখা দিল। উৎসবের পর বাবাজী মহারাজের ইচ্ছানুসারেই প্রথমতঃ এগ্‌রাবায় যাওয়া হইল। গ্রামটি চতুঃপার্শ্বস্থ সমতলভূমি হইতে উচ্চ, সুতরাং স্বাস্থ্যকর। এখানে একমাস বাস করিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। গুরুভ্রাতৃগণ এই সংবাদ পাইয়া অন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্য বিশেষরূপ অনুনয়পত্র দিতে লাগিলেন। পাটনা বি. এন্. কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুধীর গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাটনার জলবায়ু এই সময় ভাল বলিয়া তথায় যাইবার জন্য বিশেষরূপে প্রার্থনা করিয়া পত্র দিলেন এবং রেলভাড়ার টাকাও পাঠাইলেন। তদনুসারে ফাল্গুন মাসের শেষভাগে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ এগ্‌রারা হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং কয়েকদিন পরেই পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনায় আসিয়া প্রথম কিছু দিন তাঁহার শরীর একটু ভাল হইল, কিন্তু তারপর আর উন্নতি হইল না। এখান হইতে ক্রমে গয়া, হাজারিবাগ, গিরিডি ও জামতাড়া হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি শিবপুর আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। কোনখানেই তাঁহার বিশেষ স্বাস্থ্যোন্নতি হইল না, সর্ব্বত্রই প্রথম কিছুদিন ভাল থাকিতেন, একটু উন্নতির মত বোধ হইত, তারপর আর কোন পরিবর্ত্তন হইত না। তিনি বলিতেন, "কোন নূতন স্থানে গেলে জলবায়ুর প্রভাবে আমার শরীরের যে উন্নতি হইবার তাহা প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই হইয়া যায়, তারপর আর কোন কাজ হয় না।"

একজন গুরুভ্রাতা শিলং হইতে লিখিলেন, এই সময় (বর্ষারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) সেখানকার জলবায়ু খুব ভাল। তদনুসারে শিবপুরে কয়েকদিন মাত্র থাকিয়া শিলং যাত্রা করা হইল, পথে গৌহাটীতে কয়েক-দিন বিশ্রাম করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে তথায় পৌছিলেন। এখানেও প্রায় তিন সপ্তাহ থাকা হয়, কিন্তু শরীরের বিশেষ কিছু উন্নতি হইল না। তথাপি বিভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতৃবর্গের একান্ত আগ্রহে আবার নানাস্থানে যাইতে হইল। শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আগরতলা, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আষাঢ়ের শেষে যখন শিবপুরে ফিরিলেন তখন তাঁহার শরীর আবার অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে এই ভ্রমণের একটি শুভফল এই হইল যে, বহু নরনারী তাঁহার চরণে আশ্রয়লাভ করিলেন। আর পুরাতন শিষ্যগণও শেষবারের জন্য তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন।

এই সময়ে আমরা কেহই মনে করি নাই যে, তাঁহার লীলাসম্বরণের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। প্রয়াগকুম্ভের সময়ে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার দেহ-পতনের বিলম্ব আছে, তাহাতেই এই কয়বৎসর সকলে নিশ্চিন্ত ছিলাম। সম্প্রতি চিন্তার কারণ ঘটিল। প্রায় বৎসরাবধি তাঁহার শরীব খারাপ চলিয়াছে, চিকিৎসায় কিম্বা বায়ু পরিবর্ত্তনে স্থায়ী ভাবে সারে না, অল্প অনিয়মেই আমাশয় কখনও বা জর পর্য্যন্ত হয়; ইহাতে চিকিৎসকগণ চিন্তিত হইলেন। তথাপি কেহই মনে করিতে পারেন নাই যে তিনি শীঘ্র দেহ রাখিবেন।

শিবপুরে পৌছিবার পর হইতেই অল্প অল্প জর হইতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাশয়, যকৃত বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ সম্বলিত হইয়া রোগ কঠিন আকার ধারণ করিল। চিকিৎসায় রোগের কিছু উপশম হইলে আবার স্থান পরিবর্ত্তনের কথা উঠিল। এই সময়ে

পুরীধামে, অথবা ভুবনেশ্বরে আমাদের একটি আশ্রম হইবার প্রস্তাব চলিতেছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তোমরা আমাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র নিয়া যাইতে চাহিতেছ, ভুবনেশ্বরের জল-বায়ু ত ভাল, সেখানেই চল না কেন?" তদনুসারে ১৩৪২ সালের ২৫শে ভাদ্র তাঁহাকে ভুবনেশ্বরে লইয়া যাওয়া হইল। এখানে আসিয়া শরীরের উন্নতি কিছুই দেখা গেল না। এইরূপ শরীর লইয়াই প্রত্যহ রিক্সায় করিয়া বাহির হইয়া আশ্রমের জন্য জায়গার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সপ্তাহাধিক কাল প্রত্যহ এইরূপে ঘুরিয়া একটি জায়গা পছন্দ করিলেন এবং জমির মালিকের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা বিজয়বাবু ও বিনোদবাবুকে টাকা লইয়া আসিবার জন্য শিবপুরে পত্র লিখিলেন। যথাসময়ে জমি ক্রয় করা হইয়া গেল, উক্ত গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের ইচ্ছানুসারে আমাদের বৃন্দাবনের ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাবিহারী-জীর নামেই দলিল সম্পাদিত হইল। বাবাজী মহারাজ নিজেই মন্দির ও আশ্রম-বাটীর নক্সা প্রস্তুত করাইয়া ভিত্তিস্থাপনের দিন স্থির করিয়া দিলেন।

এখানে থাকা কালে তাঁহার শারীরিক অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতে লাগিল। ক্রমে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে কথা কহিতে কষ্ট হইত। ভুবনেশ্বরে সুচিকিৎসকের অভাব। এরূপ অবস্থায় আর তাঁহাকে সেখানে রাখা যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। ১৮ই আশ্বিন প্রাতে একরূপ চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থাতেই তাঁহাকে লইয়া যখন শিবপুরে আসা হইল তখন তাঁহার শরীর একেবারে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখানে আসিয়াই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। ভুবনেশ্বরে থাকিতেই বৃন্দাবনে শীঘ্র ফিরিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া সেইভাব আরও বর্দ্ধিত হইল। অনেকবারই





সেই কথা বলিতেন। কিন্তু অনবরত নানাস্থান হইতে লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন এবং শরীরের ঐ অবস্থায় তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন, ইহা অনেকের ইচ্ছা নহে, চিকিৎসকগণেরও অমত, সুতরাং বৃন্দাবন ফিরিয়া যাইতে পারেন না—এই অবস্থায় দিন কাটিতে লাগিল। কয়েকবার যাত্রার দিন স্থির করিয়া সকলের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহা পরিবর্ত্তন করিলেন। ২৫শে আশ্বিন তারিখে বৃন্দাবনে নিম্নলিখিতরূপ পত্র দিলেন :—

প্রিয় বংশীদাস! তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমার শরীরের অবস্থা এই যে আহারে কোন প্রকার রুচি নাই। শরীর কোন আহার গ্রহণ করিতে চায় না; আহার করিলেই গা বমি বমি করে, বাহির হইয়া যাইতে চায়। শরীর এত দুর্ব্বল যে অনেক সময় ২।৪টি কথাও কহিতে পারি না। ইজি চেয়ারে বসাইয়া তিন চারজনে বহিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়। ২রা কার্ত্তিক এখান হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখানকার বন্ধুবর্গ এবং ডাক্তার মত করিতেছেন না। যাইতে সমর্থ হইব না বলিতেছেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া ১৩ই কার্ত্তিক যাইব বলিয়া আপাততঃ স্থির করিয়াছি *।

ক্রমশঃ এত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, এক এক সময় মূর্চ্ছার মত হইত। তথাপি শরীরের এই অবস্থাতেও তাঁহার কর্ম্মধারা রুদ্ধ হয় নাই। কিঞ্চিদধিক এক বৎসরকাল পূর্ব্বে তিনি একটি লোককল্যাণকর মহৎ প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন—তাহা সাধকসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে মতভেদ জনিত কলহের অবসানপূর্ব্বক একতা স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে "ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি

* এই দিনও পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল।

ভাষ্যকারগণ" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র সমূহের যে নানা বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে কতখানি ঐক্য এবং কোন্ কোন্ স্থানে বিরোধ তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন *। এই সকল বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে, তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। শরীরের বর্ত্তমান অবস্থাতেও এজন্য চেষ্টা করিতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই। আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে বৃন্দাবন আশ্রমস্থ আমাদের এক গুরুভ্রাতাকে পত্রে

* এই গ্রন্থের চারিটি অধ্যায়। প্রথমাধ্যায়ে জীব-জগৎ, এতৎসম্বন্ধীয় মূল ব্রহ্মসূত্র সমূহ ও তৎসমুদায়ের নিম্বার্ক ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া ও ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যের প্রচারিত সিদ্ধান্ত কি, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়াধ্যায়ে এই সকল বিষয়ে নিম্বার্ক মতের সহিত আচার্য্য শঙ্কর স্বামী, আচার্য্য রামানুজ স্বামী, আচার্য্য বিষ্ণু স্বামী ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতের যতদূর ঐক্য আছে তাহা তত্তৎকৃত বেদান্তভাষ্যের অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে এই সকল মতের মধ্যে যে যে স্থলে বিশেষ বিরোধ আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায়, বিরোধ অপেক্ষা মূলগত ঐক্যই বেশী। চতুর্থ অধ্যায়ে সামঞ্জস্যের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং স্বয়ং একটি সুনিশ্চিত পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কি উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাও এই অধ্যায়ের শেষভাগে বর্ণনা করিয়াছেন—"বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনা বিভিন্ন প্রকারের হইলেও সমস্ত উপাসনা একেরই উপাসনা, মূলে ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। অতএব সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলে, সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া যে বিবাদ মিটিতে পারে না, এমন নহে। উদারচেতা রাজনৈতিকগণ ভারতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেমন একতাস্থাপন করিতে যত্ন করিতেছেন, এবং তাঁহাদের যত্ন সফল হওয়া যে একান্ত অসম্ভব তাহাও অনেক কৃতবিদ্য লোক মনে করিতেছেন না, তদ্রূপ ধর্ম্মমত সকলের বিরোধ মিটাইয়া তন্মধ্যে একতা স্থাপনের জন্যও যত্ন করা আবশ্যক; করিলে শ্রীভগবৎ-কৃপায় তাহাও সংসাধিত হইতে পারে এবং এইরূপ একতা স্থাপিত হইলে যে মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি আছে?"

লিখিলেন, "..... এবার প্রয়াগে যে কুম্ভমেলা হইবে, শুনিতেছি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রভৃতি হইতে আমার লিখিত "ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত" পুস্তকের বিশেষ সমালোচনা হইবে। তাঁহারা কেহ কেহ এ গ্রন্থের পক্ষপাতী হইয়াছেন। যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের মিল হইতে পারে, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইবে; অতএব শ্রীমান্ ধনঞ্জয়দাসকে বলিবে, সে যেন আদ্যোপান্ত সেই বইখানা খুব ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখে, এবং সাধারণতঃ বেদান্তদর্শনটি ভাল করিয়া আয়ত্ত করা আবশ্যক। কোন বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইলে যাহাতে অপ্রস্তত না থাকে। মেলায় আমার যাইবার সামর্থ্য হইবে এইরূপ দেখিতেছি না, অতএব তাহার বিশেষরূপ প্রস্তুত হওয়া চাই........।" ৬ই কার্ত্তিক তারিখে, তাঁহার দেহান্তের মাত্র এক পক্ষকাল পূর্ব্বে শ্রীশ্রীস্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহাশয় তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। ইঁহাকে এই পুস্তক একখণ্ড অর্পণ করিয়া বলিলেন, "কুম্ভের মেলায় যাইতে পারি কিনা সন্দেহ। তোমাকে ছোট ভ্রাতার ন্যায় দেখিয়া আসিয়াছি, তুমিই এই বিষয়ে ধ্যান দিবে।" সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কলহের অবসানের জন্য কি প্রণালীতে কাজ করা হইবে, তদ্বিষয়েও ইঁহার সহিত অনেক আলাপ হইল। আরও কয়েক দিন পরে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় খ্যাতনামা বৈদান্তিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার যে দার্শনিক বিচার হইয়াছিল তাহার বিবরণ পূর্ব্বাধ্যায়েই প্রসঙ্গক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে; এই বিচার হইবার কারণও উক্ত গ্রন্থ। ইহার একখণ্ড সমালোচনার জন্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবুকে দেওয়া হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষেই ইনি শিবপুর আশ্রমে আসিয়াছিলেন। এইদিন তেজের সহিত দুই ঘণ্টার উপর ইঁহার সঙ্গে বিচার করিবার পর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তৎসত্ত্বেও সেই দিনই বৈকালে আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রাহা মহাশয়কে

ডাকিয়া ব্রহ্মস্বরূপ, জীবতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব বিষয়ে প্রায় দশ বারো পৃষ্ঠা লিখাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "এ সম্বন্ধে ইহাই আমার শেষ বক্তব্য"।

অপরদিকে শরীরের এরূপ অবস্থায়ও গুরুরূপে আমাদের সম্বন্ধে তাঁহার যাহা করিবার—শাসন, উপদেশ, প্রবোধ—সময়মত তাহাও করিতেন। তাঁহার তৎকালীন উপদেশ স্মরণ করিয়া এখন বুঝিতে পারি যে লীলাসংবরণের দিন নিকট আসিবার আভাস তাহাতে থাকিত। তখন আমরা বুঝি নাই।

আশ্রমের বাগান কোপাইতে আমাদের অনেককে নিযুক্ত করিয়া তিনি নিজের আসন হইতে জানালা দিয়া তৃপ্ত ও প্রসন্নভাবে চাহিয়া দেখিতেন। একদিন বলিলেন, "তোমরা সকলে নিজ নিজ বাক্ত করিয়া সুসংবদ্ধভাবে একযোগে তাঁর দিকে চলিতেছ, ইহা আমি দেখিয়া যাইতে চাই।"

একদিন বালকের ন্যায় আবদার করিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে একখানি 'ব্রহ্মসঙ্গীত' কিনিয়া দাও"। বইখানি আনাইয়া দেওয়া হইল। মাঝে মাঝে তাহা দেখিতেন ও নিজে কখন কখন দুই একটি গান গাহিতেন। মহাযাত্রার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে বড় মধুরস্বরে নিম্নলিখিত গানটি প্রায়ই নিজে নিজে গাহিতেন,

"তোরা কে যাবিরে আয়রে ভাই
সবে মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেম মুখ, এস দেখে প্রাণ জুড়াই।
পাপের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়ে সবায়
কতকাল আর থাক্‌বো বল ভুলিয়ে হেথায়
এস প্রেম ভরে কেঁদে কেঁদে সবে তাঁর পায় লুটাই।

পাপতাপ সমুদায় কিছু নাহিক তথায়
নিত্যপ্রেম নিত্যশান্তি বিরাজে সেথায় ॥
ঐ শোন প্রেমময় ডাকিতেছেন
এস আনন্দেতে ধাই সবাই।
এস প্রেমানন্দে নেচে যাই
(তোরা আয়) ॥

একদিন আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা, "বাবা কেমন আছেন?" জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "এ শরীরে আর কিছু নাই, এত দুর্ব্বল যে তোমাদের সঙ্গে অনেক সময় কথা বলিতেও পারি না, কিন্তু বড় সুখে আছি। কোন কষ্ট নাই, বাবা।" একান্ত দুর্ব্বলতা আর আহারে অপ্রবৃত্তি, আহার করিলেও শরীর তাহা গ্রহণ করে না, ভুক্তদ্রব্য যে কোনরূপে হউক বাহির হইয়া যায়, ইহাই অবস্থা। আর কিছু রোগ আছে বলিয়া বোধ হইত না, শরীরের এই অবস্থাতেও একান্ত প্রসন্নভাব। তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন কিছু শিথিল হইয়াছে, পরিস্ফুট আনন্দময়তা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

স্বধামে ফিরিবার জন্য আগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ব্যাকুলতায় পরিণত হইয়াছে। অথচ শরীর এত দুর্ব্বল যে, যে কোন মুহূর্ত্তে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এ অবস্থায় এত দীর্ঘপথ রেলভ্রমণ—আমরা ত কল্পনাই করিতে পারি না; ইতিমধ্যে কয়েকবারই যাত্রার দিন স্থির করিয়াছেন, বৃন্দাবনে চিঠি পর্য্যন্ত দিয়াছেন, আর সকলে মিলিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া যাত্রা স্থগিত করাইয়াছি। অবশেষে বালকের ন্যায় জিদ্ ও অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন—একদিন আমাদের মনোভাব বুঝিয়া স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, "যদি পথেই দেহ

ছাড়িয়া যায়, তাহাতেই বা আপত্তি কি ? ভগবান্ ত সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে বিরাজিত আছেন !”

এই সময়ে—খুব সম্ভবতঃ ২০শে কার্ত্তিক তারিখে, শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন, “ব্রজলালবাবু, আমি যেদিন সংসার ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করি, সেইদিন যেমন তোমরা আমার সহায় হইয়া প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিয়াছিলে, এখনও সেইরূপ সহায় হইয়া আমাকে শ্রীবৃন্দাবনের গাড়ীতে তুলিয়া দাও, আমার শরীর আর থাকিবে না। শ্রীগুরুদেবের আশ্রমের প্রতি বড় আকর্ষণ বোধ করিতেছি, শরীরটা যাহাতে সেই আশ্রমে গিয়া পৌছে তাহার ব্যবস্থা করিয়া, এখনও সেইরূপ প্রকৃত বন্ধুর কাজ কর।” ইহাতে ব্রজবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তিনিও শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের বৃন্দাবনযাত্রার বন্দোবস্ত করার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

আমরা সকলেই বুঝিলাম, আর তাঁহাকে রাখা যাইবে না, এবং ভারাক্রান্তহৃদয়ে সকলে মিলিয়া তাঁহার যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গাড়ী রিজার্ভ করা হইল, হাথ্‌রাস জংশনে নামিয়া একখানি উৎকৃষ্ট প্রথমশ্রেণীর মোটরযোগে বৃন্দাবন যাওয়াই সকলে যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এই সকল ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাদের সাধু গুরুভ্রাতা দিবোদাসজী আগেই বৃন্দাবন রওনা হইয়া গেলেন। বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম করিয়াও সকল বিষয় জানান হইল। আমাদের গুরুভ্রাতা শিবপুরের খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন বসু মহাশয় বৃন্দাবন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল।

২২শে কার্ত্তিক বৈকালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে লইয়া আমরা বৃন্দাবনে ফিরিয়া চলিলাম। বিদায়কালে আশ্রমে ও হাওড়া ষ্টেশনে দর্শনার্থী নরনারীর ভিড় হইয়াছিল—কতলোক যে ব্যাকুল হইয়া শেষ

দেখা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাহার ঠিক নাই। যিনিই তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহাকেই প্রসন্নভাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেও অনেকে চলিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠে যশোদানন্দনদাস নামক পাঞ্জাবী সাধুশিষ্য, কানাইয়াদাস নামক বাঙ্গালী সাধুশিষ্য ও ডাক্তার শিষ্য অমূল্যবাবু রহিলেন, অনতিদূরে তৃতীয়শ্রেণীর কামরায় আরও ৭।৮ জন শিষ্যশিষ্যা রহিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার সময় প্রসন্নভাবে সকলের দিকে চাহিয়া শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তোমরা কোন চিন্তা করিও না।" শতশত অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্যে যথাকালে তুফানমেল ছাড়িয়া দিল।

শ্রীযুক্ত কানাইয়াদাস বলিয়াছেন :—

"হু-হু শব্দে গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। বাবার সঙ্গে ট্রেণে চলা নূতন নয়, কিন্তু সে আর-এ কত যে তফাৎ তা বলা যায় না। মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ছুটিয়া গাড়ী কোন দিনই পারে না, কিন্তু এবার তা নয়। মন এই কামরার মধ্যে ঐ একটি জায়গায় স্থির হইয়া আছে। একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছি, মন যেরূপ ভীতোদ্বিগ্ন হইবার কথা, তাহা কিন্তু নয়। ভয়ের সঙ্গে অভয়, উদ্বেগের তলায় শান্তি যেন মিশ্রিত হইয়া আছে।

"গাড়ী তখনও বর্দ্ধমান পৌঁছে নাই, সূর্য্যদেব অস্তমিতপ্রায়। বাবা একবার শৌচে যাইতে চাহিলেন। আসনে থাকিয়া সঙ্গে আনীত বেড-প্যানে কিছুতেই যাইবেন না; চেয়ারে বসাইয়া তাঁহাকে পায়খানায় নিয়া যাইতে হইল। বসিয়া থাকিবার সামর্থ্য নাই, ধরিয়া রাখিতে হইল। পায়খানায় বসিয়াই বলিলেন, 'যশোদানন্দনদাসকে বলিয়া এস, ঠাকুরজীর উত্থাপন করুক্।' তাহাই করিলাম। তাঁহার ইচ্ছানুসারে যশোদানন্দনদাসজী গাড়ীর একটি স্থান গঙ্গাজল দ্বারা পরিষ্কার করিয়া সজীব শ্রীশ্রীশালগ্রামদেব ও শ্রীশ্রীদাদাগুরুজী মহারাজের মূর্ত্তি

(ক্ষুদ্রাকৃতি ফটো) সেখানে স্থাপন পূর্ব্বক আরতির আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে শৌচ সারিয়া বাবাজী মহারাজ গঙ্গাজল চাহিলে তাঁহার হাতে গঙ্গাজল দেওয়া হইল, তিনি তাহা প্রথমে মস্তকে ও মুখে, তারপর সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন। অমূল্যবাবু ও যশোদানন্দনদাসজীকে ডাকিয়া আনিলাম, তিনজনে ধরিয়া চেয়ারে উঠাইয়া লইবার সময় একবার ফিটের মত হইল। চেয়ারে বসাইবামাত্র নেত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। মনে হইল, এখনই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, অমূল্যদা তাড়াতাড়ি একটা ইন্‌জেক্‌সন করিলেন, যশোদানন্দনদাসজী বলিলেন, 'বাবাজী গয়ে।' কিন্তু তিনি তখনই সুস্থির হইয়া বলিলেন, 'বাবা, আমার শ্বাস চড়িয়া গিয়াছিল, সেইজন্য এরকম হইয়াছিল। যা হোক্ তোমরা কোন চিন্তা করিও না, তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই ; এখন আমাকে আসনে নিয়া চল'।

"বাবাকে আসনে আনিয়া শোয়াইয়া দিয়াছি, গায়ে চাদর ও বালাপোষ দিয়া দিয়াছি।...কখন বর্দ্ধমানে গাড়ী থামিয়াছে, তাহা টের পাই নাই। একটু পরে বাবা আবার শৌচে যাইতে চাহিলেন। এবারে আমরা দৃঢ় থাকিয়া কিছুতেই পায়খানায় যাইতে দিলাম না, বেড-প্যান দিলাম ; অগত্যা আমাকে বলিলেন, 'আমাকে একবার উঠাইয়া বসা।' ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাইলাম, তিনি বলিলেন, 'বসান হইবে না।' তখন একটু দৃঢ়ভাবেই বলিলাম, 'আপনাকে উঠান হইবে না।' বাবা একেবারে শিশুর মত আব্‌দার করিয়া বলিলেন, 'তুই আমাকে একটু উঠাইয়া বসা না রে!' এবারে ডাক্তারবাবুও আর পারিলেন না ; দু'জনে ধরিয়া বসাইয়া দিলাম, পিঠের দিকে দু'টি বালিশ বুক দিয়া ঠেকাইয়া রাখিলাম। একটু পরে বলিলেন, 'হইয়াছে।' তখন ধুইয়া

মুছিয়া গঙ্গাজল দিয়া আবার তাঁহাকে শোয়াইয়া দিলাম, গায়ে চাদর ও বালাপোষ দিয়া দিলাম। তিনিও ঠাণ্ডা হইয়া শুইলেন।

"কখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে জানি না। একবার জল খাইতে চাহিলেন। গঙ্গাজল আনা হইল, কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে বলিয়া এখন আর খাইলেন না। একটা জিনিস দেখিতেছি, গাড়ীতে উঠিবার পর হইতে বাবা প্রায়ই জোড়হাত করিয়া আছেন ··শ্রীশ্রীঠাকুর-জীর আরতি হইল, স্তুতিপাঠ হইল, বাবা জোড়হাত করিয়া আছেন। যশোদানন্দনদাসজী আরতির দীপ নিয়া আসিলে বাবা খুব ভালভাবে আরতির তাপ লইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শঙ্খের জল ছিটাইয়া দেওয়া হইল। বলিলেন 'এখন জল দে'। গঙ্গাজল আনিয়া দিলে খাইলেন। ইঙ্গিতে দেখাইয়া আমাকে বলিলেন 'এমন করিয়া টিপিয়া দে যেন হাড়ে লাগে।'······সহসা যশোদানন্দনদাসজীকে বলিলেন, 'কুচ্ চিন্তা মাৎ করো' *।

"পা টিপিতেছি···তীব্রবেগে গাড়ী চলিয়াছে আসানসোলের দিকে। বাবাকে দেখিতেছি তিনি করে জপ করিতেছেন, সহসা দেখি হাত স্থির, গাল একটু ঝুলিয়া পড়িয়াছে, নেত্রতারকা উর্দ্ধে উঠিয়া ভ্রূমধ্যের দিকে স্থির।······

"···তখন সন্ধ্যা সাতটা দশ মিনিট।···

"নীরব, নিথর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন স্তব্ধ, রুদ্ধশ্বাস, একান্ত স্থির। . মনের যে কি অবস্থা নিজেই বুঝি না, বলিব কি? বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে···। আসানসোল·· ধানবাদ···গোমো···হাজারিবাগ···গয়া ···মোগলসরাই···এলাহাবাদ···। প্রত্যেক ষ্টেশনেই অনেকে আসিয়া-

* ইনি এই সময় উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছিলেন, 'বাবা যদি এখন দেহ ছাড়েন ত কি বিপদই হইবে? ট্রেণ হইতে হয়ত নামাইয়া দিবে, ইত্যাদি'। ইহার নিকট আশ্রমের কিছু টাকাও ছিল, সেজন্যও ভাবনা হইতেছিল। এ সকল কথা পরে ইনি আমাদিগকে বলিয়াছেন।

ছিলেন, গাড়ীতে উঠিতে দেওয়া হয় নাই, সবাই জানিতেন বাবার শরীর বিশেষ অসুস্থ, তিনি ঘুমাইয়া আছেন এরূপ অবস্থায় বাহির হইতেই তাঁহাকে দেখিয়া নীরবে ফিরিয়া গিয়াছেন।……

"……[illegible]গুলা হইতে গাড়ী ছাড়িয়াছে, বেলা প্রায় সাড়ে বারটা। বাবার [illegible]কলে মিলিয়া চেয়ারে বসাইলাম। সকলেই, বিশেষতঃ ডাক্তারবা[illegible]হের অবস্থা দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন।

"কাল সেই সন্ধ্যা ৭টায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে, আজ এখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা, এই প্রায় আঠার ঘণ্টা পরে দেহের কোথাও একটু জড়তা কিম্বা কাঠিন্য নাই, একান্ত কোমল, সহজ, স্বাভাবিক অবস্থা। পদ্মাসনে বসাইয়া জোড়হাত করিয়া দেওয়া হইল। গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়া দিলাম।

"হাথ্‌রাস জংশনে যখন গাড়ী পৌছিল তখন দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। একখানি মোটর লইয়া অনন্তদাসজী ও দিবোদাসজী দাঁড়াইয়া আছেন। গাড়ী থামিলে তাঁহারা আসিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিলেন। নিম্নস্বরে অমূল্যদা সকল কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ উভয়ে চেয়ার ধরিয়া বাহির হইয়া গেলেন ও বাবার দেহ মোটরে স্থাপন করিলেন। অমূল্যবাবু তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। এই মোটরে অনন্তদাসজী এবং অমূল্যবাবু উঠিলেন, অমূল্যবাবু ড্রাইভারকে বলিলেন, "জোর্‌সে চালাও"। আমাদের ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহাদের মোটর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।"

বেলা তিনটার সময় ইঁহারা আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। আশ্রমের পশ্চাদ্ভাগে যে স্থানটিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বসিতেন তাহার সম্মুখস্থ চত্বরে তাঁহার দেহ শায়িত করিয়া রাখা হইল। কিয়ৎকাল পরে একখানি বাসে করিয়া জিনিসপত্র ও অন্যান্য সঙ্গীয় লোকজনকে

লইয়া দিবোদাসজীও আসিয়া পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যেই এই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। আশ্রমে আশ্রমে সংবাদ পৌঁছিলে সাধুগণ ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন, প্রত্যেক রাস্তা দিয়া অবিরত জনস্রোত আসিয়া আমাদের আশ্রম পূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে আশ্রমটি সাধু, গৃহস্থ, ধনী, দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর লোকে পূর্ণ হইয়া জনসমুদ্রে পরিণত হইল।

সাধুগণ মিলিয়া একখানি বিমান প্রস্তুত করিলেন, রাশি রাশি পুষ্পমাল্যে তাহা সুসজ্জিত হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সমস্ত প্রস্তুত হইলে সঙ্কীর্ত্তন, ব্যাণ্ডপার্টি প্রভৃতি সমেত বিরাট জনতা আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা গুরুভ্রাতৃগণ বিমানখানি স্কন্ধে লইলাম। মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অল্পক্ষণপরে জনতা সহরে প্রবিষ্ট হইলে সহস্র সহস্র লোক আসিতে আরম্ভ হইল—সে এক অপরূপ দৃশ্য! ব্রজবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা দলে দলে আসিয়া "ধন্য মহারাজ", "জয় হো মহারাজ", "এয়সা মহাত্মা ঔর্ নেহি মিলেগা" ইত্যাদি বলিয়া সবাই প্রণাম করিতেছে, কেহ ফুলের মালা দিতেছে, কেহ আরতি করিতেছে! এইখানেই মিছিলের অগ্রগতি মন্থর হইল। সহরের সর্ব্বত্রই এইরূপ হইতে লাগিল বলিয়া অতি ধীরে ধীরে সেই বিপুল জনতা অগ্রসর হইতে লাগিল। "কাঠিয়া বাবাজী মহারাজকী জয়", "জয় কাঠিয়া বাবাজী মহারাজকী জয়"* শব্দে অবিরত চারিদিক মুখরিত করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে পুরাণ সহর হইয়া সেবাকুঞ্জ, শ্রীশ্রীরাধারমণজীর মন্দির, গোপেশ্বর মহাদেবের

* যদিও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কাঠের কৌপীন ধারণ করিতেন না, তথাপি শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবার গদিতে ছিলেন বলিয়া ব্রজবাসিগণ তাঁহাকেও কাঠিয়া বাবা নামেই অভিহিত করিতেন।

মন্দির, বংশীবট প্রভৃতি স্থান হইয়া যমুনা পুলিনের সমস্ত ঘাট দর্শন করিতে করিতে অবশেষে যুগল ঘাটে গিয়া সকলে উপনীত হইলাম। তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীস্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের দেহেরও অগ্নিসংস্কার এইখানে হইয়াছিল। যমুনাতটে যখন তাঁহার দেহকে পদ্মাসনে বসাইয়া আমরা যমুনাজলে স্নান করাইতেছিলাম, তখন দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন সাক্ষাৎ তিনিই ধ্যানস্থ রহিয়াছেন! এরূপভাবে বসাইতে একটুও বেগ পাইতে হয় নাই, হাত পা যেখানে যেমন ভাবে রাখি ঠিক সেইভাবে থাকে, শরীরের স্বাভাবিক কোমলতা অব্যাহত রহিয়াছে দেখা গেল। দর্শনের জন্য সমবেত সাধুগণ ও ব্রজবাসিগণের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। সকলেই দর্শন করিয়া "ধন্য, ধন্য" করিতে লাগিলেন, বলিলেন মৃতদেহের এইরূপ অবস্থা ইহার পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখেন নাই। চন্দন কাষ্ঠ ও প্রচুর ঘৃত সহযোগে অগ্নিসৎকার কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হইল। আনন্দের হাটও ভাঙ্গিয়া গেল। অদ্ভুত আনন্দোৎসবের মধ্যে এতক্ষণ কাটিয়াছিল, শোকের অবকাশ ছিল না। সব শেষ করিয়া শূন্যহৃদয় লইয়া যখন আশ্রমে ফিরিলাম, তখন রাত্রি এগারটার অধিক হয় নাই।

পর দিন প্রভাতে দেখা গেল আশ্রমে যুগলমূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর মুখশ্রী উজ্জ্বলতা-পরিশূন্য হইয়া অতিশয় ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহাদের, বিশেষতঃ শ্রীজীর, এই ম্লানভাব অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল।

মথুরায় শ্রীযুক্ত বনয়ারীলাল ভট্নাগর নামে আমাদের একজন তদ্দেশীয় গুরুভ্রাতা আছেন *। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কবে আসিবেন,

* ইনি মথুরার একজন বিশিষ্ট নাগরিক ও মোক্তার। আশ্রমের জমি লইয়া একবার মথুরার কোর্টে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে তাঁহার শিষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন।

ইনি সর্ব্বদা খবর লইতেন। "আজ তিনি ক্লান্ত হইয়া আসিতেছেন, কাল সকালে গিয়া দর্শন করিব" এইরূপ মনে করিয়া সেদিন আর আসেন নাই। পরদিন সকালে আসিয়া যখন সকল কথা শুনিলেন, তখন একেবারে বিকলচিত্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং আমরা তাহাকে খবর দিই নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "তখন আমরা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, আপনাকে খবর দিবার সময়ও ছিল না" ইত্যাদি এবং নানাপ্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার মন প্রবোধ মানিল না। আশ্রমে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন, তারপর কাঁদিতে কাঁদিতেই মথুরায় ফিরিয়া গেলেন। বাড়ীতে গিয়াও ব্যাকুলভাবে অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহার সারাদিন অতিবাহিত হইল, সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "বাবা, শুধু লোকদৃষ্টিতেই আমার এই দেহ পরিত্যাগ, তুমি শান্ত হও। সর্ব্বদা তোমরা আমার দৃষ্টিতেই রহিয়াছ জানিবে। তুমি বৃন্দাবনের আশ্রমে মধ্যে মধ্যে যাইবে এবং দর্শন করিয়া আসিবে।"

তখন ইনি শান্ত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলে তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। এই সমস্তই বনয়ারীবাবু পরে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের দেহরক্ষার কয়েকদিন পরেই মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মহাদেবানন্দগিরি মহারাজের নিম্নোক্ত পত্র আমার নিকট আসে।

শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম
লালতারাবাগ, হরিদ্বার
তাং ২৬ কার্ত্তিক, ১৩৪২ সন

"নারায়ণস্মরণম্—

মহাশয়! বাবাজী সন্তদাসজীব তিরোধানসংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছি। যাহাতে তাঁহার সমাধি ও ভাণ্ডারাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য বিধিমত ব্যবস্থা করতঃ উৎকণ্ঠচিত্ত জনগণের চিত্তের সমতা বিধান করুন। তিনি আত্মজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, তৎসম্বন্ধে দেহত্যাগের স্থান অস্থান বিষয়ক প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কারণ শাস্ত্রে বলে "তনুং ত্যজতু বা কাশ্যাং শ্বপচস্য গৃহেঽথবা। জ্ঞানসংপ্রাপ্তিসময়ে মুক্তোঽসৌ বিগতাশয়ঃ।........."

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি।"

এই মহাপুরুষের কথায় আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। আর একটি বিষয়ে একটু সংশয় রহিল, পরে তাহাও এক সিদ্ধ মহাত্মার কৃপায় তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহার দেহত্যাগের সম্পূর্ণ এক দিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পরেও হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি করিয়া কোমল ও নমনীয় ছিল, তাহা তৎকালে বুঝিতে পারি নাই। জয়পুরের খ্যাতনামা সিদ্ধ মহাত্মা "সিদ্ধবাবা" ইহার পরে বৃন্দাবনে আসিলে তাঁহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি উত্তরে বলিলেন, "বৃন্দাবন তক্ ব্রহ্মরন্ধ্রমে বে রহে। তুম্ সবকো মালুম নহী রহা। বে ভগবৎস্বরূপ থে, উনকী ইচ্ছা তুম্ সব ক্যাসা সমঝোগে।" এ বিষয়ে ইহার বাক্যে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম।

ত্রয়োদশ দিবসে ভাণ্ডারা করাই স্থানীয় নিয়ম কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত জোগাড় হইয়া উঠিবে না ভাবিয়া বৃন্দাবনস্থ সাধুমণ্ডলীর অনুমতিক্রমে ঠিক এক মাস পরে ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে আশ্রমে ভাণ্ডারার দিন ধার্য্য করা হইল। ত্রয়োদশ দিনে বৃন্দাবনে সাধারণভাবে অল্পসংখ্যক সাধু ও ব্রাহ্মণ ভোজন এবং বস্ত্রাদি দান করা হইল এবং শিবপুর নিম্বার্কাশ্রমে বৃহৎ ভাণ্ডারার অনুষ্ঠান করা হইল। তথায় নিকটস্থ সমস্ত আশ্রমের ও মঠের সাধুগণ ও বঙ্গদেশের অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতমহোদয়গণও আসিয়াছিলেন। নিকটস্থ সমস্ত স্থানের দরিদ্রনারায়ণগণকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। অন্যূন ছয় সহস্র লোক এইদিন এখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট, বামৈ, হবিগঞ্জ, শিলং, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নবীনগর, খুলনা, বরিশাল, কিশোরগঞ্জ, পাটনা, গয়া, সমস্তিপুর প্রভৃতি অন্যান্য বহু স্থানেই এই দিন তাঁহার নামে ভাণ্ডারা ও উৎসব হইয়াছিল।

পূজার বন্ধের পর কলিকাতা হাইকোর্ট খোলার তারিখে (২৫শে কার্ত্তিক, ১১ই নবেম্বর) অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি মিঃ এস্. কে. ঘোষের এজলাসে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। এই উপলক্ষে প্রধান বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতঃ তাঁহার জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। তৎপর ১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে কলিকাতাস্থ এলবার্ট হলে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর উদ্যোগে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করেন *।

কলিকাতার বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলিতেও শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

২২শে অগ্রহায়ণ, রবিবার শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে সুবৃহৎ ভাণ্ডারার অনুষ্ঠান হইল। একাদশীর দিন (২০শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার) আশ্রমের একাংশে তাঁহার গুরুদেবের মন্দিরের পার্শ্বে একটি নবনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের তৈলচিত্র ও পাদুকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরদিন এই তৈলচিত্র লইয়া বৃন্দাবনের সাধু ও ব্রজবাসিগণ এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া মহাসমারোহে বৃন্দাবন সহর পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। সর্ব্বত্রই নাগরিকগণ পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অর্চ্চনা ও আরতি করিয়াছিল। তৎপরদিবস ভাণ্ডারা সম্পন্ন হইল। সর্ব্বত্র সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া আশ্রম মনোরম শোভা ধারণ করিল। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর মূর্ত্তি আজ প্রসন্ন, সমস্ত মূর্ত্তির শৃঙ্গার অতি সুন্দর হইয়াছিল। দূরদূরান্তর হইতে মহন্তগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। গুরুভাইভগিনীগণ অনেকে আসিয়াছেন। গীতা ও ভাগবতপাঠ, সমাজ ও সঙ্কীর্ত্তনের স্রোত চলিয়াছে। লোকসমাগমের অবধি নাই। নানাবিধ মিষ্টান্ন ও উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্যের দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভোগ লাগিল; অনন্তর সমস্ত দিন ধরিয়া এই সকল প্রসাদের দ্বারা সাধু, ব্রাহ্মণ, ব্রজবাসী সাধারণ লোক ও দরিদ্রনারায়ণগণকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইল; সাধু ও ব্রাহ্মণগণকে একখানি করিয়া দশহাতী বস্ত্র দেওয়া হইল। যে আসিয়াছে তাহাকেই অকাতরে প্রসাদ দেওয়া হইল। অন্যূন আট সহস্র লোক এই দিন প্রসাদ পাইয়াছিল। বিতরণের জন্য প্রচুর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ছবি সঞ্চিত ছিল। শুধু এই দিন নহে, ইহার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত বহু লোকে তাহা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

এমন সুশৃঙ্খলভাবে এই বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল যে সকলে আশ্চর্য্য হইলেন।

ইহার দুই মাস পরে প্রয়াগের অর্দ্ধকুম্ভমেলায়, দুই বৎসর পরে ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে বৃন্দাবন যমুনাপুলিনের অর্দ্ধকুম্ভমেলায় এবং চৈত্রমাসের শেষে হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভমেলায় তাঁহার উদ্দেশ্যে বৃহৎ ভাণ্ডারার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। এই শেষোক্ত পূর্ণকুম্ভের ভাণ্ডারার দিন অন্যূন পঞ্চদশ সহস্র সাধু প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

তাঁহার ইচ্ছানুসারে আমাদের আশ্রমে অবারিত সাধুসেবা আজিও চলিতেছে, বরঞ্চ বর্ত্তমানে সাধুসংখ্যা ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এই নিয়মিত সাধু সেবা ও পূর্ব্বোক্ত সুবৃহৎ উৎসব চতুষ্টয় সম্পূর্ণ আকাশ-বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া সম্পন্ন হইতেছে ও হইয়াছে। হরিদ্বারের সুবৃহৎ ভাণ্ডারার পূর্ব্বে ইহা কিরূপে সংকুলান হইবে তাহা ভাবিয়া আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়াছিলাম, কিন্তু যথাসময়ে সমস্ত দ্রব্যজাত সংগৃহীত হইয়া গেল এবং অতি সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সম্পন্ন হইল।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দেহান্তের পর আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বনয়ারীলালবাবুর ন্যায় আরও অনেকে তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং সময় সময় করিতেছেন। এইরূপ দুএকটি ঘটনা ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থ মধ্যেই বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতাকে তিনি একবার লিখিয়াছিলেন, "আমার দেহ পতনের এখনও বিলম্ব আছে। পতন অবশ্য হইবে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের পক্ষে কিছু ব্যতিক্রম ঘটিবে না।" বস্তুতঃ তিনি দেহে থাকিতে তাঁহার কৃপা যেরূপ অনুভূত হইত, আজ তাহা অপেক্ষা আরো বেশীই হইতেছে। এই রকমই যে ঘটে, মহাপুরুষগণের দেহান্তে তাঁহাদের প্রকাশ ভাব যে আরও অধিক

হয়, ইহা তিনিও উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল উপদেশের যথার্থ মর্ম্ম তখন বুঝি নাই, আজ তাহা বোধগম্য হইতেছে। কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। তাঁহার করুণাধারা আজিও সমভাবে প্রবাহিত হইয়া আর্ত্ত মানবের শান্তি বিধান করিতেছে। লোকদৃষ্টিতে দেহ পরিত্যাগ করায় তাঁহার স্থূল দেহের কার্য্য আজ নাই সত্য, কিন্তু তখন দূরে থাকিলে তিনি যে সকল লীলা প্রকাশ করিতেন, আজিও তাহা করিতেছেন; বরঞ্চ স্থূলদেহসম্বন্ধ রহিত হওয়াতে তৎকালাপেক্ষা একটু অধিক করিতেছেন; বিপদে উদ্ধার করিয়া, অভাবনীয় উপায়ে সংশয়ভঞ্জন করিয়া, স্বপ্নে দর্শন দিয়া, এমন কি সাক্ষাদ্দর্শন প্রদান পূর্ব্বক বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিয়া "তোমরা সর্ব্বদাই আমার দৃষ্টিতে রহিয়াছ", "আমি সর্ব্বদাই তোমাদের কাছে আছি" ইত্যাদি বাক্য সফল করিতেছেন। তাঁহার এই লীলা ও মহিমার কথা এবং তাঁহার অশেষ দয়ার বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় আশায় ভরিয়া যায়, জীবন আনন্দে পূর্ণ হয়!

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

ওঁ গুরো কৃপাহি কেবলম্

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট (ক)

উপদেশাবলী

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের উপদেশাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়া কতক-গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। উপদেশগুলির বিষয় অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ইহা খুব সূক্ষ্ম নহে।

ইহজন্মের সুখ-দুঃখ

(১) জন্মান্তরে যে যেরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছে তদনুসারে ইহজন্মে সুখ, দুঃখ, লাভ, ক্ষতি যশ, অপযশ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। খুব পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত লোকেরও অর্থাভাব ক্লেশ হয়। তদপেক্ষা অবিদ্বান্ অকর্ম্মা লোকও প্রভূত অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী হয়, ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের জন্মান্তরীণ কর্ম্মই এইরূপ প্রভেদের কারণ জানিবে।

(২) রোগ, শোক প্রভৃতি জন্মান্তরের কর্ম্মের ফল ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এই সকল ভোগের দ্বারাই জন্মান্তরের দুষ্কৃতি কাটিয়া যায়। এই সকল দুষ্কৃতি কাটিয়া না গেলে চিত্তের মলিনতা দূর হয় না, এবং ধর্ম্মরাজ্যে বিশেষরূপে অগ্রসর হইতে পারা যায় না। ইহা নিশ্চিত সত্য জানিবে। অতএব রোগ, শোক উপস্থিত হইলে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে নাই।

(৩) প্রাক্তন কর্ম্মের ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এই কর্ম্ম ভোগের দ্বারাই শেষ হয়। রোগ সকল এই সকল কর্ম্মের ফল। প্রসিদ্ধ

মহাজনেরা অনেকে রোগ নিমিত্ত ক্লেশ পাইয়াছেন। রোগ প্রাক্তন কর্ম্মের ফল বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রমতে ভগবৎ উপদেশ এই যে, রোগ হইলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে। চিকিৎসা রোগের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

(৪) যাহারা জন্মান্তরে পুণ্যকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে ইহজন্মে সুখ ভোগের দ্বারা সেই পুণ্যের ক্ষয় হইলে তাহাদের চিত্তের শুদ্ধি আসে। যাহারা জন্মান্তরে পাপকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, ইহজন্মে ক্লেশভোগের দ্বারা তাহাদের সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চিত্তের শুদ্ধি জন্মে। অতএব সুখ অথবা দুঃখ বিধাতা প্রেরণ করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে অসহিষ্ণু না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহা ভোগ করিয়া লয়েন। ইহাতেই তাঁহার কল্যাণ হয় জানিবে।

(৫) দৃষ্টতঃ যে ব্যক্তিকে তোমার সুখ অথবা দুঃখদাতা বলিয়া মনে কর, বাস্তবিক সে কিছুই নয়, তোমার কর্ম্মেরই ফল তুমি ভোগ করিতেছ ও করিবে। · যাহাকে নিমিত্তরূপে খাড়া করিয়া বিধাতাপুরুষ অপরের দুঃখ সংঘটন করেন, তাহার সেই কর্ম্মের ফল তাহাকে জন্মান্তরে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, পরন্তু সদ্বিবেচক লোক সেই অপকারী ব্যক্তিকে দয়াই করিয়া থাকেন।··· দৃষ্টতঃ অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতিও তোমার দয়াই হওয়া উচিত। এইরূপ বুদ্ধি যাহার অন্তরে উপস্থিত হয়, বিধাতা তাহার দুঃখভোগের মাত্রাও কমাইয়া দেন।

(৬) সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে সংসার ক্রীড়ার ভূমি মাত্র। ইহার সুখদুঃখ, অভাব প্রাচুর্য্য সমস্তই ক্ষণস্থায়ী এবং বাহিরের জিনিষ, তোমার আত্মাতে এই সকল স্থান পায় না। যখন উপস্থিত হয় তখন তুমি ইহাদের সহিত একাত্মবুদ্ধি হইয়া যাও এবং নিজেকে সুখী, দুঃখী, অভিগ্রস্ত, লাভবান্ বলিয়া মনে কর।

(৭) সম্পদ-বিপদ, দুঃখ-সুখ কিছুরই স্থিরতা নাই জানিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন "যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" * ইহা জানিয়া স্থির ভাবে সমস্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন সহ্য করিয়া যাওয়াই যথার্থ কল্যাণার্থী পুরুষের পক্ষে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

(৮) ইহজন্মে যে সকল কর্ম্ম সাধারণতঃ করা হয় তাহার ফল জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়, সচরাচর ইহজন্মে তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল অতি গুরুতর যদি পাপ অথবা পুণ্য হয়, তবে ইহজন্মেই তাহার ফল ভুগিতে হয়।

(৯) ভগবৎ উপাসনা নিয়মিতরূপে করিলে তদ্দ্বারা জন্মান্তরের কর্ম্মের ভোগ অপেক্ষাকৃত সহজে কাটিয়া যায়। পরন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত একেবারে ক্ষয় হয় না।

শান্তিলাভ

(১০) নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ দর্শন করিয়াও যাহার মনের শান্তির ব্যাঘাত জন্মে না তিনিই অবিচলিত শান্তি লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে" এইটির প্রতি যেন সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে।

(১১) যাহার চিত্ত এরূপ হইয়াছে যে, ধৈর্য্য কিছুতেই চ্যুত হয় না এবং অন্যের কৃতকর্ম্মের প্রতি আর বিদ্বেষবুদ্ধি আসে না, তাঁহারই চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে বলা যায় এবং তিনিই যথার্থ শান্তিলাভের অধিকারী হয়েন।

(১২) সাধারণ ব্যবহারে যে পরিমাণ নিষ্কপটতা, সরলতা এবং

---

* অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে সমস্তই গমনশীল (বিনাশশীল—পরিবর্ত্তনশীল)।

স্বার্থশূন্য প্রীতির ভাব অন্তরে উদয় হয় সেই পরিমাণেই চিত্ত যথার্থ নির্ম্মল হইয়াছে, এই লক্ষ্য অন্তরে সর্ব্বদা রাখিবে।

(১৩) যথার্থ শান্তি সহজে পাইবার পথ,—যখন যে অবস্থায় ভগবান রাখেন সেই অবস্থা তাঁহারই প্রেরিত জানিয়া তাহাতে সন্তোষ অবলম্বন করিয়া থাকিতে অভ্যাস করা। এইরূপ যিনি করেন তাঁহার প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন এবং তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত দুষ্কর্ম্ম সকল হীনবল হইয়া যায়।

(১৪) বাস্তবিক সর্ব্বপ্রকার আশা ও বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই যথার্থ শান্তিলাভের পথে পড়া যায়। যতদিন বাহিরের ভোগ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রতি আসক্তি থাকে, ততদিন শান্তিলাভ করা অসম্ভব।

(১৫) ... . তিনি যখন যেমন রাখেন, তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাত্রা স্বীকার করিয়া লওয়া ভিন্ন যথার্থ শান্তির আর উপায় নাই। ইহা জানিয়া কোন বিষয়ে বিশেষ আগ্রহান্বিত না হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্য অবস্থানুযায়ী করিয়া যাওয়াই শান্তিলাভের উপায়।

(১৬) নিজের কোন বিষয়ে ক্ষমতা নাই জানিয়া যে যত আকিঞ্চন-ভাবে ভগবৎচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে সে তত শীঘ্র শান্তিলাভ করে। ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া সর্ব্বদা সকলপ্রকার অভিমান ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে......হইবে।

(১৭) ভগবৎসেবক যিনি হইবেন তাঁহার পক্ষে সেবাসংক্রান্ত যে-কোন কর্ম্ম উপস্থিত হউক, তাহাই তিনি সানন্দে গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহা সম্পাদন করেন। ভগবান্ যে কোন কর্ম্ম করিতে দেন, তাহাই তাহার কল্যাণার্থ হয়, অতএব এই ভাব সর্ব্বদা রক্ষা করিতে যত্ন করিবে। এইভাবে যিনি চলিতে পারেন তিনি যথার্থ শান্তিলাভ করিবার অধিকারী হয়েন—"স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী"।

(১৮) বাহ্যবস্তুর সহিত আসক্তি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান জন্মাইলেও পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ সহজে অন্তর হইতে ইহার বাহ্য তৃষ্ণা যায় না। ভজন করিতে করিতে অল্পে অল্পে সেই সংস্কারের বেগ কমিতে থাকে। নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভজন কর, ক্রমশঃ শান্তিলাভ করিবে।

(১৯) যথাসাধ্য দশজনের সেবা করিয়া যাও এবং নিজের প্রতি সকলের সেবক এই বুদ্ধি রাখিয়া চল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিছু কিছু ভগবৎনাম সাধন কর, কোন প্রকারেই চিন্তিত হইবার কারণ নাই, শ্রীভগবৎ প্রসাদে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ করিবে।

বাহ্যিক আচরণ

(২০) বৃথা কথা বলা যতদূর সম্ভব পরিহার করিবার চেষ্টা করিবে এবং যাহাতে ভগবানের মনন অন্তরে অধিকক্ষণ চলিতে থাকে তাহার চেষ্টা করিবে।

(২১) পরের দোষ দর্শন ও নিন্দা পরিত্যাগ না করিলে, অপর সকলে……অপ্রসন্ন থাকিবে এবং সে অপ্রসন্নতাই ভগবৎ-অপ্রসন্নতা……।

(২২) সকল দেহেই ভগবান্ আছেন ইহা জানিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না এবং সকলকেই যথাসাধ্য ধর্ম্মানুসারে সেবাদ্বারা সুখী করিতে যত্ন করিবে।

(২৩) অপরের দোষদর্শন হেতু তৎপ্রতি অবজ্ঞা আসে। যিনি সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করিতে যত্ন করিবেন তাঁহার পক্ষে দোষদর্শনের বুদ্ধি বিলুপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং অবজ্ঞার ভাব আর আসে না, মর্য্যাদা-বুদ্ধি সর্ব্বত্র স্থাপিত হইতে থাকে। এইরূপ চিন্তা মনে পোষণ করিবে।

(২৪) সকলের কাছেই নিজে নম্র, বিনীত হইতে সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে।... মনে সদা শুচি, পবিত্র ও নির্লিপ্ত হইয়া বাস করিবে।

(২৫) ভক্তমাল, বাল্মিকী রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ করিতে চেষ্টা করিও, তাহাতে অন্তঃকরণে নূতন নূতন পবিত্র ভাবের উদয় হইবে এবং মনের অস্থিরতা কমিয়া যাইবে।

(২৬) যে যত বাস্তবিক মহৎ হইবে, তাহাকে সেই পরিমাণ ধৈর্য্যাবলম্বী ও পরিশ্রমশীল হইতে হইবে।

(২৭) সর্ব্বদা নিষ্কপট সরল ব্যবহার সকলের সহিত করা আবশ্যক। মিথ্যা কপট বাক্য সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।

(২৮) পরনিন্দা কদাপি করিবে না।

(২৯) আত্মপ্রশংসা কদাপি করিবে না।

(৩০) কাজ কর্ম্মে সর্ব্বদা আলস্য বর্জ্জন করা চাই। সদা .... ক্ষমাশীল হইয়া সদয় ব্যবহার দ্বারা দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলের সেবা করিবে।

(৩১) পাপী, নীচ বলিয়া কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিবে না, ইহাই যথার্থ বৈষ্ণব লক্ষণ জানিবে।

(৩২) কাহাকেও ক্লেশ যাহাতে দিতে না হয় এবং কাহারও প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি যাহাতে না আসে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। মনে বিদ্বেষ ভাবের উদয় হইলেও তৎক্ষণাৎ বিচারবুদ্ধি দ্বারা তাহাকে মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

(৩৩) হিংসা-বিদ্বেষ শূন্য হইয়া সকলের প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করিয়া উপদিষ্ট প্রণালীতে জীবন যাপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

(৩৪) বাহিরের কার্য্য করিতে অপর সকলের সুবিধাও দেখিতে

হয়। দশজনের সহিত একত্র থাকিতে হইলে ঠিক নিজ ইচ্ছামত সকল কার্য্য করা যায় না।

(৩৫) যে স্থানে পরনিন্দা, বিশেষতঃ বৈষ্ণব, সাধু, সন্ন্যাসী ও এইরূপ লোকের নিন্দা হয়, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া...... চলিয়া যাইবে।

(৩৬) এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে দোষ ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলের মধ্যেই আছে......অপরের সম্বন্ধে দোষ যিনি ক্ষমা করিয়া চলেন, ভগবান্ তাহার দোষ সকল ক্ষমা করিয়া তাহাকে শীঘ্র পবিত্র করেন।

রিপুদমন ও মনঃসংযম

(৩৭) কাম-ক্রোধাদি রিপু অনন্তকাল হইতে হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছে, সহজে ইহাদিগকে সম্পূর্ণ জয় করা অসম্ভব। দীর্ঘকালেও যদি হয় তবে খুব সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এতৎসমস্তের দমন, সকলের সহিত প্রীতির ব্যবহারের অভ্যাসদ্বারা অল্পে অল্পে হইতে থাকিবে, তন্নিমিত্ত ব্যস্ত হইও না, তবে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে চেষ্টা করিবে।

(৩৮) খুব অধিক পরিমাণে সর্ব্বদা মনে মনে ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে অভ্যাস কর, তাহাতে কালক্রমে কামাদি রিপুসকল বলহীন হইয়া যাইবে।...এই সকল শারীর-ধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ হওয়া কঠিন, তবে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ বশীভূত হইতে থাকে। অতএব তোমার...হতাশ হইবার কোন হেতু নাই ; অবশ্য বৈধ উপায় যথাসাধ্য তাহা নিবারণের নিমিত্ত অবলম্বন করিবে।

(৩৯) যখন দুঃখ উপস্থিত হইবার সময় হয় তখন পরম আত্মীয়েরও বুদ্ধি প্রতিকূল হয়—পরম মিত্রও দুঃখ দেয়। এই কথাটি সর্ব্বদা

মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহাতে অপরের প্রতি ক্রোধ আসিবে না এবং উত্তম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি আসিবে। ইহা জানিবে যে সর্ব্বদা ভগবান্ তোমাকে দেখিতেছেন। অতএব তাঁহার জীবের প্রতিকূল আচরণ দেখিয়াও সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হইতে অভ্যাস করিবে।

(৪০) শরীরের ধর্ম্ম ক্ষুৎপিপাসা যেমন আপনা হইতে সময় সময় উদয় হয় ও ক্লেশ দেয়, কাম-ক্রোধও তদ্রূপ শরীরের ধর্ম্ম জানিবে। শরীরের অবস্থানুসারে ইহাদের সময় সময় হ্রাস এবং সময় সময় বৃদ্ধি হয়। ইহারা উপস্থিত হইলে "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে * এই গীতা বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। সাধ্যমত নাম-সাধন অবশ্য করিবে। তাহাতেই পার হইয়া যাইবে।

(৪১) মনে কামবৃত্তির চিন্তা বিশেষ না থাকিলেও শরীরে আপনা হইতে রস সঞ্চয় হয়, ইহা শরীরেরই ধর্ম্ম।...প্রায়শঃ দশমী একাদশীতে শরীরের এই অবস্থা ঘটে। এইজন্য দশমী হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শরীরকে অনেক সময় অনাহারে এবং অল্পাহারে রাখিয়া শরীরের রস শুকাইয়া ফেলিতে হয়।

(৪২) দোষগুণ উভয়ই ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রত্যেকের মধ্যে আছে। তৎপ্রতি উপেক্ষা না করিলে কাহারও সঙ্গে প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে না। তোমার নিজেরও বহু দোষ আছে তাহা তোমার নিজ চক্ষে পড়ে না, এইজন্য তোমার প্রতি অপরের বিদ্বেষবুদ্ধি থাকা যেমন ভাল নয় সেইরূপ তোমার পক্ষেও অপরের দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকা উচিত নহে। এই বিদ্বেষভাব মনকে

* অর্থাৎ গুণাত্মক ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ের প্রতি বৃত্তিসম্পন্ন হইতেছে ; (তিনি নিজে ইহাদের পরিচালক অথবা কর্ত্তা নহেন) এইরূপ মনে করিয়া (তত্ত্বদর্শী পুরুষ) কখনও গুণকার্য্যে আসক্তচিত্ত হয়েন না।

কলুষিত রাখিয়া বর্ত্তমান থাকে জানিবে, অতএব তাহা সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিয়া সকলের সহিত মনের প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা কর, ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম জানিবে।

(৪৩) নিষ্ঠাপূর্ব্বক জপ করিতে করিতে মনের নির্ম্মলতা ক্রমশঃ আসিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং অহঙ্কার ও অভিমান এই সকল রিপুকে সর্ব্বদা দমন রাখিতে যত্নবান্ হইবে এবং যাহাতে বুদ্ধির উন্নত ভাব গিয়া শান্ত ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতি আসে তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইও।

(৪৪) সকলের প্রতি দয়া ও ক্ষমা সর্ব্বদা মনে রক্ষা করিতে যত্ন করিবে। তুমি যদি অপরের দোষ দেখিয়া রাগ কর, ক্ষমা না কর, তবে তোমার দোষ ভগবান্ কিরূপে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আশা করিতে পার? এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া ক্ষমাবৃত্তি যাহাতে সর্ব্বদা ধারণ করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। ইহা মনে সর্ব্বদা ধারণ করিতে চেষ্টা করিবে যে, ভগবানের জীবের সেবা করাই পরম ধর্ম্ম। এই সেবা-বুদ্ধিতে যদি কার্য্য কর তবে শীঘ্র ক্রোধ ও অহংভাব দূর হইতে আরম্ভ হইবে। নামে রুচি হইলেই কামাদি অপবিত্র ভাব দূর হইতে থাকিবে। কোন চিন্তা করিও না। ভগবৎকৃপা অবশ্য তোমাদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধন করিবে।

কর্ত্তব্য কার্য্য ও সেবক ভাব

(৪৫) তোমাদের কার্য্যে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করা চাই, কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কার্য্য করিয়া যাইতে হয়।

(৪৬) চেষ্টার ফল যখন এবং যেরূপ ভগবান্ দেওয়া উচিত বোধ

করিবেন তদ্রূপ দিবেন। কি হইবে তাহা ভাবিয়া চিত্তকে ব্যাকুলিত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

(৪৭) ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান নির্লিপ্তভাবে করিতে করিতে চিত্তের নির্ম্মলতা আসে, অলসভাবে গল্প করিয়া সময় নষ্ট করিলে বৃথাই সময় যাইতেছে মনে করিবে, কেবল বৃথাই যাইতেছে তাহা নহে, এই সকল গল্পে প্রায়শঃ পরচর্চ্চাই হইয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয়।

(৪৮) যাহারা আলস্যবর্জ্জিত হইয়া প্রাণপণে কর্ম্মচেষ্টা করে তাহাদিগকে উন্নতিশীল দেখা যায় এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া যাহারা খুব ভজননিষ্ঠ হয়, তাহারা অল্প কর্ম্মচেষ্টা না করিলেও তাহাদের অভাবসকল বিধাতা পুরুষ সর্ব্বদা পূরণ করেন। অতএব হয় আলস্য বর্জ্জিত কর্ম্মচেষ্টা, নতুবা নিষ্কাম হইয়া ভজনে নিষ্ঠা ব্যতিরেকে কেহ অভাব মুক্ত হইতে পারে না জানিবে।

(৪৯) যে যে কর্ম্ম ভগবান্ যাহার দ্বারা করাইবেন তাহা তিনি জন্মকালেই অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা করিতেই হইবে। তিনি কর্ম্মের প্রবৃত্তিদাতা, ইহা জানিয়া নিজের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যদি জীব কর্ম্ম করিতে পারে তবে সে কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত থাকে এবং অন্তিমে সদ্গতি লাভ করে। নিজে তাঁহার সম্পূর্ণরূপে অধীন সেবক মাত্র এই জানিয়া যিনি সমস্ত কার্য্য সেবাবুদ্ধিতে করেন, তাঁহার অধোগতি কদাপি হয় না।

(৫০) হিংসা-বিদ্বেষশূন্য হইয়া সকলের প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করিয়া উপদিষ্ট প্রণালীতে জীবনযাপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে উপদেশানুসারে যথাসাধ্য কার্য্য করিতে চেষ্টা কর। তাহাতেই ভগবান প্রসন্ন হইবেন।

(৫১) নিজেদের মনোমত কার্য্যটি করিব, অন্য কার্য্যটি উপস্থিত হইলে মাথায় বজ্রাঘাতের মত বোধ করিব, এইরূপ মনোবৃত্তি মঙ্গলজনক নহে। ইহা বুদ্ধির একান্ত তামসিক অবস্থা।

*(৫২) পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী-পুত্রাদি সকলকেই ভগবানের প্রকাশিত রূপ মনে করিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে। ইহাদের কাহারও প্রতি আপন বুদ্ধি করিবে না, এবং কোন বস্তুতে আত্মবুদ্ধি করিবে না। সকলই তাঁহার, নিজে সেবকমাত্র এই বুদ্ধি রক্ষা করিতে যত্ন করিলে অন্যান্য সাধনে যে বৈরাগ্য বিচার প্রভৃতির আবশ্যকতা, সমস্তই ইহার দ্বারা কৃত হইয়া যায়, এবং ইহার ফলও সকল সাধন অপেক্ষা অধিক।

(৫৩) সেবাবুদ্ধিতে জাগতিক কর্ম্ম করিলে তাহা ভগবৎ আরাধনা বলিয়াই গণ্য হয়।

(৫৪) ভগবান সর্ব্বাতীত হইয়াও সর্ব্বময়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল ঘটে ঘটে তিনি বিরাজমান আছেন। ইহা জানিয়া সকলের নিকট অবনত মস্তক হইয়া যথাসাধ্য সেবা করিবে।

(৫৫) বর্ত্তমানকালে জীব পাঁচ মিনিটকালও চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হয় না। ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি কিরূপে এই চিত্তের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে? অতএব এইরূপ চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।"

(৫৬) তুমি নিজের ভজনকার্য্য যথাসম্ভব করিবেই, কিন্তু ভগবানের জীবের সেবাও কিছু সঙ্গে সঙ্গে করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্য জীবজন্তু যাহাদের সহিত সংসর্গে আসিতে হয় তাহাদেরও সেবা যথাসম্ভব করিতে যত্ন করিবে।

(৫৭) কেবল নিজে নির্দোষ থাকিলেই হইবে না, বাহিরের লোকও যাহাতে দোষ আশঙ্কা করিতে পারে এইরূপ আচরণ করিবে না।

(৫৮) শীঘ্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক কর্ম (যাহাকে সৎকর্ম বলে তদ্রূপ কর্ম) করিতে দেখিয়া তাহার প্রশংসা করা যায় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয়ে বিলম্ববোধক কর্মকে দেখিয়া তাহার নিন্দা করা যায়। পরন্তু এইরূপ নিন্দাস্তুতি ন্যূনাধিক পরিমাণে অজ্ঞানেরই পরিচায়ক। অতএব ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন 'সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে'। শ্রীমদ্ভাগবতেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে অপরের দোষ দর্শনকেই দোষ বলে।

(৫৯) সাধারণতঃ মনস্থির করা সকলের পক্ষেই কঠিন জানিবে। অতএব তদ্রূপ সকলের জন্য ভগবান্ কর্মযোগেরই উপদেশ দিয়াছেন। সেবাবুদ্ধিতে ভগবৎ-কার্য্য করিতে করিতে যে নির্মলতা লাভ হয় তাহাতেই ভগবান্ এইকালে পার করিয়া দেন। ইহা তিনি নিজে বলিয়াছেন।

আচার নিয়ম

(৬০) হিন্দুধর্ম বলিতে কেবল কতকগুলি আচার নিয়ম মাত্র বুঝায় না এবং ইহা কেবল কোন বিশেষ দেশবাসী বিশেষ শ্রেণীর লোকের ধর্ম নহে; ইহা সনাতন ধর্ম, মনুষ্যমাত্রেরই ইহাতে অধিকার আছে...ইহা সর্ববিধ মনুষ্যের সর্ববিধ প্রকৃতির উপযোগী ধর্ম…। ধর্মের উচ্চ উপদেশসকল ধারণা করিবার জন্য শরীর এবং মনের বিশেষ পবিত্রতার আবশ্যক, সেই পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত সাধারণ জীবের সর্ববিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তত্তৎবিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত আচার নিয়ম অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৬১) আচার নিয়ম যথার্থ হিন্দুধর্মের বহিরঙ্গমাত্র; অন্তরঙ্গ সাধনের সহিত যুক্ত থাকিলেই এই সকল উপকারী হয়, নতুবা অনেক স্থলে কুফল উৎপাদন করে।

(৬২) শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রতোপবাসাদি করিবে, অসমর্থ শরীরে করিবে না।

(৬৩) গঙ্গাস্নান তীর্থসেবাদি কার্য্য নিশ্চয়ই কল্যাণ সাধন করে। যাহাদের চিত্ত অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল তাঁহারাই গঙ্গাদির পুণ্যস্পর্শজনিত উপকার সঙ্গে সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অপর লোকে অনুভব করিতে না পারিলেও যে কোন ফলপ্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে।

(৬৪) অশৌচ হইলে নিত্য পূজা বন্ধ কদাপি করিবে না। ...... ভক্তিই পূজার মুখ্য অঙ্গ জানিবে। ভক্তিতে সমস্ত বস্তু পবিত্র হয় ...... শরীর অসুস্থ হইলে তাহা আপৎকাল বলিয়া গণ্য। তাহাতে স্নান না করিয়া জপ পূজা করিলে কিছু দোষ হয় না।

(৬৫) রাস্তায় চলা ফেরা করিতে আহারের ··· নিয়ম সমস্ত রক্ষা করা যায় না। তৎকালে আপদ্ধর্ম্মের নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

(৬৬) কোন স্থানে যাইতে শ্রীগুরু ও শ্রীশ্রীঠাকুরজীর মূর্ত্তি সঙ্গে করিয়া নিলে গাড়ীতেই কোন প্রকার সুযোগ করিয়া, উত্তম জল দ্বারা মুছাইয়া কিছু ভোগ দিতে চেষ্টা করা উচিত। গাড়ীতে বসিয়া দিলেও কিছু দোষ হইবে না। দীর্ঘ কাষ্ঠ পৃথিবীতুল্য। মৃত্তিকার উপর বহু লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও, সকলেরই আসন এক মৃত্তিকা হইলেও—তন্নিমিত্ত স্পর্শদোষ হয় না। অতএব এক গাড়ীতেই অন্য লোক থাকিলেও, তাহাতে স্পর্শদোষ হয় না।

(৬৭) আদর্শ রক্ষার নিমিত্ত সামাজিক ভেদ একবারে ভঙ্গ করিয়া দেওয়া উচিত বিবেচনা না করিলেও ব্যবহারিক ভেদ রক্ষার বিষয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত বিবেচনা করি না। সর্ব্বসাধারণভাবে যাহা সমাজে চল হইয়া যায় তাহার সহিত বিরোধভাব যত কম রাখিয়া চলা যাইতে পারে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। এই উভয় দিক্ লক্ষ্য করিয়া কাজ করিলে কোনও গোলমাল হইবে না।

নাম জপ ও দাস্যভাবের সাধনা

(৬৮) প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভজন করিবে। নির্দ্দিষ্ট সময় মালা জপ ত করিবেই, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে হাঁটিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, চলিতে, ফিরিতে সকল সময় মনে মনে ঐ মন্ত্র জপ করিতে যত্নবান হইবে। · ·· আর যথাসাধ্য সকলের সেবা করিবে। এইরূপ করিলে শীঘ্র শান্তিলাভ করিবে এবং ভগবৎ প্রসন্নতা অনুভব করিবে।

(৬৯) নিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে যথাসম্ভব ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করিবে; এবং সকল ঘটেই ভগবান্ আছেন ইহা অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়া নিজেকে সকলের সেবক বলিয়া মনে করিতে যত্ন করিবে। সাধকের পক্ষে অহঙ্কার সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করা চাই। সর্ব্বদা স্থির বুদ্ধিতে থাকিয়া সকলের প্রতি বিনীত ভাব অন্তরে পোষণ করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ যথাসাধ্য যত্ন করিলেই নিশ্চয় অজস্রভাবে ভগবৎকৃপা বর্ষণ হইতে থাকিবে। তাহাতে অন্তরে আনন্দের অভাব হইবে না।

(৭০) নিত্য ভগবৎনাম জপ করিতে ভুলিও না। যেরূপেই হউক সময় করিয়া প্রত্যহ মন্ত্র জপ করিবে। ……শরীর অসুস্থ

হইয়া পড়িলে বিছানায় শুইয়া শুইয়াই মালায় নাম জপ করিবে। মালা ছাড়াও মনে মনে সর্ব্বদা মন্ত্র স্মরণ করিতে অভ্যাস করিবে। তাহাতে তোমার সমস্ত অনাচারজনিত পাতক বিনষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রীভগবৎ নামে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

(৭১) ভক্তিপূর্ব্বক ভগবৎনাম সাধন করিতে থাক, তাহাতে চিত্ত নির্ম্মল হইবে, এবং যে পরিমাণে নির্ম্মল হইবে সেই পরিমাণে কর্তৃত্বাভিমান দূর হইতে থাকিবে।

(৭২) জপ করিবার সময় কোনও মূর্ত্তি ধ্যান না করিয়া কেবল মন্ত্র ধ্বনিটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিলে মনও শীঘ্র স্থির হইয়া যায় এবং অশেষবিধ কল্যাণ লাভ হয়।

(৭৩) তন্ত্রে যে ষট্‌চক্রের কথা উল্লেখ আছে, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, সম্পূর্ণ সত্য। আধ্যাত্মিক সাধনের ইহাই স্বাভাবিক পন্থা—ইহার ভিতর দিয়া সকলকেই যাইতে হয়। কিন্তু যাইবার প্রণালী বহুপ্রকারের আছে। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য এই ষট্‌চক্র বিদ্ধ করা। রাজযোগ যাহা কেবল ধ্যানাত্মক তাহার ফলেও ষট্‌চক্র বিদ্ধ হইয়া থাকে। তোমরা যে সাধন পাইয়াছ নিষ্ঠাপূর্ব্বক সে সাধন অবলম্বন করিলে তদ্দ্বারা অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন ব্যতীতই ষট্‌চক্রের রাস্তা সম্পূর্ণ খুলিয়া যায়।

(৭৪) ভোরের সময় উঠিতে পারিলে ভাল, না পারিলে অন্য নির্জ্জন সময় ভজন বিশেষরূপে করিবে; শুষ্কতা প্রভৃতি স্থায়ী হইবে না, কখন কখন আসিবেই, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিয়মপূর্ব্বক যথাসাধ্য প্রত্যহ নাম জপ করিতে চেষ্টা করিবে, কোনপ্রকার হতাশ হইও না।

(৭৫) জপ ঠিক মত হইলে চিত্তের প্রসন্নতা হয়, কখনও কখনও বেশ আনন্দবোধ হয়, এবং অন্য সকল লোকের প্রতিও প্রীতির উদয়

হয় জানিবে। কিন্তু কখনও কখনও শরীরের তেজ বৃদ্ধি হয়, তাহাতে শুষ্কতা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, সেই সময় হৃদয়ে মন স্থির করিয়া জপ করিলে আস্তে আস্তে শুষ্কতা কাটিয়া যায়।

(৭৬) ৺গোস্বামী প্রভু প্রত্যহ সায়ংকালে একটি গান করিতেন, তাহার শেষ চরণে আছে—

"এয়সা ভকৃতি কর ঘট ভিতর, ছোড়ি কপট চতুবাই
সেবা বন্দন আউর অধীনতা সহজে মিলযে রঘুবাই।"

এই কথাগুলি · · সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

(৭৭) উপাস্যের প্রতি ভগবৎবুদ্ধি থাকিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ বাৎসল্য, সখ্য ও শান্তভাব স্থানপ্রাপ্ত হয় না। ‥ ··· ভগবৎ প্রতিমূর্ত্তিতে ভাগ্যক্রমে কাহারও এই সকল ভাব উৎপন্নজাত হয়। পরন্তু এইটি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রশস্ত রাস্তা (royal road) নহে। ····· দাস বলিলে স্বাতন্ত্র্যরহিত সম্পূর্ণরূপে অধীন বুঝা যায়। যিনি সম্পূর্ণ দাস তিনি প্রভুর অঙ্গবিশেষ স্বরূপ ····। এই অবস্থাপন্ন দাসে' প্রভুই নিয়ন্তা—আত্মা, প্রভু হইতে ভিন্ন বোধ তাহার নাই।

(৭৮) দৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম এবং তুমি (সাধক) ব্রহ্মের অঙ্গীভূত অংশ মাত্র, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে তদধীন। অতএব ব্রহ্মই তোমার আত্মা এবং তুমি সম্পূর্ণরূপে তদধীন দাসমাত্র, এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া সমস্ত জগৎ ও জাগতিক জীবকে ব্রহ্মেরই প্রকাশভাব মাত্র জানিয়া সুতরাং সর্ব্বত্র অদোষদর্শী হইয়া ব্রহ্মবুদ্ধিতে সকলের (পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, দাস প্রভৃতি সকলের) যথাসম্ভব সেবায় নিযুক্ত হইয়া নির্লিপ্ত-ভাবে কালযাপন করিবে। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তের সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায়।

মৃত্যু—শোকশান্তি

(৭৯) জগতে কেহ চিরকাল থাকে না, সকলকেই এই দেহ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিধাতাপুরুষ সকলেরই সংসারে স্থিতির কাল অবধারিত করিয়া দিয়াছেন। সেই কাল উত্তীর্ণ হইলে সকলকেই যাইতে হইবে।

(৮০) প্রত্যেকেরই জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে আয়ু ও ভাগ্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। তাহার অন্যথা সম্ভবপর নহে।

(৮১) সকলকেই একসময়ে যাইতে হইবে, কাহার কোন্ সময় বিধাতার নিয়ম অনুসারে ডাক পড়ে তাহা বলা যায় না, তন্নিমিত্ত প্রত্যেকেরই মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

(৮২) জীবের ইহজন্মের কর্ম্মের শেষ হইলেই তাহাকে চলিয়া যাইতে হয়; আমরা মোহবশতঃ তাহাকে রাখিতে চেষ্টা করি। কিন্তু বিধাতার নিয়ম অলঙ্ঘনীয় এবং ইহাই বাস্তবিক কল্যাণজনক, তদ্বিরুদ্ধ আমাদের চেষ্টা কল্যাণজনক নহে। ···· মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সংসারাশ্রমেই সাধারণতঃ সকল লোক থাকে। ······ ইহাতে দুঃখের ভাগ অধিক কি সুখের ভাগ অধিক দেখিয়াছ? ······ বিচার করিয়া দেখিবে মনুষ্য-জীবন সকলের পক্ষেই ক্লেশকর। সুখের অংশ অল্পই আছে। তোমাদের··· এর আয়ু পূর্ণ হওয়াতে এই ক্লেশের মূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তন্নিমিত্ত তোমরা এত দুঃখিত থাক কেন? এই সকল বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ কর ······ এবং যাহাতে তাহার আত্মা সর্ব্বপ্রকারে সুখী হয় এইরূপ শ্রাদ্ধকার্য্য তাহার নিমিত্ত যথাসম্ভব কর।

(৮৩) সকলকেই সময় উপস্থিত হইলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ইহা নিশ্চিত আছে। তন্নিমিত্ত প্রতিক্ষণ সকলেরই প্রস্তুত

থাকা উচিত। তদ্রূপ প্রস্তুত থাকিলেই চিত্ত অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল থাকে এবং ভজনেও মতি বসে।

(৮৪) সংসারে চিরস্থায়ী কাহারও শরীর হয় না ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে এই শিক্ষাই মনে মনে ধারণা করা উচিত যে, নিজের বা অপরের শরীরের প্রতি যে অত্যন্ত আসক্তি তাহা মূর্খতামাত্র। ইহার নিয়তি ভগবানের হাতে সম্পূর্ণ আছে। যতদিন থাকে ততদিন ইহাকে ক্ষণভঙ্গুর জিনিসের মত যত্ন করিতে অবশ্য হয়। কিন্তু ইহার পতনে আপশোষ করা বুদ্ধির কার্য্য নহে, শোককে ঝাড়িয়া ফেলাই উচিত। আর নিজের দেহকেও ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া ইহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ভজনে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

(৮৫) খুব অধ্যবসায়ের সহিত ভজন করিতে থাক। তাহাতে প্রথমে অর্থ ও অপর বিত্ত সম্বন্ধে মোহ কমিতে আরম্ভ হইবে। তৎপর স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গের প্রতি মোহও কমিতে থাকিবে, তাহাদের বিয়োগেও কোন ক্লেশ থাকিবে না। তৎপর নিজ দেহের প্রতি মোহ কাটিবে। তখন মৃত্যুভয়ও ক্রমশঃ দূর হইয়া যাইবে।

(৮৬) যাঁহারা ইহ সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন যেন এমন মনে না হয় যে আরও কিছুকাল থাকিয়া যাই। মৃত্যুকে বারণ করিতে চেষ্টা করি। মৃত্যুর সময় ইহ সংসারের এমন কিছুর প্রতি টান থাকিলে এই পশ্চাৎদিগের টান পুনর্জন্ম ঘটায়, ইহা মনে রাখিবে। অতএব যিনি মোক্ষ ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে এমনভাবে কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে কর্ম্ম শেষ হইল না বলিয়া পশ্চাৎ টান না থাকে।

(৮৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উচ্চৈঃস্বরে ...... কিছুকাল পাঠ করিলে

তোমাদের অন্তরের ক্লেশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। বুঝিতে পারা যায় না যায় ক্ষতি নাই, উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করিবে। ইহা মন্ত্রমালা। বিয়োগজনিত দুঃখ উচ্চৈঃস্বরে পাঠের দ্বারা দূরীভূত হয় জানিবে।

(৮৮) মৃত্যু কাহারও অনুরোধ রক্ষা করে না। বাল্য, যৌবন অথবা বার্দ্ধক্য এতৎ সমস্তই মৃত্যুর নিকট সমান। অবশ্য ইহা সকলেই দেখিতেছে ও জানে, তথাপি ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই এই বিষয়ে মোহ উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কিছু উচ্চৈঃস্বরে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রত্যহ কিছু পাঠ করিবে। অর্থবোধ হউক না হউক পাঠ করিবে। তাহাতে অন্তরের দুঃখ আপনা হইতে লাঘব হইয়া যাইবে। তোমার মা যদি পড়িতে পারেন ভাল, নতুবা কেহ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে, যেন বসিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনেন, তাহাতে উপকার হইবে।

গুরু

(৮৯) অপর সকল প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতেই গুরুকরণের প্রয়োজন হয়; অপরের কোন সাহায্য বিনা আপনা আপনি কেহ কোন বিদ্যা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্যা অপর সকল বিদ্যা অপেক্ষা কঠিন এবং ইহাকে অপর সকল বিদ্যার সার বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সুতরাং এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গুরু-করণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

(৯০) অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, মনঃসংযম করিতে অভ্যাস করিতে করিতে বুদ্ধিমান পুরুষ নানাবিধ অলৌকিক শক্তিও লাভ করিতে পারেন সত্য। ·····পরন্তু মোক্ষমার্গ লাভ সদ্গুরু-কৃপা ভিন্ন কখনই হইতে পারে না বলিয়া মহর্ষিগণ উপদেশ করিয়াছেন।

(৯১) ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান সদ্‌গুরুর আশ্রয় ভিন্ন উপজাত হয় না। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভক্তির সহিত ভজন করিলে ব্রহ্ম সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়েন।

(৯২) ইহা মনে রাখিবে যে নিজের মনে যাহা উদয় হয় তাহাই যে করিয়া থাকে তাহাকে সাধুগণ গোঁয়ার বলেন। কথায় বলে "মনমুখী গোয়ারা। গুরুমুখী ভগবৎ প্যারা॥" যাহারা মনমুখী হইয়া কার্য্য করে তাহারা ক্লেশই পায় জানিবে।

(৯৩) সদ্গুরুর নিকট ভক্তিবীজ লাভ করিয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক ভজন করিলে যথার্থ কল্যাণ লাভ করা যায়।

(৯৪) গুরুবাক্য পালন করিলে ভগবানের দয়া আপনা হইতে আসিতে থাকে, নতুবা সহজে আসে না, ইহা জানিবে।

(৯৫) আপনাতে কর্তৃত্ববুদ্ধি যাঁহার আছে, যিনি নিজে নিজে সাধন করিয়া পারগামী হইবেন মনে করেন এবং গুরু হইতে কেবল উপদেশ মাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেই সাধন-ভজন করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন বলিয়া মনে করেন, তিনি অদূরদর্শী প্রাকৃত শিষ্য। তাঁহার কৃতকৃত্যতা লাভ করা অতি কঠিন।

(৯৬) আমাকে সদ্গুরু গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছেন। তিনি এই (আমার) ঘটে থাকিয়া তোমাদের গুরু হইয়াছেন, এবং তোমাদের সমস্ত কল্যাণ বিধান করিবেন। এ বিষয়ে তুমি সংশয় করিও না। তিনি তোমার সমস্ত কার্য্য নিশ্চয়ই দেখিতেছেন, তাহা যে পরিমাণে তোমার চিত্ত নির্ম্মল হইবে, সেই পরিমাণে তুমি নিজ অন্তরে বুঝিতে পারিবে। তুমি বুঝিবে যে তিনি তোমার সম্বন্ধে সমস্ত বিধান করিতেছেন। এতৎ সমস্ত অন্তরের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়, বাহিরের কথা শুনিয়া মন নিঃসংশয় হয় না।

(৯৭) গুরু কেবল এক বিশেষ দেহে আবদ্ধ নহেন, তিনি ভগবদ্ হইতে অভিন্ন ইহা জানিবে। যে দেহকে অবলম্বন করিয়া তোমাকে ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন সেই দেহ কখন চিরস্থায়ী নহে, তাহাতে মাত্র গুরুবুদ্ধি করিলে, গুরুতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই জানিবে। সর্ব্বজীবে ভগবদবুদ্ধিতে সেবাভাব রাখিলে গুরুদেহ অবর্ত্তমানেও তদ্দ্বারাই গুরুসেবারূপ ভগবৎ সেবা হয়।

(৯৮) গুরুতত্ত্ব এই যে গুরু পরমাত্মাই, পরমাত্মাই তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত গুরুরূপী হইয়াছেন।

মুক্তি

(৯৯ ; যথার্থ কল্যাণার্থী পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, সদ্গুরুর শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তদধীন করিয়া দেয় এবং নিজে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সদ্গুরুর আদেশ মাত্র প্রতিপালন করা জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করে, এইরূপ যিনি করিতে পারেন; তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন—সর্ব্ববিধ কর্ম্মে নির্লিপ্ত হয়েন এবং দেহান্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন।

(১০০) অবধারিত সময়ে ভজন করিয়া অন্য সময়ে ভগবৎ-সেবা বুদ্ধিতে জগতের জীবের সেবা করা অতিশয় শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিবে। ইহা করিতে পারিলেই কর্ম্মে কোন আসক্তি জন্মে না এবং জীব মুক্তি-লাভের অধিকারী হয়।

(১০১) ভগবান্ তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, অবশ্য সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। তবে উহা যথাকালে হইবে। উতলা

হওয়া বাস্তবিক ভগবদ্‌বিধানের উপর বিশ্বাসহীনতার পরিচয় দেয়। অতএব শ্রুতি এবং মহাজনেরা বলিয়াছেন :—

"ন স্ববমানেন লভ্যঃ"

যথাসময়ে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। চিন্তিত হইও না।

(১০২) তোমাদের মধ্যে কাহারও এক জন্মে মুক্তি ঘটিবে কাহারও তিন জন্ম পর্য্যন্ত বিলম্ব ঘটিতে পারে। সকলের পশ্চাতেই আমার গুরুদেব আছেন জানিবে। আমার দেহ অবলম্বন করিয়া তিনিই চেলা করিতেছেন।

(১০৩) যখন সদ্‌গুরু তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন তখন অবশ্যই পরাগতি প্রাপ্ত হইবে জানিবে। কোন প্রকার সংশয় মনে রাখিবে না।

(১০৪) প্রথম উপাস্যের তত্ত্ব গুরুমুখে জ্ঞাত হইয়া সাধনা করিতে করিতে ক্রমশঃ ভক্তির উদয় হয়। যাঁহার প্রতি ভক্তি হয় তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না হইলে কাহার প্রতি ভক্তি হইবে? এই প্রকার জ্ঞান পূর্ব্বে হয়, তৎপরে ভক্তি সঞ্চারিত হয়, ভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবৎ দর্শন লাভ হয়।

(১০৫) জীব গুণে বিভু হইলেও, বদ্ধাবস্থায় তাহার সমস্ত গুণ প্রকাশিত হইতে পারে না। সাধনাদি অবলম্বনে যে পরিমাণে দেহ নির্ম্মল এবং দেহাত্মবুদ্ধি ক্ষীণ হয়, সেই পরিমাণে তাঁহার স্বরূপগত শক্তিসকল প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে, এই জন্মেই তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, এবং দেহান্তে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্ববিধ সামর্থ্যযুক্ত হয়েন। তখন তিনি যে বিশেষ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি করিতে পারেন।

(১০৬) জীবসকলের সর্ব্ববিধ সাধারণ কল্যাণসাধন এবং বিশেষতঃ মোক্ষানন্দ প্রদান করিবার জন্য ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া

প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার স্বরূপের ধ্যান, সদগুরুদত্ত তাঁহার নাম জপ ও তদর্থে সমস্ত কর্ম্ম দাস ভাবে সম্পাদন করিয়া তদ্গতচিত্তে যিনি কালযাপন করিবেন, তিনি অচিরে সমস্ত কল্যাণ লাভ করিয়া মোক্ষাধিকারী হইবেন।

(১০৭) [শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের নিম্নলিখিত উপদেশাবলী তাঁহার একজন শিষ্যাকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়]

(ক) কাহারও প্রতি মনে মনে দ্বেষ পোষণ করিও না। দ্বেষ করিবে কাহাকে? জীব-জগৎ সবই যে তিনি, তিনিই যে সকলের অন্তরে অন্তরাত্মা।

(খ) সংসারের যাবতীয় কাজ সেবাবুদ্ধিতে শ্রদ্ধার সহিত করিবে। সবই যখন তিনি তখন তাঁহারই সেবা করিতেছ মনে করিয়া কর্ত্তব্য যাহা করিয়া যাইবে, তাহাই হইবে তাঁহার প্রত্যক্ষ পূজা।

(গ) মানুষের জন্ম ও কর্ম্ম ভগবদিচ্ছায় নির্দ্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়। নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজেকে তাঁহার দাসের দাস ভাবিয়া নিরলস ও নিষ্কাম সেবক হইতে হয়।

(ঘ) এই আদর্শ মনে রাখিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া যাওয়াই সংসারীর পক্ষে উচ্চাঙ্গের সাধন।

(ঙ) সাগরাভিমুখী স্রোতস্বতী কখনও সরলরেখায় প্রবাহিত হয় না। সর্পিল গতি তার ধর্ম্ম। তেমনি জীবনধারা স্বভাবতঃই ভগবদভিমুখী হইলেও অনেক উত্থান পতন, নানা সঙ্কট, সমস্যা ইহাতে বর্ত্তমান। ধৈর্য্য ধরিয়া এই সব সহ্য করিলে চলার পথ ক্রমশঃ সুগম হয়।

(চ) সর্ব্বোপরি শরণাগত হইতে হইবে। আত্মোন্নতি লাভের ইচ্ছা থাকিলে আত্মোৎসর্গ অনিবার্য্য। পথের অভাব নাই, একটিকে

ধরিয়া চলিতে পারিলেই হইল। যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে শান্তি নাই।

(১০৮) [ফরিদপুর সহরে ১৩৩৭ সনের ২৩শে চৈত্র তারিখে দীক্ষাদানের পর কতিপয় শিষ্যকে তাহাদের নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে উদ্ধৃত]

(ক) সাধারণতঃ একবার সকালে এবং সন্ধ্যায় বেশ স্থিরচিত্তে জপ করিবে। সকালে খুব ভোরে এবং সায়ংকালেই জপ করিবার নিয়ম। তবে যদি কোন কাজ থাকে তবে সে সব ঝঞ্ঝাট্ শেষ করিয়া জপ আরম্ভ করিবে।

(খ) অন্য সময়ে চলিতে ফিরিতে, শুইতে বসিতে, (এমন কি পায়খানায় বসিয়াও) নাম জপ করা যায়। কিন্তু মালায় নহে, মনে মনে। বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

(গ) অশৌচাদি কোন অবস্থায় মালা জপ বন্ধ করিবে না।

(ঘ) জুতা পায়ে না রাখিয়া জপ করাই ভাল। ইহা জপের মর্য্যাদার জন্য ব্যবস্থা। কিন্তু তোমরা সর্ব্বদা তাহা পারিবে না। (অবস্থা বিশেষে জুতা পায়ে রাখিয়াই জপ করা যাইতে পারে।)

(ঙ) সেবাবুদ্ধিতে সমস্ত দৈনিক কার্য্য করিবে। কাহারও অন্তরে ক্লেশ দিবে না। শয়ন করিবার পূর্ব্বে বিছানায় বসিয়া প্রত্যহ দৈনিক কার্য্যের সমস্ত স্মরণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে ঠিক সেবাবুদ্ধিতে (কার্য্য) করা হইয়াছে কি না, এবং নাম জপ মনে মনে চলিয়াছে কিনা। যদি কোন স্থলে না (করা) হইয়া থাকে তবে আগামীতে যাহাতে সাবধান হইতে পার এবং তদ্রূপ না হয় এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্যতার নিমিত্ত ভগবৎকৃপা প্রার্থনা করিবে। তৎপর নাম স্মরণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইবে।

পরিশিষ্ট (খ)

(১)

স্বামী রামদাসজী—এই মহাত্মা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ ৩৮০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার সম্বন্ধে আরও কিছু বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইনি একজন উচ্চ সাধনশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছি যে তিনি ভগবদনুভূতিতে মাতোয়ারা থাকিতেন। তাঁহার আচরণ সাধারণের চক্ষে অনেক সময় প্রায় পাগলের মত ছিল। সাধুগণ তাঁহাকে "রাজ রামদাসজী" বা "রাজাজী" বলিয়া ডাকিতেন। ইহার একটি কারণ ছিল। তিনি বলিতেন—"হাম ত সাতো দ্বীপ চারো হাত্তাকা মালিক হৈ *।" সকলকে গালাগালিও করিতেন কিন্তু তাঁহার গালি এত মিষ্ট ছিল যে, যাহাকে গালি দিতেন সেও আনন্দ পাইত। কাহারও ক্লেশ দেখিলে তিনি বড় কাতর হইতেন। একবার ব্রজে বড় অনাবৃষ্টি হয়, ফলে সকল প্রাণীরই খুব কষ্ট হইল। ঘাস ইত্যাদি শুকাইয়া যাওয়ায় গরু, ছাগল প্রভৃতি পশু আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইল। রামদাসজীর ইহা সহ্য হইল না। তিনি পদব্রজে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। ব্রজবাসিগণ এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে গিরিরাজ বলিয়া থাকেন এবং জাগ্রত দেবতাজ্ঞানে পূজা-অর্চনা করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ও দীপালীর সময় এখানে মেলা হয় ও ব্রজবাসিগণ সমবেত হইয়া গিরিরাজের পূজা,

---

* কি অর্থে তিনি এই উক্তি করিতেন তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিতেন না। শ্রীভগবানের সহিত নিজের অভেদবুদ্ধিহেতুই ঐরূপ বলিতেন মনে হয়।

আরতি ও পরিক্রমা করেন। রাজা রামদাসজীও এইখানেই আসিলেন এবং গিরিরাজের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা করিলেন—"মহারাজ! গোধন কা প্রাণ যা রহা হৈ, অব আপ কৃপা করকে বর্ষণ করিয়ে।' অতঃপর কিছুক্ষণ প্রার্থনা করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি হইল। তাহাতে সমস্ত ব্রজ শীতল হইয়া গেল এবং নূতন তৃণাদি জন্মিয়া গবাদি পশুর জীবন রক্ষা হইল। তাঁহাকে কয়েকদিন না দেখিয়া অনুসন্ধান করিয়া আমরা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলাম। এইরূপ আরও একবার গবাদি পশুর ক্লেশ দর্শনে দাউজীতে গিয়া বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ও এইরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল। ইঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'আপনি কি ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন ?' তিনি তৎক্ষণাৎ দীপ্ত হইয়া বলিলেন "মৈঁ তো হররোজ উন্‌কো দর্শন করতা হুঁ। তোমারা ক্যা আঁখ নেহী হৈ। যহ সূর্য্য ঔর চন্দ উন্‌কা আঁখ হৈ, বায়ু উন্‌কা নিঃশ্বাস হৈ। উনকো তো মৈঁ সর্ব্বত্র দেখতা হুঁ। তোমারা মন্দির মে ভী সাক্ষাৎ ভগবান্ বিরাজ-মান হৈ। উন্‌কো ভী তো রোজ দর্শন করতা হুঁ।"

একদিন প্রভাতে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর শৃঙ্গার আরতির পর, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার বসিবার স্থানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় রাজা রামদাসজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু পরেই সহসা বাবাজী মহারাজের দিকে চাহিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কান্নার পর শান্ত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া যেমন সহসা নীরবে আসিয়াছিলেন, তেমনি নীরবে সহসা চলিয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে আশ্রমত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মুখ্য ধাম অযোধ্যা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহার অল্পকাল পরে সংবাদ পাইলাম, সেখানে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

(২)

স্বামী কৃষ্ণদাসজী (সিদ্ধবাবা)—ইনিও একজন উচ্চ সাধন-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ ৩৮০-৮১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে তাঁহার সম্বন্ধে আরও কিছু বিবরণ দেওয়া হইল :—

তাঁহার ভক্তবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দ্বারা তিনি একটি নূতন মন্দির ও আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিন্তু তিনি সেই আশ্রমে বাস করিতেন না। বহির্দ্দেশে একটি ছাতার নীচে অবস্থান করিতেন। এবং দিনের বেলায় একবারমাত্র সামান্য বাজরার আটার রুটি খাইতেন এবং রাত্রে একটু দুধ পান করিতেন মাত্র। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি একবার আমাদের শ্রীবৃন্দাবনের আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাঁহার একটি কঠোর সাধন আমরা এই সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যমুনা হইতে বালি আনাইয়া তাহা দ্বারা আমাদের মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে উন্মুক্ত স্থানে একটি শয্যা রচনা করাইলেন। বেলা বারটা পর্য্যন্ত রৌদ্র পাইয়া তাহা এত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত যে তাহাতে হাত দেওয়া যাইত না। জ্যৈষ্ঠ মাস—এই সময়ে শুধু বৃন্দাবন নহে, সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলে অসহ্য গরম। "লু"র জন্য বেলা দশটার পর বাহিরে যাওয়া যায় না। এই সময়ে ইনি প্রতিদিন সেই উত্তপ্ত বালির উপরে বেলা বারটার সময় প্রচণ্ড রৌদ্রে নগ্নদেহে চিৎ হইয়া শুইয়া সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। বৈকালে চারিটার সময় উঠিয়া গিয়া স্নানাদি করিয়া একটু বাদামের সরবৎ পান করিতেন, পরে রুটী প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। দিনের পর দিন এরূপ তপস্যা চলিল। প্রায় দুইমাস পরে বর্ষারম্ভে তিনি বলিলেন, "আব্ ধূনী ঠাণ্ডা হয়া হৈ, আব্ মহাত্মায়োকো কুছ ভোজন দেনা চাহিয়ে।" তখন তাঁহার সেবকগণ সাধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন।

ইহার পরে আরও অনেকবার তিনি বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। আসিয়া আমাদের ঠাকুরজীর বাগিচায় আসন লাগাইতেন। পরে কিন্তু আর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কঠোর তপস্যা দেখি নাই। এক অনির্ব্বচনীয় স্থির শান্ত আনন্দময় ভাবেই সর্ব্বদা থাকিতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলে যেন শান্তির সমুদ্র বলিয়া বোধ হইত। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার খুব আন্তরিক প্রীতি ও আকর্ষণ ছিল। ইঁহারা দুইজনে বহুদূরে অবস্থান করিলেও পরস্পরের সংবাদ রাখিতেন। গত ১৩৪১ সালের আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কঠিন পীড়া হয়। এই সময় সিদ্ধবাবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থকারকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন—"বাবাজীকা আভী ভোগ দেওয়ালী তক্ হৈ। হামারা ভী তবিয়ৎ খারাপ চলতা হৈ। দেওয়ালী তক হামারা ভী তবিয়ৎ ঠিক হো যায়েগা।" বাস্তবিকই দেওয়ালীর পর বাবাজী মহারাজের শরীরের রোগ কমিয়া গিয়াছিল। কিছুকাল হইল এই মহাত্মা দেহ-রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার ফটো ৩৮০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

(৩)

শ্রীযুক্ত রোহিণীমোহন চক্রবর্ত্তী এম্.এ., বি.এল্. (উকিল, হাইকোর্ট) মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে বিবরণ :—ইনি পাবনা জিলার তারেজা গ্রামের প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থায় মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। এম্.এ. ও বি.এল্. পরীক্ষা পাশ করার পর ১৮৮৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি বহু বিদ্যাশিক্ষার্থীকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া তাহাদের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করিতেন এবং যাহাতে

তাহারা স্বধর্ম্মে ও নিজ নিজ কর্ত্তব্যকার্য্যে রত থাকে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ওকালতিতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ও পসার হইয়াছিল এবং তাঁহার সততার জন্য হাইকোর্টে জজদিগের নিকট বেশ সুনাম ছিল। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার মধুর ব্যবহারে তিনি সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি আজীবন শুদ্ধাচারী ছিলেন এবং কলিকাতা অবস্থানকালে নিত্য গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করা তাঁহার নিয়ম ছিল। কিন্তু কোন প্রকার গোঁড়ামি তাঁহার ছিল না এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি তিনি আন্তরিক সহৃদয়তার সহিত আচরণ করিতেন। তিনি একজন অনলস কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কার্য্য নিজহস্তে সম্পন্ন করিতেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ল কলেজ স্থাপিত হইবার পর হইতে তিনি তথায় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ছাত্রদিগকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার আজীবন সৌহার্দ্দ ছিল এবং উভয়ে একত্রে কয়েকবার শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবার সহিত ব্রজ-পরিক্রমায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের ওকালতি কার্য্যের অবসর সময়ে উভয়েই ধর্ম্মালোচনায় কাল কাটাইতেন এবং শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের ধর্ম্মবন্ধুগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। ১৯৩০ সালের ২৯শে মার্চ্চ কলেরা রোগে তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ হয়। তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি হাইকোর্টের ওকালতি কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন। দেহত্যাগের কয়েক

দিন পূর্ব্বে তিনি শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে এক পত্রে জানান যে, তিনি অল্প কয়দিন পরই ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন। শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও যোগীর মত জীবন যাপন করিতে পারা যায় এবং উচ্চ সাধনশক্তিসম্পন্ন হইতে পারা যায়।

পরিশিষ্ট (গ)

Extract from the Amrita Bazar Patrika

(Town edition, dated 12th November, 1935)

LATE SWAMI SANTADAS

Touching Tributes by the Acting Chief Justice, High Court, Calcutta

Touching tributes were paid by the Acting Chief Justice (the Hon'ble Sir Manmatha Nath Mukherjee) sitting with Mr. Justice S. K. Ghose to the memory of Srimat Swami Santadas Babaji Mohant (formerly known as Mr. Tara Kishore Choudhury).

From his earliest boyhood, said the Chief Justice, Mr. Choudhury gave ample indications of the career that was to be his in the latter part of his life. After a brilliant University career he joined this Court as a Vakil and soon acquired for himself a name and a fame as a learned, acute and able lawyer. With the brilliant parts that were his own and the gifts which Providence had endowed him with, he could not but do so. But all along he had concealed in the inner depths of his mind a hunger and thirst for spiritual knowledge which never allowed him to remain satisfied but goaded him on to more and more vigorous and persistent efforts in a life-long search for Truth. While attaining greater and greater eminence in the profession at the Bar which he had adopted as his own, his inner mind always continued to remain engaged in seeking further

higher knowledge which alone can enable a man to approach his Maker.

After practising as a lawyer in this Court for nearly 26 years and at a time when he was in the height of his glory in the profession and in the best of health, Mr Choudhury startled us all by renouncing the world. The readiness and the cheerfulness with which he responded to the call that came from within and gave up what seemed to everybody a most lucrative practice, was unique and almost unparalleled and is an object-lesson which humanity may well take note of. He retired to Brindaban and devoted himself heart and soul to meditation and worship and after pursuing there and at other places a spiritual careeer for a period of 20 years during which his eminence in that line was duly recognised by those who belonged to it, he has now cast off his mortal coil.

No less than 3000 men and women, many of them are persons of light and leading, claim him as their spiritual guide ; and there is hardly a human being in this country who would not readily accord him that revered position.

His life of 76 years has left behind it his own memorial, more permanent than that of metal or of stone And he will always be remembered within and outside these walls as one who was able to teach others that, after all, the pomp and pageantry of the life that is led, are of little worth compared with that rest and peace which the inner man finds in his communion with the Maker.

We join with all in praying to the Almighty that Mr. Tara Kishore Choudhury may find the goal that he was all along striving for.

(বঙ্গানুবাদ)

অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত

(কলিকাতা সংস্করণ, ১২ই নভেম্বর, ১৯৩৫)

স্বামী সন্তদাস

কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের মর্ম্মস্পর্শী শ্রদ্ধাভিব্যক্তি

হাইকোর্টের বিচারমঞ্চে বিচারপতি মিঃ এস্. কে. ঘোষ সহ উপবিষ্ট অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহন্ত মহারাজের (পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী নামে পরিচিত) স্মৃতির প্রতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রধান বিচারপতি মহাশয় বলেন, মিঃ চৌধুরী জীবনের পরবর্ত্তীকালে কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহা তাঁহার বাল্যজীবনের প্রারম্ভেই তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছিল। ছাত্রজীবনে সমুজ্জল প্রতিভার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে তিনি এই আদালতে উকিল স্বরূপে যোগদান করেন এবং অবিলম্বেই সুবিজ্ঞ, তীক্ষ্ণধী ও সুযোগ্য ব্যবহারজীবীরূপে সুনাম ও সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ উজ্জল গুণাবলী ও বিধিদত্ত শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত না। কিন্তু অনবরত তাঁহার হৃদয়ের সুগভীর প্রদেশে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য যে বুভুক্ষা ও পিপাসা সুগুপ্ত ছিল, তাহাতে তিনি নিজের অবস্থায় তৃপ্ত থাকিতে পারিতেন না, এবং তাহারই তাড়নায় জীবনব্যাপী সত্যান্বেষণে

ক্রমশঃ অধিকতর প্রবল ও অক্লান্ত চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। একদিকে তিনি যেমন তাঁহার অবলম্বিত ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন, অপরদিকে তাঁহার অন্তরাত্মা যে উচ্চ জ্ঞান লাভে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা যায় সেই জ্ঞানের অনুসন্ধানে নিয়ত ব্যাপৃত ছিল।

তাঁহার এই আদালতে প্রায় ছাব্বিশ বৎসর কালে আইন-ব্যবসায়ীরূপে কার্য্য করিয়া তিনি যে সময়ে ব্যবসায়ক্ষেত্রে গৌরবের সমুচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি উত্তম স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়েই সংসার ত্যাগ করিয়া আমাদিগের সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন। যেরূপ তৎপরতা ও প্রফুল্লতার সহিত তিনি অন্তরের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন এবং সকলের নিকটে যাহা অত্যন্ত অর্থকরী ব্যবসা বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তাহা ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই বলিলেই হয়।

এই দৃষ্টান্ত হইতে যে বাস্তব শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহা মানব মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বৃন্দাবনে গিয়া ভগবচ্চিন্তায় এবং ভগবদারাধনায় মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং কুড়ি বৎসর কাল বৃন্দাবন ও অন্যান্য স্থানে ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে যে উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক মার্গাবলম্বী সাধুগণ তাহা যথাযথরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অন্যূন তিন সহস্র নরনারী তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন। এই দেশে এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি তাঁহাকে অধ্যাত্ম গুরুর মর্য্যাদা প্রদান করিতে বিমুখ হইবেন।

তিনি তাঁহার ছিয়াত্তর বৎসরব্যাপী জীবনের স্মৃতির যে নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, ধাতু বা প্রস্তর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ অপেক্ষা তাহা অধিককাল স্থায়ী। এই বিচারালয়ের অভ্যন্তরে ও বাহিরে লোকশিক্ষকরূপে তাঁহার স্মৃতি বিদ্যমান থাকিবে। অন্তরাত্মার সহিত ভগবানের যোগ সংস্থাপিত হইলে যে বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করা যায়, তাহার তুলনায় জীবনের ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের মূল্য অতি সামান্য।

শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী যে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য আজীবন বিপুল চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি যেন তাহা লাভ করেন। অদ্য আমরা সকলের সহিত মিলিতভাবে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি।

Extract from the Forward

(Town edition, dated 1st December, 1935)

MOHANT SANTADAS BABA

From a Lawyer to a Saint

Leading exponents of different schools of religious thoughts in Bengal who, in the language of the poet, are characterised as "true to the kindred points of heaven and home" studied the life and teachings of Brojobidehi Mohant Santadas Baba (known as Mr. Tarakishore Choudhury before his initiation) at a memorial meeting held yesterday (Saturday) at the Albert Hall under the auspices of the Sylhet Union under the presidency of the Hon'ble Sir Manmatha Nath Mukherjee, acting Chief Justice of Bengal. The speakers, who included friends of the Mohant since his boyhood and brother lawyers at the High Court, paid respectful tributes to His Holiness pointing out to his sacrifice and renunciation and advising the youths, who had assembled in large numbers, to emulate the noble ideal and lessons of the Mohant's life.

Dr. Sundari Mohan Das, who belongs to the home-district of Mohant Baba, in proposing Sir M. N. Mukherjee to the chair pointed out the great change of His Holiness' life from a lawyer to a saint.

Kumar Saradindu Narayan Roy of Dinajpur seconded the proposal.

The President read out a telegram from Mr. Narendra Nath Sett, Advocate, and a letter from the Mohant of

the Nimbarka Asram at Sibpur. The latter believed that Santadas Baba had fulfilled his great mission in life and identified himself with the Supreme Being.

Sj. Krishna Kumar Mitra in narrating his association with the late Mr. Tarakishore Choudhury, revealed an old chapter of the renaissance period of Bengal in the seventies of the last century. He recalled that the boarding house at 14, College Street was the meeting place of a band of students who in later life became prominent in various fields of activities. It was here he first met Tarakishore Choudhury in 1874 along with Surendra Nath Banerjee, Ananda Mohan Bose, Bepin Chandra Pal, Dr. Sundari Mohan Das and Pandit Sitanath Tattwabhusan. He described the different stages of the Mohant's religious life. From a Brahmin boy he became almost an agnostic. Next he was inclined to Brahmo doctrine for some time. Later he became a Yogi and finally the call of Vaishnavism appealed to him to such an irresistible degree that he left the life of a lawyer.

Swami Chandreswaranand of the Ramkrishna Mission in paying his homage to the Mohant referred to the spiritual wealth of India.

Bond of Love

Pandit Sitanath Tattwabhusan, who also belongs to Sylhet said that he was tied with the bond of love and respect to Santadas Baba from his boyhood. He held that every one should have a balanced mind before adopting any system of religion and referred to the religious susceptibilities of his friend.

Mahamahopadhyaya Durgacharan Sankhya-Vedantatirtha traced the religious undercurrent flowing through the mind of the Mohant all through his life and said that material prosperity was not enough for spiritual peace and happiness. The heart of a man yearns for going back to the Supreme Being who sent him to this world.

A True Devotee

Mr. Hirendranath Dutta paid tribute to the keen intellect and forensic acumen of Mr. Tarakishore Chowdhury as a lawyer. He ranked him with great devotees (Bhakta) like Chaitanya, Jesus Chirst and Mirabai as distinguished from heroes Karmi) like Shivaji, Napoleon. Julius Cæser and sages (Jnani) like Sankaracharya, Buddha, Plato and Hegel. His great hunger for the Absolute made him respond to the call of Vaishnavism. Mr. Dutta had an opportunity to study during a short stay at Bankipur the spotless character, affecionate heart which attracted a large number of devotees at Brindaban. Though he had left the mortal coil, Mr. Dutta added, the Mohant would bless his countrymen from the other world. "We can make our lives purer and nobler by worshipping the saint".

President's Speech

Sir M. N. Mukherjee thanked the organisers of the meeting for giving an opportunity to pay his homage to one who was a brother lawyer with him at the High Court. The President recalled his first meeting with the Mohant in 1897 after passing the B. L. examination when he was an articled clerk to Mr. Ramcharan Mitra. Sir M. N. Mukherjee

characterised Mr. Choudhury as a first class lawyer who commanded careful attention even from the late Sir Rashbehari Ghose when the two represented opposite parties. The President distinctly remembered the day when Mr. Choudhury left the profession for the life of a saint. Mr. Choudhury argued a second appeal till 1-45 P. M., came to the Bar Library and took farewell of brother lawyers. Even Sir Rashbehari Ghose who never bowed his head to anybody, took the dust of Mr. Choudhury's feet. Sir Manmatha who had watched the career of Mr. Choudhury for about 18 years sitting face to face across a table at the Bar Library, wondered at the great sacrifice of a well-established lawyer. The scene left an imperishable impression on his mind. He referred to his meeting with the Mohant at Kumbha Mela at Allahabad where he asked him several questions and got answers The two lessons of the Mohant's life, the President said, were :—

(1) A seeker of Truth is not deterred by difficulties in his pursuit.

(2) Man wanted something more than material prosperity for the peace and happiness of the mind.

The President hoped that many of the audience would follow the lessons of this great life to make themselves nobler.

Prof. R. K Roy moved the vote of thanks to the chair.

(বঙ্গানুবাদ)

ফরওয়ার্ড পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত

(কলিকাতা সংস্করণ, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

মহন্ত সন্তদাস বাবা

ব্যবহারজীবী হইতে সাধুরূপে পরিণতি

গতকল্য (শনিবার) এলবার্ট হলে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর উদ্যোগে বাংলার অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় কবির ভাষায় বলিতে গেলে 'স্বর্গ ও গৃহের মধ্যে যে সকল বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তাহার প্রতি নিষ্ঠাবান্' বলিয়া যাহাদিগকে অভিহিত করা যায়, এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অভিব্যক্তকারী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রজবিদেহী মহন্ত সন্তদাস (পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী নামে পরিচিত) বাবার জীবন ও তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা এবং উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বক্তৃগণ পরলোকগত মহাত্মার বিরাট স্বার্থত্যাগ ও সংসারত্যাগের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন এবং সভায় সমবেত যুবকবৃন্দকে মহন্ত মহারাজের জীবনের মহান্ আদর্শ ও শিক্ষা হইতে আত্মোৎকর্ষ লাভের চেষ্টা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। বক্তাদের মধ্যে মহন্ত মহারাজের বাল্যবন্ধু ও হাইকোর্টে সমব্যবসায়ী ব্যবহারজীবিগণও ছিলেন।

মহন্ত মহারাজের স্ব-জিলা নিবাসী ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতির আসন গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় মহাত্মা সন্তদাসজী কিরূপ মহান্ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া উকিল হইতে সাধুরূপে পরিণত হন, তাহার উল্লেখ করেন।

দিনাজপুরের কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

সভাপতি মহোদয় এডভোকেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠের প্রেরিত টেলিগ্রাম এবং শিবপুর নিম্বার্ক আশ্রমের মহন্তের পত্র পাঠ করেন। সন্তদাস বাবাজী তাঁহার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া মহন্তজী বিশ্বাস করেন। এই কথা পত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরীর সহিত তাঁহার সাহচর্য্যের উল্লেখ করিতে গিয়া গত শতাব্দীর সপ্ততিপর্য্যায়ভুক্ত সময়ে বাংলার পুনরুত্থানযুগের এক পুরাতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করেন। তিনি বলেন যে, ১৪নং কলেজ ষ্ট্রীটস্থিত বোর্ডিংগৃহ এরূপ একদল ছাত্রের মিলনক্ষেত্র ছিল—যাহারা উত্তর জীবনে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই স্থানেই ১৮৭৪ সালে তিনি প্রথমে তারাকিশোর চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস ও পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের সাক্ষাৎলাভ করেন। তিনি অতঃপর মহন্ত মহারাজের ধর্ম্মজীবনের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেন। ব্রাহ্মণসন্তান হইতে তিনি প্রায় নিরীশ্বরবাদীতে পরিণত হইয়াছিলেন; তৎপর কিছুকাল তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের নীতির প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন, অনন্তর যোগীসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে বৈষ্ণবধর্ম্মের আহ্বানে তাঁহার চিত্তকে এরূপ অপ্রতিহত বেগে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে তিনি সেই আহ্বানে ওকালতি ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ মহন্তজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশকালে ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের উল্লেখ করেন।

প্রেমের বন্ধন

শ্রীহট্টনিবাসী পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় বলেন যে, তিনি বাল্যকাল হইতে সন্তদাস বাবার সহিত প্রেম ও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি এই মত অভিব্যক্ত করেন যে কোন ধর্ম্মমত গ্রহণের পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই মনের সাম্যাবস্থা থাকা উচিত। অতঃপর তিনি তাঁহার বন্ধুর ধর্ম্মমতগ্রহণক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করেন।

মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহন্তজীর জীবনের সমগ্র সময়ে কিরূপে ধর্ম্মের একটা অন্তঃপ্রবাহ তাঁহার মনের মধ্যে প্রবাহিত হইত, তাহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দলাভের পক্ষে পার্থিব সুখ-সম্পদ পর্য্যাপ্ত নহে। পরমাত্মা মানুষকে এই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, মানুষের প্রাণ তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাওয়ার জন্যই ব্যাকুল হয়।

প্রকৃত ভক্তবীর

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ব্যবহারজীবীরূপে শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের প্রখর ধীশক্তি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তিনি কর্ম্মবীর শিবাজী, নেপোলিয়ন, জুলিয়াস সীজার এবং জ্ঞানবীর শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ, প্লেটো এবং হেগেলের সহিত তাঁহার স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য, যীশুখ্রীষ্ট এবং মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্তগণের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মলাভের জন্য তাঁহার প্রাণের যে প্রবল বুভুক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল তাহারই প্রেরণায় তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বাঁকীপুরে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

সন্তদাসজীর যে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও স্নেহময় হৃদয় বহুসংখ্যক ভক্তকে বৃন্দাবনে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার সম্পর্কে অনুশীলনের সুযোগ তিনি সেই সময়ে পাইয়াছিলেন। মহন্তজী যদিও নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে পরলোক হইতে আশীর্ব্বাদ করিবেন। 'সাধু মহাত্মার পূজা করিয়া আমরা আমাদের জীবনকে মহত্তর ও পবিত্রতর করিতে পারি।'

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতি মহোদয় হাইকোর্টে তাঁহার সমব্যবসায়ী একজন ব্যবহারজীবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ প্রদানের জন্য সভার আহ্বানকারীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ১৮৯৭ সালে বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি যখন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্রের 'আর্টিকেল ক্লার্ক' ছিলেন, তখন মহন্ত মহারাজের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবীরূপে অভিহিত করেন এবং যখন তিনি ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ মামলার বিরুদ্ধপক্ষে উকিল স্বরূপে উপস্থিত হইতেন, তখন স্যার রাসবিহারীও সতর্কতা ও অভিনিবেশ সহকারে কার্য্য করিতেন। চৌধুরী মহাশয় যেদিন ব্যবসায় ছাড়িয়া সাধুজীবন যাপনের জন্য চলিয়া যান, সেই দিনের কথা তাঁহার স্পষ্টরূপে স্মরণ আছে। চৌধুরী মহাশয় পৌনে দুইটা পর্য্যন্ত একটি আপীলের মোকদ্দমায় সওয়াল জবাব শেষ করিয়া বার লাইব্রেরীতে আসিয়া সমব্যবসায়ীদিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ করেন। এই সময় স্যার রাসবিহারী ঘোষ, যাঁহার মস্তক কাহারও নিকট অবনত হইত না তিনিও চৌধুরী মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। স্যার মন্মথ বার লাইব্রেরীতে চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখীন ভাবে বসিতেন।

তিনি আঠার বৎসর কাল তাঁহার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত উকিলের এরূপ মহান্ স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। এই দৃশ্যে তাঁহার চিত্তে একটি ভাব চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিল। অতঃপর তিনি এলাহাবাদ কুম্ভমেলায় মহন্তজীর সহিত সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন করিয়া তাহার সদুত্তর পাইয়াছিলেন। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, মহন্তজীর জীবন হইতে এই দুইটি শিক্ষা লাভ করা যায়—

(১) সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহার গন্তব্যপথে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও নিরস্ত হন না।

(২) মানুষ মানসিক শান্তি ও আনন্দ লাভের জন্য পার্থিব সম্পদের অতিরিক্তও কিছু চায়।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় এই আশা ব্যক্ত করেন যে, শ্রোতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁহাদিগের স্ব স্ব জীবনকে মহত্তর করিবার জন্য এই মহান জীবনের শিক্ষা অনুসরণ করিবেন।

অতঃপর অধ্যাপক বি. কে. রায় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ঠাকুরের মন্দির	ঠাকুর মন্দিরের	৭৪	২
হেব	হ্যাব্	১০১	৫
থুব	খুব	১২৭	১০
মর্ত্তি ছিলেন।	মর্ত্তি ছিলেন।”	১৩৯	১৬
গাড়ার	গাড়ীর	১৫৪	১০
চিত্ত	চিত্তকে	১৮০	১৫
দেয়	দেশ	১৮২	৭
দ্বাদশ	ত্রয়োদশ	২০১	৬
দুইবার	সাতবার	২০১	৭
অপেক্ষ	অপেক্ষা	২০২	১৬
হৈ	হ্যার্	২০৩	২১
”	”	২০৪	৯
”	”	”	২৪
কাজ	কাজ	২০৫	১
হৈ	হ্যার্	”	১০
”	”	২০৬	৪
”	”	২০৭	১৮
”	”	”	২০
”	”	২০৮	২
”	”	”	১৬
চাকর	ঢাকর	২০৯	১৩
হৈ	হ্যার্	”	১৪
”	”	২১০	৭
বহ্	ইয়ে	২১৫	৮
হৈ	হ্যার্	”	৯
”	”	২১৯	৭
বহ্	ইয়ে	”	১১
সহ	”	”	১৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
হৈ	হার্	২২১	১০
বহ	হয়ে	„	„
হৈ	হার্	„	„
„	„	„	১১
মন্দির	নাটমন্দির, মন্দির	২২৫	১২
বহ	হয়ে	২˚	১৩
বহাঁভি	হিঁয়া ভী	২৯১	১০
বহাঁ	হিঁয়া	„	„
হাঁয়	হার্	„	১১
„	„	„	১২
ম্যাগী	এ্যাগী	„	১৪
বন্দোবস্ত	বন্দোবস্ত	৩২০	১৭
শ্রীশ্রীঠাকুরজার	শ্রীশ্রীঠাকুরজীর	৩৭৮	১৮
হৈ	হার্	৩৮১	১৯
„	„	„	„
„	„	„	২৪
„	„	৩৮৩	২১
অন্তর্ভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত	৩৮৫	১২
বণিত	বর্ণিত	৪১৬	৩
পাবি	পারি	৪১৭	৯
আকষণ	আকর্ষণ	„	১৭
আবার	০	৪০৮	১১
সদসৎউচ্চনীচ	সদসৎ উচ্চনীচ	৪১৯	৩
এই দিকটি	একটি দিক	৪২৭	১
তস্তু	তন্তুং	৪৮০	৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪৬১ পৃষ্ঠার ৪র্থ পংক্তির পর এবং ৫ম পংক্তির পূর্বে নিম্নলিখিত পংক্তি যোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে—তাঁহার প্রকৃতিতে উদারতা ও কার্পণ্য, করুণা ও গাম্ভীর্য, কোমলতা ও কঠোরতা, কর্মশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তা, সর্বজ্ঞতা ও অজ্ঞতা এই সকল বিরুদ্ধ ভাবের যুগপৎ সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়.